হিমালয়

দুই শতকের নির্বাচিত হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী

সম্পাদনা / স্বপন রায়

বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

HIMALAYA
a collection of bengali travelogues
on himalayas
Edited by SWAPAN ROY

প্রথম প্রকাশ

১৭ এপ্রিল, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ চিত্র
আশিস মুখার্জী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

শব্দগ্রন্থক
শুভায়ণ গুহ, সত্যব্রত ভাবক এবং বিমান মজুমদার
শুভ কম্পিউটার ওয়ার্কস
৯৮/৩০ গোপাল লাল ঠাকুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩৬

মুদ্রক
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৭ বি লেক ভিউ রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

প্রকাশক
বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়
বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অস্ত্যুত্তরস্যাং
দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম
নগাধিরাজঃ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কমলা মুখোপাধ্যায়

সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণব নাগ

শিশির ঘোষ

বন্দিরাম চক্রবর্তী

শুক্লা সরখেল

অজয় ভট্টাচার্য

অধীর বিশ্বাস

অদ্বৈত আশ্রম লাইব্রেরী (ইন্টালী)র কর্মিবৃন্দ

কলকাতা নগর গ্রন্থাগার (পার্কসার্কাস)এর কর্মিবৃন্দ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সূচী

সংকলন প্রসঙ্গে

হিমালয় কথাটির মধ্যে যে কী অনিবর্চনীয় যাদু আছে তা হিমালয় প্রেমিক মাত্রেই জানেন। চার অক্ষরের এই শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারায় ফুটে ওঠে এক অন্যতর ছবি। নীল আকাশের বুকে তুষারধবল শৃঙ্গ শোভিত অগণিত পর্বতের শ্রেণী। সম্মোহনের মত হাতছানি দিয়ে ডাকে। হিমালয়ের সেই মহিমাময় সত্তার অমোঘ অকর্ষণ উপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই। মহান কোন শিল্পীর গড়া অপার্থিব সৌন্দর্য যাকে একবার মুগ্ধ করেছে তার সমস্ত জীবন ঐ সুন্দরের কাছে বাঁধা পড়ে যায়। বারবার সে ছুটে যায় সেই সুন্দরের অভিসারে। আর প্রতিবারই তার অতৃপ্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। বাকি জীবনেও সেই সৌন্দর্যতৃষ্ণা মেটে না।

ভারতবাসী হিসাবে আমরা ভীষণভাবে গর্বিত এই কারণে যে আমাদের হিমালয় আছে। পৃথিবীর অন্যকোন পর্বতের মহত্ত্ব হিমালয়কে ম্লান করতে পারে না। হিমালয়ের রূপ দর্শন করলে মনের সমস্ত দরজা খুলে যায়। মন প্রাণ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নির্মল আলো। সে আলোয় জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, অন্ধকার দূরে সরে যায়। জীবন হয় ঋদ্ধ; মন প্রাণ ভরে যায় অনাবিল প্রশান্তিতে।

কী সেই অনির্বচনীয় বস্তু যা দিয়ে হিমালয় যুগ যুগ ধরে ঋষি মহাত্মা থেকে সাধারণ মানুষকে আবিষ্ট করে রেখেছে? এককথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কী বিপুল বিশাল ঐশ্বর্যের আকার এই হিমালয় তা পরিমাপ করাও দুঃসাধ্য। মহাকবি কালিদাস যে হিমালয়ের মধ্যে ভারতাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যেও হিমালয়ের সেই রূপ বৈচিত্র্য নিয়ে আলেখ্য নিমার্ণের কাজ সুদীর্ঘকাল ধরে চলেছে। শুধু মাত্র হিমালয়কে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে অজস্র অনবদ্য ভ্রমণ সাহিত্য।

আমরা দুই শতক সীমার মধ্যে পঞ্চাশজন লেখকের ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে এই সংকলন গ্রন্থ সাজিয়ে দিলাম। যেকোন সংকলনই কিছু বিতর্কের সূচনা করে। এটিও সম্ভবত তার বাইরে নয়। যেহেতু প্রতিটি পাঠকের রুচি পছন্দ জীবনদর্শন ভিন্ন, তাই এক এক জন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সংকলনকে দেখবেন। এখানে লেখকরা নানা আঙ্গিকে হিমালয়ের অন্তহীন বৈভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বৈচিত্র্যময় রচনার মধ্যে হিমালয়ের নানা দিক যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে সব ধরণের পাঠককে সন্তুষ্ট করবে বলে আশা রাখি।

এই সংকলনের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক করেছিলাম যে কেবল বাংলাভাষায় লেখা গ্রন্থ থেকেই হিমালয় ভ্রমণ এর কথা চয়ন করব। সেই কারণে বাংলায় লেখা নয় বলে কালিদাস, রাহুল সংকৃত্যায়ন, স্বামী প্রণবানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, পল ব্রান্টন প্রমুখের মূল্যবান রচনার অংশ এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

হিমালয়কে ভিত্তি করে বাংলায় লেখা অধিকাংশ ভ্রমণ কাহিনী কেদার বদরীনাথকে ভিত্তি করেই রচিত। হিমালয়ের এই দুই তীর্থ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তাই সর্বকালেই এই

তীর্থদুটির যাত্রী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তার কারণ অন্য সমস্ত আপাত দুর্গম তীর্থ অপেক্ষা কেদার বদরী ভ্রমণ অনেক সহজ। ভ্রমণার্থীরা সেই ভ্রমণ এবং তীর্থদর্শনকে অক্ষয় করে রাখার জন্যে গ্রন্থ রচনা করেন। কাজেই কেদার বদরীর ওপর যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চল ততটা গ্রন্থিত হয়নি। এখানে কেদারনাথ, বদরীনাথ এবং কৈলাসের জন্যে দু'জন করে লেখকের রচনা সংকলিত হয়েছে। এতে সেকাল এবং একালের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পাঠক নিশ্চিত বৈচিত্র্যের সন্ধান পাবেন। যেমন বিবর্তনের স্বাদ পাবেন লেখকদের বানান ব্যবহারে। মূল রচনার বানান সর্বত্রই অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি। তাই 'তৈরি' কখনো হয়েছে 'তৈরি', 'বদরীনাথ' হয়েছে 'বদরিনাথ'।

বর্তমান সংকলনের পরিকল্পনা করেছিলেন মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। মলয়শঙ্কর সুদক্ষ সম্পাদক। কাজটি তিনি করলে গ্রন্থটি অন্য মাত্রা পেত। কিংবা যদি করতেন বিশিষ্ট হিমালয় প্রেমী, পর্বতারোহী এবং লেখক প্রদীপ্ত চক্রবর্তী। প্রথমজন শারীরিক কারণে এবং দ্বিতীয়জন সময় অভাবের জন্য সংকলনটি সম্পাদনা করার গৌরব পেলেন না। প্রদীপ্ত চক্রবর্তী একসময় কাজ শুরুও করেছিলেন বিশেষ আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু শেষ করেননি। যাহোক, শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়ে। আমার সৌভাগ্য এই যে সম্পাদনার কাজে আমি এই দুই অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সুপরামর্শ এবং সাহায্য পেয়ে সংকলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করেছি।

আরেকটি কথা অবশ্যই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের কাজে যার কাছে গিয়েছি, তিনিই মাত্রাতিরিক্তভাবে সাহায্য করেছেন। গ্রন্থভুক্ত লেখকদের কাছ থেকে যে উদার সাহায্য, সাহচর্য এবং বন্ধুতা পেয়েছি তা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে। হিমালয়ের উদার মহত্ত্ব যেন সূক্ষ্মভাবে লেখক পর্যটকদের মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

আমরা হিমালয় ভ্রমণ কাহিনীর সংকলন করতে চেয়েছি। এখানে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকরা ভাষায় ভঙ্গিতে তাঁদের লেখকসত্তার পরিপূর্ণ দক্ষতা প্রকাশ করেছেন হিমালয়ের বহুমাত্রিক সৌন্দর্য রহস্য উদ্‌ঘাটনে। এই সংকলন হিমালয়ের খন্ড খন্ড আলেখ্য। যা পাঠকের কল্পনা দৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করার এক প্রচেষ্টা মাত্র। পাঠকের সেই অমূল্য কল্পনাদৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হবার ভয়ে এই সংকলনে কোন আলোকচিত্র দেওয়া হল না।

সম্মানীয় লেখকরা তাঁদের রচনা পুণর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাকে ও বুকট্রাস্টকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। পরিশেষে এই অর্বাচীন সম্পাদককে সংকলন গড়ার স্বাধীনতা এবং আনন্দময় সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন বুক ট্রাস্টের বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়। অলমিতি।

স্বপন রায়

১২ ডি রামমোহন বেরা লেন
কলকাতা-৭০০০৪৬

হি মা ল য়

দুই শতকের নির্বাচিত হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী

যদুনাথ সর্বাধিকারী
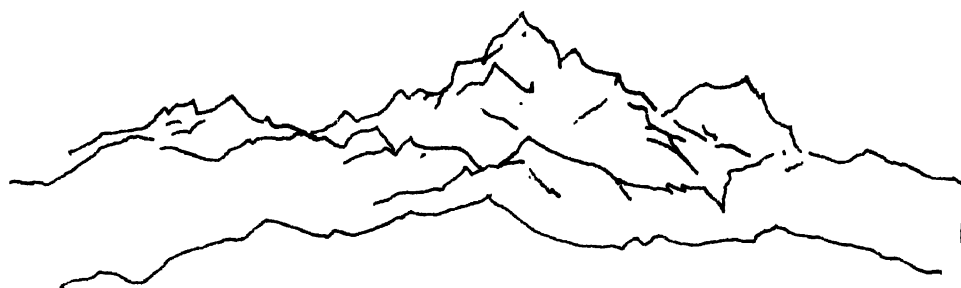
কেদারনাথ

অতি প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বস্ত্রত্যাগ করিয়া কেদারনাথ দর্শনার্থে গমন। গাত্রে তুলাভরা জামা, তাহার উপর লুই, বনাত (ও) কম্বল মুড়ি দেওয়া, হাতে আপন আপন যষ্টি, স্কন্ধে পূজা ভেটের দ্রব্যাদি। ইহার পূর্ব্বে চারি দিবসের পথ পাহাড় হইতে বিল্বদল সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহার পর আর বিল্ববৃক্ষ নাই। ঐ বিল্বদল এবং ঘৃত, মধু, চিনি ও মেওয়া জাত যে যাহা লইয়া আসিয়াছিল, তাহা লইয়া "বম্ কেদার" বলিয়া কেদারনাথ দর্শনে যাত্রা করিল। ভীমগড়া হইতে চারি ক্রোশ পাহাড়ে উঠিতে হয়। তাহার এক ক্রোশ পথ কোথাও পর্ব্বতের পাথর, কোথাও বা বরফ, কোথাও বা বরফ-গলা জল, কোথাও ঘাসপাতা, এই মতে এক ক্রোশ। তাহার পর তিন ক্রোশ ক্রমিক বরফের উপর হইয়া পথ। পর্বতের উচ্চের কথা কি লিখিব। গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় চারি শত ক্রোশ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া গমন করিতে হয়, বরফের পর্ব্বত — কত যুগের বরফ জমিয়া আছে, তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার। চলিতে পায়ের সাড় থাকে না, যেমন ঝিন্‌ঝিনা হইয়া পা অসাড় হয়, সেই মত বরফে পদক্ষেপে পদের অচৈতন্য হয়। পথের ভীষণত্ব কি কহিব! বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত, তাহার বরফ সকল কাটিয়া পথ হইয়াছে, এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে — এই পরিসর পথ, যে যে স্থানে পদের কোন চিহ্ন আছে, তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশেপাশে পদক্ষেপ করে, তবে মহাবিপদ হয়। পশ্চিম দিক পদক্ষেপ হইলে বরফে কোমর পর্য্যন্ত কোথায় অস্থায়ী হইয়া ডুবে, পূর্ব্ব দিকে পদক্ষেপ হইলে কোথায় যায় তাহার নিরাকরণ হয় না, তাহার কারণ পাহাড়ের গড়েন; কম-বেশী দশ হাজার হাত নিম্নে মন্দাকিনী বহিতেছেন, তাহার উপরে বরফ আচ্ছাদিত আছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বরফ গলিয়া ফাঁক হইয়াছে, তথায় জানা যায় যে, মন্দাকিনীর স্রোত বহিতেছে। ঐ পূর্ব্বদিকে পদক্ষেপ হইলে একেবারে বরফে মগ্ন হইয়া গঙ্গায় পতিত হয়। এক ব্যক্তির পা

বেহিসাব পড়িয়াছিল, সে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অনেক নিম্নে বরফের উপরে পতিত আছে। প্রায় এক মাহা হইল প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বরফের গুণে পচে গলে নাই, তাজা আছে। এই সুকঠিন পথ হইয়া এক পুল পার হইয়া কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়, পুল হইতে এক ক্রোশ। এ বৎসর একশত এগার হাত বরফ পড়ে, তাহা কাটিয়া মন্দির বাহির করে। মন্দিরের চিহ্ন ইহাতে পায় যে, যত উচ্চ হইয়া বরফ পড়ুক, মন্দিরের উপর যে ত্রিশূল আছে, তাহা আবৃত হইবে না। যে সমস্ত বাড়ী, ঘর, কুণ্ড, তীর্থ (ও) দেবালয় আছে, সকল বরফে ঢাকিয়া আছে — কেবল ধবলাকার, তাহাতে অন্য চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, দেখিতে সুশোভিত। পুরাতন যে বরফ আছে, তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন, নূতন যে বরফ তাহা অতি শুভ্র, সাফা লবণের ন্যায় দানাদার।

কেদারনাথ দর্শনের প্রথমে পঞ্চগঙ্গাতে স্নান-তর্পণ, পরে হংস-তীর্থে শ্রাদ্ধাদি গৃহী মনুষ্যে করিয়া দেবদেব মহাদেবের দর্শন। এ স্থলে পঞ্চগঙ্গা— অলকানন্দা, মন্দাকিনী, দুধগঙ্গা ক্ষীরগঙ্গা (ও) মৌগঙ্গা। এই পঞ্চগঙ্গার সঙ্গম-স্থানে স্নান-তর্পণ, শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিয়া, শ্রীঁকেদারেশ্বর দর্শন করা হইল। তেহারা মন্দির মধ্যে মহিষাকৃতি মূর্ত্তি। শ্রীঁদেবদেব মহাদেবের মহিষমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বহুঁকালের মন-মানস এবং দেহ ও চক্ষুর সফলতা করিয়া পর্ব্বতে উঠিবার এবং বন-জঙ্গলের ক্লেশের শান্তি হইল। গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চগঙ্গার সঙ্গম-জলে স্নান করাইয়া বিল্বদল চন্দন দিয়া পূজা করিয়া প্রদক্ষিণান্তর কোল দিতে হয়। মন্দির অতিশয় অন্ধকার, অষ্টদিকে অষ্ট স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভ বেষ্টিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া কেদারকে কোল দিয়া বারংবার প্রদক্ষিণ।

কেদারের মন্দির বরফে ডুবিয়াছিল। অদ্যাবধি মন্দিরের ভিতরের সকল বরফ যায় নাই, সর্ব্বদা জল পড়িতেছে। এই বরফ জন্য শ্রীঁকেদারনাথ ও শ্রীশ্রীঁবদরীনারায়ণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর হইতেঅক্ষয়-তৃতীয়া পর্য্যন্ত ছয় মাহা দ্বার রুদ্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে এক এক ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিত করিয়া তাক মধ্যে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অসিমঠ ও জোযীমঠ দুই স্থানে দুই গদি আছে। ঐ গদিতে ছয় মাহা পূজা হয়। কেদারনাথের গদি অসিমঠে। মন্দিরের নিকট কোন মনুষ্য কি জীবজন্তু পশু পক্ষ্যাদি কিছু থাকিবার ক্ষমতা হয় না। ঐ ছয় মাস দেবগণে পূজা করে, এ কথা পূর্ব্বাবধি সকলে শ্রুত আছেন। এক্ষণে দেবতাগণের পূজা করার

এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে, ঘরের ভিতরে ঐ ঘৃত প্রদীপ জ্বালিত থাকে, আর অর্ঘ্যের চাউল ও নীলকমল দিয়া যে পূজা হয়, তাহা ঐ মন্দির মধ্যে থাকে। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিবস মন্দির ও পথ খোলসা হইলে টেরির রাজা অগ্রে দর্শনার্থে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হন। রাজা দর্শন করিবা মাত্র ঐ ঘৃত-জ্বালিত প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। প্রদীপের বাতি ও গুল যাহা থাকে তাহা, আর ঐ দেবপূজিত অর্ঘ্যের চাউল ও কমল-পুষ্প রাজা লয়েন, পরে অর্ঘ্যের চাউল ও প্রদীপের গুল ও বাতি রাজা কাহাকেও দেন না, কমল-পুষ্প যাত্রীদিগকে নির্ম্মাল্য দিবার জন্য রাওলের নিকট কেদারনাথের ভাণ্ডারে আমানত থাকে। অর্ঘ্যের চাউলের অতি অল্প ভাগ ভাণ্ডারে আইসে, অনেক স্তব-স্তুতিতে যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহাকে দেন।

মহাপন্থা ও হিমলিঙ্গেশ্বর

মন্দির মধ্যে ঘৃতের প্রদীপ দিবারাত্র জ্বলিতেছে, আলো না হইলে কিছু দৃষ্ট হয় না। নাটমন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে, আর মন্দিরের ভিতর বাহিরে কত দেবদেবী, মুনিঋষিগণের মূর্ত্তি, আর নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে নন্দিকেশ্বর আছেন।

মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে আসিতে বরফে স্পন্দন রহিত হয়। কেদারের মন্দিরের উত্তর দিক্ হইয়া মহাপন্থা। এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তর মুখে গমন করিয়া যাইতে পারিলে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব, যাঁহাকে স্পর্শ করিবা মাত্র দেহ বজ্র তুল্য হইয়া সকায়াতে স্বর্গে গমন করিতে পারে। কিন্তু এই তিন ক্রোশ পথ যাওয়া অতি দুষ্কর, তাহার কারণ দিবারাত্র, বরফ জলের ন্যায় বরিষণ হইতেছে, এই শীতবীর্য্যে কেহ মহাপন্থাতে গমন করিতে পারে না। যদি কেহ সাহস করিয়া ঐ পথে গমন করে, তাহা কদাচ পঁহুছিতে পারে না। তাহার কারণ ঐ পন্থাতে পদক্ষেপ করিতে যদি কিছু শব্দ হয়, তবে এমত বরফ খসিয়া পড়ে যে, তাহাতে প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই — তাহার নাম খুনি বরফ। যে অঙ্গে ঐ বরফ স্পর্শ হয়, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ খসিয়া পড়ে। এই সকল কারণ জন্য শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের এবং টেরির রাজসরকার হইতে ছত্রিশ জন পার্ব্বতীয় মনুষ্য রক্ষক আছে — কোনক্রমে কেহ বিনানুমতিতে ঐ পথে না যাইতে পারে।

যে সকল রক্ষকগণ আছে, তাহারা লোমসমেত দুম্ব-ভেড়ার চামড়ার জামা, ইজার, টুপী (এবং) তাহার উপর কম্বল আচ্ছাদনে থাকে। অগ্নির কুণ্ড সমভ্যারে ঐ

রক্ষকগণ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কষ্টে যাইতে পারে, তাহার পর গমনের ক্ষমতা নাই। একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ, তাহারা দুইজনে কেদারনাথ দর্শনে গিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণের সময় মহাপন্থা গমনের পথ স্থির করিয়া, আপন দ্রব্যাদি সকল সমভ্যারে ব্যক্তিদিগের নিকট দিয়া, উলঙ্গ হইয়া, এক কম্বল গাত্রে আচ্ছাদন দিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া গিয়াছিল। পরে রক্ষকগণ জানিতে পারিয়া তাহাকে বহুতর কপট স্তব করিয়া গমন স্থগিত করাইয়া, নিকটে যাইয়া তাহাকে বন্ধন ও প্রহার করিতে করিতে বিচার স্থলে লইয়া গেল, তাহাকে অনেক ভয়মৈত্র দেখাইয়া অন্য পর্ব্বতে পাঠাইয়া দিল।

যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি অন্য অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া গোগ্রাসে ভোজন, তদনন্তরে আপন পদে ঝিক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন, তদনন্তরে রাজার নিকট মহাপন্থা গমনের আবেদন করিতে হয়। রাজা শ্রুত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে রাজভবনে রাখিয়া, উত্তম উত্তম মেওয়াদি তেজস্কর দ্রব্য, দুগ্ধ (ও) ঘৃত প্রচুররূপে আহার করাইয়া, উত্তম শয্যাতে শয়ন করাইয়া, উত্তমরূপ রূপসী যুবতীগণকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া, দুই তিন মাস একত্রে বাস করাতে যদি কিছু বিকার জন্মে তবে তাহাকে পুনর্ব্বার পায়ের ঝিকে পাকস্থলী বসাইয়া চরু পাক করিয়া আহার করিতে পারিলে, সেই ব্যক্তিকে মহাপন্থা গমনের অনুমতি হয়। ঐ ব্যক্তি এই স্থলে আসিয়া উলঙ্গ হইয়া সকল ত্যাগ করিয়া মহাপন্থাতে গমন করে, এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পায়, তৎপরে কোথা যায়, কি হয়, কেহ দেখিতে পায় না।

কৈলাস

কেদারনাথের মন্দিরের উত্তরাংশ হইতে ঈশান-কোণে ধবল পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, ঐ কৈলাস পর্ব্বত। ঐ স্থানে শ্রীঁহরপার্ব্বতীর মন্দির আছে। এখান হইতে মন্দির স্পষ্ট দর্শন হয় না, ধবল পর্ব্বত স্পষ্টরূপে দেখা যায়। তাহার উপর শৃঙ্গস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ বস্তু মন্দির হয়, তবে দেখা হইয়াছে।

রেতকুণ্ড

মহাপন্থার শেষভাগে তিন পন্থা আছে — বিষ্ণুপন্থা, রুদ্রপন্থা (ও) ব্রহ্মপন্থা,

যে যে পন্থা গমনের ইচ্ছা করে সে সেই পন্থাতে যায়, সাধনক্রমে প্রাপ্ত হয়। কেদার-দর্শনান্তর রেতকুণ্ডের জল পান করিতে যাইতে হয়। অর্দ্ধক্রোশ পথ বরফের উপর দিয়া কুণ্ডে আসিতে হয়। কুণ্ড দীর্ঘ-প্রস্থে চারি হস্ত। চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরের সোপানবদ্ধ বেষ্টিত ঘর আছে; ঐ ঘর মধ্যে কুণ্ড বরফে পরিপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি পথ ও কুণ্ডের বরফ কাটিয়া মুক্ত করিয়াছে। এই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ও) মহেশ্বর ত্রিদেব প্রসূত হন। এইজন্য এই কুণ্ডের জলপান করিবার বিধি। জলপানের নিয়ম এই যে, প্রথমে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাহার বচনের পুস্তক চারি পাঁচ পাত হইবে। তাহার মূলার্থ — এই জল স্পর্শে পাপ দেহ পরিত্যাগ হইয়া জীবন মুক্ত হইল। দেহকে ভস্মরাশি এবং কালপুরুষকে শিলাতে ফট্ করিবার মন্ত্র। তৎপরে বার তিথি মাস কল্প উচ্চারণ করিয়া তিন গণ্ডূষ বাম হস্তে তিন অঞ্জলি পূরিয়া তিন বার গোগ্রাসে বারংবার কুণ্ডের জলপান করিয়া লম্ফ দিয়া কক্ষবাদ্য করিতে করিতে বাহু আস্ফালন করিয়া দম্ভে কহিতে হয় —

অহং ব্রহ্মঃ অহং বিষ্ণুঃ অহং রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ।
মত্তুল্য সর্ব্বতীর্থানি নাস্তীব দেবদানবে।।

এই কথা বারংবার কহিয়া স্থগিত। এই প্রকরণে উদক-কুণ্ডের জলপান করিতে হয়। দুই কুণ্ড একাকৃতি, এক নিয়ম। এ সময়ে এখানে ত্রিরাত্র বাস করিতে কেহ ক্ষমবান হয় না, তাহার কারণ যত বাড়ি ঘর আছে সকলই ডুবিয়া আছে, থাকিবার স্থানাভাব, উদাসীনদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক রাত্র ছিল, কিন্তু এক জন এক টাকার কাষ্ঠে ধুনি করিয়া অগ্নি উত্তাপে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বর্ষাকালে যাহারা দর্শনার্থে যায়, তাহাদের পথ-ক্লেশ অতিশয়। তাহার কারণ এ সকল পথেও ঝোলা থাকে না, পর্ব্বতের উপর উপর পাকদণ্ডি পথে আসিতে হয়। কিন্তু সে সময়ে কেদারে তিন রাত্র কি সপ্ত রাত্র — যাহার যত দিবস ইচ্ছা হয়, যম দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া দর্শন-স্পর্শন করিয়া থাকে। তৎকালে বরফ সকল গলিয়া পড়ে, পাণ্ডাদিগের এবং রাজার ধর্ম্মশালার যে সব বাড়ী আছে তাহা মুক্ত হয়, তাহাতে থাকিতে পারে।

বদরীনারায়ণের পাহাড়

কেদারনাথের পাহাড়ে এবং বদরীনারায়ণের পাহাড়ে তিন ক্রোশ অন্তর।

কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণের পাহাড় উত্তমরূপ দেখা যায়। এক জন পূজারি দুই স্থানে পূজা করিত। ঐ পূজারি-ব্রাহ্মণ আপন স্ত্রীসহ বিবাদ করিয়া, স্ত্রীকে প্রতি দিবস প্রহার করিত; কহিত "আমি দুই পাহাড়ে পূজা করিয়া এলাম, তথাচ তোমার গৃহকর্ম্ম হয় নাই!" এই কহিয়া অতিশয় প্রহার করিত। এক দিবস অত্যন্ত দেহ যন্ত্রণা পাইয়া দুই দেবের নিকট প্রার্থনা করিল যে, 'তোমাদের পূজার পূজারি হইয়া আমার প্রাণনষ্ট করিতেছে। আমি মরিলে স্ত্রীহত্যার ভাগী তোমাদিগকে হইতে হইবে।' ব্রাহ্মণীর এরূপ খেদোক্তিতে দুই দেব হর-হরির কৃপা হইল, কহিলেন "এক দিবসে দুই পাহাড়ে যাইবার ক্ষমতা থাকিবে না।" মধ্যে এক উচ্চ পর্ব্বত স্থাপিত করিলেন, তাহা লঙ্ঘনের পথ রহিল না। এজন্য এক্ষণে কেদারনাথ (ও) বদরীনারায়ণে নয় দিবসের পথ অন্তর হইয়াছে।

পঞ্চগঙ্গা

স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর যে ধারা আসিতেছে, নির্ম্মল জল। দুধ-গঙ্গার জল দুগ্ধের বর্ণ, ক্ষীর-গঙ্গার জল ক্ষীরের তুল্য স্বাদু, মৌ-গঙ্গার জল মধুর সমান মিষ্ট, অলকানন্দা সুশীতল। পঞ্চ-গঙ্গা যথায় একত্র মিলিত হইয়া সঙ্গম হইয়াছে, তথায় জলস্রোত ও প্রবাহ অত্যন্ত হইতেছে। স্নানকালীন দেহের স্পন্দন রহিত হয়, তর্পণাদি করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হংসতীর্থে কিম্বা সঙ্গম-স্থানে বসিলে সকল ক্লেশ শান্তি হয়।

কেদারমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি রেতকুণ্ড (ও) উদককুণ্ডের জলপান করিবে, পানের নিয়ম পূর্ব্বে কহিয়াছি, সে ব্যক্তির হৃদিমধ্যে তৎক্ষণাৎ এক শিবলিঙ্গাকৃতি জন্মিবে, তাহাতে তাহার যে স্থলে মৃত্যু হউক কাশীতে মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হইবেক। যে কেহ কেদার-দর্শনের যাত্রা করিয়া পথে প্রাণ-ত্যাগ করিবে, তাহার অধোর্দ্ধ ত্রিসপ্ত পুরুষ উদ্ধার হইবে। কেদার-মাহাত্ম্য মান্য করিলে, তাহা শ্রুত হইলে ফলশ্রুতি হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিমালয় ভ্রমণ

পর দিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে;,তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে। অনেক তরুণবয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরো নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘনপল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কেবল কেলু-নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ এক প্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণ-লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ রক্তবর্ণ পীতবর্ণ নীলবর্ণ স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্পসকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্কপবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি ফলসকল খন্ড খন্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে

অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে; তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিবিরে সিক্ত করিয়া, লতাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা! 'তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনোই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।'

হরগিজ্ ম্ মেহ্‌রে তো অজ্ লওহে দিল্ ও জাঁ ন-রবদ্।

....

আঁচুনা মেহ্‌রে তো অম্ দর্ দিল্ ও জাঁ জায়ে গিরিফ্‌ৎ,
কে পর্ অম্ সর্ বে-রবদ্, মেহ্‌রে তো অজ্ জাঁ ন-রবদ্।

— দীবান্-হাফিজ্.

হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্য অস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে সুঙ্গ্রী নামক পর্ব্বত-চূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন্ চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান। কোন পর্ব্বতের আপাদ-মস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে একএক গ্রামে দশ বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্য-কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্ব্বত আপাদ মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্ব্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ-ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত — একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্যবসতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্ব্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখাসকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঝাউগাছের পত্রের ন্যায়, অথচ সূচী-প্রমাণ দীর্ঘমাত্র, ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখাসকল শীতকালে বহু তুষার-ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্রসকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা আশ্চর্য্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য! এই পর্ব্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? এই কেলু বৃক্ষের কোন পুষ্প হয় না। ইহা বনস্পতি, এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাতে আল্‌কাতরা জন্মে।

কতক দূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিলাম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পথে এক পাল অজা অবি চলিয়া যাইতেছিল। আমার ঝাঁপানী একটা দুগ্ধবতী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল, এবং বলিল যে 'ইস্‌সে দুধ মিলেগা'। আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম। উপাসনার পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। 'সভ্‌না জীয়াকা তুম্ দাতা, সো মৈঁ বিসর না জাই'। সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই। তাহার পরে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম। পুনর্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে আফিমের ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য কর্ত্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে।

রৌদ্রের জন্য পুনর্ব্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালি নায়ক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সুঙ্গ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্নে। এই পর্ব্বতের তলে 'নগরী' নদী এবং ইহার নিকটেই অন্যান্য পর্ব্বত-তলে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে, এবং তাহা রৌপ্য-পত্রের ন্যায় সূর্য্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। এই শতদ্রু-নদীতীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাইতেছে; তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহু পথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে, এবং ইংরাজী ভাষাও অল্প অল্প শিখিয়াছেন। শতদ্রূ নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী সোহিনী হইয়া, তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে।

গত কল্য সুঙ্গ্রী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্যও তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্ণে নগরী নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহা বেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ অস্তিকায় তুল্য প্রস্তরখণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেনময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দ করতঃ সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্রসমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্ব্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত সমান উঠিয়া পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পরপারে গিয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলাম। এই উপত্যকাভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে এক জন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে, সে পর্ব্বতের গহ্বর; সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে; তাহার আর-একটি ছেলে পর্বতের উপরে সংকট-স্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; তাহার পুত্র একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাঁহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন

শান্তিসুখ দুর্ল্লভ।

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্', পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গপতিত হইয়া নদীতীর পর্য্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষসকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষসকল দেখিয়াছি, এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্ব্বতের প্রজ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি; কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি ব্যাপ্তি উন্নতি নিবৃত্তি, প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল। রাত্রিতে যখনই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনি তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, এবং উৎসব-রজনীর প্রভাতকালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভুক্ লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটি করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুপ্রহরের সময় 'দারুণ ঘাট' নামক দারুণ উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে আর-এক নিদারুণ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণ ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষার বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার বর্ষণ সিমলাবাসিদিগের পক্ষেও আশ্চর্য্য, যেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই সিমলা পর্ব্বত তুষারজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্তবেশ ধারণ করে।

হিমারণ্য

আমাদের দেশে দোলমঞ্চ যেরূপ,কৈলাসেরও আকার সেইরূপ। দোলমঞ্চ পরিক্রম করিবার সময় যেরূপ চর্তুদিকে পরিক্রম করিতে পারা যায়,সেইরূপ দারচিন হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাসের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আবার দারচিনে আসা যায়। কৈলাসের চতুর্দিক নদীবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে রাস্তাও কৈলাসকে বেষ্টন করিয়া দারচিনে আসিয়া মিশিয়াছে। গৌরীকুন্ড হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উর্ধ্বদিকে যে বরফ শৃঙ্গ আছে, তাহাকে কৈলাসশিখর বলে। কৈলাসশিখরের আকার শিবলিঙ্গের অনুরূপ। এইরূপ শত শত লিঙ্গবৎ বরফমন্ডিত শিখর আছে। তাহা কৈলাসের অন্তর্গত হইলেও উচ্চশিখরকেই কৈলাস বলিয়া থাকে। এই কৈলাসের একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখিলাম। সকল শৃঙ্গগুলিই লিঙ্গবৎ; যেন শুভ্র শুভ্র লিঙ্গমূর্তিবৎ শিখর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কৈলাসপতি মহালিঙ্গের আকার ধারণ করিয়া কৈলাস রাজসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অথবা অনন্ত লিঙ্গবৎ অনন্ত চক্ষে এই সর্বোচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে সসাগরা পৃথিবীর ভূত,ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দর্শন করিতেছেন। হিমালয় অজয়,অমর, অক্ষয় ও অব্যয়; কৈলাসও তদনুরূপ। ভাষাতে শব্দ নাই, ভাবে অনন্তত্ব নাই, বাক্যের অনন্ত স্ফূর্তি নাই, চক্ষুর বর্ণনাশক্তি নাই, বাক্যের দর্শনশক্তি নাই, সুতরাং কৈলাসের বর্ণনা হইল না।

এইস্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া কৈলাস দর্শন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গীরা বলিলেন,"আর দিন নাই চলুন, এখনও দুই মাইল না গেলে আড্ডা পাইব না।" অনিচ্ছায় আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম। এইস্থানের নিম্নেই নদী, সুতরাং আমাকে একেবারে নদীতীরেই অবতরণ করিতে হইল। এই নদীর নাম কৈলাসগঙ্গা। কৈলাসগঙ্গায় একটি সেতু আছে; এই সেতুটি বড় বড় প্রস্তরের উপর বৃহৎ কাষ্ঠ স্থাপিত করিয়া নির্মিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেতুটি ভাসিয়াও যায়। আজ সেতুটি ভাসিয়া যায় নাই, সুতরাং নির্বিঘ্নেই সেতু পার হইলাম। সেতুর পরপারেই চড়াই। চড়াইয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে মঠ। দূর হইতে মঠের কোনপ্রকার চিহ্ন দেখা যায় না,

কেবল প্রস্তরস্তূপ বলিয়া বোধ হয়। একে কৈলাস, তাহার পর চড়াই। এই চড়াইটিতে সকলেই গলদঘর্ম হইলেন। তাহার উপর আবার পথিমধ্যে বৃষ্টি ও বাতাস আরম্ভ হইল। শীতে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। মঠ দেখিতে পাইতেছি; ইচ্ছা হইতেছে, দৌড়িয়া মঠে প্রবেশ করি; কিন্তু শরীর শক্তিহীন, পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, দ্রুত চলিবার উপায় নাই; কি করি, বাতাস বৃষ্টি সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে মঠে উপস্থিত হইলাম। মঠটি তেতলা। সর্বোচ্চ তলাতে দেবালয়। মধ্যতলায় লামার বাস ও অতিথিশালা, রন্ধনশালা নিম্নতলে কতকগুলি গুহা; এইসকল গুহায় পালিত পশু ও রন্ধনের উপযোগী কাষ্ঠ থাকে। আমি প্রথমে যাইয়া অতিথিশালায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে লাসার একজন লামা বসিয়া আছেন। আমি সেখানে যাইয়া আসন করিলাম। লামা বলিলেন, "আমিও অতিথি; আমি আপনার কি সেবা করিব? আপনি এই মঠের লামার নিকট যান, তিনি বড় দয়ালু, আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি করিয়া দিবেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ লামার নিকট গমন করিলাম। লামা একটি প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া আছেন; চারিদিকেই শাক্যমুনির মূর্তি সুসজ্জিত; মূর্তির সম্মুখে ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর লামাকে সম্মুখে করিয়া পনের-যোলজন লামা ও ডাবা চা পান করিতেছে। লামা উচ্চ আসনে বেদীর উপর বসিয়া আছেন; অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে পশমের গদীর উপর তাঁহার পারিপার্শ্বিকেরা বসিয়া আছেন; সকলেরই সম্মুখে চা ও ছাতু। চা হইতে ধূম উদ্গত হইতেছে, আর সেই গরম চা তাঁহারা পান করিতেছেন। আমি একেবারে যাইয়া লামার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া লামা তাঁহার আসনপার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "আপনি চা পান করিয়া সুস্থ হউন, পরে কথাবার্তা হইবে।"

লামার ইঙ্গিত অনুসারে একজন ডাবা গরম চা ও ছাতু আনিয়া দিল। আমি দুই-তিনপেয়ালা চা পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম, আমার ধরে প্রাণ আসিল। আমাকে সুস্থ দেখিয়া লামা মহাশয় বলিলেন, "এই মঠের লামা আমি নহি, দারচিনের লামাই এই মঠের লামা। আমি যাত্রী, ভগবানকে স্নান করাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। একজন ডাবার উপর মঠ পরিচর্যার ভার, সে এখনই আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।" এই বলিয়া মন্দিরের কর্মচারীকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া অতিথিশালায় এক পশমের গদি পাতিয়া দিল, তাহার উপর আমার আসন পড়িল। এই কৈলাসে পশমের আসন ভিন্ন টিকিবার উপায় নাই। আমার সঙ্গীরাও লামার

নিকট চা পান আর ছাতু আহার করিয়া সুস্থ হইল, এবং সান্ধ্য ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল। লামা আমার নিকট লোক পাঠাইলেন। লামার লোকের সঙ্গে যাইয়া দেখি,সম্মুখে একটি শ্বেতপ্রস্তরের শিবমূর্তি। লামা কুঙ্কুম ও কেশরের জল দ্বারা মূর্তিকে মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইতেছেন, বাদ্যকরেরা শঙ্খ ও বাঁশী বাজাইতেছে, দর্শকেরা জোড় হস্তে স্নান-দর্শন করিতেছেন। ধূপের সুগন্ধে দেবালয় আমোদিত। ভগবান শঙ্করের স্নান হইয়া গেলে তাঁহাকে শীতবস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হইল। লামা শঙ্করকে আসনে স্থাপিত করিলেন। এই মন্দিরের পূর্বদিকে আর একটি মন্দির আছে; সেই মন্দিরে কালীমূর্তি স্থাপিত। আদ্যার মূর্তি চতুর্ভূজা, বিকটবদনা ও লালজিহ্বা। চর্তুদিকে নানাবিধ অস্ত্র সুসজ্জিত, দেখিলে বোধহয়, অসুরনাশিনী অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শিব সমীপে বিশ্রাম করিতেছেন। দেবীমূর্তির বাম ও দক্ষিণ খড়্গ, ঢাল, তরোয়াল, বন্দুক, বর্শা, শক্তি, শূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ইহা ব্যতীত অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তিব্বতীয় অস্ত্র দেখিলাম; তাহাদের নাম জানি না। এই দেবালয়ে দুই-তিনটি শঙ্খ দেখিলাম। শঙ্খগুলি খুব বৃহৎ, শব্দ গম্ভীর ও মধুর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"এই শঙ্খ তোমরা কোথায় পাইলে?"

একজন উত্তর করিল,"মহাসাগর হইতে এই শঙ্খ সংগৃহীত হইয়াছে।" দারচিন কৈলাসের প্রথম মঠ, নেন্দি দ্বিতীয় মঠ। এই মঠই মহাত্মা জিপচুনের আবিষ্কৃত প্রথম মঠ বা তীর্থ। এখানে তিনি কিছুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। এই মঠের ঊর্ধ্বদেশে পর্বতাঙ্গে তিন-চারটি গুহা আছে। গুহাতে যোগীরা আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পূর্বে একটি যোগী ওই গুহা হইতে অদৃশ্য হইয়া যান। তাঁহার ডম্বরু চিহ্ন পর্বতাঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি সেই উদ্দেশ্যে গুহাকে ও যোগীরাজকে প্রণাম করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

অদ্য ২৫শে আষাঢ়। নেন্দি গুহাতেই বাস করিলাম। এখানে যে লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার বাসস্থান ডেরিফু মঠে। পরদিন প্রাতঃকালে লামা ডেরিফু অভিমুখে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন,"আপনি ডেরিফু আসুন, আমি অগ্রে অগ্রে যাইতেছি; আপনি যাইয়া আমার মঠে অতিথি হইবেন।"

আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অদ্য আমাদিগকে আট মাইল যাইতে হইবে। রাস্তা ভাল। বরাবর নদীর তীরে তীরে চলিয়া বেলা অনুমান বারোটার সময় ডেরিফু মঠে উপস্থিত হইলাম। এই মঠটি প্রাচীরে আবৃত, একটি ছোটখাটো দুর্গের অনুরূপ। মঠের সাজসজ্জা জাঁকজমক খুব; অনেকগুলি লামা ও ডাবা এই মঠে বাস করেন। চামর গাই, মেষ ও ছাগ প্রভৃতি এই মঠে যথেষ্ট আছে। লামা জ্ঞানবান,যোগী ও বুদ্ধিমান। আমি মঠে প্রবেশ করিয়া লামার নিকট চলিয়া গেলাম। এই মঠটিও দ্বিতল। উভয় তলেই দেবালয় ও গ্রন্থ সুরক্ষিত। আমি তথায় যাইবামাত্র লামা আসন হইতে উঠিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও বসিবার আসন দিলেন। আমিও তাহাকে একখন্ড মিছরি ও একটি সিকি প্রণামী দিলাম। ইহাতে লামা অতিশয় প্রীত হইলেন। তিব্বতদেশীয় প্রত্যেক মঠের দস্তুর এই যে, আগন্তুক লামা মঠের প্রধান লামাকে প্রণামী দেন। যে লামা প্রণামী না দেন, তিনি মঠপ্রণালীর অনভিজ্ঞ বলিয়া মঠের মধ্যে স্থান পান না। তাঁহার উপর মঠাধ্যক্ষের সন্দেহ হইয়া থাকে। তিব্বত-ভ্রমণকারী সাধুদিগের এই প্রণালী একান্ত অনুসরণীয়। সাধুও যা লামাও তা।

আমি পূর্বে লিখিয়াছি, এতদ্দেশে আমি কাশীলামা বলিয়া পরিচিত হইতেছি। মঠাধ্যক্ষ লামার সহিত কিছু কথাবার্তার পর তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় তলের দেবতা ও গ্রন্থ দর্শন করাইলেন। এই মঠে তিনটি শাক্যমুনির মূর্তি এবং হরগৌরী, মহাকালী ও বিষ্ণুমূর্তি সংস্থাপিত। আমি এই সব দর্শন করিয়া নিম্নতলে আসিলাম। ভাল স্থানেই বাসা পাইলাম; কিন্তু এখানে একটা বিপদ ঘটিল। মঠের সূপকার লামা আমার সঙ্গী লোকদিগকে রন্ধনশালায় ঢুকিতে দিল না। সে বলিল, "তোমাদের লামা ইংরেজ, ইংরেজের লোকদিগকে আমরা মঠে প্রবেশ করিতে দিই না। তোমাদের লামাকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দিব।" এই বলিয়া সে আমার বাসস্থানে আসিল। আসিয়া দেখে, আমি আমার বাসস্থানে দেবতা ও ত্রিশূল সংস্থাপিত করিয়া চন্ডীপাঠ করিতেছি। এই সব দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল, আর বলিল,"লামাজী, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনেক লোক এখানে আসিয়া থাকে। কৈলাস পবিত্র তীর্থ, এখানে অপরের প্রবেশের অধিকার নাই; তাই না জানিয়া আপনাকে ইংরেজ মনে করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" আমি বলিলাম,"ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই; এইরূপ

না করিলে মঠের পবিত্রতা রক্ষা হয় না।" তাহার পর সেই লামাই আমার প্রধান সেবক হইয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং বলিল, "তুমি আমার হাতে খাইবে কিনা?" আমি বলিলাম, "তুমিও লামা, আমিও লামা, আর এই উত্তরখন্ডে বিচার করিলে দেহরক্ষা হয় না, সুতরাং তোমার হাতে খাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই।"

ইহার অব্যবহিত পরেই লামা আমার নিকট আসিলেন ও আমার সঙ্গে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ইনি নিজে শক্তি উপাসক ও রাজযোগী। কিছু কথাবার্তার পর আমাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় তলস্থ দেবালয় দেখিতে লইয়া গেলেন। দ্বিতীয় তল একটি প্রকান্ড গুহা। প্রস্তর খনন করিয়া এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে। গুহার মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি অত্যন্ত যত্নে সুরক্ষিত। সেবা-পূজার বন্দোবস্তও আছে। সহস্র সহস্র ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। গুহার বাম ও দক্ষিণে রাশি রাশি পুঁথি বস্ত্রাবরণে আবৃত। আমি লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পুস্তক কি ও কোন ভাষায় লিখিত ও কোথা হইতে আনীত হইয়াছে?" লামা উত্তর করিলেন, "এই সমস্ত পুস্তকই কাশী হইতে আনীত, পুস্তকের অক্ষর তিব্বতীয়, ভাষা সংস্কৃত। এই সব পুস্তক অতি গোপনীয়, লামা ভিন্ন অন্যের দেখিবার অধিকার নাই। পাছে পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইহার জন্যই পুস্তক অক্ষরান্তরিত হইয়াছে।" আমি এইসব দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নেন্দিগুহাতে এই স্থানবাসী জনৈক লামার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, তাঁহার বাসস্থানে অতিথি হইব; কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমি প্রধান মঠে বসিয়া আড্ডা করিয়াছি। আমি বাসস্থানে আসিয়া দেখিলাম সেই লামা ও তাঁহার তিন-চারিজন শিষ্য মাখন,চা, ছাতু, 'থুথু' নামক মিঠাই ও কৈলাসপতির প্রসাদ লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাঁহার উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার আলয়ে না যাইবার কারণ বলিলাম। তিনি বলিলেন, " এক স্থানে থাকিলেই হয়, তাহার জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না।" এই বলিয়া আমার সেবার জন্য তাঁহার একটি ব্রহ্মচারী শিষ্যকে আমার নিকট রাখিয়া বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

আমরা সকলে মিলিয়া কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময় বিষ্ণু সিং বলিল, একদল ডাকাত আসিয়াছে। এই কথা মঠে প্রচারিত হইল। মঠের অধিকারী সদর

দরজা বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও প্রস্তরখন্ড লইয়া সকলে ছাদে উঠিলেন। কেবল দ্বিতলস্থ দেবালয়ের দ্বার খোলা রইল। কারণ এই দ্বিতল এমনভাবে নির্মিত যে, অন্য তলের সহিত কোন যোগ নাই, এবং এই তলে যে দেবতা আছেন, তাহা সাধারণের ও দেবালয় সাধারণের অর্থে নির্মিত, সর্বদা খোলা থাকে, এবং সকল সময় সাধারণের প্রবেশের অধিকার আছে। ডাকাতদের কথা শুনিয়া আমি দেবালয়ের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি,দশ-বারোজন ঘোড়সওয়ার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তাহারা আপন আপন গাঁঠরি হইতে মাখন ও ছাতু খুলিল এবং পকেট হইতে টাকাকড়ি বাহির করিয়া দেবদর্শন করিতে চলিয়া গেল। তাহারা দেবদর্শন করিয়াই গৌরীকুন্ডের দিকে চলিল। মঠবাসীরা নিরুদ্বেগ হইলেন, আমরাও বাঁচিলাম। এই রাত্রি এখানেই বাস করিতে হইল।

মহাভারতে সভাপর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণবিষয়ে ময়দানব বলিতেছেন যে,"পূর্বে আমি কৈলাসের উত্তর ও মৈনাক পর্বতের সন্নিধানে দানবদিগের যাগকালে একটি বিচিত্র মণিময়সভা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা দানবরাজ বৃষপর্বার সভা ছিল।" অন্য স্থানে লিখিত আছে,"বিন্দুসরোবরের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপনের জন্য কতিপয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তথায় হিরণ্য পর্বত; ঐ পর্বতে স্বর্ণ পাওয়া যায়।" এই ডেরিফু হইতে আঠার-উনিশ দিনের পথ উত্তরে মানস সরোবরের ন্যায় এক সরোবর আছে; তথায় স্বর্ণখনিও আছে। ডেরিফুতেই কতিপয় স্বর্ণব্যবসায়ীর নিকট শুনিলাম 'তাহারা ঐ কৈলাসের উত্তর হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহা বিক্রয় করিবার জন্য মন্ডিতে যাইতেছে।' তাহারা ইহাও বলিল যে,"স্বর্ণখনির নিকটেই সরোবর আছে। তথায় তিব্বতবাসী ভিন্ন অন্যে যাইতে পারে না।" এই মঠ হইতে বরাবর উত্তর দিকে গেলেই বিন্দু সরোবর ও হিরণ্য পর্বত দর্শন করা যায়।

অদ্য গৌরীকুন্ডে যাইব। মনে বড় আনন্দ, কিন্তু ভয়ও ততোধিক। এখান হইতে তের-চৌদ্দ মাইল না গেলে জনিংফ্ মঠ পাইব না। গৌরীকুন্ডে মঠ নাই, বিশ্রামের স্থানও নাই। এখান হইতে নিরবচ্ছিন্ন চড়াই; তাহার মধ্যে আবার পাঁচ-ছয় মাইল চিরস্থায়ী বরফ। কৈলাসের ঊর্ধ্বশিখর বরফে সমাদৃত। যদিও কৈলাসের ঊর্ধ্বশিখরে উঠিব না, উঠিতে পারিব না, তথাপি গৌরীকুন্ডের ঊর্ধ্বদিকস্থ শিখর

অতিক্রম করিয়া গৌরীকুণ্ডে নামিতে হইবে। এই সব চিন্তায় নিদ্রা আসিল না। রাত্রি অনুমান দুইটার পর আমরা যাত্রা করিলাম। ঠান্ডার তো কথাই নাই, তার পর চড়াই। এক-একবার কিছু চলিতেছি-আর বিশ্রাম করিতেছি,এবং শীত নিবারণের জন্য মিছরী ও গোলমরিচ চিবাইতেছি। এইরূপ করিতে করিতে একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে প্রস্তরের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কৈলাসযাত্রীরা এই সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া যান। লোকপ্রবাদ এই যে, "পাপীরা কখনই এই সুড়ঙ্গ ভেদ করিতে পারে না।" আমি পাপী কি পুণ্যবান জানি না, তবে অনায়াসে এই ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ পথ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলাম।

মেঘদূতে কৈলাস বর্ণনাকালে কালিদাস এক সুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, এই সুড়ঙ্গই সেই কালিদাসের উল্লিখিত সুড়ঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। ইহা কালিদাসের উল্লিখিত মেঘের গমনাগমনের সুড়ঙ্গ হউক আর নাই হউক, আমার গমনের সুড়ঙ্গ বটে। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ আমার অনুসরণ করিল, আর কেহ কেহ এদিক ওদিক দিয়া চলিয়া গেল। আমরা সুড়ঙ্গ পার হইয়া একটি নদীতে নামিলাম। নদী পার হইয়া কতকদূর ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেখি, বরফমণ্ডিত কৈলাস। এই বরফ অতিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। শরীরের বলে আর চলিতেছে না। মনই শরীরকে চালাইতেছে। শীতে হৃদয় গুরগুর করিতেছে, হস্তপদের সাড় নাই। তাহার কথাও নাই। পদ স্খলিত হইতেছে, পদ মনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিতেছে না। উপর হইতেও বিন্দু বিন্দু বরফ পড়িতেছে; এখানে তো জমাট বরফ ছিলই, তাহার উপর আবার বরফ বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে। এ যেন সোনায় সোহাগা। পর্বতের সানুদেশ ও পর্বতশিখর শুভ্র। বরফপাতে আমার বস্ত্র শুভ্র, মাথার উপরও বরফ পড়িয়াছে। মস্তকে বরফ পড়াতে বোধ হইতেছে, কৈলাস কৃপা করিয়া আমার মাথায় পুরস্কার স্বরূপ বরফের শিরোপা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

এই পুরস্কারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই পথটি এত দুর্গম যে, পথের চিহ্নমাত্রও নাই। বরফ ভাঙিয়া লোক গিয়াছে; তাহাদের পদচিহ্ন মাত্র আছে, সেই পদচিহ্নের অনুসরণে আমরা চলিতেছি। বৃহৎ ও খন্ড খন্ড প্রস্তর, তাহার উপর নূতন বরফ পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছে। এক প্রস্তর হইতে অপর প্রস্তরে লম্ফপ্রদান করিয়া চলিতেছি। একটু লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হইলেই সর্বনাশ! দুই হস্তে দুই লাঠি। এই দুই লাঠির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তর সকল অতিক্রম করিতেছি। এইরূপ ভাবে অনুমান

তিন মাইল যাইয়া দেখি, খুব উচ্চ একটি প্রস্তর। প্রস্তরটি নানাবিধ বর্ণের নিশান দ্বারায় অলঙ্কৃত। এই দেশীয় লোকেরা এই প্রস্তরকে বন্যজন্তুর শৃঙ্গ ও দন্ত দ্বারা সাজাইয়া রাখাইয়াছে। এই প্রস্তরখন্ডটি দোলনা অর্থাৎ শক্তিমূর্তি বলিয়া পূজিত। মহাত্মা জিপচূন এই প্রস্তরখন্ডেই শক্তিমূর্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। আমি প্রস্তরখন্ডের সমীপে উপস্থিত হইলাম; প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা করিলাম। মনের আনন্দে কৈলাসপতির কৃপায় শরীর ভুলিয়া গিয়াছি, এমন আত্মহারা হইলাম। মনপ্রাণ কৈলাসপতির শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল, কৈলাসপতির কৃপাও বুঝিতে পারিলাম না। এস্থানে কতক্ষণ ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তাহার পর সঙ্গীদের তাড়নায় আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর চলিয়া নিম্নে দেখিলাম, গৌরীকুন্ড।

গৌরীকুন্ড একটি হ্রদ। জলভাগ ও স্থলভাগ উভয়ই বরফ দ্বারা আবৃত, কেবল কুন্ডের পশ্চিম দিকে দশ-বারো হাত নীল জল দৃষ্টিগোচর হইল। কুন্ডটির পরিধি দুই-তিন মাইলের কম হইবে না। কুন্ডে পশ্চিম তীর হইতে জলভাগকে আলিঙ্গন করিয়া একটি লিঙ্গবৎ শৃঙ্গ ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়াছে। এই শৃঙ্গের বামে দক্ষিণে অনেকগুলি শৃঙ্গ ভেদ করিয়া কৈলাসের উচ্চশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত শৃঙ্গগুলি বরফে আবৃত। এই বরফ কখনও গলে না, চিরস্থায়ী। আমি ধীরে ধীরে কুন্ডের তীরে নামিলাম। অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলাম। যষ্ঠি দ্বারা বরফ ভাঙিয়া কুন্ডে স্নান করিলাম। "ধন্যোহহং কৃতকৃত্যহং সফলং জীবিতং মম" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া স্নান শেষ করিলাম। সঙ্গীরা শুষ্কবস্ত্রে আমার শরীর মুছাইয়া দিলেন; কারণ আমি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম। গা মুছিবার বা বস্ত্র পরিধান করিবার শক্তি ছিল না। এইস্থান সমুদ্র সমতল হইতে ২২০২৮ ফিট উচ্চ। ঊর্ধ্বে যে প্রস্তরখন্ডের কথা লিখিয়াছি তথা হইতে গৌরীকুন্ড অনেক নীচে। ঊর্ধ্ব হইতে গৌরীকুন্ড পাতাল বলিয়া বোধ হয়। রাস্তাও দুই মাইলের কম নহে।

গৌরীকুন্ডের তীরে প্রকান্ড প্রস্তর। এই প্রস্তরের উপর দিয়া চলা বড়ই ক্লেশকর। গৌরীকুন্ডের তীরে একটি গুহা আছে। উহাতে তিন চারিজন লোকজন বাস করিতে পারে, কিন্তু অগ্নি ব্যতীত এখানে টিকিবার উপায় নাই। আমাদের সঙ্গে কাঠ ছিল না; সুতরাং আমাদের গৌরীকুন্ডে আমাদের থাকা হইল না। এই দেশের প্রথা যে, গৌরীকুন্ডে স্নান করিয়া কিছু আহার করা চাই। আমাদের সঙ্গে

আহারীয় ছিল। আমরা এখানে কিছু আহার করিলাম। আহার করিয়া আমরা কাষ্ঠের বাটিটি ঝুলিয়া রাখিতেছি, এমন সময় আমার একমাত্র ভোজনপাত্র কাষ্ঠের বাটি গৌরীকুন্ডের ভিতর পড়িয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও তাহা পাইলাম না। আমরা গৌরীকুন্ডে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এই সময় অনবরত ঝড়বৃষ্টি ও বরফপাত হইতেছিল। জীবনের আশা কিছুমাত্র ছিল না, কোন রকম চিন্তা বা নিরুৎসাহ ছিল না, এইরূপে নিম্নে অবতরণ করিয়া একটি নদী পাইলাম। নদীও সজলা। নদী দিয়া খরতর স্রোত বহিতেছে। নদীর উভয় তীর তৃণাচ্ছাদিত। গ্রাম্য পথের ন্যায় তীরেও পথ আছে। রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও কমিয়াছে। এই রাস্তাতে একেবারে চড়াই নাই; এখন অল্প অল্প উৎরাই। পথ চলিতে আর কষ্ট নাই, তবে মধ্যে মধ্যে নদীর একপার হইতে পরপারে যাইতে হইতেছে। রাস্তায় বড় লোকজন দেখিলাম না। দারচিনের রাস্তাই আমাদিগকে দারচিন লইয়া যাইতেছে, তবে মধ্যে মধ্যে কৈলাস পরিক্রমকারী দুই একজন লামাকে দেখিতে পাইলাম।

তাঁহারা মৌনী হইয়া কৈলাস পরিক্রমা করিতেছেন। আর একজন দন্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে আমাদিগের বিপরীত দিকে যাইতেছেন। আমরা যে নদীর পার দিয়া যাইতেছি, সেই নদীর উভয় তীরই জলসিক্ত, সুতরাং ভিজিতে ভিজিতে বেলা তিনটার সময় জংলিফু মঠে উপস্থিত হইলাম। দেশবাসীরা কৈলাসকে বড়ই মান্য করে। ইহারা তিন প্রকার পদ্ধতি অনুসারে কৈলাস পরিক্রমা করে। কেহ কেহ প্রত্যূষে দারচিন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রির মধ্যে দারচিনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ প্রত্যেক মঠে এক-একদিন করিয়া বিশ্রাম করিয়া দারচিনে ফিরিয়া আসে। আর যাহারা পরম ভক্ত, তাহারা একবার সাষ্টাঙ্গে দন্ডবৎ করে; দন্ডবৎ করিয়া কৈলাস প্রদক্ষিণ করে; তাহাদের বারো-তেরো দিনের কম কৈলাস প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয় না। ইহারা বুকে একটি ভেড়ার ছাল বাঁধে ও সঙ্গে একজন লোক থাকে। সে-ই আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দেয়; যথায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তথায় রাত্রিযাপন করে। আমরা অদ্য জংলিফু মঠে বাসা করিলাম। মঠে স্থান ছিল না; মঠের রন্ধনশালায় আমার স্থান হইল। স্থানটি মন্দ নহে; একটু গরম পাইয়া বেশ আনন্দেই দিন কাটাইলাম। সঙ্গে আহারীয় ছিল না, লামাও কৃপা করিলেন না, সুতরাং চা খাইয়া রাত্রি কাটাইতে হইল। এখানকার লামাটি ধর্মের ধার ধারেন না; একটি বিবাহও করিয়াছেন, বাণিজ্য-ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত। মঠে থাকেন না;

মঠের নিম্নে তাঁবু খাটাইয়া সপরিবারে বাস করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কথা নাই। ইঁহার নামে লাসাতে অভিযোগ হইয়াছে, শীঘ্রই পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। ২৭শে আষাঢ় জংলিফুতে আসিলাম। ২৮শে আষাঢ় অনুমান ৮টার সময় দারচিনে ফিরিয়া আসিলাম। দারচিন হইতে কৈলাস পরিক্রমা করিয়া দারচিন পর্যন্ত চল্লিশ মাইলের কম হইবে না।

দারচিনে আসিলাম বটে, কিন্তু শরীর একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া একান্ত অকর্মণ্য হইয়া পড়িলাম। উপবাস আমার অভ্যস্ত থাকিলেও হিমালয়ে উপবাস সহ্য হইল না। গতরাত্রি উপবাস ছিলাম বলিয়া অদ্য আমার এই দুর্দশা। বেলা অনুমান ৮টার সময় দারচিনে পঁহুছিলাম। দারচিন মঠের প্রধান লামা ও পদচ্যুত লামার নিকট আমার পৌঁছানো সংবাদ গেল; তাঁহারা আমার আহারীয় পাঠাইয়া দিলেন।

অদ্য ২৮শে আষাঢ় এখানে বিশ্রাম করিলাম। দারচিন হইতে মানসসরোবর দুই দিনের পথ। ২৯শে আষাঢ় প্রাতঃকালে দারচিন পরিত্যাগ করিলাম। অদ্য অনেকগুলি লোক আমার সঙ্গী। একসঙ্গে দশ-বারোজন লোক দারচিন পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পূর্ব কোণে চলিতে আরম্ভ করিলাম। অদ্যকার পথ সমভূমি হইলেও বড় জটিল। পশ্চাতে কৈলাস, সম্মুখে রাবণহ্রদ, পূর্বদিকে মানসসরোবর, মধ্যে মাঠ; মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। কৈলাস হইতে যত নদীর উৎপত্তি হইয়াছে সমস্ত নদীই এই মাঠ ভেদ করিয়া রাবণহ্রদে পড়িয়াছে, সুতরাং এই মাঠটিকে মাঠ না বলিয়া বিল বলিলেও চলে। একে হিমপ্রধান প্রদেশ, তাহাতে বিল। বিলে জলের অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করিতে হইতেছে, সুতরাং অল্প চলিতেই বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল, পা অসাড় হইয়া উঠিল; বাতাস প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে চার-পাঁচ ঘন্টাতে চারি মাইল পথ আসিলাম। ক্ষুধা-পিপাসার তো কথাই নাই। চলৎশক্তি পর্যন্ত অভাব হইল। এই মাঠের মধ্যে ভুটিয়াদের একটি ডুং ছিল। সেই ডুং-এ অনেকগুলি প্রান্তসীমার ব্যবসায়ী হিন্দু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাণিজ্য করিতেছিল। আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমার দুর্দশা দেখিয়া বসিবার আসন ও পানীয় চা দিল। আমি কিছু সুস্থ হইয়া আবার চলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহারা আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে বলিল, "আপনি কিছু আহার করুন এবং আরও দুই-এক ঘন্টা বিশ্রাম করুন, পরে

আমরা আপনার সঙ্গে যাইয়া আপনাকে বরখায় রাখিয়া আসিব।

বরখা একটা ছোটখাটো রাজধানী। বরখার রাজা বরখায় নাই; তিনি অদ্য কৈলাস প্রদক্ষিণ করিতে গিয়াছেন। একজন সামান্য কর্মচারীর উপর রাজধানীর তত্ত্বাবধানের ভার। আমি এখানে অনুমান দুই ঘন্টাকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে বরখায় পঁহুছিলাম। বরখার রাজাকে বরখাতজ্জুন কহে।

রাজধানীটি রাবণহ্রদের উপকূলে স্থাপিত। চারিদিকেই মাঠ, গাছপালার নামগন্ধও নাই। ঘুঁটে ও ছাগলের নাদে কাষ্ঠের কার্য হইয়া থাকে। বাড়ি-ঘরের মধ্যে অতিথিশালা ও রাজবাটী উল্লেখযোগ্য। রাজবাটী সামান্য, একতলা, দেখিতে অতি কদাকার, ধূমের কালিতে কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় চারিদিকেই ঘুঁটিয়া ও ছাগলের নাদের স্তূপ। দশ-বারোটি কুকুর রাজবাটীর প্রহরী; তাহারা বিকট চীৎকার করিয়া দিনরাত্রি পথিকদিগের ত্রাস জন্মাইতেছে। সেই দিক দিয়া অপরিচিত লোকের যাতায়াতের উপায় নাই। অতিথিশালাটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তিব্বত,ভোট ও প্রান্তবাসী ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া থাকে। আমি অতিথিশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গীরা রাজকীয় কর্মচারীর নিকট চলিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। কর্মচারী আসিয়া আমার রাত্রিবাসের জন্য দুইটি কুঠুরি পরিষ্কার করাইয়া দিলেন। একটিতে আমার থাকিবার স্থান হইল, অপরটিতে রন্ধনশালা ও সঙ্গীদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল, অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজভাণ্ডার হইতে ঘুঁটে, ছাগলের নাদ, ছাতু, মাখন ও লবণ আসিল; ইহাই এ দেশে রাজকীয় অভ্যর্থনা। আমি রাজকীয় অভ্যর্থনায় প্রীত হইলাম। রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল এবং নগরবাসীরা আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁবুতে বাস করে। শীতকালে এখানে কেহই থাকিতে পারে না। রাজাকেও সদলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে যাইতে হয়, প্রজারাও রাজার অনুকরণ করে। এখানকার চার-পাঁচটি লোক কিছু কিছু হিন্দী জানে; ইহারা বাণিজ্যের জন্য হিন্দুস্থানে যাইয়া হিন্দী শিক্ষা করিয়াছে। সুতরাং এখানে আর আমার কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। প্রজারা আমাকে *বুঝিল; আমিও প্রজাদিগকে বুঝিলাম;* তবে একজন প্রজা আমাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল, ''আমার ছয়টা ঘোড়া ডাকাতে লইয়া গিয়াছে; তাহা কোথায়

আছে বলিয়া দাও।" আমি বলিলাম,"তোমার ঘোড়া ডাকাতে লইয়া গিয়াছে, আমি কেমন করিয়া সন্ধান বলিয়া দিব?" সে বলিল,"তুমি সাধু সব জান, কেবল আমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছ।" এই বলিয়া সে বিরক্তির সহিত চলিয়া গেল। যেমন নিম্নদেশে সাধু দেখিলেই লোক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং ঔষধ চায়, সেইরূপ ইহারাও আমার নিকট নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল এবং ঔষধ প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি ইহাদের কোন ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে পারিলাম না, সকলেই দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। আমি নিস্তার পাইলাম।

মানসসরোবর বরখার রাজার অধীন; মানসসরোবর যাইতে হইলে বরখার রাজার অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে। আমি ইতঃপূর্বে রাজার অনুমতি লইয়াছি, আমাকে আর কোনপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। আমি এইস্থানে রাত্রিযাপন করিলাম। দারচিন হইতে বরখা ছয় মাইল। বরখা হইতে মানসসরোবর আট মাইল। অদ্য ৩০শে আষাঢ় সংক্রান্তি। পূর্বে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, সংক্রান্তির দিবসে মানসসরোবরে গিয়া স্নান করিব; অদ্য প্রত্যূষে উঠিয়া সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার জন্য দ্রুতবেগে মানসসরোবরের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। সূর্যোদয়ের পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিলাম। এখন সূর্যোদয় হইয়াছে, চতুর্দিকের বরফমণ্ডিত পর্বতগুলি মাথা উঁচু করিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সূর্যদেব প্রসন্ন হইয়া সুবর্ণকিরণময় হস্ত পর্বতের মস্তকে অর্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। এই আশীর্বাদে পর্বতশিখর যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রস্রবণরূপ গলদশ্রুতে ধরাকে সিক্ত করিতেছেন। ধরা রাবণহ্রদ ও মানসসরোবরের রূপ। উভয় হস্তে পর্বতের অশ্রুবেগ ধারণ করিয়াছেন। প্রভাত হইয়াছে, রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও একটু কমিয়াছে। এদিকে আমার হৃদয়ে মানসসরোবর যাইবার জন্য উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এখন পূর্বদিকে চলিতেছি; দক্ষিণ ভাগে রাবণহ্রদ, বামভাগে একটি ক্ষুদ্র বরফ-মণ্ডিত পর্বত; রাস্তা সবুজবর্ণ ঘাস ও কন্টকে আবৃত, হ্রদের জল গভীর নীলবর্ণ। এই মনোহর দৃশ্য বর্ণনার অতীত।

রাবণহ্রদের মধ্যে একটি পর্বতময় দ্বীপ। এই দ্বীপস্থ পর্বতও তুষারমণ্ডিত। এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনের আবেগে সরোবরের দিকে ছুটিতেছি, এমন সময় দুইটি বস্তু দেখা গেল। সেই দুইটি বস্তুকে আমার সঙ্গীরা মনে করিলেন, ঘোটকারোহণে দুইজন ডাকাত আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এখানে

ডাকাতের বড় ভয়। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেই ডাকাতের ভয়ে ভীত। রাস্তায় চলিতে চলিতে সম্মুখে যা কিছু চলৎবস্তু দেখা যায়, তাহাকেই ডাকাত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়; কারণ বিভীষিকাময় স্থানে ভয়ের এমনই মহিমা যে, সম্মুখে যাহা কিছু বস্তু দেখা যায়, তাহাই ভয়জনক বলিয়া মনে হয়। সম্মুখস্থ জিনিস দুইটি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই সঙ্গীদের ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমরা বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গের জিনিসপত্র টাকাকড়ি আহারীয় প্রভৃতি কন্টকগুল্মের নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। পরস্পর অন্যমনস্ক হইয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম। সেই দুইটি জিনিস নিকট হইতে নিকটে আসিল। এখন দেখিলাম তাহারা দুইটি মনুষ্য, বোঝা ঘাড়ে করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। ক্রমে তাহারা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন দেখিলাম তাহারা দুইজন লামা, মানসসরোবর হইতে আসিতেছে, কৈলাসে যাইবে। দুইজনেই হস্তে জপচক্র ঘুরাইতেছে, আর বলিতেছে, "ওঁ মানিপেমাহুঁং"। ইহা এই দেশীয় লোকদিগের মহামন্ত্র। লামাদ্বয় আমাদের নিকট বসিল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মানসসরোবর কত দূর?" লামা উত্তর করিলেন, "বরখা হইতে যতদূর আসিয়াছেন আর ততদূর।" এই বলিয়া লামাদ্বয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের মধ্যে হাসির উচ্চরব উঠিল।

আমি আমার দোভাষী ভৃত্য বিষ্ণু সিংহকে বলিলাম, "ভাল ডাকাত দেখিয়াছিলে বটে!" বিষ্ণু সিংহ বলিল, "এ বড় ভয়ানক স্থান; ডাকাতে পরিপূর্ণ; অতি সাবধানের সহিত চলিতে হইবে। যদি ইহারা ডাকাত হইত, তবে কি হইত?" আমি আর বিষ্ণু সিংহের কথার উত্তর দিলাম না। সকলে সরোবরের দিকে চলিতে লাগিলাম। বিষ্ণু সিংহ লামাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এ পথে ডাকাতের ভয় আছে কিনা?" লামা উত্তর করিয়াছিলেন, "আজ কোনও ডাকাত দেখি নাই বটে, কিন্তু ৬. [illegible]।"

সে যাহা হউক, আমরা চলিতে লাগিলাম। এখন রাস্তা ঢেউ খেলানো, একবার উপরে উঠিতেছি, একবার নিম্নে অবতরণ করিতে হইতেছে। যখন ঊর্ধ্বে উঠিতেছি, তখন মানসসরোবর নয়নগোচর হইতেছে, আর যখন নিম্নে অবতরণ করিতেছি, তখন আর সরোবর দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ ক্ষণিক দর্শন, তার পরক্ষণেই অদর্শনে মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি ক্রমাগত দৌড়িয়া একটি উচ্চ স্থানে যাইয়া উঠিলাম; সেইখান হইতে সরোবরের দর্শন অতি মনোহর।

চারিদিকেই পর্বতমালায় বেষ্টিত, মধ্যে নীলবর্ণ জলরাশি পবনের আবেগে আন্দোলিত হইয়া এদিক ওদিক ছুটিতেছে এবং সমুদ্রবৎ বীচিমালায় তীরভাগকে আক্রমণ করিতেছে। যখন ঢেউ ছুটিতেছে, তখন বোধ হইতেছে যে, নীলবর্ণ জলরাশি হইতে শুভ্র মুক্তামালা উদ্বেলিত হইয়া তীরের দিকে ছুটিতেছে। এই জলের মধ্যে অসংখ্য চক্রবাক চক্রবাকী ক্রীড়া করিতেছে, এবং বহুসংখ্যক রাজহংস মানসসরোবরের বক্ষে বিচরণ করিতেছে। এই হংস ও চক্রবাক-চক্রবাকীর বর্ণ কর্পূরবৎ শুভ্র। ইহা দর্শন করিয়া মনে হইল, মানসসরোবর শ্বেতপদ্মমালায় বিভূষিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গে শুভ্র মহা শোভা সম্পন্ন করিতেছে। মানসসরোবরের চর্তুদিকের পর্বত-প্রাচীরও বরফে আবৃত।

আমি যেখানে বসিয়া আছি, এই স্থান হইতে জুগুমফা অর্ধ মাইল হইবে। জুগুমফা হইতে বামাবর্তে মানসসরোবর ভ্রমণ করিতে হইলে জুগুমফা হইতে নাংমুনা মঠে যাইতে হয়; নাংমুনা হইতে ঝিগেফ, ঝিগেফ হইতে সারালুং, সারালুং হইতে বন্ডী, বন্ডী হইতে ইয়াংগো, ইয়াংগো হইতে ঠোকর, ঠোকর হইতে খুচুর। এই সব স্থানে এক একটি মঠ আছে। প্রত্যেক মঠে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান আছে। এক মঠ হইতে অপর মঠ দশ-বারো মাইলের কম হইবে না। সুতরাং মানসসরোবরের পরিধি মঠের গণনা অনুসারে ৮০ হইতে ৮৫ মাইল। আমার বিচার অনুসারে মানসসরোবরটি অষ্টদল পদ্মের অনুরূপ, এক একটি পদ্মে এক একটি মঠ সংস্থাপিত। এই মঠের মধ্যে জুগুমফা মঠ সর্বপ্রধান এবং ঠোকর মঠ দ্বিতীয়। অদ্য আমার বিশ্রাম স্থান জুগুমফা মঠ; আমি এইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জুগুমফাতে আসিলাম। মানসসরোবরের পশ্চিমতীরকে আলিঙ্গন করিয়া একটি ক্ষুদ্র পবর্ত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। এই পর্বতে অনেকগুলি স্বাভাবিক গুহা আছে এবং পর্বতকে আশ্রয় করিয়া মঠ প্রস্তুত হইয়াছে। এই মঠে যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট স্থান আছে; কিন্তু কে যাত্রী, কে ডাকাত মঠের অধিকারী তাহা চিনিতে না পারিয়া যাত্রীদিগকে স্থান দেন না।

আমি মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর একজন লামা আমাকে মঠে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ইহা শুনিয়া বিষ্ণু সিংহ মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রধান লামাকে আমার পরিচয় দিয়া দিল, এবং লামা মঠের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আমাকে মঠের মধ্যে লইয়া গেলেন। এই মঠে আমি একটি ভাল কুঠুরী পাইলাম।

এই মঠে প্রবেশ করিয়া দেখি, প্রথমেই রাস্তার বামপার্শ্বে রন্ধনশালা। এই রন্ধনশালাতেও মঠের সমস্ত লোকের রন্ধন হয় ও অতিথিদিগেরও রন্ধন হইয়া থাকে। রন্ধনশালায় মঠের কর্মচারী লামার বাস। যত আগন্তুক ও ব্যবসায়ী এই রন্ধনশালায় স্থান পাইয়া থাকেন। রন্ধনশালার পশ্চিম দিকে আর একটি কুঠুরী, সেই কুঠুরীতে আমার বাসস্থান নির্ণীত হইল। এই কুঠুরীর মধ্যে অনেক জিনিসপত্র ছিল, তাহা এদিক ওদিক সরাইয়া আমার স্থান হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে বড় ডাকাতের ভয়। বাহিরে জিনিসপত্র রাখিলে ডাকাতেরা তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বাণিজ্যব্যবসায়ীদের পক্ষে মঠই কেল্লা; এখানে তাহারা জিনিসপত্র রাখে ও নিজেরা থাকে। এদিকে জুগুমফার ন্যায় আর নিরাপদ স্থান নাই। আমার কুঠুরীর পশ্চিমদিকে হলঘরের ন্যায় একটি বৃহৎ কুঠুরী। কুঠুরীর পূর্বদিকে সুবৃহৎ গুহা। গুহার ঊর্ধ্বদিকে হরপার্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং অনেকগুলি শিব ও শক্তিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গুহার মধ্যে হস্তলিখিত রাশি রাশি পুস্তক অতি গোপনে সুরক্ষিত। সকলের ভাগ্যে এই পুস্তকদর্শন ঘটে না, কেবল দেবদর্শন করিয়াই চলিয়া যান। লামার সঙ্গে সদ্ভাব হওয়াতে আমি এই পুস্তকগুলি দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই গুহাটি অন্ধকারময়, আলোক ভিন্ন এই গুহাতে প্রবেশ করা যায় না।

মানসসরোবর আমাদের একটি পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ হস্ত এই মানসসরোবরেই পড়িয়াছিল। এই পীঠের ভৈরব অমর, দেবী দাক্ষায়ণী। এই গুপ্ত গুহাই পীঠস্থান। এই গুহার সম্মুখেই যে হলঘরটির উল্লেখ করিয়াছি, সেই হলঘরের প্রায় চতুর্দিকেই পশমের গদি দ্বারা সুসজ্জিত, গদির উপর লাল-নীল বস্ত্রের আবরণ। এই আসনে লামারা বসিয়া জপ করেন এবং বিশেষ পর্বদিবসে এই স্থান হইতে গুহাস্থিত দেবীর দর্শন হইয়া থাকে। পর্বদিবস উপস্থিত হইলে এই ঘর ও গুহাটি আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়, সুতরাং তখন দেবী দর্শনের আর কোনও কষ্ট হয় না। এই ঘর হইতে বাহির হইয়াই ঊর্ধ্বদিকে সিঁড়ি, সিঁড়ির পর ছাদ, ছাদের উত্তর ও পূর্ব দিকে দ্বিতল ও ত্রিতল চার-পাঁচখানি ঘর আছে। এই সব ঘরে লামাদিগের বাস। প্রধান লামার বসিবার ঘরের পশ্চাতে তাঁহার যোগাসন। সেই যোগাসনের গুহাটি অতি সংকীর্ণ; অতি কষ্টে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় এবং সেই গুহাটি হইতে সরোবর দেখা যায়।

গৃহটির পশ্চাৎভাগে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া বাহিরে গেলেই তীরস্থ পর্বতে উঠা যায়। এই পর্বতের ঊর্ধ্বদেশে একটি গৃহ আছে, সেই গৃহে একটি যোগিনীর বাস। দুই বৎসর হইল তিনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বাহির হন নাই। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, আরও দুই বৎসর আমি এখানে থাকিব। ইঁহার সঙ্গে যোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। তাহাতে জানিলাম, ইনি একজন প্রধান রাজযোগী। ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাও মহাযোগী। ইনি ইঁহার ভ্রাতার শিষ্যা। পূর্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এইস্থানেই বাস করিতেন, অদ্য তিনি কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। রাস্তাতে যে লামাটির সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরু। ইনি এই গৃহ হইতে বাহির হন না; মঠবাসীরা দয়া করিয়া যাহা কিছু দেন, তাহাতেই ইঁহার উদর পূর্ণ হয়। ইঁহারা উভয়েই শৈব।

এই পর্বতে আরও চার-পাঁচটি গৃহ আছে। যাহারা মঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা ঐসব গৃহে বাস করে ও সোরা লবণ প্রভৃতি বাণিজদ্রব্য রাখে। আমি মঠে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম ও লামাপ্রদত্ত চা পান করিলাম। পরে স্নানার্থে সরোবরতীরে গমন করিলাম। মঠ হইতে সরোবরতীর অর্ধমাইল নিম্নে। মঠ হইতে সরোবরে অরোহণ করিবার একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া সরোবরে গেলাম। সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া সরোবরে স্নান করিতে ইচ্ছা হইল। বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, খুব হাওয়া উঠিয়াছে, সরোবর হইতে প্রচন্ড ঢেউ উঠিয়া তীরকে আক্রমণ করিতেছে। আমি শীতে কম্পান্বিত কলেবর; ঢেউয়ের সঙ্গে যত মৎস্য উঠিতেছে, তাহা তীরপ্রস্তরে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ গতাসু হইতেছে। আমি সরোবর দর্শন করিতেছি; যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূরই নিম্নে দেখিতেছি প্রস্তর, আর কিছুই নাই। আমি কাহারও কথা না শুনিয়া গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলাম, এবং সরোবরের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়া পড়িলাম; খুব অবগাহন করিলাম, শত শত ডুব দিলাম, আর ইচ্ছামত জলপান করিলাম। প্রাণের আনন্দে শীতের কষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম না। এখানে প্রায় সমস্ত দিনই বসিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার পূর্বে জুগুমফায় ফিরিয়া আসিলাম। এই জুগুমফার সকলেই জপযোগী; কেবল প্রধান লামা প্রাণায়াম-যোগী; ইঁহারা মহাশঙ্খমালা জপ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ রুদ্রাক্ষমালাও জপ করেন। মঠবাসীরা সকলেই বিনীত, শান্ত, অতিথিসেবাতৎপর ও উদার। এই মহাতীর্থে আসিয়া আমার মনে হইল, এই তীর্থের ব্রাহ্মণ লামা ও ডাবা; ইঁহাদিগকে

ভোজন দেওয়া উচিত। ইহা প্রধান লামাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "বেশ ভোজন করাইলেই চলিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি খাইবেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "চা, ছাতু ও মাংস।" তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমস্ত প্রস্তুত হইল এবং ভোজনকার্য শেষ হইয়া গেল। লামার সঙ্গে এখন আমার খুব ভাব হইয়াছে এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। তিনি শাস্ত্রপাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, আমিও চন্ডীপাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছি। আমি চন্ডীপাঠ করিতেছি আর তিনি বলিতেছেন, "এই চন্ডী আমার কাছেও আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কি কি গ্রন্থ আছে?" তিনি কহিলেন, "বিষ্ণুর সহস্রনাম ও ভগবদ্‌গীতা আছে।" তাঁহার সহিত আমার যত কথা হইয়াছিল, সমস্তই দোভাষীর মারফৎ। তাঁহার কথা দোভাষী আমাকে হিন্দী করিয়া বুঝাইতেছিল; আমার কথা তাঁহাকে তিব্বতীয় ভাষায় বুঝাইতেছিল; কারণ তিনিও হিন্দী জানেন না, আমিও তিব্বতীয় জানি না। মাঝে মাঝে আকার-ইঙ্গিতেও কথাবার্তা হইতেছে। আমি বলিলাম, "এই মঠে তিনদিন বাস করিয়াই আমি মানসসরোবর প্রদক্ষিণ করিতে যাইব।" তিনি বলিলেন, "তাহা হইবে না: কারণ সরোবরের চতুর্দিকেই ডাকাতদিগের আড্ডা। যতদিন ইচ্ছা আপনি এখানে বাস করুন, মানসসরোবর দর্শন ও সরোবরে স্নান করুন; ইচ্ছা করিয়া বিপদ আহ্বান করা উচিত নহে।" আমি তাঁহার কথা শিরোধার্য করিলাম এবং সরোবর প্রদক্ষিণের সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম।

এখানে পঞ্চ রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। অদ্য ষষ্ঠ দিবস প্রাতঃকালে লামার জন্য বরখা হইতে ঘোটক আসিয়াছে। লামা অদ্য বরখায় যাইবেন এবং কল্য বরখার রাজার সঙ্গে ছেক্‌রামুন্ডী যাইবেন। এখানকার রাজারা বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া থাকেন এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অধীন ও নিকটস্থ 'মুন্ডী' অর্থাৎ বাজারে গমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে একজন লামা থাকেন। লামা শাস্ত্রপাঠ করিয়া রাজাদিগকে শুনান এবং লামারাও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন। তাই এই মঠের লামা দুই মাসের জন্য মঠ পরিত্যাগ করিবেন। মঠ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে লামা বলিলেন, "আপনি কি করিবেন ও এখন কোথায় যাইবেন?" আমি বলিলাম, "আমি কল্যই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঘুচুর মঠে যাইব; তথা হইতে তক্‌লাখার হইয়া খুজরুনাথে যাইব।" লামা বলিলেন, "তা বেশ। খুজরুনাথ হইতে ফিরিবার সময় আপনি ছেকরামুন্ডী হইয়া যাইবেন। তথায় আমার সঙ্গে ও বরখার রাজার সঙ্গে দেখা হইবে।" এই বলিয়া লামা চলিয়া গেলেন। আমিও স্নানার্থ মানসসরোবরতীরে গেলাম।

জগদীশ চন্দ্র বসু

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরে এক সময়ে কূলপ্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোটো ছোটো তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম। কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত 'মহাদেবের জটা হইতে'। তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্বকথা শুনিতাম, 'মহাদেবের জটা হইতে'।

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম পরিচিত , বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে তো আর ফিরে না ; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি! যে যায় সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম,

"আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদী?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে"।

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি ! বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া আসিব"।

শুনিয়াছিলাম, উত্তর পশ্চিমে যে তুষারমন্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায় তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্মাচল নামক পূরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহদ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দন্ডায়মান। আমার পথ প্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখো, জয় নন্দাদেবী ! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎ ক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম,

অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমন্ডল। সেই নিবিড় নীল স্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়-মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইঁহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী তাহা পরে বুঝিলাম। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষাব নদী দেখিতেপাইবে।"

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্মহইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বণিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকান্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে,যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা ; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায় দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ।

ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতন প্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম — সমগ্র পর্বত ও বনস্থলিতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমন্ডলু মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষার-পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিনী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয় রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষারশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষারশয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনো পথ ছিল না; পতিত পর্বতখন্ডের ঘর্ষণেই

পথ কাটিয়া লইল — উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষার বাহিত প্রস্তরখন্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমিপ্রায় হইয়াছিল। নদীতট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে। জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুন্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গাররূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্ধ্ব ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা-বলে পর্বত-শিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাঁহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' ইহার উত্তরে এখন ও সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই —

'মহাদেবের জটা হইতে'।

বদরিনাথ

২৯শে মে, শুক্রবার। — কাঠের একটা সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হ'য়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথে প্রবেশ কল্লুম। আঘাতের পর প্রতিঘাত স্বাভাবিক নিয়ম। বদরিনাথের পথে যখন চলছিলুম, তখনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ, মনের ভয়ানক আবেগ, অভীষ্ট স্থানে এসে সে সমস্ত যেন সংযত হ'য়ে গেল। এই রকমই হ'য়ে থাকে।

পথে যখন অবিশ্রান্ত সংযম ক'রতে হয়েছে, তখন মনে হয়েছিল এই নিদারুণ যুদ্ধের অবসানে এমন একটা কর্মশীলতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যেখানে পূজার্চ্চনার অবিরাম কলরবে মানবহৃদয়ের সুখ দুঃখ ও হর্ষের বিপুল উচ্ছ্বাসে এক সুগভীর কল্লোল উত্থিত হ'চ্ছে। নদীর জলপ্রবাহ সমুদ্রের ফেনিল ঊর্মিরাশির নির্বোধ নৃত্যের মধ্যে মিশে যেমন হারিয়ে যায়, সেইরূপ হিন্দুর মহাতীর্থে, নারায়ণের পুণ্য পীঠতলে, দেবমহিমার এক অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ব্যাকুল-বাসনা ও অশান্ত উদ্বেগও সমাহিত হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে কেমন নিরাশ হ'য়ে প'ড়লুম।

বদরিনাথে প্রথমে প্রবেশ ক'রেই চারিদিকে একটা নিরুদ্যম, একটা উদাসীন ভাব চোখের সম্মুখে পড়লো। মনে হ'লো এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্মের মর্মে মর্মে বিজড়িত। তীর্থযাত্রীদের উদ্যম উৎসাহে কি হবে, একটা অলস কর্মহীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের আড্ডা বেঁধেছে। অলকানন্দা অতি নিরুদ্বেগে মন্থর গমনে বরফরাশির নীচে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে; শহরের অধিকাংশ ঘর বাড়ী এখন পর্যন্তও বরফের তলায় প'ড়ে আছে। যে কয়খানা ঘর দেখা যাচ্ছে, তাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়; তাহা কতক বরফের প্রসাদাৎ আর কতক আমাদের পূর্বাগত সন্ন্যাসী মহাশয়দের কৃপায়, আর কতকগুলি ঘর এই তিন বৎসরকাল ধ'রে বন্ধ থাকা বশতঃ নষ্ট হ'য়ে গেছে; বিশেষ সন্ন্যাসী মহাশয়েরাই ক্ষতি করেছেন কিছু বেশী। ঘরের দরজা জানালাগুলি বেবাক অন্তর্হিত হ'য়েছে। অবশ্য সেগুলো যে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছে, তা নয়; যে সকল সন্ন্যাসী সর্বপ্রথমে এখানে এসেছিলেন, তাঁরা দেখেছিলেন তখনও হাট বাজার বসেনি সুতরাং জ্বালানি কাঠ পাওয়া অসম্ভব; তাই

আপনাদিগকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত জানালা দরজা ব্রহ্মাকে উপহার দিয়েছেন,এবং তীর্থস্থানে এসে পরের জিনিসপত্র নাশ ক'রে "আত্মানাং সততং রক্ষেৎ" এই মহানীতি-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্যে তাঁদের মহৎ হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হ'য়ে উঠে ছিল- এই সমস্ত জানালা দরজার অভাব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পরে যে সকল যাত্রী আসবে, তারা এই বরফ-রাজ্যে এসে এদের অভাবে যে কত কষ্ট পাবে এ কথা চিন্তা করবার বোধ করি তাঁদের অবসর হয়নি।

পুরপ্রবেশ করার পূর্বে যে সকল পান্ডা আমাকে পেয়ে ব'সেছিল, তাদের হাত থেকে যে রকম ক'রে অব্যাহতি পেলুম, সে কথা পূর্বেই লিখেছি। বদরিনারায়ণে এসে কোথায় উঠবো তা লছমীনারায়ণ আমাদের দেবপ্রয়াগেই ব'লে দিয়েছিল। তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত সেই ঠিকানা এখনও আমার ডাইরী বইয়ে আছে; তা এই "কুর্মধারাকি উপর মোকাম, লছমীনারায়ণ পান্ডা, বেণীপ্রসাদ রামনাথকী চাচী।'- প্রথম কথাগুলোর অর্থ বুঝেছিলুম যে কুর্মধারার উপরে লছমীনারায়ণ পাণ্ডার বাড়ী, আর সেখানে বেণীপ্রসাদ আছেন। তা সে বেণীপ্রসাদ মানুষই হোন আর লছমীনারায়ণের গৃহবিগ্রহই হোন। কিন্তু শেষের দিকটার অর্থ নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হওয়াতে সে অর্থ নিষ্কাশনে অসমর্থ হ'য়ে তখনই লছমীনারায়ণকে সে কথা জিঞ্জেস করেছিলুম; কিন্তু কি কারণে জানিনে, উক্ত পান্ডাশ্রেষ্ঠ ঐ কথা কয়টির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সজ্ঞান করানোর আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করে নি। আমার কৌতূহল প্রবৃত্তির আগ্রহাতিশয্য দেখে উপরন্তু ব'লেছিল, "বস্ উয়ো বাৎ বোলনেসেই ডেরা মালুম হোগা" — সুতরাং কথাটা আর মোটেই বোঝা হয়নি। কিন্তু এখনও মনে পড়ে সে দিন সমস্ত অপরাহ্নটা এই কথার অর্থনির্ণয়ের জন্যে বৈদান্তিক ভায়ার সঙ্গে কিরূপ অনর্থক বাক্যব্যয় কর'তে হ'য়েছিল। বৈদান্তিক শুধু তার্কিক নন, একজন সুরসিক ও ভারি সমাজদার লোক; তাই তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হ'লো এই বেণীপ্রসাদ লোকটা লছমীনারায়ণের হয় শ্যালক, না হয় ভগিনীপতি। সম্বন্ধটা কিছু মধুররসাত্মক ব'লেই পান্ডার পো আমাদের কাছে তার মর্মভেদ করা বাহুল্য জ্ঞান ক'রেছিল। যা হ'ক বৈদান্তিক শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে ক্ষান্ত হ'লেন না, এবং আমিও এই অনুমানের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ ক'রেছিলুম, সুতরাং তিনি কথাটার ধাতু ও শব্দগত অর্থ বের করবার জন্য প্রস্তুত

হ'লেন। গভীর গবেষণা ও প্রচুর চিন্তার পর শেষে তিনি এই স্থির ক'ল্লেন যে, সেখানে বেণীপ্রসাদ আছে এবং রামনাথের খুড়ী আছেন, কেন না "চাচী" শব্দের অর্থ খুড়ী ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না; কাজেই "রামনাথকী চাচী" এক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। তবে স্ত্রীলোকের নাম ধরে আড্ডা খুঁজতে হবে, এই যা মনের মধ্যে, একটা খটকা লেগে রইল। বৈদান্তিক ব'লে বসলেন, জায়গায় জায়গায় অমনতর দুই একটা স্ত্রীলোক থাকে, পুরুষের চেয়ে তাদের খ্যাতি অনেক জেয়াদা। বলা বাহুল্য স্বয়ং লছমীনারায়ণ আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, কারণ সে আরও কয়দিন দেবপ্রয়াগে না থাকলে অনেক নতুন যাত্রী তার বেদখল হ'য়ে যাবে, তার এই ভয় ছিল: তবে সে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে এসে মিশবে। যা হোক বদরিনাথে এসে সেই "রামনাথকী চাচীর" অনুসন্ধানে বেশী নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি; সকল পান্ডাই তীর্থের কাকের মত রাস্তায় ব'সে থাকে: যখন তারা শুনলো যে, আমরা লছমীনারায়ণের লোক, তখন তাদের মধ্যে একজন এসে নিজেকে বেণীপ্রসাদ ব'লে পরিচয় দিলে। বেণীপ্রসাদের আকার প্রকার কি রকম তা আমরা কেউই জানতুম না, সুতরাং কলিকাতা, কালীঘাট, কি ঐ প্রকার কোন স্থানে হ'লে স্বতঃই সন্দেহ হ'তো যে, হয়ত বা একটা জাল বেণীপ্রসাদ এসে আমাদের স্কন্ধে ভর ক'রেছে এবং গোলযোগের মধ্যে যখন আসল বেণীপ্রসাদটা বেরিয়ে প'ড়বে তখন আমাদের এক বিষম মুস্কিলে প'ড়তে হবে। কিন্তু বদরিনাথের মত স্থানের এখনও ততটা অধঃপতন হয় নি! সুতরাং ঐ লোকটা বেণীপ্রসাদ ব'লে পরিচয় দেবামাত্র আমরা অসঙ্কোচে তার সঙ্গে চ'লতে লাগলুম।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ বেচারীও আমাদের নিয়ে মহা বিপদে প'ড়লো। তাদের ঘরবাড়ী এখনও বরফে ঢাকা, আরও পনের ষোল দিন না গেলে তারা বরফস্তুপের মধ্যে হ'তে প্রকাশ হ'চ্ছে না। বেণীপ্রসাদ নিজে অন্য লোকের একটা কুটির দখল ক'রে বাস ক'চ্ছে; সুতরাং এ রকম অবস্থায় সে আমাদের কোথায় রাখে, এই ভাবনাতে অস্থির হ'য়ে প'ড়লো। যা হোক, শেষে সে পাহাড়ের উপর আর একজনের একটা ঘরে আমাদের আড্ডা স্থির ক'রে দিল। এই ঘর যার সে তখনও এখানে এসে পৌছে নি; আমাদের আশঙ্কা হতে লাগলো, ঘরওয়ালা হঠাৎ এসে আমাদের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা না করে; কারণ এরা বিলক্ষণ অতিথিপরায়ণ হ'লেও অতিথিসেবার পুণ্যটুকু তাদের জন্যে রেখে অন্যলোকে যে তার অর্থগত উপস্বত্বটুকু

ভোগ ক'রবে, এদের পক্ষে তা অসহ্য। কিন্তু অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়াতে কোন লাভ নেই ভেবে আমরা সেই ঘরেই আড্ডা গাড়বার যোগাড় ক'রে নিলুম। ঘরটি বেশ লম্বা চওড়া বটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরিক অবস্থা অতি শোচনীয়; দ্বারগুলি পূর্বাগত সন্ন্যাসীদের অগ্নি সেবায় লেগেছে। রাত্রে দুর্জয় শীত আসছে; তখন এই ঘরে কি ক'রে তিষ্ঠান যাবে, এখন এই চিন্তাতেই আমরা সকলে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লুম। সন্ধ্যা হ'তেও আর বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যার সময় একবার নারায়ণ দর্শনে যাব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনলুম অপরাহ্নেই নারায়ণের দ্বার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, সুতরাং রাত্রিযাপনের জন্যে আগুনের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব হতেই বড় শীত বোধ হ'তে লাগল এবং সর্বশরীর পুরু কম্বলে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও শীতে সর্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে এল। শুনেছি মহাকবি কালিদাসকে কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিল "মাঘে শীত, না মেঘে শীত"?- তার উত্তরে কবিবর নাকি ব'লেছিলেন, "যত্র বায়ু তত্র শীত"। কখন বদরিকাশ্রম দর্শন করতে এলে কালিদাস তাঁর এই উত্তরের অসারতা বুঝে নিশ্চয় লজ্জিত হ'তেন। চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে বায়ু প্রবাহশূন্য স্থানেও যে রকম মারাত্মক শীত, তা কবি প্রতিভার আয়ত্তীভূত নয়; যে সকল পূণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রী এ সকল স্থানে আসে, তাহারাই তা মর্মে মর্মে অনুভব করে। তবু ত মে মাস, মাঘমাসের প্রবল শীত অনুমান করবার শক্তি মানুষের নাই। আমরা বহু কষ্টে কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বাল্‌লুম এবং তার পাশেই শয্যারচনা করা গেল। সে রাত্রে কিছুই আহার হ'ল না।

হিমালয় পর্বতের মধ্যে এত দূরে জনমানব শূন্য চিরতুষাররাশির ভিতরে এতখানি সমতলভূমি দেখলে প্রাণ বড় আনন্দ বোধ হয়। হরিদ্বার থেকে যাত্রা ক'রে এতদূর এসেছি, এর মধ্যে যা কিছু অল্প সমতল জমি দেখেছি তা শ্রীনগরে ভিন্ন সমস্ত জায়গাই "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ" অষ্টাবক্রবিশেষ। হরিদ্বার হ'তে বদরিকাশ্রম দুই শত মাইলেরও বেশী। একে তো হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী গম্ভীর; এ গাম্ভীর্যের সহিত স্বতঃই সাগরের গাম্ভীর্য তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই দুই জিনিসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের তফাৎ। একটি মহা উচ্চ, অসমান, সুদীর্ঘ শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর চিরন্তনের বাসভূমি- আর একটি সুগভীর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন, তবু এ দুইয়ের মধ্যে কেন যে তুলনার কথা মনে আসে, তাহা ঠিক বলা যায় না; বোধ করি, এ উভয়কে দেখেই আর একজনকে মনে পড়ে; এই মহান সৌন্দর্যের মধ্যে

বিশ্বপিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটি দেখে আর একটির কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই ত গম্ভীর দৃশ্য তার উপর বদরিকাশ্রমের দৃশ্যটা আরও গম্ভীর। দুই দিকে দুইটা পর্বত একেবারে আকাশ ভেদ ক'রে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের স্তব্ধ ছায়া বদরিকাশ্রমকে ঢেকে ফেলেছে। পান্ডাদের মুখে শুনলুম , এই দুইটি পর্বতের একটির নাম 'নর" অপরটির নাম "নারায়ণ"। আরও শুনলুম, এই পর্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হ'চ্ছে। শাস্ত্রে না কি লেখা আছে, ক্রমে এরা বর্দ্ধিত-কলেবর হয়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেলবে সুতরাং বদরিকাশ্রম তীর্থ চিরদিনের মত হিমালয়ের পাষাণ-বক্ষে লুকিয়ে যাবে। তবে পান্ডারা এই ভরসা করে যে দুই চারিশত বছরের মধ্যে সে রকম দুর্ঘটনা ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই; কাজেই আশু দারিদ্র্যতার আক্রমণ সম্বন্ধে তারা নিরাপদ; তবে তাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের যথেষ্ট আশঙ্কা রইল বটে।

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তা অতি সুন্দর? শুধু ভক্তের নয় কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে। এই পুণ্যভূমি ভেদ ক'রে অলকানন্দা প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু বছরের বেশী সময়ই তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, এখন ইহা বরফে ঢাকা। আরও কিছুদিন পরে বরফ গ'লে তার ললিত তরল স্রোতে ভেসে যাবে! সে দৃশ্য ভারি সুন্দর!

বদরিকাশ্রম উত্তর দক্ষিণে লম্বা; দীর্ঘ বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশী নয়, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানটুকু খুব দীর্ঘ ব'লে বোধ হয়। দীর্ঘে এতখানি হলেও প্রস্থে বেশী নয়; আরও দেখলুম প্রস্থদেশ খানিকটা ঢালু, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তবে তা বুঝতে পারা যায়, নহিলে সহসা বোধগম্য হয় না। দূরের পর্বত থেকে অনেকগুলি ঝরণা বের হ'য়ে অলকানন্দায় পড়েছে এবং নদীর বরফ ভেদ করে সেই জল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। উপরে যে কূর্ম-ধারার কথা ব'লেছি, তা এই বদরিনাথের বাজারের মধ্য দিয়ে নেমে নদীতে পড়েছে । এই ঝরণাতে বাজারের লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। কূর্মধারা ছাড়া বাজারের পাশেই আর একটা ঝরণা আছে। বাজারে যে কতগুলি দোকান আছে, প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিক বুঝতে পাল্লুম না; এখনও অনেকগুলি দোকান বরফের নীচে সুপ্তাবস্থায় লুপ্ত আছে, কিন্তু সমস্ত ঘর বাড়ীর একটা সঠিক ধারণা না হ'লেও বোধ হ'লো পান্ডাদের বাসস্থান ও দোকান সবশুদ্ধ ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা ঘরের বেশী হবে না। বাজারে দরকারী

জিনিসপত্র সকলই পাওয়া যায়; তবে দরকার অর্থে যদি কেহ অনুমান ক'রে থাকেন জুতা, ছাতা, সাবান, পমেটম ইত্যাদি সৌখীন রকমের জিনিসপত্র সব পাওয়া যায়, তবে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। পাহাড়ের মধ্যে এসে অনাবশ্যক বহুবিধ দরকারী জিনিসের কথা ভুলে গিয়েছিলুম; আবশ্যক বোধ হ'তো আটা, ভাল ঘি, লবণ, লঙ্কা আর কাঠ। আর বাঙ্গালী মানুষ অনেকদিন উপরি উপরি ডাল রুটির শ্রাদ্ধ ক'রতে ক'রতে এক এক দিন চাট্টি ভাতের জন্যে প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠতো, সুতরাং মধ্যে মধ্যে চাউলের খোঁজও না হ'তো এমন নয়। তার উপর যে দিন বড়ই নবাবী করার প্রবৃত্তি হ'তো, সেদিন গোটা দুই চারি "পেড়ার" (সন্দেশ) আয়োজন করা যেতো; কিন্তু এ রকম দুঃসাহস প্রকাশ করতে প্রায়ই ভরসা হ'তো না - কারণ, সে সকল সন্দেশের জন্মদিন স্থির করতে হোলে বহুদর্শী প্রত্নবিৎ পণ্ডিতকে যত্নপূর্বক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হয়; কত কীটই যে তার মধ্যে বাসা বেঁধে বংশানুক্রমে বাস ক'রছে তার ঠিক নেই! এখানে যে কয়খানা দোকান আছে, তার সকলগুলিতে কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্যের যোগাড় থাকে, আর প্রত্যহ ছাগলের পিঠে বোঝাই দিয়ে অনেক জিনিসের আমদানীও হয়। আমাদের দেশে যেমন গাড়ী কি বলদ বা ঘোড়ার উপর জিনিসপত্র চাপিয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ দেশে সে রকম হবার যো নেই। পাহাড়ে ঘোড়াই হ'ক আর বলদই হ'ক, এই সকল দুর্গম পথে তারা বোঝা বইতে সম্পূর্ণ অশক্ত। একে পথ দুরারোহ, তার উপর এত সঙ্কীর্ণ যে, বৃহৎকায় পশু সে সকল পথে চলাফেরা ক'রতে পারে না; আর যদিই বা তা সম্ভব হয় ত শীঘ্রই তারা হাঁপিয়ে পড়ে! ক্ষুদ্রকায়, কষ্টসহ ছাগলজাতিই এ পথের একমাত্র অবলম্বন; এবং তাদের উপরই এ দেশের লোকের জীবন নির্ভর ক'রছে। বাঙ্গালা দেশে যখন ছিলুম, তখন জানতুম, মা দুর্গার কাছে বলি দেওয়া ছাড়া ছাগলের ছাগজন্ম সার্থকের আর কোন পথ নাই, এমনকি ছাগমাংসে উদর পরিতৃপ্তির আশায় মগ্ন গুপ্ত-কবি লিখে গিয়েছেন, "এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা, শুধু সেই বোকা নয়, তার বাড়ে বংশে বোকা।" উদর-পরায়ণতার বশবর্তী হয়েই তিনি রহস্যপূর্বক মানব সন্তানকে লক্ষ্য ক'রে উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন। এতদ্ভিন্ন কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবনে দেহ পুষ্ট এবং ছাগলদুগ্ধ পানে উদরাময় নিরাকৃত হয়, এরূপও শুনা গিয়েছে। এই জন্যই আমাদের দেশ ছাগবংশের প্রতি যা কিছু কৃতজ্ঞ; কিন্তু এই বরফবাজ্যে এসে দেখি ছাগলের দ্বারাই

এখানে রেলওয়ের কাজ চ'লছে এবং ছাগলই এ দেশের সুখসমৃদ্ধির কারণ হ'য়ে রয়েছে। প্রতিদিন কত ছাগলের পিঠে কত জিনিস চাপিয়ে পাহাড় হ'তে পাহাড়ান্তরে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে; কিন্তু কোনোদিনও তাদের পদস্থলনের কথা শুনতে পাওয়া যায় নি। তবে এরা যেমন ছোট জানোয়ার, তেমনি অল্প বোঝা বয়। ছাগলের পিঠে দশ সেরের বেশী বোঝা চাপাতে দেখি না, কিন্তু তার চেয়েও ভারি বোঝা বইতে পারে। বোধ হয় অনেক দূর চ'লতে হয় ব'লে বোঝা লঘু করা হয়। আর যখন দলে দলে ছাগল এই কাজে লাগান হয়,তখন বোঝা ছোট হওয়াতে ব্যবসায়ীদের কোন ক্ষতি হয় না, বরং বেশী বোঝা দিলে যদি কোন ছাগল পথের মধ্যে অক্ষম হ'য়ে পড়ে ত বিপদের কথা। এই সকল ছাগল যে শুধু এই তীর্থস্থানের ও হিমালয় প্রদেশের লোকের খোরাক বয় এমন নয়, ভোট ও তিব্বতের লোকেরাও লবণ প্রভৃতি তাদের প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেনবার জন্যে দলে দলে ছাগল নিয়ে আসে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং আষাঢ়ের কয়েকদিন পর্যন্ত প্রতিদিন দলে দলে লম্বকর্ণ বৃহদাকৃতি ছাগল যাতায়াত করে। তারপর যখন বর্ষা নামে, তখন স্থানে স্থানে বেগবতী ঝরণা সকল হ'তে অবিশ্রাম জল ঝরতে থাকে; পথ ও দারুণ পিচ্ছিল হয়। তখন চলাচল এক রকল অসম্ভব হ'য়ে উঠে। তারপরে শীতকাল — তখন ত বরফে রাস্তাঘাট সমস্ত একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, সুতরাং যা কিছু কেনাবেচা , তা এই কয় মাসের মধ্যেই শেষ করে নিতে হয়।

বদরিনাথের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি দেখতে তত পুরাতন বলে বোধ হয় না; তবে অল্পদিনের, তাও নয়। মন্দিরের বাহিরে চারি পাশে সামান্য একটা উঠান। এই উঠানের চারিদিকে একটা একমহল ছোট চক, তাতে অনেক ছোট দেবতার অধিষ্ঠান আছে। নারায়ণের সঙ্গে এই সকল দেবতার কোন পার্থিব সম্বন্ধ নেই, এগুলি পান্ডাঠাকুরদের রোজগারের অবলম্বন মাত্র। নারায়ণের প্রাঙ্গণে যখন এঁদের স্থান হ'য়েছে, তখন এঁরা মাহাত্ম্য অংশে নিতান্ত খাট নয়, এই হেতুবাদে পয়সাওয়ালা অনেক যাত্রী এই সকল বিগ্রহের মাথায় দুই এক পয়সা চড়ায় (অর্থাৎ প্রণামী দেয়)। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার একটা দ্বার আছে, তার কবাট অতি প্রকান্ড। মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরের মতই। মন্দিরের গায়ে বিশেষ কোন কারুকার্য দেখলুম না; আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরগুলি যে রকমের বৈচিত্র্য-বিহীন, এও তাই; তবে দেবমহাত্ম্যেই এর মাহাত্ম্য এত বেশী। উঁচুতে

কালীঘাটের মন্দিরের চেয়েও খাট বলে বোধ হ'লো; তবে এটি আগাগোড়া পাথরের গাঁথা , এ পাথরের রাজ্যে পাথরের উপর যে মন্দির নির্মিত, তার পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়, বরং ইষ্টকনির্মিত হ'লেই একটু আশ্চর্য হবার কারণ থাকতো। এদিকে যত মন্দির দেখলুম, সকলগুলিই পাথরের গাঁথা।

মন্দিরটি জীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আগে ব'লেছি বাহ্যদৃশ্যে তেমন জীর্ণ বলে বোধ হয় না। সকলের বিশ্বাস এ মন্দির শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। এ কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই; ইহা বহু প্রাচীন জনপ্রবাদ, এবং তার কতক প্রমানও যে নেই, এমন নয়! কিন্তু মন্দিরটি দেখলে কেহই বিশ্বাস করবে না যে, এটি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত-এমন আধুনিকের মত দেখায়! আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হ'য়েছিলুম. কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, যে মন্দিরটি বছরের মধ্যে আট মাস বরফের নীচে ঢাকা থাকে, রৌদ্র-বৃষ্টির সঙ্গে বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না, সুতরাং তাঁর উপরের দিকে ময়লা ধরবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। কিন্তু আর বেশী দিন বে-মেরামত অবস্থায় রাখা উচিত নয় ভেবে মন্দিরাধ্যক্ষ এর মেরামত আরম্ভ ক'রেছেন। তবে কতদিনে যে এই কাজ শেষ হবে, কখনও হবে কি না , তা ভবিষ্যৎ-জ্ঞান না থাকলে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে বলা ভারি শক্ত। হয় ত মেরামত শেষ হ'তে না হ'তে আরও দু'চার জন মোহান্তের জীবনকাল কেটে যাবে; কারণ একে ত বছরের দু'তিন মাসের বেশী কাজ হবার যো নাই, তার উপর যে রকম "গদাইলস্কর" ভাবে কাজ চলছে, তাতে একদিকে গড়ে তুলতে আর একদিক ভেঙে না পড়ে। হায় কলিকাল! স্বয়ং বিশ্বকর্মা থাকতে নারায়ণের মন্দির মেরামতের জন্য আজ কিনা সামান্য রাজমিস্ত্রিরা তাদের দুর্বল হাতে ছোট ছোট পাথরের চাপ নিয়ে টানাটানি ক'রছে এবং যতটুকু কাজ ক'রছে তার চেয়ে অনেক বেশী পয়সা ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, এদের নরকেও স্থান হবে না।

এখন পর্যন্ত অদৃষ্টে নারায়ণ দর্শন ঘটেনি; কিন্তু বাল্যকাল হ'তে শুনে আসছি, বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মূর্তি, পরশ-পাথরে নির্মিত। স্পর্শমণি উপকথায় বস্তু, কল্পনা ও কবিতাতে কখন কখন তার শক্তি অনুভব করা যায়বটে; কিন্তু এই পৃথিবীতে যদি সে রকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাকতো, তা হলে এই ঘোর জীবন সংগ্রামের দিনে অনেকের পক্ষে সুবিধার কথা ছিল। বাধাবিভ্রাটের ভয়টা ত ক'মে যেতই, তা ছাড়া ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের জন্যও এতটা কষ্ট পেতে হ'তো না, এবং অনাহারে থেকে

ভদ্রতার দণ্ডস্বরূপ ঘটি বাটি বিক্রয় ক'রে ট্যাক্স দেবার দায় হ'তেও অনেকাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। কিন্তু কবিতা ও কল্পনাতে যা মেলে, এ নিষ্ফলতার পৃথিবীতে তা কোথা হ'তে মিলবে? দেশে থাকতে কতদিন শুনেছি, কখন ঠাকুরমার কাছে কখন বা বাচস্পতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে যে,— হিমালয় পর্বতে এমন সব যোগী-ঋষি আছেন, যাঁরা যোগবলে ভস্মকে কাঞ্চন এবং বিষকে অমৃত ক'রতে পারেন! কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ এ পর্যন্ত বিষের জ্বালা অনেক সহ্য ক'ল্লুম বটে, কিন্তু অমৃতের আস্বাদন ত বড়-একটা হ'লো না; তা হ'লে বোধ করি আবার এ সংসারের কর্মভোগের মধ্যে এসে প'ড়তে হ'তো না। তবে এইটুকু ও বলা যেতে পারে যে, অমৃতের আস্বাদন না পাই, এমন এক আধ জন সন্ন্যাসী দেখা গিয়াছে বটে, যাঁরা সচ্চিদানন্দের করুণামৃত-ধারা পান করে জীবনকে কৃতার্থ ক'রেছেন; কিন্তু তাঁদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ঘটে নি, তাঁদের স্বর্গীয় জ্যোতির সম্মুখে উপস্থিত হ'লে সাংসারিক আসক্তিপূর্ণ বাসনা ও চিন্তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পাপ হৃদয়ে যে আশ্বাসবাণীর ঘোষণা হয়, আমরা তার উপযুক্ত নই, সুতরাং দু'দিনের মধ্যে সে সকলই অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন বাস্তবিকই একটা অনন্ত যাতনায় প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠে, কাতর হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে স্বতঃই ধ্বনিত হয় —

"যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনায় মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায়! ভেঙে সব যায়, ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি পথে পাথারে:
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে!"

রাত্রে শুয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। বৈদান্তিকের সুখ-নিদ্রাটা আমার কাছে নিতান্ত চক্ষুশূল ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। বিশেষ যতক্ষণ ঘুম না আসে চুপ ক'রে পড়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করার চেয়ে ততক্ষণ কথা বলাতে বোধ করি একটু বেশী আরাম আছে; কিছু না হোক কথাবার্তায় শীতের প্রকোপটা অনেক কম বিবেচনা হয়। অতএব বৈদান্তিকের ক্লান্তিহর নিদ্রাটুকু বিনষ্ট ক'রতে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হ'লো না। কাঁচা ঘুম ভাঙাতে বৈদান্তিক বোধ করি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উত্যক্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম "আচ্ছা, নারায়ণের দেহ যে, পরশ-পাথরে নির্মিত বলে, এ কথাটার অর্থ কি? আমি ত অনেকক্ষণ ভেবে কিছুই ঠাহর ক'রতে পাল্লুম না, সত্যি সত্যি পরশ

- পাথর ত আর নেই!" - আশু তর্কের একটি সুন্দর সম্ভাবনা দেখে ভায়ার নিদ্রা বিরক্তি দুই-ই এককালে দূর হ'য়ে গেল! তিনি সোৎসাহে পার্শ্বপরিবর্তন ক'রে বলতে লাগলেন যে পরশ-পাথর কথাটার অর্থ নিয়েই আমি গোল কচ্ছি। আমাদের দেশের সকল বিষয়েরই এক একটা অর্থ আছে- যাকে আজকাল আমরা আধ্যাত্মিক অর্থ ব'লে থাকি; এবং বৈদান্তিকের মতে কেহ কেহ তার প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত ও ক'রে থাকে। বোধ হয় তিনি আমার উপর কটাক্ষ ক'রেই কথাটা ব'ল্লেন; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি গুরু, আমি শিষ্য, সুতরাং কোন রকম উচ্চবাচ্য না ক'রে শুনতে লাগলুম। তিনি অর্ধরাত্রব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা যা বুঝালেন, তার মোদ্দাখানা এই যে, পরশ-পাথরের গূঢ় অর্থ ধর্ম। কারণ কল্পিত পরশ-পাথর স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়-তেমনি ধর্মের সংস্পর্শে তুচ্ছ দ্রব্যও মূল্যবান হয় এবং যা নিতান্ত মলিন, তাও উজ্জ্বল ও তেজোময় হ'য়ে উঠে; লোকে তখন তা আগ্রহ ভরে কণ্ঠে ধারণ করবার জন্য আকুল হয়; নারায়ণের দেহ পরশ-পাথরে নির্ম্মিত, তার অর্থ কি না, তিনি ধর্ম্মস্বরূপ; তাকে স্পর্শ দূরের কথা, দর্শনমাত্র মানুষ খাঁটি সোনা হয়ে যায়। পাপ মনকে যে স্পর্শমণি নিষ্পাপ, পবিত্র ক'রে তুলতে পারে - লোহাকে তুচ্ছ সোনা করার পরশমণি তার কাছে কোথায় লাগে?

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বাস্তবিকই বৈদান্তিক ভায়ার এই বক্তৃতা আমার অতি মিষ্ট লেগেছিল। এমন একটা সার কথা তাঁর কাছে থেকে আমি মুহূর্তের জন্যও প্রত্যাশা করি নি; কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার হৃদয়ে আর একটা নূতন চিন্তার উদয় হ'লো-হায়! দেবতার পদতলে এসেও আমার এই জীবনব্যাপিনী চিন্তা দূর হয় নি! আমার মনে হ'লো এ সংসারে রমণী হৃদয়ই একমাত্র স্পর্শমণি! দেবতার মহিমা যেখানে প্রবেশ ক'রতে অক্ষম, সেখানেও সে আপনার উজ্জ্বল মহিমা বিকাশ করে এবং পুরুষের কঠোর হৃদয়কেও পুণ্যময় ও পবিত্র ক'রে তোলে। আমার একখানি স্পর্শমণি ছিল, হঠাৎ তা হারিয়ে ফেলেছি। দেখি, যদি হিন্দুর মহাতীর্থে আর একখানি স্পর্শমণির সন্ধান পাই-যাতে এই পাপভারানত ধূলিম্লান জীবনকে সজীব, উজ্জ্বল ও পবিত্র ক'রে তুলতে পারি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিমালয়যাত্রা

পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল,ইস্কুল যাইব কী করিয়া? গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাকব্রাহ্মণের প্রতি তো তাহাদের ভক্তি নাই। অতএব, নেড়া মাথার উঁপরে তাহারা আর-কোনো জিনিস বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,আমি তাহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কিনা। 'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কেথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়!

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি-অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন; গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়া মাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন 'মাথায় পরো'। পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তিকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না,এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্তব্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্পস্বল্প এদিক- ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও

সর্তক থাকিতে হইত। উনিশ-বিশ হইলে হইতো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশমাত্র নড়চড় ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে-কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যেকের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জোড়া দিয়া ঘটনাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয়যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল.অন্য দিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্বে পিতামাতার সঙ্গে সত্য সেখানে গিয়াছিল। তাহার কাছে ভ্রমণ বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়া ছিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনোই বিশ্বাস করিতেই পারিত না। কিন্তু,আমাদের সেকালে সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখাটা যে কোথায় তাহা ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এ-সম্বন্ধে আমাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। রঙ করা ছেলেদের বই এবং ছবি-দেওয়া ছেলেদের কাগজ সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে আমাদিগকে আগেভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই। জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সত্য বলিয়াছিল. বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ঙ্কর সঙ্কট,পা ফসকাইয়া গেলে আর রক্ষা নাই। তার পর ,গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই , নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার

ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয় ভয় করিতেছিল। কিন্তু, গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয়তো গাড়ি ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল; তরুশ্রেণীর সবুজ-নীল পাড় দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল,যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে, এই আমার ইচ্ছা-সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিয়া বুক দুরুদুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল,পৃথিবীর অনান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ ছিল এই যে,কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনোপ্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই লাগে না। এই অদ্ভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন না যে, আজ পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা শহরের ছেলে, কোনো কালে ধানের খেত দেখি নাই এবং রাখাল বালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম। সত্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখালবালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধানখেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাওয়া, এই খেলার একটা প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে চাহিলাম। হায় রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের খেত! রাখাল বালক হইতো বা মাঠের কোথাও ছিল,কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখালবালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না-যাহা দেখিলাম

তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গন্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন,তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছ বিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালি মাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,'কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!' আমি বলিতাম,'এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।' তিনি বলিতেন,'সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।'

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই অসমাপ্ত গর্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে করিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া মনে বড়োই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। বোঝামাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না; এবং সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই যে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিব এমন কোনো দাবি নাই,সে কথা আজও বুঝিতে ঠেকে। আমার সেদিনকার একান্তমনের প্রার্থনায় বিধাতা যদি বর দিতেন যে,'এই পাথরের বোঝা তুমি চিরদিন বহন করিবে', তাহা হইলে এ কথাটা লইয়া আজ এমন করিয়া হাসিতে পারিতাম না।

খোয়াইয়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির ঝির করিয়া বালির মধ্য

দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোটো ছোটো মাছ সেই জলকুন্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম, ''ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।'' তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন, ''তাই তো, সে তো বেশ হইবে।'' এবং আবিষ্কর্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দূরবীনের উলটা দিকের দেশ। নদী পাহাড়গুলোও যেমন ছোটো ছোটো,মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো-জাম বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটে খাটো। আমার আবিষ্কৃত ছোটো নদীটির মাছগুলিও তেমনি,আর আবিষ্কারকর্তাটির তো কথাই নাই।

পিতা বোধকরি আমার সাবধানতা বৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন,হিসাব রাখিতে হইবে,এবং আমার প্রতি তাঁহার দামী সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না,আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন,আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।' তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

বড়ো বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইত সেইদিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্কস্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমত মোটা

অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগ বিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনোদিন অসংগতি অনুভব করিতেন তবে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলা শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে , হিসাবে যেখানে কোনো দুর্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ দুটা দিন বিশেষ উদ্‌বেগের দিন ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি,মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল-তা হিসাবের অঙ্কই হোক, বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক, বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি তিনি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে , প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেইজন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল । সেইগুলি বাংলা অনুবাদ-সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার প'রে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব অনুভব করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত । তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল

খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল।একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল, উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয় বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল , 'এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে'। পিতা কহিলেন , 'না' । তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয় আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল, 'ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে'। আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সেই টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্লাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝনঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল;টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাঁথা হেট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে।আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময়ে সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খন্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার

কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন। বোধ করি তাহাকে যে-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম দিলেও সে খুশি হইত। ইহার ফল হইল এই, আমাদের বাসায় গান শোনাইবার উমেদারের আমদানি এত বেশি হইতে লাগিল যে তাহাদের পথরোধের জন্য শক্ত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। বাড়িতে সুবিধা না পাইয়া তাহারা সরকারি রাস্তায় আসিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সকালবেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। সেই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরা ঘাড়ে গায়কের আবির্ভাব হইত। যে পাখির কাছে শিকারি অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারো ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, রাস্তার সুদূর কোনো-একটা কোণে তানপুরা যন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত। কিন্তু শিকার এমনি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের তানপুরার অওয়াজ নিতান্ত ফাঁকা অওয়াজের কাজ করিত; তাহা আমাদিগকে দূরে ভাগাইয়া দিত, পাড়িয়া ফেলিতে পারিত না।

যখন সন্ধা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব - অন্ধকারে।

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন — সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর - একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি গান— 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সবকটি একে

একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে - কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parley's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিয়া পারিতেন না।

ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোন চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলট পালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছা অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টররে লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

তাঁহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে - বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ-বরো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের 'রোম'। দেখিয়া মনে হইত না ইহার মধ্যে কিছুমাত্র রস আছে। আমি মনে ভাবিতাম

আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিস পড়িতে হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই — কিন্তু ইনি তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন।

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্বতের উপত্যকা - অধিত্যকাদেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্নে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না — পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোনো, পথের কোনো বাঁকে, পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।

নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা। মন তখনো জানিতে পারে না যে, এমন আরও অনেক আছে। তাহা জানিতে পারিলেই হিসাবি মন মনোযোগের খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। যখন প্রত্যেক জিনিসটাকেই একান্ত দুর্লভ বলিয়া মনে করে তখনই মন আপনার কৃপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়। তাই আমি এক-একদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নিজেকে বিদেশী বলিয়া কল্পনা করি। তখনই বুঝিতে পারি, দেখিবার জিনিস ঢের আছে, কেবল মন দিবার মূল্য দিই না বলিয়া দেখিতে পাই না। এই কারনেই দেখিবার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য লোকে বিদেশে যায়।

আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোট ক্যাশবাক্সটি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি, সে কথা মনে করিবার হেতু ছিল না। পথ খরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত। কিশোরী চাটুর্জ্যের হাতে দিলে তিনি

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু আমার উপর বিশেষ ভার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া একদিন বাক্সটি তাঁহার হাতে না দিয়া ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।

ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন - কি, পথের যে-অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকান্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু, এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর- এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল।

শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।

সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন। অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘন্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠান্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল জলে স্নান করিয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

দুধ খাওয়া আমার আর -এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু, পূর্বেই জানাইয়াছি, কী কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উলটাদিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশী করিয়া দিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর-একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা

এক-একদিন দুপুরবেলায় লাঠিহাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর - এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম, পিতা তাহাতে কখনো উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছে, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ অনেক করিয়াছি; তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনো

তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না; তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায়, কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেঁয়াল গিয়াছিল, আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যান্ড্ ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু আমার পিতাকে যখনই বলিলাম তিনি বলিলেন, "এ তো খুব ভাল কথা; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।" এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন। আমার যে ইহাতে কোনো কষ্ট বা বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

আর-একবার যখন আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, "আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।" তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, "বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো।" যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙিয়া সে জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই। যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু, ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্‌বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারো

চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর-কাহারো কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কী করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে, এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই-সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোন চিঠিতে ছিল তিনি 'কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু' হইয়া খাটিয়া মরিতেছেন — সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই, তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু, আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে-অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর-কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালের বড়োমানুষির অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার দিনের শৌখিন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত, এই-সব গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। গয়লা দুধে জল দিত বলিয়া দুধপরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ তাহার কার্যপরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল, এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রঙও ততই ঘোলা এবং ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কৈফিয়ত দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা দুধের মধ্যে শামুক ঝিনুক ও চিংড়িমাছের প্রাদুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর, পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্জের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

হিমালয়

আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে-স্বপনে যে ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি-ভারতজননী পার্বতী দেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাষু ব্যক্তি জীবন-সন্ধ্যায় যেখানে আসিয়া 'শেষ অধ্যায়' সমাপ্ত করিতে অভিলাষী হন। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, গভীর গহ্বরে, দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমুহের তীরে সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল — যে-তত্বগুলির কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতেও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং যেগুলিকে যোগ্যতম বিচারকগণ অতুলনীয় বলিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি — অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি এবং তোমরা সকলেই জানো, আমি এখানে বাস করিবার জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি; আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা — ঋষিগণের প্রাচীন বাসভুমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইব। বন্ধুগণ, সম্ভবতঃ পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও বিফল-মনোরথ হইব, নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয়তো আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপটভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাহাই নহে, একরূপ বিশ্বাসও করি যে, জগতের অন্য কোথাও নয়, এইখানেই আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিবে।

এই পবিত্রভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে আমার সামান্য কার্যের জন্য তোমরা কৃপা করিয়া আমার যে প্রশংসা করিয়াছ, সেই জন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এখন আমার মন —কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছে না। যতই এই শৈল্যরাজের শিখরগুলি পর পর নয়নগোচর হইতে লাগিল ততই আমার কর্মপ্রবৃত্তি —বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল, এবং আমি কি করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি করিবার সঙ্কল্প আছে, ঐ-সকল বিষয়ের আলোচনায় না গিয়া এখন আমার মন —হিমালয় অনন্তকাল

ধরিয়া যে এক সনাতন সত্য শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগশীল আবর্তে আমি যে এক তত্ত্বের অস্ফুটধ্বনি শুনিতেছি — সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। 'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' —এই জগতে সকল জিনিসই ভয়-যুক্ত, কেবল বৈরাগ্যই ভয়শূন্য।

হ্যাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি। এখন আমার মনের ভাবসমূহ বিস্তারিতভাবে বলিবার সময় বা সুযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেছি, এই হিমালয়পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দন্ডায়মান, আর মানবজাতিকে আমরা চিরদিন এই ত্যাগের মহৎ শিক্ষা দিতে থাকিব। যেমন আমাদের পুর্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈল্যরাজের দিকে আকৃষ্ট হইবেন — যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্মে ও আমার ধর্মে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে, একটি সনাতন ধর্মই বিদ্যমান — সেটি অন্তরে ব্রহ্মানুভূতি, আর যাহা কিছু সব বৃথা। এইরূপ সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ 'সংসার মায়ামাত্র এবং ঈশ্বর — শুধু ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতিত আর সবই বৃথা', ইহা জানিয়া এখানে আসিবেন।

বন্ধুগণ, তোমরা অনুগ্রহপূর্বক আমার একটি সঙ্কল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়াছ। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সংকল্প আছে; আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটি এই সার্বভৌম ধর্মশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নির্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ তোমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে যদি হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র চাই-ই চাই, এই কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না — এখানে নিস্তব্ধতা শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি, একদিন না একদিন আমি ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারিব।

স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জিলিঙ -এ দু'মাস অবস্থানের পর স্বামীজী নিমন্ত্রিত হ'য়ে হিমালয়ের আলমোড়া শহরে যান। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে হিন্দীতে একটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। উত্তরে স্বামীজীর বক্তব্য 'হিমালয়' নামে প্রকাশিত হল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

গৌরীকুণ্ড

পূর্বাহ্ণেই সুপবিত্র দেবনদী-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া আমি তথা হইতে গৌরীকুন্ডাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীনারায়ণের পর শ্রীকেদারনাথের নিম্নে স্বমাহাত্ম্য-প্রভাবে গৌরীকুন্ড বিশেষ প্রসিদ্ধ। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতেই ভক্ত যাত্রিগণের মন গৌরীকুন্ড দর্শনাভিলাষে উৎফুল্ল হয়, এবং তথায় পৌঁছিবার জন্য চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হয়। তাহার প্রধান কারণ এই যে গৌরীকুন্ডে পৌঁছিতে পারিলেই মনে হয় যেন শ্রীকেদারনাথে গিয়া পৌঁছিলাম, এবং গৌরীকুন্ডের তপ্ত ধারার কথা শুনিয়া তাহাতে স্নান করিবার জন্য স্বভাবতই শীত-কাতর যাত্রিগণের ইচ্ছা বলবতী হয়। কেদারের নিদারুণ শীত সহনাক্ষম যাত্রিগণের পক্ষে গৌরীকুন্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ যে নিতান্তই সুখপ্রদ বলিয়া মনে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গৌরীকুণ্ডাভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, গিরিরাজের অভিনব অত্যুজ্জ্বল বিরাটমূর্তি দর্শন করিয়া মনে হইল যেন তিনি স্তরে স্তরে নানা বিচিত্র বেশে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। যতই উপরে উঠি ও চতুর্দিক অবলোকন করি, মনে হয় যেন একে একে হিমগিরির বহিরাবরণগুলি ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতেছি। অপূর্ব কেদাররাজ্যে গিরিরাজের নিত্যই নব নব বিচিত্র সাজসজ্জা এবং তাহার অধিকতর উজ্জ্বল মূর্তি দর্শন করিয়া আমার মনঃপ্রাণ যে কিরূপ মুগ্ধ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। যে কেদারনাথের নিকটবর্তী স্থান-সমূহের অপার সৌন্দর্য-রাশিরই ইয়ত্তা হয় না, না জানি সেই কেদার কেমন-ইহাই ভাবিতে ভাবিতে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় আমি গৌরীকুন্ডে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অতি বিচিত্র, নিবিড় অরণ্যানী-সমাচ্ছাদিত, তুষারাচ্ছন্ন, উত্তুঙ্গগিরিশ্রেণী-পরিবেষ্টিত, নাতিপ্রশস্ত ভূখন্ডে সুপবিত্র গৌরীকুন্ড প্রতিষ্ঠিত। মন্দাকিনীর বিমল সলিলে গৌরীকুন্ড সদা সুসিক্ত, এবং উচ্ছলিতা প্রবাহিণীর সুশীতল সদা স্নাত। গৌরীকুন্ডের মন্দিরে জগন্মাতা গৌরীর এক দিব্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তাহার পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবল বেগবতী মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইয়াছেন। গৌরীকুন্ডের সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিতা মন্দাকিনী যেন জগজ্জননীর মন্দির-সমীপবর্তিনী হইয়া

কিছু শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থানে মন্দাকিনীর যে ভৈরব গর্জন শ্রুত হইয়াছিল, তাহা যেন এইখানে মহামায়ার স্তুতিগানে পরিণত হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুমধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার পর একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ধারায় উত্তপ্ত এই দেবদুর্লভ, পরম-রমণীয় গৌরীকুন্ড বহুদূরদেশাগত ভক্ত যাত্রিগণের পক্ষে অধিকতর সুখপ্রদ হইয়া রহিয়াছে ও কেদারের নিদারুণ শীতসহনক্ষম করিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে সবল করিতেছে। এই তপ্তধারার উষ্ণ জল কৃত্রিম উপায়ে প্রবাহিত হইয়া অবিরাম ঝর্ঝর শব্দে একটি প্রস্তর নির্মিত কুন্ডে নিপতিত হইতেছে। এই কুন্ডকে গৌরীকুন্ড বলে। উষ্ণ জলপ্রবাহ কুন্ডে অবরুদ্ধ না হইয়া একেবারে স্বচ্ছ-সলিলা মন্দাকিনীর তুষার-বিগলিত অতি শীতল জলরাশিতে মিলিত হইয়াছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণ গন্ধক-মিশ্রিত হওয়ায় ইহাতে কয়েকবার স্নান করিলে সকল প্রকার চর্মরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়। ঁকেদারনাথের পথে আর কোথাও এরূপ উষ্ণ প্রস্রবণ দেখি নাই। চিরহিমানীর মর্মভেদী শীতবাতে কাতর যাত্রিগণ এই তপ্তধারায় স্নান করিয়া বড়ই আরাম বোধ করেন; কিছুক্ষণের জন্য কেদারের অসহ্য শীতকষ্ট বিস্মৃত হন।

আমি গৌরীকুন্ডে পৌঁছিয়াই দেখিলাম যে স্থানটি নানাদেশীয় যাত্রি-সমাগমে পরিপূর্ণ; যাত্রিগণের কোলাহল ও দেবনদী মন্দাকিনীর কলনাদ উভয়ে মিলিত হইয়া এক প্রকার অপূর্ব ধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে। ঁকেদারনাথের পথে অগস্ত্যমুনি,গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীনারায়ণের পর এমন স্বভাব-সুন্দর জনমানবপূর্ণ চটি এবং সুপ্রশস্ত, পরম রমণীয় স্থান আর একটিও দেখি নাই। এইখানে কয়েকখানি দোকান আছে; তাহাতে যাত্রিগণের আবশ্যকীয় প্রায় সকল আহার্য সামগ্রীই পাওয়া যায়; বাসোপযোগী ঘরেরও অপ্রতুল নাই। ঁকেদারনাথের পথে এই গৌরী-কুন্ডই শেষপ্রান্তবর্তী স্থান; ইহার উপরে এক বাবা কেদারনাথের মন্দির ব্যতীত আর এমন স্থায়ী ঘর বাড়ী ও মন্দিরাদি কোথাও নাই; এমন কি, অত্যন্ত তুষারপাত-নিবন্ধন শীতকালে এই গৌরীকুন্ডেও কেহ থাকিতে পারে না। ইহার চতুস্পার্শ্ববর্তী যে সকল গ্রাম অছে, শীতকালে তাহাতেই সকলে বাস করিতে সমর্থ হয়।

গৌরীকুন্ড সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট নহে। হিমালয়ের অন্যান্য স্থানসমূহের ন্যায় কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই গৌরী-কুন্ড প্রসিদ্ধ নহে। অতীতের যে অপূর্ব ও মহাপবিত্র স্মৃতি ইহা আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়, এবং

যে সকল বিচিত্র ঘটনাবলীর সহিত এই গৌরীকুন্ড ও শ্রীকেদার-শৈল বিজড়িত, এস্থলে তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর যাবৎ উত্তরাখণ্ডের অতিশয় নিভৃত ও দুর্গম স্থানসমূহ দর্শন করিয়া আমি যতদূর বুঝিয়াছি ও লোকমুখে শুনিয়াছি, তাহাতে এক্ষণে আমি ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে হর—পার্বতীর যাবতীয় লীলাই এই কেদার-রাজ্যে সুনিষ্পন্ন হইয়াছিল। হর-পার্বতীর লীলা-মাহাত্ম্যে এই অদ্ভুত কেদার-রাজ্য পরিপূর্ণ এবং সেই জন্যই বুঝি ইহার এত বিচিত্রতা ও মহত্ত্ব। সমুদয় উত্তরাখণ্ডের মধ্যে যতগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে তাহাদের সহিত তুলনায় প্রকৃত প্রস্তাবেই মনে হইবে যেন এই কেদার-রাজ্য বাবার খাসমহল, এবং সেই জন্যই বুঝি ইহার এত প্রভাব ও গৌরব।

সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গৌরীকুণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে কিজন্য ইহার মাহাত্ম্য অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার সুরম্য-প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কমনীয় ভাব দর্শনে স্বতই ইহাকে সর্বতোভাবে তপস্যার অনুকূল স্থান বলিয়া মনে হয়। সয়ং গৌরী এই সুপবিত্র মহা-ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই তাঁহারই নামে এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যে স্থানের দর্শন-মাত্রেই আমাদের মন ও প্রাণ বিমুগ্ধ হয়, বলিতে পারি না সেই সুমহৎ পবিত্র স্থানের চতুষ্পার্শবর্তী অন্যান্য স্থান-সমূহের প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়টির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে আরও কত অদ্ভুত ব্যাপারই আমরা দেখিতে পাই। আদ্যাশক্তি মহামায়া যেন যথার্থই বিরলে বসিয়া আপনি আপনার সেই মহাকঠোর তপস্যার জন্য এই দেব-দুর্লভ স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তপস্যার যাবতীয় অনুকূল পদার্থসমূহের দ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। গিরিরাজনন্দিনী উমা নাকি এই পরম রমনীয় মহানিভৃত স্থানেই সুদুষ্কর তপোনুষ্ঠান করিয়া সদাশিব ভোলানাথের মনোহরণ করিয়াছিলেন। মা জগদম্বা যে এইখানেই জগৎপিতা জগদীশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণের আশা পূর্ণ করিয়া বিশ্ববাসীগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কেদার-শৈলেই যে ভূতভাবন ভোলানাথ মহাতপস্যায় মগ্ন হইয়া জগজ্জননী পার্বতীর সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ কেদারের সুরমা, মহান্ ও অপার বিভব ও দৃশ্য দেখিলে ইহাকে দ্বিতীয় কৈলাস বলিয়াই বোধ হয়; গিরিরাজের অমরাবতীকল্প পুরী, পার্বতীর জন্মস্থানও এই কেদার শৈলের নিকটবর্তী হওয়ায় মনে হয় যেন অতি সহজেই

ভগবতী গৌরীর সহিত মিলিত হইবার জন্য জগৎপিতা সদাশিব কৈলাস হইতে জগন্মাতার জন্মভূমিরূপ মহাপবিত্র ক্ষেত্রের অপূর্ব মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়া তপোনুষ্ঠানে রত হইয়া ছিলেন; অথবা শ্বশুরালয়ের মমতায় আকৃষ্ট হইয়াই বুঝি বাবা আমাদের মাতুলালয়ের এত সান্নিধ্যে আসিয়াই ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার পরে হর-কোপানলে মদন ভস্ম হইবার পর মা জগদম্বা ভগ্নমনোরথ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, এবং গুরুজনের আজ্ঞানুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্ধাঙ্গী হইবার মানসে পুনরায় তিনি যে গৌরী-শিখর নামক স্থানে ঘোরতর তপস্যায় রত হইয়াছিলেন, এই গৌরীকুন্ডই যে সেই সুপবিত্র তপোভূমি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গৌরীশিখরের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই গৌরীকুন্ডই যে সেই গৌরীশিখর তাহার প্রমাণস্বরূপ স্বয়ং বাবা কেদারনাথই অদূরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং বিশ্বজননী ভগবতীর নিজ পদ্মহস্তে রোপিত ও বর্ধিত এবং মায়ের হৃদিপীযূষ-ধারায় পরিপুষ্ট অপূর্ব অমর লতাকুঞ্জ ও বৃক্ষরাজী এখন এই মর্ত্যধাম কে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় উত্তরাখন্ড-মাহাত্ম্যই কেদারখন্ডের অন্তর্গত, সুতরাং সেজন্য আর প্রমাণান্তরের কোন আবশ্যক দেখি না। জগন্মাতা গৌরী এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এত মাহাত্ম্য এবং সেই জন্যই তাহার নামানুসারে এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র হিমালয় ও উত্তরাখন্ডের মহিমা এবং তাহার রমণীয়তা ও পবিত্রতা অতুলনীয়া হইলেও প্রাকৃতিক শোভা, সম্পদ্ ও গাম্ভীর্যে শ্রীকেদারনাথ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। হরপার্বতীর লীলাস্থল এই অপূর্ব কেদার রাজ্য যেন যথার্থই বিধাতার বিশেষ বিধানে সৃষ্ট হইয়াছিল। বিধাতার কলা-কৌশল এবং তাঁহার অনন্ত রত্ন-ভান্ডার নিঃশেষিত হইয়াই যেন এই অনুপম কেদার-রাজ্য নির্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই খানেই একদিন বিশ্বজননী পার্বতী অতি কঠোর ও অলৌকিক তপস্যায় মহাকাল রুদ্রেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। এইখানেই একদিন পার্বতী সতীর সর্বলোক-বিস্ময়-কর তপস্যায় মহাযোগী ভোলানাথেরও মন টলিয়াছিল। এইখানেই এক-দিন চন্দ্রমৌলি সদাশিব তপোনুষ্ঠানরতা জগজ্জননী গৌরীর অপূর্বকান্তি-দর্শনে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মচারী-বেশে এইখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আদ্যাশক্তি মহামায়ার মনোভাব জ্ঞাত হইবার জন্য শিবনিন্দা

করিয়া পরিশেষে তাঁহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এইখানেই একদিন সেই অপূর্ব হরগৌরী-সম্মিলন হইয়াছিল। হর-পার্বতীর তপোভুমি এবং তাহাদের মহামিলনক্ষেত্রের অপূর্ব মাহাত্ম্য কথা বিস্তারিত লিখিবার সাধ্য আমার নাই। তবে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার বশবর্তী হইয়া এবং আমার মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়াই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যথাসাধ্য তাহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলিতে পারি না, আমি সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইব।

লে

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা লে সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। তহশীলদার মহাশয় আমাদিগের পরিচয়-পত্র দুইখানি দেখিয়া বাসের জন্য উজির মহাশয়ের বাগান-বাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনক্রিয়া তহশীলদার মহাশয়ের বাড়ীতেই হইল। এক ঘন্টাকাল বিশ্রামাদির পর শ্রীনগর, লাহোর, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থানে আমাদের নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর সংবাদ স্বামীজী পত্রের দ্বারা জানাইলেন। রাত্রে ভীষণ শীত পড়িল। সমস্ত রাত্রি ঘরের চিম্‌নিটি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াও ভাল নিদ্রা হইল না। প্রাতে উঠিয়া দেখি অত্যন্ত তুষারপাত হইতেছে। আধ ঘন্টার মধ্যে চারিদিক বরফে সাদা হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল যেন পৃথিবীর উপর কে একখানি সুবৃহৎ সাদা চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। এই প্রকার বরফ পড়া অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকে পাহাড় ও গাছগুলির দৃশ্য আরও সুন্দর হইয়াছে। বাংলাদেশে দেখাইবেন বলিয়া স্বামীজী কয়েকটি ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইলেন।

প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করিয়া আমরা সহরটি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। তহশীলদার মহাশয় একজন পথ-প্রদর্শক সঙ্গে দিলেন। লোকটি লামা, কিন্তু বেশ হিন্দী বলিতে পারে।

লে সহর একটি বৃহৎ বাজার মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা স্থানে ইয়ারকান্দি, দার্দ ও পাঞ্জাবী সওদাগরেরা পশুর লোম, সোহাগা নাম্‌দা, চরস প্রভৃতির কেনা-বেচা করিতেছে। কাশ্মীরের বড় বড় শাল ও আলোয়ানের কারখানাগুলিতে এইস্থান হইতেই পশম যাইয়া থাকে। বাজারে কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য এইরূপ। নামদা-৩ টাকায় ১ খানি। পশম-দশ আনা হইতে এক টাকা আট আনা সের। লাসা চা-৮ টাকা সের। আলু--ছয় আনা সের। দুধ-আট আনা সের। ইয়ারকাঙ্গি আলু (হাতী শুঁড়)-চার আনা সের। ভেসিলিন-এক কৌটা ছয় আনা। বেকিং পাউডার-এক টাকা চার আনা কৌটা। লামাদের মণিচক্র-দুই টাকায় একটি। কাঠ-চোদ্দ আনা মণ। চাউল-দেড় সের টাকায়। চিনি-এক টাকা চার আনা সের। কেরোসিন তৈল-বার আনা বোতল। ভেড়া অথবা পাঁঠার মাংস-চোদ্দ আনা সের। খোবানি-দশ

আনা সের। ডিম-সাত আনা ডজন। সাদা কাগজ—এক তা দুই পয়সা। চমরী গাইয়ের মাখন-দশ আনা পোয়া। পেঁয়াজ-সাত আনা সের।

দেশীয় ও বিদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই বাজারে পাওয়া যায়। বাজারে বিক্রয়কারীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কোথাও লাদাকী স্ত্রীরা মেটে কলসী করিয়া ছাং সুরা বেচিতেছে, কোথাও বহু স্ত্রীলোক পিঠে ঘাসের বোঝা বাঁধিয়া খরিদ্দারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বাজারের মধ্যস্থলে একটি ইংরাজী পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস। শ্রীনগর হইতে এই পর্যন্ত ডাক ও তারঘর আছে। ইহার পর আর কোথাও পোষ্ট অফিস নাই।

শীতকালে যখন চারিদিকের পথঘাট বরফে ডুবিয়া থাকে তখন এই বাজার বন্ধ হইয়া যায়। পরে এপ্রিল মাস হইতে বরফ গলা সুরু হইলে সওদাগরেরা পুনরায় আসিতে থাকে। বাজারে রাস্তার দুই ধারেই ঘর। ঘরগুলি কাঁচা ইঁট, পাথর,কাঠ ও মাটি দিয়া নির্মিত। পাকা ইঁটের বাড়ী খুব কম। সকল বাড়ীর ছাদগুলি দু'ধারে ঢালু। বরফ পড়িলে গড়াইয়া যায়। বাজারটি লম্বায় প্রায় দুই ফার্লং। ইহার প্রবেশের পথে একটি নহবৎখানার মত তোরণ রহিয়াছে। তাহার পাশেই এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের একটি দাতব্য চিকিৎসালয়।

বাজারের শেষে একটি অল্প উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর প্রাচীন প্রাসাদ, লামাদের মঠ ও অন্যান্য কয়েকটি বাড়ী অবস্থিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এইগুলি সেঙগে নামাজলের কীর্তি। প্রাসাদটি দশতলা উচ্চ। ইহার উপর হইতে সহরের চতুর্দিক অতি সুন্দরভাবে দেখা যায়। মনে হয় যেন, কলিকাতার মনুমেন্টের উপরে উঠিয়াছি। সহরের উত্তরে কৈলাস পর্বতমালার চিরতুষারমন্ডিত পর্বতগুলি অভ্রভেদী তুঙ্গশিরে দন্ডায়মান। উচ্চতায় প্রায় ২৮,০০০ ফিট, দক্ষিণে লোহিত পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। ইহার পাথরগুলি সব লাল ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ইহার উচ্চতা ২২,০০০ ফিট, প্রাতঃকালে ইহার উপর সাদা বরফ পড়িয়াছিল, তাই দেখিতে অতি সুন্দর ছবির মত।

প্রাসাদের ভিতরে বড় বড় ঘর, পূর্বে ইহার দেওয়ালে কারুকার্য ও চিত্রাদি অঙ্কিত ছিল, তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। সভা গৃহ, মন্ত্রণা গৃহ প্রভৃতির নির্মাণ-কৌশল এইরূপ সুন্দর যে, দেখিলে মনে হয় যেন ইহা সেদিনকার তৈরি। এই প্রাসাদসংলগ্ন যে মঠটি রহিয়াছে উহা বিদেশী আক্রমণকারীদের ও দস্যুদের দ্বারা

বহুবার লুণ্ঠিত হইয়া ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে স্কারদূর মুসলমান শাসনকর্তা সর্দার শের আলী ইহ:র বিগ্রহ ও হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি অগ্নি সংযোগে নষ্ট করিয়া দেন। কাশ্মীরের সেনাপতি জোরোয়ার সিংও বহু দেবমূর্তি ও পুঁথি ধ্বংস করেন। মঠের পাঠাগারের মধ্যস্থলে মেজেতে প্রায় দুই মণ ছিন্ন কাগজ সংগৃহীত রহিয়াছে। এইগুলি প্রাচীন পুঁথিসকলের ছিন্ন পত্র। উহা হইতে একখানি পত্র আমরা লামাজীর নিকট হইতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই দিতে স্বীকার হইলেন না। বলিলেন, উহা তাঁহাদের ধর্মপুস্তকের অংশ। উহা অন্য লোকের হাতে দিতে নাই। এই মঠের দেড়তলা সমান উঁচু মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্তি দেখিবার যোগ্য; শিল্প সম্বন্ধে ইঁহাদের রুচি কিরূপ তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইঁহারা মনে করেন দেবতার মূর্তি যত বড় করা যায় তাহারা ততই সুন্দর হয়। ঐ মূর্তির গৌরবর্ণ কান্তি, মুখ চোখের করুণাপূর্ণ ভাব অবশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

এইস্থান হইতে আসিয়া আমরা ডাকবাংলোর সরকারী বাগান, মুসলমানদের কবরভূমি, লামাদের শ্মশান, যেখানে প্রত্যেক পরিবারের স্বতন্ত্র শবদাহ স্থান নির্দিষ্ট আছে, বিচারালয় প্রভৃতি দেখিতে গেলাম। বাজারের অল্প দূরে লামাদের পোলো খেলার মাঠ। লামারা প্রত্যহ বৈকালে ঘোড়ায় চড়িয়া এইস্থানে পোলো খেলিতে আসেন। তখন ঘোড়ার চার পায়ের ঘুঙ্ঘুরের মৃদু মধুর ধ্বনিতে মাঠটি পূর্ণ হইয়া উঠে। এই মাঠ একটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত।

সিমলা পাহাড় হইতে অনেক পাহাড়ী সওদাগর চামড়ার কোট, চামর প্রভৃতি কিনিতে এইস্থানে আসিয়া থাকে। লে হইতে সিমলা পর্যন্ত পথটি চারিশত ত্রিশ মাইল দীর্ঘ। উহা চলিতে বিশেষ কষ্টকর নহে। পাহাড়ীরা ইউরোপীয়ানদিগকে এই পথে চলিতে দেয় না।

ইয়ারকন্দ এই স্থান হইতে ৪৭৭ মাইল, পথে কারাকোরাম পর্বতে ১৮,২০০ ফিট উচ্চ একটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল পাহাড় ও বরফ। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই এই সহর হইতে লইয়া যাইতে হয়। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু লইতে হয়, নচেৎ পথে তুষারপাত হইলে বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গে জ্বালানি কাঠও লইতে হয় কারণ পথে কোথাও একটি গাছ নাই।

লে-তে মোরেভিয়ান মিশনারীদের একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় রহিয়াছে, উহাতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লাদাকী বালক তিব্বতীয় ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষা

করে। খালসার পাদ্রী সাহেব আসিয়া মধ্যে মধ্যে সহরে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন বাজারের অল্প দূরে, ডাকবাংলোর নিকট, লে-র বৃটিশ জয়েন্ট কমিশনার সাহেবের বাংলো। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি খোলা মাঠ অবস্থিত।

লাদাকের অধিবাসীরা বেঁটে ও বলবান, ইঁহাদের শরীর স্নানের অভাবে ও পোষাক ধোয়ার অভাবে অত্যন্ত অপরিষ্কার ও উকুনে ভরা। স্ত্রী ও পুরুষ সকলের মুখই তুরানীয়গণের মত বৃহৎ ও গোলাকার। সকলেই শ্যামবর্ণ, কেহই ফরসা নহে। পুরুষদের পোষাক গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত একটি লম্বা পশমী পিরান, ইহার বোতাম বা পকেট থাকে না। কোমরে পিরানের উপর চওড়া পশমী পট্টি জড়ান। তাহার ভিতর ছাগলের লোম, টেকো, ছাতুর নাড়ু, গেঁজে, চাকু, তামাকের কৌটা, শিঙ্য়ের হুঁকা, ছুঁচ, সুতা, চিরুণি প্রভৃতি রাখা থাকে। কোমরে চক্‌মকি ও পিরানের বুকের ভিতর জলপানের বাটি থাকে। পায়ে কম্বলের বুট জুতা ও গরম পট্টি বাঁধা। মাথায় ইহারা ভেড়ার চামড়ার টুপি ব্যবহার করে। অনেকে গায়ে ভেড়ার লোমযুক্ত চামড়ার কোট গায়ে দেয়। কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই ইহাদের একই প্রকার পোষাক। শীতকালে পথে বাহির হইতে হইলে ইহারা গায়ের উপর এতগুলি কাঁথা, কম্বল, লেপ প্রভৃতি চাপায় যে দেখিলে মনে হয় যেন একটি সচল বিছানা। সকলেরই মাথায় লম্বা চুল বিনানো দীর্ঘ টিকি আছে। স্ত্রীলোকদের পোষাকও এই একই প্রকার, কেবল তাঁহারা পিঠে একখানি সম্পূর্ণ ভেড়ার চামড়া, কানের দুই ধারে খোঁপার সহিত দুইখানি ভেড়ার চামড়ার টুকরা ও মাথার মধ্যস্থলে নীল, লাল, ফিরোজা প্রভৃতি নানা বর্ণের মূল্যবান পাথরগাঁথা একখানি লম্বা চামড়া বাঁধিয়া রাখেন। ইঁহারা জুতা পরেন কিন্তু টুপি পরেন না।

লাদাকীরা সকলেই কৃষিজীবী। যব, ত্রম্বা, গ্রীম (একপ্রকার পাহাড়ী যব), মূলা, আলু, খোবানী প্রভৃতি এই প্রদেশেরই উৎপন্ন দ্রব্য। চমরী ও সাধারণ গাই-এর মিশ্রণে উৎপন্ন ঝো নামক একপ্রকার বলদের সাহায্যে চাষের কার্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থেরই চমরী গাই, ছাগল ও ভেড়ার পাল আছে। পাহাড়ে অনেক জঙ্গলী ছাগল, ভেড়া, সাপু, আমন, কুরেল, হরিণ, দুই-তিন প্রকার বারশিঙ্‌গা, খরগোস, সাদা নেকড়ে বাঘ এবং লাল ভল্লুক আছে।

দুই একজন ধনী ব্যক্তি ও মঠের লামারা ব্যতীত এখানে সাধারণ লোকে

লিখিতে ও পড়িতে জানে না। ইহাদের আহার সাধারণতঃ মাংসের যুষ, যবের মন্ড, ছাতু, ঘোল, দুধ, চা (দুধ-চিনি বর্জিত ও নুন-মাখন সংযুক্ত), ছাং সুরা ও যবের পিঠার মত রুটি।

ইহারা সন্তুষ্টচিত্ত, কষ্টসহিষ্ণু, অলস ও শান্ত প্রকৃতির কিন্তু মুসলমানগণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। সামাজিক বন্ধন কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অতি সামান্য এবং সকলেই খুব পরিশ্রমী। ধনী লোক ব্যতীত সকল পরিবারেই স্ত্রীলোকের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত। প্রত্যেক পরিবারে সমস্ত ভাই এরা মিলিয়া একটি বালিকাকে বিবাহ করে।

তিব্বতীয় ভাষায় ইহারা নিজেদের দেশকে পো বলে। তিব্বা শব্দে ঢিপি ও সময় সময় ছোট পাহাড়কে বুঝায়। ইহা হইতে এই প্রদেশের নাম তিব্বত হইয়াছে।

পরদিন সহরের নিকটেই চুবি নামক গ্রামে নামজাল সীমো নামক পর্বতের উপরিস্থিত মঠটি দেখিয়া আসিলাম। উহা অতিশয় পুরাতন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ত্রাসী নামজাল উহা নির্মাণ করেন।

লে-তে চারদিন অবস্থান করিবার পর আমরা হিমিস গুম্ফা দেখিতে গেলাম। পথটি বরাবর সিন্ধুনদের উপত্যকার মধ্য দিয়া গিয়াছে। স্থানটি লে হইতে চব্বিশ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। পথে কোন পাহাড় নাই। নিকটেই স্তোগ গ্রামখানি রহিয়াছে। লাদাকের রাজবংশের শেষ বংশধর জিগসমেদ নামজালের পৌত্র শ্রীসেদনাম নামজাল কাশ্মীররাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইনি যে এই প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজা, এখন তাহার কোন চিহ্ন বর্তমান নাই। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। যে পাঁচশত টাকা তিনি কাশ্মীর মহারাজার নিকট হইতে প্রতি বৎসর পাইয়া থাকেন তাহা সকল ব্যয় করিয়া প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করিয়া ফেলিয়াছেন। হিমিস গুম্ফার মোহন্তজী ইঁহার বর্তমান সম্পত্তি সকল লিখিয়া লইয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ঐ টাকা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন না তিনি ঐ টাকা সুদ-সমেত তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে লাভ করিবেন ততদিন তিনি সম্পত্তি ভোগ করিবেন। তিনি এখনও ঋণ গ্রহণের বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। সম্প্রতি আশী টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি মহারাজার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ীতে সর্বদা লাদাকীয় স্ত্রীলোকেরা নৃত্য ও গীতবাদ্য করিতে আসে, যখন কোন দূরদেশ হইতে কোন গায়িকা বা নর্তকী আসিয়া থাকে

তখন ইনি তহশীলদার মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া নৃত্য দেখিতে লইয়া যান।

যে প্রাসাদটিতে তিনি বাস করেন তাহা একটি নাতি-উচ্চ পর্বতের গায়ে নির্মিত। বাটীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালাগুলি দূর হইতে ঠিক বড় বড় পায়রার খোপের মত দেখায়। ঐ প্রাচীন প্রাসাদটি সেপাল দানদ্রুব নামজাল ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করেন।

গ্রামখানির আয়তন অতি ক্ষুদ্র। ইহার লোকসংখ্যা শতাধিক হইবে। ইহার পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে সিন্ধুনদ প্রবলবেগে কলরোলে প্রবাহিত হইতেছে। বিস্তীর্ণ মাঠ, কোথাও সিন্ধুতীরে অবস্থিত শস্যক্ষেত্র, কোথাও বাগান প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। পথ বালুকাময়। মাঠের মধ্যস্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢিপির মত পাহাড়ের মাথার উপর সন্ন্যাসী লামাদের গুম্ফা। সিন্ধুনদের পরপারে পাহাড়ের গা বাহিয়া আর একটি পথ রহিয়াছে, উহা দিয়াও লে হইতে হিমিস যাওয়া যায়। ফিরিবার সময় আমরা ঐ পথে আসিব ঠিক করিলাম। মাঠের পথটি বেশ সমতল তাই শীঘ্র শীঘ্র চলা যায়। আমরা বেলা আন্দাজ তিনটার সময় হিমিস গ্রামের নিকটবর্তী হইলাম। গ্রামটি সিন্ধুর অপর পারে পাহাড়ের তলায় অবস্থিত। হিমিস মঠ সিন্ধুর এই পাড়ে একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। পথ হইতে গুম্ফাটি দেখা যায় না এবং উহার অস্তিত্বও অনভিজ্ঞদের নিকট হঠাৎ ধরা পড়ে না। কোন কোন মঠ এইরূপ গুপ্তস্থানে অবস্থিত হওয়াতে ডোগ্রা সেনাপতি জোরোয়ারের হস্ত হইতে অনেক সময় বাঁচিয়া গিয়াছে। সিন্ধুতীর ছাড়িয়া আমরা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কত শস্যক্ষেত্র, কত গৃহ দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই মাইল পথ যাইয়া উপত্যকার শেষ পাহাড়ের গায়ে ও পাদদেশে অনেকগুলি বড় বড় পায়রার খোপের মত বাড়ী দেখিতে পাইলাম। উহাই বিখ্যাত হিমিস মঠ। প্রায় ১১,০০০ ফিট উচ্চ। এই মঠের বিস্তর ভূ-সম্পত্তি আছে। নিকটেই একটি শস্যক্ষেত্রে চৌদ্দ পনের জন লামা যব কাটিতে কাটিতে সমস্বরে গান গাইতেছিল। আমরা তাহাদের নিকট হইতে মঠে যাইবার নিয়ম জানিয়া লইলাম। একজন লামা মঠের মোহন্তজীকে সংবাদ দিতে গেল। পথের বাম পার্শ্বে খাদ ও তাহার পরপারে অনেকগুলি শস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহস্থ লাদাকীদিগের বাড়ী, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট দেবমন্দির রহিয়াছে; কোথাও অনেকগুলি দেবতার মন্দির একত্রে রহিয়াছে, সেইগুলিতে বিষ্ণু, বুদ্ধদেব, যমরাজ প্রভৃতির মূর্তি প্রস্তরের উপর খোদিত

ও নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। মঠের নিকটেই অধিকাংশ গ্রামবাসীর গৃহ। কত বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, লামা, কেহ রাস্তায় আসিয়া, কেহ ঘরের ঘুলঘুলি দিয়া, কেহ ছাদের উপর হইতে আমাদিগকে কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল। গৃহস্থদের বড় বড় কুকুরগুলি ভেউ ভেউ শব্দে আমাদিগের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিল। মঠের প্রকান্ড ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেই আমাদিগকে ঘোড়া হইতে নামিতে হইল, কারণ ভিতরে ঘোড়া যাইবার নিয়ম নাই। পথে একটি বৃহৎ মণিচক্র রহিয়াছে। আচ্ছাদিত পাকা রাস্তা দিয়া কিছুদূর যাইয়া ৩০ x ৪০ গজ লম্বা-চওড়া একটি উঠানে উপস্থিত হইলাম। তৎপর একটি সুবৃহৎ মহল্লা পার হইয়া আমরা মঠের অতিথিশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। লামারা আসিয়া সেখানকার দরজার তালা খুলিয়া দিলেন। অতিথিশালার একদিকের অংশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। লামারা অনেকগুলি পর্দা, শতরঞ্চি প্রভৃতি আনিয়া উহা আবৃত করিয়া দিলেন। আমরা ঘরে আমাদের শয্যাদি যথাযথ স্থানে রাখিয়া অন্যান্য মালপত্র খুলিতে লাগিলাম। লামারা দুধ, ডিম, কেরোসিন তৈল, কাঠ, মাখন প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন ও আমাদের রন্ধনাদির যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। লামাগণ সর্বদাই আগ্রহের সহিত আমাদের যাহাতে কোন বিষয়ে অসুবিধা না হয় তাহা করিতে লাগিলেন। রাত্রে ভয়ানক শীত পড়িল। ঘরে প্রাইমাস্ স্টোভটি জ্বালিয়া রাখিয়া আগুনের মৃদু তাপে কোনপ্রকারে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

অমরনাথ

(কাল — ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই হইতে ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত, স্থান — কাশ্মীর)

২৯ শে জুলাই। এই সময় হইতে আমরা স্বামীজিকে খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে খুব উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ একাহারী হইয়া থাকিতেন এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটান হইলে কখনও কখনও তিনি মালাহস্তে তথায় আসিতেন। আজ রাত্রিতে আমাদের মধ্যে দুইজন বওয়ানের চতুর্দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বওয়ান জায়গাটি একটি পল্লীগ্রামের মেলার মতো — সমস্তটির উপর ধর্মাভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ডগুলি ঐ ধর্মভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমরা ধীরা মাতার সহিত তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমরা পহলগামে পৌঁছিলাম; উপত্যকাটির নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনি পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কিনা তদ্বিষয়ে স্বামীজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “স্বামীজী, ইহা সত্য যে আপনার শক্তি আছে, কিন্তু আপনার ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে;” বলিবামাত্র স্বামীজী চুপ করিয়া গেলেন। যাহা হউক, সেইদিন অপরাহ্নে তিনি তাঁহার কন্যাকে আশীর্বাদলাভে ধন্য হইবার জন্য ছাউনির চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন— প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা তাঁহাকে শক্তিমান বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবস আমাদের তাঁবুটি ছাউনির পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। যেখানে আমাদের ঠিক সন্মুখে খরস্রোতা লিডার নদী ও অপরতীরে পাইন্‌বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্বতমালা বর্তমান ছিল এবং খুব উচ্চে একটি রন্ধ্রের অপর পারে একটি তুষারবর্ত্ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই গোপগণের গ্রামে আমরা একাদশী করিবার জন্য পুরা একদিবস অবস্থান

করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে যাত্রিগণ রওয়ানা হইল।

৩০ শে জুলাই। প্রাতে ছয়টার সময় আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া যাত্রা করিলাম। কখন ছাউনিটি স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা যখন খুব প্রত্যুষে জলযোগ করি তখনই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রি বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। কল্য যে স্থানে সহস্র লোক এবং তাহাদের পটনিবাস বিদ্যমান ছিল, সেখানে গতপ্রাণ অগ্নিসমূহের ভস্মরাশি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

পরবর্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়ী যাইবার রাস্তাটি কি সুন্দর! চন্দনবাড়ীর একটি গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় আমরা ছাউনি ফেলিলাম। সমস্ত বৈকালবেলা ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্তার জন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ভৃত্যগণের এবং অন্যান্য যাত্রিগণের নিকট হইতে অনেক ছোটখাট বিষয়ে যে অশেষ সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলাম, তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী; দুই পশলা বৃষ্টির মধ্যের অবকাশটিতে আমি গাছপালা - সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলাম এবং সাত-আট রকমের Myesotis দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে দুইটি আমার নিকট নতুন। তৎপরে আমি আমার ফার গাছটির ছায়ায় ভিড়িয়া যাইলাম, উহা হইতে তখনও বারিকণা টপটপ করিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় চটির রাস্তাটি অন্য সব চটির রাস্তা অপেক্ষা কঠিন ছিল। মনে হইতেছিল বুঝি উহা অফুরন্ত। চন্দনবাড়ীর সন্নিকটে স্বামীজী জেদ করিলেন যে, "ইহাই আমার প্রথম তুষারবর্ত্ম বলিয়া আমাকে উহা খালি পায় অতিক্রম করিতে হইবে।" জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিলেন না। ইহার পরেই বহুসহস্রফিটব্যাপী এক বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। তাহার পর এক সরু পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলি য়াছে; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম; এবং সর্বশেষে আর একটি খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির উপরিভাগের জমিটিকে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস (Edelweiss) ঠিক যেন গালিচা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। তৎপরে রাস্তাটি শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফিট উচ্চ দিয়া চলিয়াছে। শেষনাগের জল গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষারমণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে ১৮০০০ ফিট উচ্চে এক ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছাউনি ফেলিলাম। ফার গাছগুলি বহু নিম্নে ছিল, সুতরং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলা কলিরা চারিদিক

হইতে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসিলদারের, স্বামীজীর এবং আমার তাঁবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল; সন্ধ্যাবেলায় সন্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বালিত হইল। কিন্তু উহা ভাল জ্বলিল না, আবার তুষারবর্ত্মটিও বহু ফিট নিম্নে বিদ্যমান ছিল। আমাদের ছাউনি পড়িবার পর আমি আর স্বামীজীকে দেখি নাই।

পাঁচটি তটিনীর সম্মিলনস্থল 'পঞ্চতরণী' যাইবার রাস্তাটা এতটা দীর্ঘ ছিল না। অধিকন্তু ইহা শেষনাগ অপেক্ষা নীচু ছিল এবং এখানকার ঠান্ডাও বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপদ ছিল। ছাউনির সন্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সবগুলিতেই একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিতে গিয়া যাত্রিগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এবিষয়ক আইনটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

আহা, কি সুন্দর সুন্দর ফুল! পূর্ব রজনীতে (না অদ্যকার রাত্রে?) বড় বড় নীল ও সাদা Anemone ফুল আমার তাঁবুতে বিছানার নীচে জন্মিয়াছে এবং এখানে অপরাহ্নে নিকট হইতে তুষারবর্ত্ম দেখিবার জন্য বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে চলিয়া গিয়া আমি Gentian, Sedum. Saxifrage এবং ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ সলোম পত্রবিশিষ্ট এক নূতন রকমের ফর্‌গেট-মি-নট ফুল দেখিলাম. ঘন সন্নিবিষ্ট পাতাগুলি রাশীকৃত মখমলের মত দেখাইতেছিল। এমন কি জুনিপারও এস্থানে অতি বিরল ছিল।

এই সকল উচ্চ অংশে আমরা প্রায়ই দেখিতাম যে, আমরা তুষারশৃঙ্গরাজির মহান্ পরিধিসমূহের মধ্যে রহিয়াছি —এই নির্বাক বিপুলয়াতন পর্বতগুলিই হিন্দুমনে ভস্মানুলিপ্ত ভগবান শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে।

২রা অগষ্ট। ২রা অগষ্ট মঙ্গলবারে অমরনাথের মহোৎসব দিনে প্রথম যাত্রিদল নিশ্চয়ই রাত্রি দুইটার সময় ছাউনি হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবে। আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটিতে পৌঁছিলে সূর্যোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে যাতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল, তা নয়। কিন্তু যখন আমরা ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনই প্রকৃত বিপদের সূত্রপাত হইল। অজাযুগের গতিবিধি-পথের মত একটি 'পগ্‌ডাণ্ডী' প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া অপর পার্শ্বে —উতারের অংশে —শষ্পাচ্ছাদিত জমির উপর একটি ক্ষুদ্র সোপানপরম্পরায় পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক দু'চার পা অন্তর কমনীয়

কলাম্বাইন, মাইকেলমাস ডেজি এবং গোপাল ফুটিয়া রহিয়াছিল এবং ভয় হইতেছিল পাছে উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার লোভে হাত পা ভাঙ্গে বা প্রাণ খোয়াইয়া বসে! পরে কোনমতে ওপারের উতারটির তলদেশে পৌঁছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া বহুকষ্টে যাইতে হইয়াছিল। আমাদের গন্তব্যস্থানের মাইলখানেক আগে বরফ শেষ হইল এবং উহা হইতে সে জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হইয়াছিল। এমন কি, যখন আমরা প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছি বলিয়াই বোধ হইতেছিল তখনও পর্যন্ত আমাদের পাথরের উপর দিয়া আরও একটি বেশ কঠিন চড়াই করিতে বাকি ছিল।

স্বামীজী ক্লান্ত হইয়া ইতোমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আমি, তিনি যে পীড়িত হইতে পারেন, তাহা মনে থাকায়, কঙ্কর-স্তূপগুলির অধোভাগে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন এবং "স্নান করিতে যাইতেছি" মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সস্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্ধবৃত্তটির এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটি বিশাল ছিল, এত বড় যে তথায় একটি বিশাল গির্জা ধরিতে পারে এবং সুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটি প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদঘাটিত হইয়াছে! তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তিনি 'মূর্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্য নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৈনিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা চিরদিনের মত বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভুতভাবে পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল — "ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর এ শরীর রাখবে না।"

আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সহৃদয়

নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন, "আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে, তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব। আর তথায় কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসায় ছিল না, কোন কিছু খারাপ ছিল না। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি অত আনন্দ উপভোগ করি নাই।"

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন; উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির কবিত্বের বর্ণনা করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা কোন এক নিদাঘ-দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিল ও এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিল যে তাহারা অদ্রব-তুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সর্বদা ইহাও বলিতেন, "সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যুবর দিয়াছেন।" আর আমাকে তিনি বলিলেন, "তুমি এক্ষণে বুঝিতেছ না। কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে এবং ইহার ফল ফলিতেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য হইবে নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।"

বদরীনারায়ণের পথে

হরিদ্বার

১৮৯৪ সালে গ্রীষ্মকালে আমি প্রথমবার হরিদ্বার যাত্রা করি। তখন সাহারাণপুর হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত অল্পদিন হইল রেল খুলিয়াছে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে যখন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ), স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি হরিদ্বারে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সাহারাণপুর হইতে পদব্রজে গিয়াছিলেন। রেলের পথ তখনও হয় নাই। যাহা হউক, আমি লক্ষ্ণৌ ও বেরিলী হইতে রেলে করিয়া সাহারাণপুরে পৌঁছাইলাম এবং গাড়ী বদল করিয়া হরিদ্বারের ট্রেনে বসিলাম। তখন লাক্‌সা স্টেশন বালি ও কুশঘাসের মাঝে রেলের একখানি ভাঙ্গা মালগাড়ীতে ছিল, পাকা বাড়ী হয় নাই। ট্রেনের যাত্রীরা রব তুলিল যে, ঐ অঞ্চলে বাঘের ভয়, এমন কি, বাঘ ট্রেনে লাফাইয়া পড়ে। আমরা দিনের বেলা যাইতেছিলাম, কিন্তু বাঘের ভয়ের এত গল্প হইতেছিল যে যাত্রীরা কেহ জানালা দিয়া হাত বাড়াইতে সাহস পাইল না। যাহা হউক, আমরা বৈকালবেলা হরিদ্বারে পৌঁছাইলাম। স্টেশনটির দুইধারে দুইখানি পাকা ঘর ও পাণ্ডাদের কতকগুলি পাকা বাড়ী, আর বিশেষ কিছুই নাই। সম্মুখের চারিধারের দৃশ্য-বালির মাঠ ও টিপি। জল যাওয়ার মত একটি নালা এবং আর কিছু দূরে একটি মেটে গোলাবাড়ী; কারবারীরা এই ঘরটিতে মালপত্র রাখিত। নালার মাথায় একটি সাঁকোর মত ছিল; সেইস্থানে পান্ডারা তাহাদের চামড়ার মলাট দেওয়া খাতা ও লাঠি লইয়া বসিয়া ছিল। তাহারা ত যাত্রী দেখিয়াই সাত পুরুষের খবর জিজ্ঞাসা করিল ও লাঠি লইয়া আমাদের দিকে চাহিতে লাগিল অর্থাৎ লাঠির ভয় দেখাইয়া যেন যে যার যাত্রী দখল করিয়া লইবে। ট্রেনে আসিবার সময় কয়েকটি বাঙালী সহযাত্রী ছিল, অতএব আমরা একদল হইয়া একজন পান্ডার সহিত চলিলাম। তখন রাস্তাঘাট, বাড়ী ইত্যাদি কিছুই হয় নাই। আমরা একটি সড়ক ধরিয়া গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিলাম এবং ব্রহ্মকুন্ডের কাছে যে একটি নালাওয়ালা বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে প্রথম উঠিলাম। রাস্তায় অতিশয় খোয়া এবং গঙ্গার ধারটি গড়ানে। স্থানটি পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝখানে

একটি ক্ষুদ্র লোকালয়। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পাণ্ডাঠাকুর একটি কেরোসিনের ডিপেতে একটি আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।

আমি সমস্তদিন উপবাস করিয়াছিলাম, তাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশে বাহির হইয়া খোয়াতে হোঁচট খাইতে খাইতে গড়ানে গঙ্গার ধারে যাইলাম। চতুর্দিক অন্ধকার, জনপ্রাণী নাই। গঙ্গার জল কনকনে ঠাণ্ডা, তবু কয়েকটি ডুব দিয়া তীর্থস্নান করিলাম। তাহার পর বাসায় আসিয়া গরম জামা পরিয়া শীত নিবারণ করিলাম। তাহার পর বাসায় অসিয়া গরম জামা পরিয়া শীত নিবারণ করিলাম। এখন যে স্থানটি চাতাল জমি, বাজারের মত হইয়াছে, সেইস্থানে স্নান করিলাম, এখনকার হরকাপৌরীতে নহে। তাহার পর খাবার কিনিতে বাহির হইলাম। তখন দুইখানি খাবারের দোকান ছিল। তাহাদের মাটির পোতা বা দাওয়া অনেক উঁচু ছিল। তখন খাবারের দোকানের সম্মুখে জনকতক হিন্দুস্থানী সাধু বসিয়াছিল। আমি কতকগুলি ডালপুরী, চিনির ডেলার বরফি ও এক ভাঁড় দৈ কিনিয়া বাসায় আসিয়া খাইলাম। দেখিলাম যে সেইস্থানে থাকা সুবিধা নহে। তাই রাস্তায় বাহির হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম, দেখিলাম সম্মুখে একটি মুদির দোকান। মুদিকে অনুনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "ঐদিকে একটা পাহাড়ের উপর নতুন ধর্মশালা হচ্ছে, সেখানে গেলে থাকবার জায়গা হতে পারে।" আমি তাহার কথানুযায়ী সেই উঁচু পাহাড়টিতে উঠিলাম। দেখিলাম যে একটি ধর্মশালার কতক অংশ তৈয়ারী হইয়াছে। এদিকে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, পথে আলো নাই। দরোয়ানকে বকশিশ দিব বলায়, সে সম্মত হইয়া থাকিবার একটি ঘর দিল। আমি পূর্ব বাসায় আসিয়া জিনিস-পত্র লইয়া অন্ধকার রাত্রে হোঁচট খাইতে খাইতে পাহাড়ের উপর সেই বাড়ীটিতে যাইলাম এবং সদর দরজার দক্ষিণ দিকের ছোট একটি ঘরে থাকিতে পাইলাম। এইটি হইতেছে সূরযমলের এখনকার নূতন ধরণের প্রথম ধর্মশালা। পুরান ধরণের দুই চারিটি ধর্মশালা আরও ছিল, কিন্তু তাহাতে থাকা সুবিধা বিবেচনা করিলাম না। এখন হরিদ্বারের রাস্তায় মাটি ফেলায় রাস্তার থামাল উঁচু হইয়া গিয়াছে, এইজন্য সূরযমলের ধর্মশালা যে পাহাড়ের উপর ছিল, তাহা এখন বিশেষ বুঝা যায় না এবং টিলা বা খড আর কিছুই প্রভেদ করা যায় না।

প্রাতে উঠিয়া সম্মুখে গঙ্গায় গিয়া স্নান করিলাম। এখন এই ধর্মশালার ও গঙ্গার মাঝে অনেক বাড়ী ও বাজার হইয়াছে, রীতিমত সহর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন এই স্থানটি ফাঁকা ছিল। যাহা হউক, স্নান করিয়া গঙ্গার ধারে একটু জপ-ধ্যান করিয়া স্থানটি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এই স্থানের পুরান নক্সা বলিতে গেলে বুঝায় যে একটি পাহাড়, পাহাড়ের মধ্যে উপর দিকে অনেকগুলি গুহা এবং পাহাড়ের তলায় অল্পপরিসর

একটি সমতল ভূমি, তাহার পর গঙ্গা। এখন যাহাকে হরকাপৌরী বা ব্রহ্মকুন্ড বলে, উহা তখন একটি গড়ানে জমি ছিল, ক্রমে আমি সেইস্থানে আসিয়া পড়িলাম। নুড়ি, পাথরের খোয়া ও মড়ার হাড় চতুর্দিকে ছড়ান। মড়ার হাড় পায়ে বিঁধিয়া যাইতে লাগিল। ইহার নিকটে বিশেষ কোন বাড়ীও ছিল না এবং বাঁধান ঘাটও ছিল না। কেবল দূরে কয়েকটি পান্ডাদের বাড়ী, পুরান মন্দির কয়েকটি, আর সব ফাঁকা। মাঝে মাঝে দুই একটি মাটির বাড়ীও দেখা যাইত। যাহা হউক, আমি পুনরায় ব্রহ্মকুন্ডতে স্নান করিলাম। স্নানার্থী অল্পসংখ্যক ছিল, দশ-পনের জন হইবে। পিছনদিকের পাহাড়ের গুহার কাছে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। এখন অনেক বাড়ী হওয়ায় গুহা ও অশ্বত্থ গাছটি পিছনদিকে পড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই পাহাড়ী গ্রাম দেখিয়া পুনরায় সূরযমলের ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় হাতে কিছু খাবার লইয়া আসিলাম। ধর্মশালায় আসিলে দারোয়ান বলিল, "ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ভেতরে বসে খাবেন, কারণ বাঁদরের বড় উৎপাত।" আমি সেইরূপ করিলাম। কিন্তু বড় বড় বাঁদরেরা গন্ধ পাইয়া দরজা ভাঙিতে আরম্ভ করিল। খিল ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম, এইজন্য আমি দরজায় পিঠ ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া চাপিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু তবুও ধাক্কা এত জোরে মারিতে লাগিল যে আমাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ লড়াই করিয়া চলিয়া যাইলে যখন বুঝিলাম যে তাহাদের আর কোন উৎপাত নাই, তখন আমি দরজা খুলিয়া বাহির হইলাম। দেখিলাম উপরের উঠানেতে অনেকগুলি মাড়োয়ারী যাত্রী আসিয়াছে। একটি বাঁদর তাহাদের কিএকটি জিনিস লইয়া ছাদে বসিয়া আছে। এদিকে মাড়োয়ারী যাত্রীরা হই চই লাগাইয়াছে। তখন দরোয়ানটি আসিয়া তাহাদের বলিল, "দুটো ভাঁড়েতে ছোলা দিয়ে দু'জায়গায় রেখে দিন।" তাহারা সেই মত করিয়া রাখিলে, বাঁদরটি বগলে করিয়া জিনিস লইয়া যেই দুটি ভাঁড় একসঙ্গে দুই হাতে লইতে গেল, অমনি বগল হইতে জিনিসটি পড়িয়া গেল। সেই সময় সকলে হই হই করিয়া উঠিল। বাঁদরটি একটি ছোলার ভাঁড় লইয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল। এই ব্যাপার সেই প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাই এখনও স্মরণ আছে।

লছমনঝোলা

লছমনঝোলা এই স্থান হইতে প্রায় দুই মাইলের উপর হইবে। তখন ঝোলা দড়ির

ছিল, পাকা পুল হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরাহনগর মঠে কথাপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। তিনি এই ঝোলা দিয়া পার হইতে গিয়া দড়ির একটিতে পা দিলেন এবং দুই হাতে দুইটি টানা দড়ি ধরিয়া পার হইতে লাগিলেন। নিচে প্রখর গঙ্গাস্রোত বহিতেছে। বাঁশবাজির দড়ির উপর যেমন মানুষ যায়, অনেকটা সেইপ্রকার করিয়া অপর পারে পৌঁছাইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি মাড়োয়ারী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেইরূপে দড়িতে পা দিয়া ও দুই হাতে দড়ি ধরিয়া ওপর পারে পৌঁছাইলেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি যেমনি অপরদিকের ভূমিতে পা দিয়াছেন অমনি একটি দড়ি ছিঁড়িয়া দুই ভাগ হইয়া পাড়ে সবেগে পড়িল। দড়িটি যদি সবেগে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের গায়ে লাগিত, তাহা হইলে বৃদ্ধা মারা যাইতেন এবং যদি এক মিনিট পূর্বে ছিঁড়িত, তাহা হইলেও তিনি জলে পড়িয়া মারা যাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন,"এ মায়ি, আভি ত মর্ যাতি থী।" বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে স্বামী বিবেকানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,"মরনে ত আয়া বাবাজী, মরনেমে কেয়া ডর হ্যায়?" তখন স্বামিজীর মনে এই ভাব উঠিল,"আমি জোয়ান ও সন্ন্যাসী, এখনও মৃত্যুকে ভয় করি, এখনও প্রাণের মমতা এত রহিয়াছে, কিন্তু এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ভগবানের জন্য মরিতে প্রস্তুত!" এইরূপ নানা ভাব তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। হৃষীকেশের প্রথম অংশ হইতে লছমনঝোলা পর্যন্ত এই তিন চার মাইলের ভিতর আরও কয়েকটি মন্দির ছিল এবং লছমনঝোলা যাইবার পথটি একটি উঁচু পাহাড় দিয়া ছিল। এখন ইহা কাটিয়া সিধা রাস্তা হইয়াছে। যাহা হউক, হিমালয়ের অদ্ভুত সৌন্দর্য ও নিবিড় অরণ্যের গভীর মাধুর্য পূর্বে এইখানেই ছিল। লছমনঝোলা পার হইলে বদরীনারায়ণ যাইবার পথ। অদ্যাপি এই পথ দিয়া যাইতে হয়। তবে এখন সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং এক বিশাল নগরী ধীরে ধীরে উদ্ভুত হইতেছে। এইজন্য আমি পূর্বস্মৃতি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

স্বর্গাশ্রমে ঝড়বৃষ্টির অভিজ্ঞতা

এই সময় আমি ও কৃষ্ণকুমার জিন্‌বারার ভাঙ্গা বাড়ীতে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে গোল মত যে একটি ঘর ছিল, সেইটিতে থাকিতাম। এদিকে বর্ষাকাল, অবিরাম বৃষ্টি

হইতেছে। একদিন বেলা তিনটার সময় রৌদ্র উঠিল। আমরা দুইজনে বেড়াইতে বড় ঝাড়ির দিকে চলিলাম; তাহার পর কৈলাশ মঠ পার হইয়া লছমনঝোলায় পৌঁছাইলাম। কিছুক্ষণ পুলের উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলাম ও পূর্বস্মৃতির বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। তাহার পর পুল পার হইয়া স্বর্গাশ্রমের দিকে চলিলাম। স্বর্গাশ্রমে দেখিলাম যে অনেকগুলি পরিচিত লোক রহিয়াছে। তাহারা বিশেষ যত্ন করিয়া রাত্রিটা থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল এবং দুইখানি বড় রুটি ও একটু কুমড়া সিদ্ধ আনিয়া খাইতে দিল। একখানি কোঠা ঘরের ধারে বসিয়া আমাদের কথাবার্তা হইতেছিল। গঙ্গা কয়েক গজ দূরে, কিন্তু স্থানটি উঁচু হওয়ায় গঙ্গার জল হইতে কোন ভয় ছিল না। এমন সময় মহাঝড়বৃষ্টি আসিল। একে পাহাড়, তাহাতে জঙ্গল। ঝড়ের বেগ খুব প্রবল হইল। আমরা ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিলাম। ঝড়ে যেন কোঠাঘরখানিকে উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। আমরা পাঁচ-ছয়জন ছিলাম, কোন রকম করিয়া শুইয়া পড়িলাম। প্রথমরাত্রিতে আমরা একটু ঘুমাইয়া পড়িলাম। এদিকে অর্দ্ধেক রাত্রি হইয়াছে, ঝড় আরও বাড়িতে লাগিল। গঙ্গার মাঝে বড় বড় হাতির মত পাহাড় পড়িয়া থাকায় লছমনঝোলার উপরদিক হইতে প্রবল স্রোত আসিয়া জলমগ্ন পাহাড়ে ধাক্কা মারিতেছে ও ভীষণ গর্জন করিতেছে। দুইদিকে উঁচু পাহাড় ও জঙ্গল, এইজন্য নদীর জলের আওয়াজ ও ঝড়ের আওয়াজ বাহিরে যাইতে পারিল না, ভিতরেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল অর্থাৎ সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর আওয়াজটা রহিয়া গেল।

ক্রমে ঝড় কমিল ও বৃষ্টি হইতে লাগিল। হঠাৎ যেন গঙ্গার আওয়াজ বলিয়া উঠিল, ''এখানে কি ঘুমুতে এসেছিস যে মড়ার মত পড়ে আছিস্-দেখ্, গঙ্গার জলটাও যেন বলছে,'হর' 'হর' 'হর'। ঘুম ছাড়্, চুপ করে শোন্, সমস্ত রাত্রি গঙ্গা কি বলছে।'' গভীর রাত, পাহাড় ও জঙ্গল। গঙ্গাস্রোত পাহাড়ে লাগিয়া নানাভাবে দুলিতে দুলিতে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল। আমি ত চমকাইয়া কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম। মনে হইল, গঙ্গাও সারারাতি 'হর' 'হব' 'হর' করিয়া জপ করিতেছে। নানা পর্দায় ও নানা ভঙ্গীতে জপ করিতেছে-কখনও বা মৃদুভাবে, কখনও বা উচ্চভাবে। সঙ্গে ঘরে যাহারা ছিল তাহারাও মালা লইয়া জপ করিতে লাগিল, কিন্তু তখনও প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। একমনে স্থিরভাবে গঙ্গার এই 'হর' 'হর' শব্দ শুনিতে শুনিতে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল।

বদরীনারায়ণ দর্শন

পাহাড়ে উঠিয়া প্রথমে স্থানটি প্রণাম করিয়া আমরা সকলে ধীরে ধীরে নগরের দিকে চলিলাম। যেস্থানে প্রথম বদরীনারায়ণ পাহাড় দর্শন করিলাম, সেই সমতলভূমির পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি পাহাড় এবং ইহাকে ভেদ করিয়া মধ্যস্থল দিয়া অলকানন্দা প্রবাহিত হইতেছে। একটি ছোট কাঠের পুল দিয়া আমরা পূর্বদিকের নগরেতে যাইলাম। পাহাড়ের গা দিয়া একটি ধারা বহিতেছে, তথায় মুখ-হাত-পা ধুইয়া মন্দির দর্শন করিতে যাইলাম। বহুকালের বাসনা বদরীনারায়ণ দর্শন করিব, আজ তাহা পূর্ণ হইল। এইজন্য প্রাণে গভীর আনন্দ হইল, চাপল্য বা উল্লাসের কোনও চিহ্ন নাই। যাহা হউক, বাজারের ভিতর দিয়া যাইয়া প্রথমে মন্দিরের দ্বারদেশে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ চাহিলাম, তাহার পর নাটমন্দিরকে প্রণাম করিয়া একটু জপ করিতে বসিলাম।

মন্দিরটির নক্‌শা হইতেছে, একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, তাহার মাঝে মন্দির। একটি গর্ভগৃহ, তাহাতে বিগ্রহ স্থাপিত আছে। মন্দিরের স্থাপত্য-নিয়ম পাহাড়ী প্রথানুযায়ী অর্থাৎ পূর্বে বলিয়াছি টিহিরির শ্রীনগরে যেরূপ এক মন্দির দেখিয়াছিলাম, বদরীনারায়ণের মন্দির সেই প্রথা অনুযায়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। ইহা সমতলভূমির মন্দিরের সদৃশ নহে। গর্ভগৃহটি বেশ অন্ধকার। সম্মুখে নাটমন্দির, তাহাও অল্প পরিসর। গর্ভগৃহে সম্মুখের দরজা দিয়া আলো যায়, কিন্তু আশেপাশে জানালা আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, ঘরের ভিতর সব জিনিস বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

আমি এই নাটমন্দিরটিতে অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকিতাম, শুধু মধ্যাহ্নে আহারের সময় ও রাত্রে শুইবার সময় বাসায় আসিতাম। এদেশে প্রথা হইতেছে যে, পান্ডাদের জনকতককে পুলিশ করিয়া দেওয়া। ইহাদিগকে 'মন্দির পুলিশ' বলে। এই পান্ডা বা পুলিশ কর্মচারীগণ সব সময় আমায় দেখায় অতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। একদিন প্রাতে বিগ্রহের স্নান হইবে, এক পান্ডা-পুলিশ আমাকে গর্ভগৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। নিয়ম হইল, গর্ভগৃহে যাইতে হইলে অনেক টাকা প্রণামী দিতে হয়, এইজন্য আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু ঐ পুলিশটি আমাকে আগ্রহ করিয়া লইয়া যাইয়া গর্ভগৃহের দক্ষিণদিকের দেওয়ালের কাছে

দাঁড় করাইয়া দিল। দেখিলাম, প্রধান পুরোহিত বিশেষ আপত্তি করিল না। ইহা ভাগ্যক্রমে যোগাযোগ হইয়াছিল। গর্ভগৃহে রাউল সাহেব যিনি যোশীমঠের অধ্যক্ষ, তিনিই প্রধান পুরোহিতের কাজ করিতেছিলেন। বিগ্রহের অনেক হীরকাদি থাকায় একজন ব্রাহ্মণ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। সেইদিন একজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধুও উপস্থিত ছিলেন। বাঁদিকের দেওয়ালে লম্বা ডগা বাঁকান অনেকগুলি বেত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এইগুলি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব সাধুদিগের হাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে 'বদরীনারায়ণের ছড়ি' বলে।

বিগ্রহ হইতেছে ধূসর বর্ণ বেলে পাথরের। প্রায় একহাতের তিন পোয়া আন্দাজ অর্থাৎ কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ। এই চতুষ্কোণ টালির উপর একটি বক্রকটি নারায়ণ মূর্তি। স্নানপূজাদি এই প্রস্তর মূর্তিতে হইয়া থাকে, তাহার পর পরিচ্ছদাদি, হীরকের মুকুট, মুক্তার মালা ইত্যাদি দিয়া রাজবেশ করান হয়। বাজারে এই রাজবেশের প্রতিকৃতি বিক্রয় হয়, কিন্তু আসল বিগ্রহের প্রতিকৃতি লওযা নিষেধ। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি এই আসল বিগ্রহ দর্শন করিয়াছি। ইহা কেবল বদরীনারাযণের অনুগ্রহ ধরিতে হইবে। ঘরটি অতিশয় গরম হওয়ায় আমি আধঘন্টা পর বাহির হইয়া আসিলাম এবং নাটমন্দিরে বসিযা সম্মুখেব বিগ্রহ দেখিতে লাগিলাম। যাহা হউক, আমার বহুকালের বাসনা এইরূপে পূর্ণ হইয়াছিল।

অন্ধের তীর্থ গমন

বদরীনারাযণের পথে প্রায়ই দেখা যায যে কোন খঞ্জ বা খোঁড়া ব্যক্তি দুইহাঁটুতে দুইটি চামড়া বাঁধিয়া এবং দুইহাতে দুইখানি কাঠের খরম লইয়া যাইতেছে। পথে এমন দুই-তিন জনের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। আমরা বদরীনারায়ণ হইতে নামিয়া আসিয়া লালসেঙ্গায় যখন পৌঁছিলাম, যাহাকে এখন 'চামলী' বলে, তখন দেখিলাম একটি লোক চলিয়াছে, এক গাছি লাঠি তাহার সম্বল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পথ কোন দিকে।" আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, তাই বলিলাম "পথ এই যে।" পথিকটি আমায় বলিল, "আমার চক্ষু নাই, দেখিতে পাইতেছি না।" আমি মহা অপ্রতিভ হইলাম এবং অপরাধ করিয়াছি বলিয়া তাহার নিকট বহুক্ষমা প্রার্থনা

করিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া সড়কের উপর পৌঁছাইয়া দিলাম। সহর নিচু দিকে, সড়ক পাহাড়ের গা দিয়া অনেক উঁচু স্তরে ছিল। একটি অবিবেচক যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইতেছেন?" পথিকটি বলিল, "আমি বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে যাইতেছি।" যুবকটি বলিল, "আপনার ত চক্ষু নাই, কি করিয়া দর্শন করিবেন?" পথিকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হাঁ মহারাজ মেরা ত দর্শন নেহি হোয়েগা, মগর পরশন তো হোয়েগা" অর্থাৎ আমার দর্শন হবে না, কিন্তু স্পর্শ ত হবে? আমি শুনিয়া বিরক্ত হইলাম এবং বলিলাম যে এই পথিকের সত্য সত্যই দর্শন হইবে, কিন্তু অপরের আদৌ দর্শন হইবে না। এই পথিকটির কি আগ্রহ, কি ঐকান্তিক ভাব; তাহার কোন সম্বল নাই, কোনও সঙ্গীও নাই, একমাত্র ভগবান সঙ্গী। হাতের ছড়ি দিয়া একবার দক্ষিণদিকে আওয়াজ করিতেছে, আর একবার বামদিকে আওয়াজ করিতেছে। আওয়াজেই ঠিক বুঝিয়া লইতেছে, একদিকে পাহাড় ও অপরদিকে খড বা নিচু জমি। সে প্রায় বদরীনারায়ণের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। সহায় হইল এক ভগবান ও এক ছড়ি। আমি যখনই এই ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করি তখনই মনে অতি আনন্দ পাই। হিন্দুজাতির ভগবানের জন্য, তীর্থের জন্য কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কি তীব্রভাব যে অন্ধ ব্যক্তিও জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এই পার্বত্য দেশ অতিক্রম করিয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়া প্রায় গন্তব্যস্থানে আসিয়াছে। দেখিলাম, লোকটি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব সাধু। উহার ঐকান্তিক ভাবের জন্য আমি উহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সিমলা-শৈল

পূর্ব্বে যখন কালকা অবধি রেলওয়ে খুলে নাই, তখন আম্বালা দিয়া সিমলা আসিতে হইত। এখন অনেকটা সময়; কষ্ট ও অসুবিধা বাঁচিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে পাঞ্জাব-ডাক গাড়ীতে আরোহণ করিলে তৃতীয় দিবস বেলা দশটায় কালকা এবং সন্ধ্যার সময় সিমলা পৌঁছানো যায়।

কালকা স্টেশন কাশৌলি পাহাড়ের পাদমূলে। কাশৌলি হিমালয়েরই পরিবারভুক্ত। হিমালয় সম্বন্ধে অনেকের বোধ হয় একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। লোকে মনে করেন, হিমালয় প্রস্তরময় হইলেও তাহার সর্বাঙ্গ বরফে এমন আচ্ছন্ন, যে প্রস্তর কোথাও দেখিবার যো নাই। হিমালয়ের প্রচন্ড শৈত্য বশতঃ সেখানে পাখীটিও উড়িতে পারে না,কেবল লোকে দূর হইতে স্তোত্র পড়িয়া এবং প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়া থাকে। হিমালয়ের উচ্চতা সম্বন্ধেও বোধ হয় অনেকের ধারণা যে তিনি জমি হইতে বিনা নোটিসে এক নিশ্বাসে সটান উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন। আর কাহারও না হউক,অন্ততঃ নিম্ন স্বাক্ষরকারী মূর্খের প্রায় ঐরূপ ধারণাই ছিল। সুতরাং আমি যখন কালকায় নামিয়া প্রথম হিমালয় দর্শন করিলাম, তখন অনেকটা নিরাশ হইলাম। কোথায় বা বরফ; আর কোথায় বা উচ্চতা। মধুপুর বা জামালপুর অঞ্চলেব পাহাড়ের মতই। কিন্তু ভৌগোলিকেরা প্রবঞ্চনা করে নাই। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তাহার গায়ে পাহাড়, এইরূপ করিয়া হিমালয় উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং হিমালয়ের মহোচ্চ চূড়াগুলি, ভূমি হইতেই খুব উচ্চ — আপন আপন পাদমূল হইতে নহে, অথচ কাছে দাঁড়াইয়া সম্মুখের পাহাড়টা মাত্রই দেখা যায়,- যেমন কলিকাতায় কোনও বাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া মনুমেন্টের দিকে মুখ ফিরাইলেও বাড়ীটাই দেখা যায়, বহুগুণ উচ্চ মনুমেন্ট ঢাকা পড়িয়া থাকে।

আর বরফের কথা - এই সিমলা শহর হিমালয়ের বুকের ভিতর আজ ২৩শে পৌষ, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি,নিকটে পর্বত গাত্রে কোথাও একটু সাদা রঙও নাই। কেবল উত্তরে অনেক দূরে একটা তুষার মন্ডিত গিরিমালা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও চিরতুষার নহে, গ্রীষ্মতাপে গলিয়া যায়। চিরতুষার হিমালয়ের

কোথাও কোথাও আছে বটে, কিন্তু সমগ্র হিমালয়ের কলেবরের তুলনায় সে স্থানগুলি কিছুই নহে। হিমালয়েরগাত্রময় মনুষ্যের বাস; রীতিমত কৃষিকার্য চলিতেছে, আদা, গোধূম, হলুদ, আলু, তামাক ইত্যাদি প্রচুর জন্মিয়া থাকে এবং নানাদিকে গিরিবর্ত্ম আছে। এই সকল সঙ্কীর্ণ ও অসমতল পথে গাড়ী চলিতে পারে না বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীগণ ভারবাহী পশুশ্রেণী লইয়া অনায়াসে যাতায়াত করে। সিমলা হইতে তিব্বতদেশ অবধি একটা পথ গিয়াছে, দূরন্ত শীতেও সে পথ দুর্গম হয় না।

কালকা হইতে সিমলা ৫৮ মাইল, সুতরাং এই দীর্ঘ পথের একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী- পাঠকগণের প্রীতিকর হইতে পারে।

কালকা-সিমলা পথের নাম কার্ট রোড। ডাক বিভাগ এই পথে যান ব্যবসায় করিয়া থাকে। যান তিন প্রকার আছে—টোঙ্গা, ফিটন্,ও ইন্‌ভ্যালিড হিল্ ক্যারেজ।

টোঙ্গা-এক্কা এবং বগিগাড়ীর মাঝামাঝি একটা পদার্থ। সম্মুখে দুইজন এবং পশ্চাতে দুইজনের বসিবার স্থান আছে। ইহা দুইটা ঘোড়ায় টানিয়া থাকে। ফিটনের-বর্ণনা অনাবশ্যক। ইন্‌ভ্যালিড্ হিল্ ক্যারেজ রোগী মানুষদের লইয়া যাইতে পারে। ইহাছাড়া দেশীয় লোকেরা এক্কা ও ঝাঁপানের ব্যবসা করে। ঝাঁপান ডুলির মত।

কালকা হইতে সিমলা ৪৭০০ ফীট উচ্চ। কার্ট রোড এই ৪৭০০ ফীট "চড়াই" উঠিয়াছে। কিন্তু ৫৮ মাইল এই চড়াই উঠিয়াছে বলিয়া ইহার ক্রমোন্নতি অত্যন্ত মৃদু ভাবে হইয়াছে। এই জন্য সকল প্রকার গাড়ীই এপথে যাইতে পারে। দার্জিলিঙ্গে রেলওয়ে হইয়াছে; এখানে এতদিন হইল না কেন, এ প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এখানে হয় নাই তাহার কারণ এই যে গবর্ণমেন্ট এতদিন অনুমতি দেন নাই। রেলওয়ে আসিলে সিমলায় জনতাধিক্য হইবার সম্ভাবনা; তাহা সাহেবরা পছন্দ করেন না। এখন নাকি অনুমতি হইয়াছে; বৎসর দুই পরে নির্ম্মান কার্য্য আরম্ভ হইবে শুনিতেছি।

কার্ট রোড প্রস্থে অধিক নহে। দুইখানি গাড়ী পাশাপাশি যাইতে পারে মাত্র। বড় ধূলা। কালকা শহর ভেদ করিয়া এই পথ ক্রমে পাহাড়ের গায়ে উঠিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে কি ভাবে পথ রচিত হয়, তাহা সকলের জানা না থাকিতে পারে,কেহ না মনে করেন যে পথ নিম্নদেশ হইতে চূড়া লক্ষ্য করিয়া উঠে, পার্ব্বত্য পথও সেইপ্রকার উঠিয়া থাকে। বলিয়াছি, পাহাড়গুলি গায়ে গায়ে সংলগ্ন পথ এক পাহাড়

ছাড়িয়া অন্য পাহাড়, এইরূপ করিয়া ক্রমাগত চলিয়াছে। ঢালু পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া এই পথ প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া, ইহার এক পার্শ্বে যেন উচ্চ পাষাণ প্রাচীর উঠিয়াছে, অন্য পার্শ্বে ভয়ঙ্কর গভীর "খাদ" নামিয়া গিয়াছে। এই খাদের দিকে প্রস্তর খন্ড দিয়া দুই হাত উচ্চ "আল" গাঁথা আছে।

এ পথে বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যাবলী অধিক নাই। যথা পূর্ব্বস্তথা পরঃ- ক্রমাগতই পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়, মাঝে মাঝে একখানি এক্কা বা টোঙ্গার সহিত, অথবা উষ্ট্রশ্রেণীর সহিত চকিত সাক্ষাৎ,- উষ্ট্রের শ্রেণী না বলিয়া বরং ট্রেন বলা উচিত, কারণ সর্ব্বত্রই দেখিলাম এক একটি উষ্ট্রের পুচ্ছের সহিত পরবর্ত্তীর নাসিকা রজ্জু সম্বন্ধ। এইরূপ দশ পনেরোটিতে যেন এক একখানি রেলওয়ে ট্রেন হইয়া চলিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র কোথাও শ্যামকান্তি, আবার কোথাও মরুবৎ। এখানে ওখানে উচ্চদেশে পাহাড়ী কৃষকের একখানি ক্ষুদ্র কুটির, তাহার পরম নির্জ্জনতা কবিজন লোভনীয়। নিম্নে খাদের দিকে শস্যক্ষেত্র, দূর হইতে দেখিতে যেন কতগুলি লম্বা লম্বা সিঁড়ি তৈয়ারি করা রহিয়াছে।এই প্রকার সিঁড়ির মত নির্ম্মান করিয়া পর্ব্বত গাত্রে চাষ করা হয়। মাঝে মাঝে অতি ক্ষুদ্র জলধারা পাহাড়ের গা বহিয়া ঝিরি ঝিরি করিয়া পড়িতেছে। সে জল কি স্বচ্ছ, আর কি সুশীতল। আমি অকারণ শীত বিভীষিকা বশতঃ পথে পিপাসা নিবারণের জন্য বোতল ভরিয়া চা সঙ্গে লইয়াছিলাম। সে চা ফেলিয়া রাখিয়া অঞ্জলি পূরিয়া হিমালয়ের এই স্নেহধারা পান করিয়া বাঁচিলাম। পাহাড়ের গায়ে কত সহস্র প্রকার ফুল ফুটিয়াছে কেই বা তাহার নাম জানে! বেলা পড়িয়া আসিলে এক স্থানে দেখা গেল পাহাড়গুলির গায়ে ঘাস জন্মিয়া তাহা পাকিয়াছে, সে বড় চমৎকার দেখিতে, যেন পাহাড় একখানি বাঘছাল গাত্রে দিয়া বসিয়া আছে। একটা বিস্ময়ের কথা এই যে সারা পথে একটিও বন্য জন্তু দৃষ্টিগোচর হইল না।

কালকা-সিমলা পথের বিবরণ ইহার অপেক্ষা অধিক কিছু বলিবার নাই। সিমলা শহরটির বর্ণনা দিবার পূর্বে ইহার একটু ইতিহাস দেওয়ার প্রয়োজন। ভিখারীর ছেলে যদি ক্রমে রাজসিংহাসনে আরোহণ করে ,তবে তাহার জীবন চরিত জানিতে সকলেরই আগ্রহ হইবার কথা । সিমলার ভাগ্য পরিবর্ত্তন ইহার অপেক্ষা অল্প বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এখানে কি ছিল? গাছ ছিল আর পাথর ছিল, অসভ্য পাহাড়ী চাষীর কুঁড়ে ঘর ছিল। আর এখন? এখন সিমলা দ্বিতীয় কলিকাতা হইয়াছে; সুবিপুল ভারতবর্ষের অন্যতম রাজধানী হইয়াছে । সুতরাং সিমলার একটু

পূর্ব্ব ইতিহাসে, আশাকরি, নিতান্ত মধুকর জাতীয় পাঠক ভিন্ন অন্য কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

সিমলা পরগণা পূর্ব্বে পাতিয়ালার রাজা ও কেঁওথলের রাণা, এই দুইজনের 'সাজা'র জমিদারী ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের "নেপাল যুদ্ধ" চলিতেছিল সেই সময় গুর্খা জাতি যমুনা ও শৎলেজ (শতদ্রু) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূমি অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল। ইংরাজ বিবেচনা করিলেন, এ স্থান হইতে ইহাদিগকে না তাড়াইতে পারিলে যুদ্ধে মঙ্গল সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশীয় রাজন্যকের সাহায্য লইয়া ইংরাজ গুখাগণকে তাড়াইলেন। ইংরাজের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হইল, দেশীয় রাজগণও স্বীয় স্বীয় অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। সিমলা পরগণা পাতিয়ালা ও কেঁওথলেরই রহিল। ইংরাজ এই প্রথম এ পার্ব্বত্য প্রদেশের সংশ্রবে আসিলেন।

লেফ্‌টেন্যান্ট রস্ তখন পার্ব্বত্য রাজ্যের সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট। কি দিনে এবং কি ক্ষনে বলিতে পারি না, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিমলায় কাঠ, মাটি, আর খড় দিয়া একখানি কুটির নির্ম্মাণ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে রস্ সাহেবের কর্ম্মে উত্তরাধিকারী লেফ্‌টেন্যান্ট কেনেডি একখানি স্থায়ী রকমের গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ইহা আজিও দন্ডায়মান থাকিয়া, সিমলার গৃহসমার্জে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সন্মানিত উচ্চাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অতঃপর সাহেবরা, বিশেষতঃ যাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহারা পাতিয়ালা ও কেঁওথলের অনুমতি লইয়া একে একে এখানে আসিয়া বাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বিণা করে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার স্থান পাইতেন, কেবল এই শর্ত থাকিত, যে তাঁহারা গো বধ করিতে পারিবেন না এবং প্রধানদ্বয়ের বিণা অনুমতিতে কোনও গাছ কাটিতে পারিবেন না। (সিমলায় এখনও কেহ গাছ কাটিতে পায় না: কিন্তু হায় পাতিয়ালা! গো-বধ সম্বন্ধে —থাক আর কাজ নাই; এখনি "সিডিষ্যন" হইয়া দাঁড়াইবে।)- পাঁচ ছয় বৎসরে ধীরে ধীরে এইরূপ অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল, এবং সিমলা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিল। এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিল যে ১৮২৭ সালে বড়লাট আমহর্ষ্ট, ভরতপুর যুদ্ধান্তে উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ সমাধা করিয়া গ্রীষ্মের কয়টা মাস সিমলায় যাপন করিলেন। এই বৎসর হইতে সিমলার মহত্ত্বের সূচনা। ইহার তিন বৎসর পরে কেনেডি সাহেবকে (ইনি তখন স্বয়ং পলিটিক্যাল এজেন্ট হইয়াছেন) গবর্ণমেন্ট আদেশ পাঠাইলেন যে অন্যত্র ভূসম্পত্তি বিনিময় দিয়া, সিমলায় একটি রীতিমত সহর নির্ম্মানের উপযোগী স্থান লইতে পারিলে

ভাল হয়। কেনেডি সাহেব প্রধানগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেন্টের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। সিমলার সীমানায় তখন ষোলখানি ক্ষুদ্র গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। বারোখানি ছিল কেঁওথলের রাণার ,—বাৎসরিক জমিদারী আয় ৯৩৭ ; ইহার বিনিময়ে কোম্পানি রাণাকে রায়েন নামক একটি পরগণা দিলেন; তাহার বাৎসরিক আয় তখন ১২৮৯ । বক্রী চারিখানি গ্রামের বিনিময়ে পাতিয়ালার রাজাকে বারৌলি পরগণার কিয়দংশ দেওয়া হইল,—তাহার বাৎসরিক আয় ২৪৫ টাকা ।

এখন হইতে বড়লাটগণ বৎসরে বৎসরে সিমলায় আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম অবস্থিতিকাল কয়েক সপ্তাহ করিয়া হইত, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া কয়েক মাস করিয়া হইতে লাগিল। চারিদিকের পার্ব্বত্য রাজ্যের প্রধানগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পক্ষে এখানে নিতান্ত সুযোগ ছিল। তাহাছাড়া, তখন বড়লাটগণ শীত ঋতুতে ভ্রমণে বাহির হইতেন; কলিকাতার অপেক্ষা সিমলা হইতেই এই ভ্রমণ আরম্ভ করা অধিক সুবিধাজনক ছিল। প্রথম প্রথম অল্প সংখ্যক কর্মচারিবর্গ বড়লাটের সঙ্গে আসিত; সার জন লরেনসের সময় হইতে সিমলা ভারতেশ্বরের রীতিমত নিদাঘ রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে।

এইবার সিমলা শহরের একটি বর্ণনা দিতে প্রয়াস করিব। সিমলা কলিকাতার সমতলতা হইতে প্রায় ৭০০০ ফীট উচ্চে অবস্থিত। সিমলা শহরের পার্ব্বত্য শহর মাত্রেরই প্রধান বিশেষত্ব তাহাদের অসমতলতা। সিমলার উচ্চতম স্থান নিম্নতম স্থান হইতে হাজার ফীটেরও অধিক উচ্চ হইবে। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে প্রায়ই চড়াই উঠিতে হয়, নহেত উৎরাই নামিতে হয়। যাঁহারা নতুন আসেন, তাঁহাদের এই চড়াই উৎরাই প্রথম প্রথম বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। সিমলায় পদার্পণ করিবামাত্রই চড়াই ব্যাপারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। টোঙ্গা হইতে নামিয়াই, বাড়ীতে পৌঁছানো সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য টে লিগ্রাফ অফিসে যাইবার প্রয়োজন হয়। কে জানিত যে টেলিগ্রাফ অফিস সেখান হইতে ভয়ানক চড়াই। একে দুই দিনের পথকষ্ট এবং প্রায় অনাহার । তাহার উপর অতি সাবধান বশতঃ দেহখানির উপর পর্বত পরিমাণ গরম কাপড় চাপান- (আর দেহখানি ও নিতান্ত লঘু নহে) তাহার উপর সেই চড়াই। আমার যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমার অন্তরাত্মাই অবগত আছেন আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা। টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছিয়া কয়েক মিনিটকাল আমার কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে নাই বুঝিয়া ফেলিয়া, সকল জামার বোতাম খুলিয়া দিয়া অনাবৃত বক্ষে ও মস্তকে সেই রাত্রি নয়টার

সময় হিমালয়ের ডিসেম্বর মাসের বায়ু লাগাইয়া তবে আমি সুস্থ হই।

সিমলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমায় দুইটি গিরিশৃঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব প্রান্তে Peak of Jakko পাঠকের আপত্তি না থাকিলে ইহাকে আমি " যক্ষচূড়া" নামে অভিহিত করিব। কালিদাসের বিরহী - যক্ষ যে রামগিরি হইতে মেঘকে দূত করিয়া প্রিয়া সমীপে প্রেম বার্তা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ এখান হইতে অনেক দূরে। তথাপি Jakko কে যক্ষ করিলে কোনও ক্ষতি দেখি না। বরং নামের গুণে ইহার পাষাণস্তূপ হইতে কিঞ্চিৎ কাব্যসৌরভ পাওয়া যাইতে পারিবে। পশ্চিম সীমায় Prospect Hill - একটা সুদীর্ঘ গিরিপৃষ্ঠ (Ridge) এই চূড়া দুইটির পাদমূল মোহিত করিয়াছে। যক্ষচূড়ার মূল হইতে আর একটি গিরিপৃষ্ঠ (ridge) উত্তর দিকে গিয়া ইলিষীয়ম নামক চূড়ায় শেষ হইয়াছে। ইহাই হইল সিমলা শহর।

যক্ষচূড়াকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাঁচ মাইল পরিমিত একটি পথ গিয়াছে। ঘোড়া ছুটাইয়া অথবা পদব্রজে যক্ষচূড়া প্রদক্ষিণ করা এখনকার সাহেব ও বাঙ্গালীদের একটা প্রধান আমোদ। কিন্তু ঘোড়া ছুটান এখন বন্ধ আছে; কারণ এই পথের এক অংশে এখন বরফ জমিয়া রহিয়াছে। ঘোড়ার পা পিছলাইয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল এই পথে একটি বিভীষিকা পূর্ণ অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন শীতের বৈকালে তুষারপাত হইতেছিল। পথে তুষার গভীর হইয়া জমিয়া রহিয়াছে। এমন সময় তিনটি অতি সাহসী বাঙ্গালী বাবু যক্ষচূড়া প্রদক্ষিণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। দুইজন ফিরলেন, একজনের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ভ্রমণ কালে তিনজন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে দূরে পড়িয়াছিলেন। যিনি সকলের পশ্চাতে ছিলেন, তিনি পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান; বোধ হয় পূর্ব হইতে শীতে তাঁহার হাত পা অসাড় হইয়া আসিয়াছিল, -এ জন্মের মত আর উঠিতে পারেন নাই। সঙ্গীরা ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেই প্রচন্ড শীত রজনী ক্রমে মৃতদেহকে তুষার সমাধির মধ্যে লুক্কায়িত করিল। পরদিন বরফ কতকটা গলিলে শবদেহ বাহির হইল। কি শোচনীয় পরিণাম! আজিও সেই স্থান দিয়া পথ চলিবার সময় লোকে পরস্পর এই দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে।

যক্ষচূড়ার উত্তরাভিমুখী ও পশ্চিমাভিমুখী অংশ দুইটিই বহু গৃহাকীর্ণ। এই অংশ দুইটির সংযোগ স্থলে গির্জা ঘর। এই স্থান হইতেই প্রদক্ষিণ আরম্ভ করা যাউক। বাম দিকে অগ্রসর হইলে প্রথমেই লক্কড় বাজার। সিমলার যে অংশ গুলিতে

লোকের বাস, তাহাদের মধ্যে লক্কড় বাজারই সর্বাপেক্ষা অধিক শীতল। ইহার কারণ এই যে যক্ষচূড়ার অন্তরাল বশতঃ শীতকালে বেলা দুইটা তিনটার কমে আর এখানে রৌদ্র আসে না। একটা তুষার পাত হইলে অন্যখানে তাহা গলিয়া যাইতে যত সময় লাগে, লক্কড় বাজারে তাহার দুইগুণ বা তিনগুণ সময় লাগিয়া থাকে। এই স্থানে কাঠের কাজ খুব ভাল। অনেক শিল্পচতুর ছুতার মিস্ত্রি এখানে বাস করে। একটু উপরে লক্কড় বাজার শেষ হইয়াছে। এখন কেবল সাহেবদের বাসগৃহ। এ অংশ আরও অধিক শীতল। একমাস হইল একটা তুষারপাত হইয়াছে, সেই তুষার এখনও এখানে বর্তমান আছে। একটা একটা গৃহ ছাদ একেবারে সাদা হইয়া রহিয়াছে,- যেন অনেক বস্তা বিলাতী লবণ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে যক্ষচূড়ার গাত্রেও স্থানে স্থানে তুষার লাগিয়া আছে। পথের উপর - তাহা আর তুষার নহে, বরফের আকার ধারণ করিয়াছে। তুষার ও বরফের পার্থক্য এইখানে নির্দেশ করা উচিত। সকলেই জানেন যে তুষার আকাশ হইতে পড়ে এবং জল জমিয়া বরফ হয়। তুষার বিলাতী লবণের মত চূর্ণাকার - সেই প্রকার শুভ্র এবং ঠিক তাহারিই মত উজ্জ্বলতার পালিশবিহীন; অত্যন্ত মোলায়েম, যেন পেঁজা তুলার মত। বলা বাহুল্য, বরফ প্রস্তরবৎ কঠিন, কাঁচের মত মসৃণ এবং উজ্জ্বলতার পালিশযুক্ত। তুষারের উপর চাপ পড়িলে তাহা বরফের আকার ধারণ করে। সেই জন্য বলিলাম, পথের উপর পতিত তুষার এখন বরফ হইয়া গিয়াছে। পথের বরফের উপর ধূলি ঢাকা পড়িয়াছে। এ স্থান দিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলিতে হয়, নচেৎ মনুষ্যের নৈতিক জীবনের অসাবধানতার মতই পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। আমি ত রেলিং ধরিয়া এ পথে চলিয়া সঙ্গীদের পরিহাসভাজন হইয়াছি। নৈতিক জীবনেও এই রূপ রেল ধরিয়া চলিতে লোকে অনকের বিদ্রূপ সহিয়া থাকে —কিছুপরে বাম দিকে ভারত সেনাপতির আবাস গৃহ। এই অট্টালিকার বাহ্যিক আকারে মহত্ত্ব বা বীরত্ব কিছুরই চিহ্ন নাই। এমন বাড়ী কলিকাতার পথে পথে আছে। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে Mayo Orphanage.

এইবার গৃহাবলী বিরল হইয়া আসিল, তুষারও আর দেখা যায় না। কারণ এ স্থানে সূর্যদেবের প্রবেশ নিষেধ নাই। ক্রমে যক্ষচূড়ার যে অংশ পূর্বাভিমুখী , আমরা সেই অংশের নিকট দিয়া যাইতেছি। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে যক্ষচূড়ার গাত্রাশ্রিত অসংখ্য গাছপালা, বাম পার্শ্বে সুগভীর "খাদ"। খাদের ভিতর পাহাড়ীদের কুটীর এবং শস্যক্ষেত্র দেখা যায়। —অগ্রসর হইতে হইতে আমরা ক্রমে ছোট সিমলার নিকটে উপস্থিত হইলাম। যক্ষচূড়ার এই অংশ পশ্চিমাভিমুখী। ছোট

সিমলায় অনেক বাঙ্গালী বাসা করিয়া থাকেন। এখানে একটি হরিসভা আছে, আশ্বিন মাসে তাহার বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। ছোট সিমলা ছাড়িয়া আসিলে সাহেবদের আবাসগৃহের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল। ক্রমে সেই গির্জা ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম। এখানে সাহেব সওদাগরদিগের অনেকগুলি দোকান। কলিকাতা ও লাহোরের বড় বড় য়ুরোপীয় দোকানদারগণ প্রায় সকলেই এখানে শাখা খুলিয়াছেন। এখন সিমলায় ভাঙ্গা হাট। ক্রেতার অভাবে এসব দোকান-পাট বন্ধ। আমরা সেই গির্জ্জা ঘরের নিকট পৌঁছিলাম। যক্ষচূড়া প্রদক্ষিণ শেষ হইল।

গির্জ্জা ঘরের সম্মুখে অনেকটা স্থান খোলা। এখানে দাঁড়াইয়া উত্তর দিকে দৃষ্টি চালনা করিলে, অনেকদূরে পূর্ব কথিত তুষারাবৃত গিরিমালা দেখা যায়। অত্যন্ত শুভ্র —"রজতগিরিনিভ" ই বটে! বলিয়াছি, ইহা চিরতুষার নহে, চিরতুষার সিমলা হইতে দেখা যায় না। এই পর্বতগুলি অনেক দূরে। মেরুচূড়া, যেটি সর্বাপেক্ষা নিকটে, সেইটিই ২৭ মাইল দূরে, অথচ দেখিলে ভ্রম হয় যেন জোর ১০ মাইল। আজই ওখানে পৌঁছানো যায়।

গির্জ্জা ঘর হইতে একটা সুপ্রশস্ত পথ পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে, এই স্থানকে উপর বাজার কহে। প্রথমেই টাউন হল্। এই বিদ্যুৎ আলোকিত গৃহে সাহেবদের নৃত্য গীত ও সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালীরা কখন কখন থিয়েটার বা অপেরা করিবার জন্য এক রাত্রের মত ইহা ভাড়া করিয়া লন। ইহার পর বামদিকে বড় বড় দোকান — অধিকাংশ দেশীয় লোকের অধিকৃত। সিমলার জেনের‍্যাল পোষ্ট অফিসের সম্মুখে উপর বাজার শেষ হইয়াছে।

গির্জ্জার কাছ হইতে কিছু নামিয়া, নীচু বাজার বা বড় সিমলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা উপর বাজার অপেক্ষা সমধিক জনতাপূর্ণ। সমস্তই দেশীয় দোকান, এবং দেশীয় লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষের দোকান। সস্তা জিনিষপত্র, তরকারি মশলা, সর্বত্রই বাজারে মিলে। এই বাজারের শেষ ভাগে অনেক ছুতোর মিস্ত্রির দোকান, ইহাদের কাজ লক্কড় বাজার অপেক্ষা অনেক হীন। একটু অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ দিকে নামিয়া গেলে, সরকারি অফিস সমূহ। এই খানে পথ চড়াই উঠিয়া, পোষ্ট অফিসের সম্মুখে উপর বাজারের পথে মিলিয়াছে। এই মিলিত পথ সিমলার পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া ইহার এক শাখা কাইথু চলিয়া গিয়াছে। কাইথুতে অনেক" য়ুরেশিয়ান" এবং "ইস্ট ইন্ডিয়ান " বাস করেন। — আরও

কিছু দূরে যাইলে, দক্ষিণ পার্শ্বে "হিমালয় ব্রহ্ম মন্দির"। কিছু দূরে পূর্বে উল্লিখিত "কেনেডি হাউস"। কুচবেহারের মহারাজ এখন ইহার অধিকারী। দক্ষিণ ভাগে যে খাদ নামিয়াছে, তাহাতে Annandale Garden. ইহা একটি সুসজ্জিত উদ্যান, উহা বেষ্টন করিয়া ঘোড়া ছুটিবার পথ। সাহেবদের ঘোড় দৌড় ফুটবল প্রভৃতি এখানে হইয়া থাকে। কখনও কখনও বড়লাট ও ভারত সেনাপতি এই সকল আমোদ প্রমোদে উপস্থিত থাকেন। — কিছু দূরে Peter hoff নামক একটি অনুচ্চ চূড়া। ইহাতে পূর্বে "ভাইসরিগ্যাল লজ" ছিল, এখন Finance department এর কার্যালয়। ইহার কিছু দূরেই Observatory Hill. পূর্বে ইহার উপর একটি ছোট মান মন্দির ছিল। এখন ইহা মর্যাদার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ইহার উপরেই "নিউ ভাইসরিগ্যাল লজ"— ভারতেশ্বরের মন্দির। এই অট্টালিকা কলিকাতার "গভর্ণমেন্ট হাউস" অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু সুন্দরতর। Observatory Hill. টিতে অনেক গাছপালা । ভাইসরিগ্যাল লজটি যেন গাছপালার ভিতর সমাহিত। ইহার পর বালুগঞ্জ। ইহা দেশীয় লোকের বসতিপূর্ণ। বালুগঞ্জে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। এইবার Prospect Hill ইহার উচ্চতা যক্ষচূড়ার অপেক্ষা অল্পতর। জোর পাঁচশত ফীট হইবে। দূর হইতে Prospect Hill রমণীয় দর্শন নহে। কিন্তু নিকটে যাইলে ইহাকে লতাপাতায় ভূষিত পরম মনোহর দেখায়। এই শৃঙ্গে উঠিবার পথে তক্তা টাঙ্গান আছে, তাহাতে দর্শকগণকে অনুরোধ করা হইতেছে যেন কেহ লতা কিংবা ফুল না ছেঁড়েন। ই'হা পড়িয়া "সোনার তরী"- তে রবীন্দ্রনাথের "বৈষ্ণব কবিতা" মনে পড়িল। এই পাহাড়ের অজস্র পত্র পুস্পভূষণ যেন বৈষ্ণব কবিতা এবং নিষেধাজ্ঞা প্রচারক মিউনিসিপ্যালিটির বড় সাহেব যেন সাধু পন্ডিত। ক্ষুদ্র বাগান নহে, কিছু নহে, একটা পাহাড়ের অগাধ সম্পত্তি, কেহ যদি " প্রিয় গৃহ তরে " তাহা হইতে দুইটা লইয়াই যাইত। তাহাতে হে সাহেব, "তোমার কি তাঁর (পাহাড়ের) বন্ধু তাহে করি ক্ষতি? যাঁর ধন তিনি ঐ অপার সন্তোষে। অসীম স্নেহের হাসি হাসিতেছেন বসে।"

এখন Prospect Hill এর সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণ হ্রাস হইয়া রহিয়াছে। বর্ষার পর নব নব পত্রপুষ্পের অলঙ্কার পরিয়া ইহা আবার যৌবনশ্রী ধারণ করিবে। এই শৃঙ্গের উপর একটি হিন্দু মন্দির আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় নিজ ব্যয়ে ইহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরে বসিয়া দুই একজন "বাবাজি" অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধূমপান করিয়া থাকেন।

এখান হইতে সমস্ত সিমলা সহরটি ছবিখানির মত দেখা যায়।

সিমলা সহর শেষ হইল। এইবার এস্থানের শীত গ্রীষ্মের কথা বলিব। দার্জ্জিলিঙ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেখানে কেমন সর্ব্বদা বৃষ্টি হইয়া থাকে। রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে। হঠাৎ মেঘ করিল, বৃষ্টি হইল, আবার রৌদ্র দেখা দিল, পনেরো মিনিটের মধ্যে এ সকল হইয়া গেল! "দেবচরিত্রে"র খামখেয়ালির চূড়ান্ত নমুনা দার্জ্জিলিঙে। এখানে সে সব বালাই নাই। সেইজন্য শীতও দার্জ্জিলিঙ অপেক্ষা অল্প।

জানুয়ারী ও জুন চূড়ান্ত শীত ও গ্রীষ্মের মাস। নিম্নে গত ইংরাজী বৎসর এই দুই মাসে কলিকাতা ও সিমলায় প্রতি সাত দিনের তাপবৈচিত্র্যের একটা তালিকা দিতেছি। ইহা হইতে পাঠকেরা সিমলায় শীততাপের ধারণা করিতে পারিবেন।

		কলিকাতা		সিমলা	
		উচ্চতম ডিগ্রী	নিম্নতম ডিগ্রী	উচ্চতম ডিগ্রী	নিম্নতম ডিগ্রী
জানুয়ারী	১	৭৬	৬০	৪৪	৩৫
জানুয়ারী	৮	৮০	৫৪	৪৮	৪২
জানুয়ারী	১৫	৮৮	৬৪	৩৪	৩২
জানুয়ারী	২২	৮১	৫৮	৪৪	৩৯
জানুয়ারী	২৯	৮০	৫৫	৪৭	৪০
জুন	১	৯৪	৭৩	৬৪	৫৮
জুন	৮	৯৫	৮১	৮০	৬৬
জুন	১৫	৮৪	৭৬	৬৮	৫৮
জুন	২২	৯০	৮০	৭৫	৬৪
জুন	২৯	৯০	৮২	৭৬	৬২

Meteorological Department কর্ত্তৃক প্রকাশিত Indian daily weather Report এর ফাইল হইতে এই তালিকাভুক্ত বিবরণগুলি সংগৃহীত হইল।

পাঠকগণ এই তালিকা হইতে দেখিতেছেন, গত ২৯শে জুন কলিকাতায় যখন উত্তাপ ৯০ ডিগ্রী ছিল, সেই দিন সেই সময়ের উত্তাপ এখানে ৭৬ ডিগ্রী। ১লা

জানুয়ারী কলিকাতায় উত্তাপ ঠিক ঐ ৭৬ ডিগ্রী ছিল। সুতরাং উক্ত ২৯ তারিখে যদি কোনও কলিকাতাবাসী যাদুবিদ্যা বলে নিমেষ মধ্যে সিমলায় স্থানান্তরিত হইতেন, তবে জুনকে তাঁহার জানুয়ারী বলিয়া ভ্রম হইত। সহসা পাখা ও বরফের গেলাস ফেলিয়া তাঁহাকে শীতবস্ত্রের অন্বেষণ করিতে হইত। ফল কথা, এখানকার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার পৌষ মাঘ মাসের অনুরূপ।

কয়েক বৎসর এখানে শীতের প্রকোপ কম হইতেছে। ঘটনা বশাৎ উপরের তালিকায় গত ইংরাজি বৎসরের নিম্নতম উত্তাপের দিন সন্নিবিষ্ট হয় নাই। গত বৎসর তাপমানের পারদ ২৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। সকলেই জানেন, ৩২ ডিগ্রী নামিলেই জল জমিয়া যায়। কয়বৎসর শীত ঋতুতে অধিক দিন ৩২ ডিগ্রীর নীচে নামিতেছে না। একবার এখানে ১৯ ডিগ্রী পর্যন্ত নামিয়াছিল। তাপমান ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত না নামিলেও বাহিরে ধরাপৃষ্ঠের উপর যে জল থাকে,তাহা জমিয়া যায়। এবার আমরা বেলা দশটার পরেও অনেকদিন পথের জল প্রণালীতে জমা জল দেখিয়াছি। জলের উপরিভাগটা মাত্র জমিয়াছে, তুলিয়া লও, যেন সার্সি ভাঙ্গা কাঁচখানি। অথচ পূর্ব রাত্রে তাপমান ৩২ ডিগ্রী পর্যন্ত নামে নাই। ইহার কারণ এই যে জমি বায়ুর অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়, তাপমান বায়ুরই উত্তাপ নির্দেশ করে মাত্র।

শীতকালে এখানে আট দশটা তুষারপাত হইয়া থাকে। প্রথম তুষারপাত প্রায়ই ডিসেম্বর মাসে হয়, একবার নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিই হইয়াছিল। এবার ১১ই ডিসেম্বর রাত্রে প্রথম তুষারপাত হইয়াছে। সে আজ এক মাস হইল, এখনও দ্বিতীয় পাত হয় নাই। এত দেরী নাকি কখনও হয় না। লোকে (গরীবলোকে নহে) আগ্রহের সহিত দ্বিতীয় পাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। ১১ই ডিসেম্বর সমস্ত দিন মেঘ করিয়াছিল। প্রবল বাতাসও বহিয়াছিল। রাত্রে মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টি হইল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, বৃষ্টির সঙ্গে তুষার পড়িতেছে। সকল বাড়ীর ছাদ শাদা হইয়া গিয়াছে। জীবনে এই প্রথম তুষারপাত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। কতকটা তুলিয়া লইয়া ভক্ষণ করিলাম. কৃত্রিম বরফের অপেক্ষা অনেক অধিক সুস্বাদু। "ভারতী" —তে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের যে ধারাবাহিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল, তাহাতে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে তিনি তুষাররাশির উপর দিয়া চলিতে চলিতে একমুঠা তুলিয়া লইয়া গালে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

ইহা পাঠ করিয়া জলধরবাবুকে একজন অসাধারণ বীর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই শীতে বরফ খাওয়া! কি ভয়ানক কথা। এখন দেখিতেছি ইহাতে বীরত্ব কিছুই নাই। কৃত্রিম বরফের মত তুষার অত অধিক শীতল নহে। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া পিপাসা পাইলে এবং না পাইলেও কতবার যক্ষচূড়ার গাত্র হইতে তুষার খসাইয়া সুখে চর্বণ করিয়াছি! কোন কষ্ট হয় নাই। প্রেমিক আক্ষেপ করেন হায় যদি বিরহের অশ্রুজল তরল না হইত , তবে তাঁহার মালা গাঁথিয়া প্রিয়তমাকে উপহার দিতাম। আমরা আক্ষেপ করি, হায় যদি তুষার তরল হইয়া না যাইত, তবে এমন উপাদেয় ভক্ষ্য সামগ্রী পার্শেল করিয়া প্রিয় আত্মীয়, বান্ধবকে পাঠাইয়া দিতাম। এখানে বাঙালীর ছেলে মেয়েরা তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত Charlie ও Katie র অনুকরণে তুষার গোলক (Snow ball) লইয়া লেখা করিয়া বাঙালী জন্ম সার্থক করে। আমার একটি বন্ধু বলিলেন যে তাঁহার ছেলেরা বাড়ীর সম্মুখে তুষার দিয়া একটা মন্দির নির্ম্মান করিয়াছিল। পাঁচ সাত দিনে সেটা গলিয়া যায়।

একটা তুষারপাতের পর সিমলার বড় সুন্দর শ্রী হয়। সকল গৃহছাদে ঘন হইয়া তুষার পড়িয়া রহে। পথগুলি তুষারে ডুবিয়া যায়। শীতেও যাহাদের পাতা ঝরে না , সেই সকল গাছের পাতায় পাতায় তুষার জড়াইয়া যায়। যেমন কেলুগাছ। মহাতুষারেও ইহার পত্রশোভা হরণ করিতে পারে না। আর আর সমস্ত গাছ উক্ত বীরের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়াই পরাজয় স্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ পত্রাভরণ মোচন করিয়া দীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

যখন সদ্য তুষার পড়ে, তখন পথ চলিতে কোনই কষ্ট নাই। শীতও তখন অত্যধিক থাকে না। পথে বাহির হইলে তুষারের ভিতর জুতা অদৃশ্য হইয়া যায়, অথচ ভিজিয়া যায় না। তাহার পর যখন সেই তুষাররাশি পদভরে জমিয়া বরফ হইয়া যায়, তখন বড় কষ্ট। শীতও তখন কন্‌কনাইয়া পড়ে। পথ চলিতে বরফের লাঠি (Hill Stick) ব্যবহার করিতে হয়। ইহা এক খন্ড বংশদন্ড, প্রায় মাথা সমান উচ্চ, নিম্নমুখে একটা লৌহফলক লাগান, সড়কি বলিলেই হয়। কাঁচমসৃণ বরফের উপর দিয়া চড়াই উৎরাই সাধন করা কিরূপ নিরাপদ, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিয়া লইবেন। লাঠি ঠুকিয়া বরফে পুঁতিয়া তাহাকে ভর দিয়া চড়াই উৎরাই পথ অতিক্রম করিতে হয়। ইহাতেও মধ্যে মধ্যে বিনামূল্যে বিতড়িত "আছাড়" নামক সেই সুমিষ্ট পদার্থ আহার লাভ ঘটে।

বড়লাট সাহেবের শুভ অবস্থিতিকালে এখানে অন্যুন পাঁচ শত বাঙালী কর্ম্মচারী থাকেন। ইহাদের একটি সখের থিয়েটার ও একটি অপেরার দল আছে। গত ইংরাজি বৎসর থিয়েটারে "সরলা" ও "সীতার বনবাস" এবং অপেরায় "রাম বনবাস " অভিনীত হইয়া গিয়াছে। একটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় আপনাদের এখানে এত বনবাসের ধূম কেন? তিনি বললেন, রাম-সীতা আমাদিগকে এই হিমালয় পাহাড়ে বনবাস দিয়াছেন, সেই রাগে আমরা তাঁহাদের উভয়কে বনবাস দিয়া প্রতিশোধ লইতেছি। ছোট সিমলা ও বড় সিমলায় দুইটি হরিসভা আছে। তাহাদের উৎসব উপলক্ষে অনেক বাঙালী একত্র হইয়া থাকেন। এই আমোদ প্রমোদ ও ধর্মসভা ছাড়া অন্য প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দশজন একত্র হইবার সুযোগ হয় না। পূজার সময় সকল বাঙালীই এখানে থাকেন অথচ এই পাঁচ শত উপার্জনশীল হিন্দু বাঙালীর প্রবাসে একখানিও দুর্গাপূজা হয় না! ইহা প্রথম শুনিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আজ পর্যন্ত ইহার সন্তোষজনক কারণ স্থির করিতে পারি নাই। অন্য প্রকার সামাজিক ক্রিয়া কর্মও এখানে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় না। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বাঙালী বিষয় কর্ম উপলক্ষ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা অনেকটা প্রবাসকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি প্রবাসেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এখানকার বাঙালীরা বৎসরে সাত মাস এখানে থাকিয়া পুণর্ব্বার প্রিয় জন্মভূমিতে উপনীত হন। সুতরাং সিমলাকে তাঁহারা কিছুতেই গৃহ বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সেইজন্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তাঁহারা দেশেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

একটা দুঃখের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। এখানে এত সুশিক্ষিত ও কৃতী বাঙালী থাকিতেও একটিও রীতিমত বাঙ্গালা সাধারণ পাঠাগার নাই। কতিপয় যুবকে মিলিয়া " অমরাবতী লাইব্রেরী " নাম দিয়া নিজেদের মেসের বাসায় একটি ক্ষুদ্র আলমারিতে খানকতক বাঙ্গালা বই রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু এই লাইব্রেরীর " অমরত্বের" কোন লক্ষনই দেখা যায় না। অন্তর্জ্জলী রোগীর মত ইহার নাড়ী বহিতেছে কিনা বুঝা যায় না। সাহেবদের অনুকরণ করিয়া অনেকে ইংরাজি লাইব্রেরীতে উচ্চহারে চাঁদা দিয়া থাকেন। এবং চকচকে পুরু কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত, অসংখ্যছবিযুক্ত বহুবিধ গল্পপূর্ণ বিলাতী ম্যাগাজিন অফিস হইতে ফিরিবার সময় গৃহে লইয়া যান বটে, কিন্তু পড়েন কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন। ছাপার অক্ষরে

অনেকবার বাঙ্গলা সাহিত্যসেবীরা আক্ষেপ করিয়াছেন যে আমাদের প্রিয় বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালীর অন্ত ঃপুরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, ভাল বাবুরা ইংরাজি পড়িয়াই সুখী হউন, কিন্তু অন্তঃপুরেও কি বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য সুমধুর তাগাদা করিবার লোক নাই? রবীন্দ্রবাবু একবার পরিহাসছলে বলিয়াছিলেন. —"বাঙ্গালীর মেয়েরা যে এখন ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। এখন পূজার সময় লোকে স্ত্রীর জন্য আমাদের বই কিনিয়া লইয়া যায়। স্ত্রীরা ইংরাজি শিখিলে আর তাহা হইবে না" ।— তবে কি সিদ্ধান্ত করিব যে সিমলার পুর মহিলাগণ সকলেই ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন? — হয় নাই, হয় নাই তবুও এখন বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্ট আদর হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে দেখিয়াছি কোনও সাধারণ বাঙ্গলা লাইব্রেরীতে সন্ধ্যার সময় জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করা দুষ্কর। একখানি ভাল বই বাহির হইলে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। সেই বাঙ্গালীরা সিমলায় আসিয়া কেন যে এমন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। ইহা কি চিরবৈরাগ্যযোগী হিমালয়ের সংস্পর্শ গুণে?

ইতি
শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পৌষ সংক্রান্তি, ১৩০৪

মানা-ব্যাসগুহা-বসুধারা-শতোপন্ত

এখান থেকে মানা পথেও যাওয়া যায় তিব্বতে, মানা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে। পথটাও মন্দ নয়, প্রথমদিকে আমরা ঋষীগঙ্গা হয়ে চললাম মানা হয়ে বসুধারার পথে। চড়াই উৎরাই বিশেষ নেই, — নগ্ন পর্ব্বত পাদমূলে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু গাছপালার রেখা উপরে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত শীর্ষ, এ সারা পথেই দেখা যায়। মানা পথ, এই পথটার নামই মানাপথ, গ্রামখানি বেশ বড় পার্ব্বত্যগ্রাম, এখানে ভোটিয়াদের বাস।

এখান থেকে বসুধারা বেশীদূর নয়, সাড়ে তিনমাইলের কিছু বেশী হবে। আর পথ খুব কঠিন নয়, তবে হাঁপ লাগে, গিরিসঙ্কটের মত। পাথর, পাথর, পাথর পাথরের নানা আকাব ক্ষুদ্র বৃহৎ, তারি পাশে জঙ্গল, মাঝে পথ। আর উপর দিকে নগ্ন পাষাণ স্তর, আর শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীটি। সারা পথটা হাঁপ লেগেছিল এমনভাবে যেন আমাদের সকল শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। আজই আমরা বসুধারা দেখে ফিরব বদরীতে এই ঠিক ছিল। আমরা খাবার নিয়েছিলাম,-পরোটা আর কিছু আচাব আর হালুয়া। এই রকমই নিয়ম কারণ জানতাম ওখানে কিছু পাওয়া যাবেনা,— যেহেতু লোকালয় নেই।

আমরা তিনজন, তারমধ্যে এ-জন বালেশ্বর মিশ্র, এই অঞ্চলের মানুষ পথ প্রদর্শক হিসাবে, আমি আর নীলকণ্ঠ আইয়ার। প্রধান রাওয়াল পূজারীর সহকারী, যার সঙ্গে আমাব একটু মিত্রতা হয়েছিল, চমৎকাব হিন্দি কথা তার, কে বলবে যে দক্ষিণ-দেশীয় সে তামিল, বা মালাবারের লোক। আমার বসুধারা ও শতোপন্থ যাবার ইচ্ছা শুনে সঙ্গের আকর্ষণেই বোধ হয় সেই যাবে বোলে রাওয়ালের কাছে অনুমতি নিয়ে নিলে। শেষে অনুমতি পাবার পর যাত্রার কথা ঠিক হল এবং যাবার ব্যবস্থা করতে লাগা গেল। বালেশ্বর তাবই জানাশুনা লোক। কথা হল আমরা প্রভাতেই বেরিয়ে পড়বো, প্রথমে দু আড়াই মাইলের মাথায় মানাগ্রামে যাবো, ব্যাসগুহা দেখে সেখান থেকে বসুধাবায় গিয়ে স্নান করে শতপন্থ হ্রদ দেখতে যাবো। অবশ্য পথে লক্ষ্মীবান পর্ব্বত অতিক্রম করে চক্রতীর্থে তারপর মাজনাগ্রামে গিয়ে

শতপন্থের পথে প্রবেশ করা যাবে। আমরা ঐসব দেখে ঐ দিনই সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসবো। কিন্তু গাইড বালেশ্বর বললে, — কখনই ঐদিনে ফিরে আসা সম্ভব নয় একরাত্র মাজনায় থাকতে হবে। সে যা হয় হবে ঠিক করে আমরা পর্য্যাপ্ত খাবার আচার ও মিষ্টি এই সব সংগ্রহ করে নিজ নিজ কম্বল বোঝা সবই নিজেরা ঘাড়ে করে প্রভাতেই আনন্দে যাত্রা করলাম। যদিও বদরিনাথের অধিকার এখানে তাহলেও যাত্রাকালে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করেছিলাম।

মানা নামে যে পার্ব্বত্য গ্রামখানি, যেখানে গিয়ে আমরা ব্যাসগুহা দেখবো,- সেটা মাত্র দুই আড়াই মাইলের পথ, পথের বৈশিষ্ট্য, গাছপালা ক্রমশঃই কমে এসেছে কিন্তু শোভা অতুলনীয় ঐ ছোট ছোট গাছেও। তুষার জায়গায় জায়গায় দেখা গিয়েছিল, আবার কতক তুষার পদদলিত করেও চলেছিলাম। বন গোলাপের ঝাড়, ভাঙ্গের জঙ্গল কোথাও কোথাও। দেখি রক্তকরবীর গাছের মত, ফুলও প্রায় সেই রকম। এই পথেই ব্যাসগুহা,— খানিক উঠে যেতে হয় পথ থেকে। তারপর ঐ গুহাটি যা দেখলাম এভাবের গুহা আগে আর দেখিনি। প্রথম খানিক দরদালানের মত, তার উপরে গুহাদ্বার। সেখানে একজন ছিলেন তখন। তিনি অনেক দিনই আছেন, ব্যাসদেবের উপাসক। আমরা বহুদূর থেকে এসেছি বলে আমাদের বড়ই স্নেহের সঙ্গে বসতে স্থান দিলেন। আমি তাঁর কাছে বসে শুনলাম, বেদব্যাস এই গুহাতেই বেদ বিভাগ করেছিলেন। এখানে মন স্থির করে বসলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের অনেক মহাপুরুষ দর্শন হয়। আমি একরাত্র থাকবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলাম। তিনি রাজীও হয়েছিলেন কিন্তু বালেশ্বর মিশ্র বেঁকে দাঁড়ালো, সে লোকটা বলে,— এরকম জায়গায় গৃহীমানুষের থাকলে অকল্যাণ হবে। কেন? জিজ্ঞাসা করলে সে বললে, থাকতে গেলেই এখানে তোমার মলমূত্র ত্যাগ আছে, তাতেই এ স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হবে, কিছুতেই থাকা হবে না, — চলো মানা। সেই গ্রামই ভাল [illegible]দের। ইচ্ছা হোলো একটা প্রশ্ন করি, —কিন্তু তা করলাম না; —খানিক দে[illegible]াশুনা, একঘন্টার মত সময় এখানে ছিলাম তারপর বসুধারার পথে চললাম।

ঐ অলকানন্দার ধারা ধরেই আমরা অগ্রসর হয়ে বেলা নয়টার মধ্যে কতক চড়াই উঠে বসুধারায় পৌঁছে গেলাম। ওখানে দুটি ধারা একটি ক্ষীণ, অত্যন্ত ক্ষীণ, জল পড়ে যখন তখন একটা রেখার মত। সেটা উপরের বরফ গলার উপরই

নির্ভর করচে। রৌদ্রের তেজ থাকলে ঐ ধারা দেখা যায়। তবে বড় ধারাটি অবিশ্রান্ত ঝরচে, তাতে আমরা স্নানও করলাম। বহুদূর উঁচু থেকে পড়চে। আমরা প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত ঐখানে ঐ রম্য দৃশ্য, স্বর্গের মুক্ত বায়ুমন্ডলের মধ্যে বিচরণ করলাম, —তারপর ভোজন শেষ করে যাত্রা করলাম। তুষার সেতুর পথে, খানিক গিয়ে আমাদের সম্মুখে যে তুষার স্তর দেখা গেল ঐ পর্য্যন্তই আজিকার গতি। বালেশ্বর বললে, কাল আমরা সকালে মাতামূর্ত্তি দেখে শতোপন্থ দেখতে যাত্রা করবো। কাজেই আমরা বৈকালেই ফিরে এলাম বদরীনাথ ধামে।

পরদিন আমরা দুর্গা দুর্গা বলে আবার যাত্রা করলাম। আর প্রথমেই তিন মাইলের মাথায় মাতামূর্ত্তির পথে যেতে আরম্ভ করলাম, কিছু খাদ্যদ্রব্য বেশী বেশী নিয়ে। মাতামূর্ত্তির মন্দির কাছেই, বোধ হয় দেড় মাইল। ইনি বদরীনারায়ণের জননী। উদ্ভবজীর যে বিগ্রহটি বদরীনাথ মন্দিরে আছে সেই বিগ্রহটি মন্দির বন্ধ হবার আগে এক বিরাট উৎসবের আকারে বহু লোক এবং গান বাজনার শোভাযাত্রার সঙ্গে জন্মাষ্টমীর পরেই বামন দ্বাদশীর দিন ধুমধাম করে এখানে আনা হয় এবং পূজা ও ভোগরাগ ইত্যাদির দ্বারা তুষ্ট করা হয়।

এখানকার দৃশ্য দেখে প্রাণ আর নড়তে চায় না; —আর বান্ধবেরা আজ,— পনরা দুনা তিশ-মিল চলনা পড়েগা, এসা বৈঠনেসে কাম ন বনি। এই বদরীনারায়ণের আশেপাশে অনেকগুলি তীর্থ ঘুরে যেতে হয় বোলেই পনেরো মাইল বিশ মাইল এই রকম দূর হয়েছে। না হলে সোজা পথে সবই কাছে কাছে।

যাই হোক এখান থেকে আমরা শতোপন্থ দেখবার আশায় যাত্রা করলাম। দুর্গা বোলে যাত্রা করা অভ্যাস তাই করেছিলাম আর জগদম্বার সৃষ্টি রক্ষার রীতি এবং নীতি যেমন চলে আসচে তিনি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেননি, সেটি কড়ায় গন্ডায় সম্পূর্ণ পালন করলেন, রতিমাসা এড়ালো না। পথে মাতৃমূর্ত্তির এলাকা পেরিয়ে এসে হাঁফ ধরচে, সবার শরীর এত দুর্ব্বল, এক ফোঁটা শক্তি আর কারো শরীরে অবশিষ্ট ছিল না। এমনই অবস্থায় তুষার বৃষ্টি আর ঝড়। এটা কি জগদম্বার উচিত হয়েছিল; —হোকনা তাঁর স্থানীয় বায়ুমন্ডলের নিয়ম, দয়া করে না হয় তিনি আমাদের প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবই দেখাতেন তাতে তাঁর কি ক্ষতি হোতো? সেদিকে কিছুই করেননি,— তুষার-বৃষ্টি যেমন হবার তা ঠিকই হয়ে গেল, আমাদের এই সময়ে যেটুকু সুখ হোলো তার কথা শেষে বোলবো এখন

দুঃখের কথাটাই সার কারণ এ দুঃখ সত্য, এখানকার প্রাণের ভয়ও সত্য। বিপন্ন, প্রাণান্তকর অবস্থায়, যখন প্রাকৃত ঘটনার বিপর্য্যয় ঘটে, তখন মানুষের পক্ষে আপনার অস্তিত্ব রাখতে প্রাণ-শক্তিকে আঁকড়ে থাকা এটা যে কতটা স্বাভাবিক তা আমাদের এ যাত্রায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়ে গেল। আপনাকে রক্ষার চেষ্টা, মৃত্যু এড়াবার জন্য দৃঢ় উদ্যম, — কি ভাবে কার্য্যকরী হয়, — কেমন করে আপন নিয়মেই আপন দুর্ব্বলতাই আত্মশক্তিতে পরিণত হয় ঐ দেহ-মন বুদ্ধির ভিতরেই, তরঙ্গের মত উঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে সকল অবসাদ নৈরাশ্যের অধঃস্তর থেকে একেবারে পূর্ণ শক্তিমান অবস্থায় জাগিয়ে তোলে আমাকে, এই অদ্ভুত খেলাটিও দেখলাম।

কষ্টকর পথ, চড়াই উৎরাই বোলে কষ্টকর নয়, আগাগোড়া তুষারমন্ডিত মালভূমির উপর দিয়েই যাওয়া-আসা। চড়াই সবশুদ্ধ দেড় মাইল। ক্রমোচ্চ পথ, যেমন গিরিসঙ্কটের উপর হয় অথচ এটা গিরিসঙ্কট নয়, গিরিসঙ্কট এখান থেকে অনেক দূর উত্তরে প্রায় দেড় দিনের পথ। এক একটা স্তরের উপর উঠে আবার ঢালু পথে নামা তারপর খানিকটা একেবারেই সোজা প্রশস্ত সমতল তুষারক্ষেত্র। এইভাবে সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফিট আমরা অতিক্রমণের পর তবে ঐ হ্রদটি পেয়েছিলাম।

পথে কি বিষম কষ্ট সহ্য করেই আসতে হয়েছে বোলেছি কারণ এতটা উচ্চ ভূমিতে বাতাস যে শুধুই শীতল নয় অসাধারণ সূক্ষ্ম, এত হালকা যে শ্বাসকষ্ট বরাবর ছিল। মানা গ্রাম ছাড়িয়ে যখন আমরা বসুধারায় পৌঁছালাম, তখন সামান্যভাবেই অনুভব করেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্মীবান পেরিয়েই তার কষ্টকর প্রভাবে আমাদের সবাইকে যেন একই হাসপাতালের রোগীর অবস্থায় পেড়ে ফেলেছিল। শতোপন্থে আমরা এইভাবেই পীড়িত হয়েছিলাম, ফিরে আসবার আর উপায় ছিলনা, ফিরতে হলে লক্ষ্মীবান পর্ব্বতের আগেই ফেরবার পথ ছিল, এখন এতটা এসে আর উপায় নেই। সুতরাং পনেরো মাইলের শেষ সাত মাইলও আমাদের শেষ করতেই হোলো। এখন মনে হচ্চে যে,-আগে জানতে পারলে আমরা বোধহয় আসতাম না।

আমাদের গাইড, তিনিও কম বিপন্ন হননি, তবুও যেন আমাদের মুখ চেয়ে সব সহ্য করলেন আমাদের সাহায্যের চেষ্টাও করেছিলেন। দু তিনবার নীলকন্ঠের হাত ধরে আবার তারই কাঁধে হাত রেখে নিজেই একটু দম নিচ্ছিলেন। যাই হোক সবাই মনে করেছে, যেমন হয়ে থাকে, তার নিজের কষ্টটাই বেশী। কিন্তু নীলকন্ঠ

শেষকালে বললে, সবার চেয়ে কম কষ্ট হয়েচে যার সেই লোকটিই বীর আমাদের আজকার অভিযানে। সেই দিনেই এইভাবে পরস্পর যত রকমের দুর্ব্বলতা কাটাবার ফন্দি ফিকির আছে সবগুলিই ব্যবহার করে শেষে আমাদের গন্তব্য সেই পৌরাণিক শতোপন্থ হ্রদের নিকটস্থ হয়ে যাত্রা সার্থক করলাম।

শতোপন্থ হ্রদটি বদরীনারায়ণ থেকে কাক ওড়ার সোজা গতি হিসাবে পশ্চিমে ছয় মাইল। কিন্তু যাবার পথ অনেক ঘুরে ফিরে পাক খেয়ে গিয়েছে। প্রথমে মাতাজীর মন্দির পথে ঐ গ্রামে তো যেতেই হবে, পাশেই অলকানন্দার গতি ধরে খানিক; — তারপর পশ্চিমদিকে বাঁক সে পথে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের দিকে তারপর সোজা পশ্চিম দিকে এসে দুটি পথের সংযোগ স্থলে পৌঁছলাম, — একটি, দক্ষিণ দিকে একটি পশ্চিম দিকে। আমাদের দক্ষিণের পথ বসুধারায় নিয়ে গেল। তারপর সেখান থেকে আবার পশ্চিমের পথটা বরাবর তুষারক্ষেত্রে এক তুষার সেতুর উপর দিয়ে আমাদের লক্ষ্মীবান পর্ব্বতের কাছে নিয়ে গেল। তারপর আবার সেই স্তর দিয়ে উঠে বরাবর অলকাপুরী শৃঙ্গ দেখতে দেখতে আমরা চক্রতীর্থে এলাম। এখান থেকে সামনের পথটাই শতোপন্থ হ্রদে নিয়ে যায়। সব কটাই তুষার শৃঙ্গ। নীচে অর্থাৎ পর্ব্বতের পাদমূলেই পথ, এই পথেই বাঁ দিকে নারায়ণ পর্ব্বত শৃঙ্গটি দেখা গেল যেন তার নীচেই শতোপন্থ হ্রদটিও দেখা গেল। খানিক তুষারাবৃত ভূমি, নিচেটা বরফ জমে প্রায় সমতল হয়ে গেছে। ছোট হ্রদটি দেড় মাইল পরিধি, ত্রিকোণাকৃতি বলা যায়, কোথাও জলের চিহ্ন নেই জানিনা সে তুষার কখনও গলে কিনা এখন জুলাই আগষ্টে যখন গলেনি। মাজনাগ্রাম থেকেই হ্রদটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয় কারণ এই গ্রামই একমাত্র লোকালয় এ অঞ্চলে যেখানে জীবনের চিহ্ন আছে। ১৪৪০০ ফিটের উপর হ্রদটি। মানসসরোবর ও রাবণ হ্রদের সঙ্গে একই লেবলে অবস্থিত। এটাও একটা ভাববার কথা যে একই স্তরে এই লেকগুলি কি ভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

আমরা যখন শতোপন্থ হ্রদের তীরে পৌঁছালাম তখন বেলা আছে, কিন্তু আমাদের প্রাণ আর দেহ আশ্রয় করে আছে কিনা সন্দেহ। অবসন্ন হয়ে হ্রদের তীরে একটা ফেঁকড়িওয়ালা পত্রশূন্য গাছ, সেখানে কম্বল পেতে খানিক বসলাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে, হ্রদের সামনে তৃষ্ণায় কাতর, হ্রদভরা জল কিন্তু এ ট্যানটালাসেরই অবস্থা। বরফে ঢাকা সর্ব্বত্র, একটুও এমন স্থান নেই সেখান থেকে

জলটা খাওয়া যাবে। খানিক বরফ লাঠির খোঁচা দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মুখে পুরতে গিয়ে দেখি ময়লা, উপরে ধূলার একটা পাতলা সর পড়ে ছিল সেইজন্য এমন স্থানে এ অবস্থায়ও মুখে দিতেই পারলাম না। কিন্তু আশ্চর্য লাগলো এতটা উঁচুতে বরফের শুভ্র স্তরের উপর ধূলা কি করে এলো। তবে এটা ঠিক, উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় ঐ তুষারের উপর মোটেই ধূলা নেই, কি শুভ্র তার লাবণ্য। সূর্য্যকিরণ তার উপর পড়লে একটা জ্বালা, একটা প্রভা দেখা যায়। আমরা অনেক চেষ্টা করেও একটু জলের সন্ধান পেলাম না। দেখলাম শেষে, ঐ হ্রদের পাশেই তুষারঢাকা একটা সরু ধারা কুল কুল রবে চলেচে। নিকটেই নায়ার ছিল সে বলে আমি জল বার করবো। ঐ লাঠির তলায় লোহার খোঁচাটা দিয়ে খানিক চেষ্টা করে যখন চাঁইটা ভাঙ্গলো তখন সেই চূর্ণগুলি নীচে জলের সঙ্গে মিলে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তৃষ্ণার পূর্ত্তি দূরের কথা, এক বিন্দু জলের সঙ্গে রসনার সম্বন্ধ যোগ ঘটলো না।

কিন্তু তারপর গাইড আমাদের নিকটস্থ গ্রামখানার নির্দ্দেশও হারিয়ে ফেললে। মাথাটা সবারই গোলমাল তো হয়েই ছিল, আমার তো সেই দুই পথের সংযোগ স্থলের আগেই দিকভ্রম হয়েছিল। কোন পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কিছুই ঠিক ছিলনা। কিভাবে এখন আশ্রয়লাভের উপায় করা যায়?

আমরা যে আজ ফিরে বদরীকাশ্রমে যেতে পারবোনা এতো জানা কথা। কিন্তু থাকবো কোথা? রাত্রযাপনের মত স্থান পাবো কোথায় তাতো জানিনা। আশ্চর্য! এ কি ব্যাপার সেই রাত্রে আমরা এমন স্থানেও আশ্রয় পেলাম। সুবিধার মধ্যে খাবার কিছু সঙ্গে আমাদের ছিল, কেবল রাত্রে একটু থাকবার, আরামপ্রিয় দেহটিকে রক্ষা করবার মত স্থান পেলেই কৃতকৃতার্থ হয়ে যাই। কিন্তু কি আশ্চর্যভাবে যোগাযোগটা ঘটে গেলো, এখানকার দেবতারই কান্ড কিম্বা অন্য কিছু তাই ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমরা হ্রদটির ধারে ধারে ঘুরছিলাম। দেখছিলাম এখানে গাছপালা আছে আবার বেঁচেও আছে। গাছের কান্ড মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মত নানা রঙ্গের ডুমো ডুমো সারি সারি উপর থেকে গুঁড়ির উপর অবধি নেমেচে খানিক তফাতে বরফ জমে আছে, কোথাও খালা, কোথাও ঢিপি আবার কোথাও অনেকটাই সমতল ক্ষেত্র। এখন দেখলাম ধীরে ধীরে আলো কমে আসচে, আমরা কোন দিকে যাবো কোথায় গেলে আশ্রয় পাবো কিছুই জানিনা। কেমন এক বিভ্রান্ত মনোধর্মে ঘুরতে লেগেছি তিনজনে সবাই। এখন নায়ারই প্রথমে লক্ষ্য করলে

বললে, শোনো শোনো!

কি শুনলাম আমরা? অতি মৃদু শাঁকের আওয়াজ। পল্লীগ্রামের মাঠের উপর পথে যেতে যেতে সন্ধ্যায় দূরের গ্রাম থেকে যেমন শাঁকের ধ্বনি শুনা যায় ঠিক সেই শঙ্খধ্বনি; শুনেই কোন্‌দিক থেকে আসচে, সেটা ঠিক করে নিতে বেশীক্ষণ লাগলো না, সেটা উত্তর-পূর্ব্ব কোণেই মনে হোলো। আমরা সেই শাঁকের ডাক লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম ঐদিকে। যেদিকে যাচ্চি সামনেই আমরা লক্ষ্য করলাম খালি চড়াই সে চড়াই কঠিন নয়, আর তার পিছনের পর্ব্বত যেখানে আরোহণ শেষ হয়েছে সেটাও খুব বেশী উঁচু নয় যদিও তার মাথার উপর বরফের ধবল লেপন, সেই শিখরের অনেকটাই বিস্তৃতির মধ্যে দেখা যাচ্চে। দুবার ইতিমধ্যে শঙ্খধ্বনি শুনেছিলাম, যখন আমরা পাহাড়ের তলায় প্রথম স্তূপের উপর উঠেছি তখন তৃতীয় ধ্বনি শুনলাম আর এই ধ্বনিই শেষ। আমরা স্তূপের পর স্তূপ অতিক্রম করে যখন স্কন্ধদেশে উঠেছি তখন সন্ধ্যার আঁধার আগতপ্রায় যদিও এখনও পথের সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল। ধ্বনি আর হোলো না আমরা সেই স্কন্ধদেশের উপর দাঁড়ালাম একটা বাঁকের মুখে। বাঁকটা ঘুরেই দেখা যাক না কেন এই মনে করেই আমরা বাঁ দিকে ঘুরে চললাম, সারি সারি তিন চারটি গুহাদ্বার দেখলাম, একটা গুহা প্রবেশ পথ থেকে আর একটা গুহার প্রবেশপথের স্বাভাবিক দূরত্ব সাত আট হাত হবে।

এই গুহার একটিতে এক উলঙ্গ মূর্ত্তি দাঁড়িয়েছিলেন। দেখলাম তাঁর হাতে শঙ্খ একটি। আমরা তিনটি মূর্তি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, — ইয়ে গুফামে রাতকো রহ যাও, বাহার মে কেঁও মরোগে। তারপর তাঁর ডান হাতের কয়টি আঙ্গুল মুখে তুলে, খাওয়ার কথা বুঝাতে যেমন সঙ্কেত করে, বললেন, ভোজনকা প্রবন্ধ কুছ হৈ, সাথ মে? বালকিষাণ এগিয়ে গিয়ে বললে, জি হাঁ, স্বামী, কুছ খানা সাথহি হৈ, হামলোক লায়াথা। বহুত আচ্ছা, — ব্যস, তব যাও ভিতর ইহাঁ রহে যাও। বোলে তিনি আর একটা গুহার দিকে গেলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরাও নির্দ্দিষ্ট গুহায় প্রবেশ করলাম। তিনটি প্রাণী আমরা,— কেউ রাত্রের কথা ভাবেনি। এখানে সবাই আনন্দে কলরব করে উঠলো যখন আমার গরম জামার পকেট থেকে বাতি ও দিয়াশলাই বার করে আলো জ্বাললাম। এটা যে আমায় আজ ব্যবহার করতে হবে তা ভাবিনি, — পকেটেই যেমন থাকে আজও

ছিল এবং এই সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজে লেগে গেল। এখন সেই আলোতে আমরা ভিতরটা উজ্জ্বল দেখতে পেলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রশস্তও কম নয়, আট দশ হাত লম্বা ও ছ'হাত আন্দাজ হবে চওড়া।

প্রথমে আমরা মহানন্দে, কাল রাত্রের প্রস্তুত পূরী হালুয়া, আচার এই সব উপযোগ করলাম। এখন জল কোথা? বালকিষাণ, বাইরে গেল। সেই অপর গুহায় প্রবিষ্ট সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিশাল এক তুম্বাপূর্ণ জল নিয়ে এলো। কি মিষ্ট জল, যেন গলিত শর্করা পান করলাম আমরা; — তারপর গুহাদ্বার বন্ধ করে পদ্মনাভ স্মরণ করে শয়ন করলাম।

শয়নের পূর্ব্বে আমরা খানিক আজ এই আশ্রয় লাভের কথা আলোচনা করেছিলাম। আমরা বিপন্ন,আশ্রয়প্রার্থী, পথহারা এ কথা এই গুহাবাসী সাধুরা জানতে পেরেই শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। এ বিষয় সবাই একমত। তারপর এই গুহাবাসীরা সাধারণ মানুষ আমাদের মত নয়, এঁরা অসাধারণ, — এ সম্বন্ধেও কারো দ্বিমত নেই। তারপর যে দু-চার কথা মুখে আসবার পূর্ব্বেই আলোচনা হোলো এদের, সে কথায় আর কাজ নেই। এখন দুর্গা দুর্গা বোলে আমি শয়ন করলাম।

পরদিন প্রভাতে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন প্রথমেই অনুভব করলাম আমরা সুরলোকে। যথাকালে যখন আমরা যাত্রা করলাম তখন কিন্তু আর কারো দেখা পেলেম না ঐ গুহাতে।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গোণাতাল

ক'দিন আগে হেমকুন্ডের পথে পরিচয় হয়েছে বনবিভাগের একজন অফিসারের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন একই সঙ্গে। ভালোই হয়েছে। এ-সব অঞ্চলে তাঁরাই রাজা। প্রবল প্রতিপত্তি। হবার কথাও। সঙ্গে দুজন চাপরাসী আছে। পুলের কাছে এ অঞ্চলের রেঞ্জারবাবুও এসেছেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। যে ক' দিন তাঁর এলাকায় অফিসর থাকবেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, চলবেনও।

অফিসারটির পদমর্যাদা আছে। তাই, সে গৌরবের ভারে ভারাক্রান্ত হবার কথা। কিন্তু, আগেই পরিচয় পেয়েছি তা তিনি নন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে চলতে সম্মত হয়েছি। তাতে আমাদের সুবিধাও হয়েছে। এ পথে লোক-চলাচল নেই, পথের নিশানাও নেই। মাঝখানে এক জায়গায় একটা গ্রাম আছে। তাও শোনা কথা। কেননা, সে গ্রাম পাহাড়ের উপরে, পথ থেকে দূরে। তাই, চোখে পড়ে না। গ্রামবাসীদেরও পথে যাতায়াত করার প্রয়োজন হয় না।

বিজন পথে একাকী পথ চলায় আমার ভয় নেই। গহন বনের মধ্যেও নয়। কেন জানি না, নিবিড় নির্জন অরণ্যে আলোছায়ায় আবছায়া পথে পথে ঘুরেছি, তবু মনে ছম্‌ছমে ভাব আসে নি। অপার আনন্দই পেয়েছি। বিরাট বনস্পতির শান্ত-ছায়ায় শ্রান্ত কায়া আশ্রয়পেয়েছে, তরুলতার শ্যামল শোভা নয়নে স্নিগ্ধতা এনেছে। বনের পশুর হিংসার কথা মনে জাগে নি! কেননা, এত ঘুরেও তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার ভাগ্য ক্বচিৎ-ই হয়েছে।

কিন্তু এখানে পথের নির্দেশ না থাকায় পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। এঁরা থাকায় সে-অভাব মিটেছে।

অফিসারটি নতুন। নতুন এসেছেনও এ-পথে।

লম্বা, দোহারা চেহারা। সাহেবী পোশাকে আরও লম্বা মনে হয়। ফরসা রঙ। বয়স অল্প।

নাম অমরনাথ।

বলে, গতবছর চাকরিতে যোগ দিয়েছে। প্রথমেই গাড়োয়ালে পাঠিয়েছে।

ভালোই হয়েছে। হিমালয় আমার ভালো লাগে।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে গাড়োয়ালী নয়!

আমার কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে বোঝে। নিজেই বলে, পাহাড়ে আমার বাড়ি নয়, তবে পাহাড়-ই আমার এখন ঘরবাড়ি? বনে জঙ্গলে ঘোরাই হল আমার কাজ। দেশ মথুরায়। পড়াশুনা করেছি আগ্রায়। এম. এস্‌সি. পাস করে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিলাম, পাসও করলাম। গভর্ণমেন্ট থেকে জানতে চাইল, পুলিসে বা বন-বিভাগে কোথায় যোগ দিতে চাও? জানতাম, পুলিসের চাকরিতে পয়সা বেশী, প্রতিপত্তিও প্রচুর। তবুও বন-বিভাগই বেছে নিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম কেন? এখানে তো বনে জঙ্গলে বাস? সমাজ-সভ্যতা-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন তো এ-জীবন?

শান্ত-স্বরে জবাব দেয়, তারি মধ্যে তো অপার আনন্দ! প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়-এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর কোন্ চাকরিতে আছে বলুন?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। চারিদিকে সুস্নিগ্ধ-দৃষ্টির প্রলেপ বুলিয়ে নেয়। উচ্ছল নদীর চঞ্চল জলধারায়, উজ্জ্বল আকাশের নিবিড় নীলিমায়, গহন বনের ঘন-শ্যামলীমায় মগ্ন হয়। 'চক্ষুভিরিব পিবন্তি' — সত্যই চোখ দিয়ে প্রকৃতির মনোলোভা শোভা যেন আকণ্ঠ পান করে নিতে চায়।

তারপর বলে, বদরীনারায়ণের পথে চাকরির প্রথমেই এসেছিলাম। কিন্তু, বিরহী-তালের পথে আসা হয় নি। এখন ইন্‌স্‌পেক্‌শনে চলেছি। হ্রদের ধারে ধারে বোট-হাউসটি এবার বর্ষায় প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। জিনিসপত্রও কিছু নষ্ট হয়েছে। সেই সব দেখতে যাওয়াই উদ্দেশ্য। পথটাও দেখে রিপোর্ট দিতে হবে। যে-পথে চলেছি আমরা, সেটা এবছরই প্রথম তৈরি হয়েছে। নইলে, পথ বলতে কিছু ছিলই না। এবছর এক মিনিস্টারের আসার কথা ছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা তৈরি হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আসা হল না-আপনারাই ভোগ করে গেলেন।

পথ তৈরির পরিচয় পথ-চলার মাঝে পাচ্ছি বটে। আবার অনেক সময় দেখছি, পথ নেই-ও। সে-সব স্থানে পাহাড় ধসে গেছে, পথও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানে, যদি সম্ভব হয়, নদীর মধ্যে নেমে জলের পাশে ছড়ানো পাথরগুলির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। যেখানে আবার নদীর দুরন্ত স্রোতের মধ্যে পাহাড়ের ধস্ খাড়া নেমে গেছে, নীচে নামা সম্ভব নয়, সেখানে পাহাড়ের কিছু

উপরে উঠে সে-সব স্থান কোনরকমে অতিক্রম করছি।

অমরনাথ বলে, পাহাড়ে প্রথম বছরের নতুন পথই সবচেয়ে বেশী ভাঙে। যেমন মানুষ প্রথম হাঁটতে শিখে বেশী পড়ে। এর বৈজ্ঞানিক কারণটিও সহজ। ভূতাত্ত্বিকের মতে হিমালয় এত বিরাট হলেও, সৃষ্টির জগতে ছেলেমানুষ। এখনও সম্পূর্ণ গড়ে ও ঠেনি। এ-সব পাহাড়ের পাথর ও মাটি সব জায়গায় শক্ত হয়ে দানা পাকায় নি। নতুন পথ তৈরির ফলে পাহাড়ের ভারসাম্যের হেরফের হয়, হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিরিরাজ ধস্ নামিয়ে দেন, পথরেখাও নিশ্চিহ্ন হয়। অথচ, এই পথ তৈরি করতে কম কাঠ-খড় আমাদের পোড়াতে হয়েছে? খরচ তো আছেই। তার কথা বলছি না। কিন্তু, গভর্ণমেন্টের কোন্ বিভাগ থেকে সেই খরচা হবে তারই সমাধান হতে ক'বছর কেটে গেল।

তারপর আশেপাশের জঙ্গলগুলি দেখিয়ে বলে, সাধারণের ধারণা চারিদিকের সব জঙ্গলই বন-বিভাগের অধীনে। কিন্তু আশ্চর্য হবেন শুনে যে, এর মধ্যে বড় বড় জঙ্গলই বন-বিভাগের অধীনে নয়।

প্রশ্ন করি,বন বন-বিভাগের নয়, সে কী ব্যাপার?

অমরনাথ দুঃখ করে বলে, কিন্তু তাই তো চলে আসছে! কবে কোন্ কারণে ইংরাজ-আমলে বড় বড় বনগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য-বিভাগের অধীনে রাখা হয়েছিল। এখন সেভাবে রাখার কোনও কারণই নেই, তবুও সেই ভাবেই চলেছে। অনেক লেখালেখির পর এবার শুধু এই পথটুকু তৈরি করবার ভার বন-বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। মিনিস্টারের আসার সম্ভাবনায় তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়েছিল। এখন সব বন্ধ।

হঠাৎ সোৎসাহে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ভালো কথা। মাছ খান তো?

এই আকস্মিক অবান্তর প্রশ্নে আশ্চর্য হই।

বলি, হঠাৎ এ-কৌতূহলের কারণ কি? কথা হচ্ছিল তো পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, পথ-তৈরির ব্যাপার নিয়ে। মাছ এল কোথা থেকে?

হেসে উত্তর দেয় বাঃ চলেছেন গোণা-লেকে, আর ও — প্রশ্ন করব না? যারা ওখানে যায়, তারা সবাই তো মাছ ধরতে ও মাছ খেতেই যায়। ওখানকার ঐ তো মস্ত স্পোর্ট। তারই জন্যে ও — লেকের প্রসিদ্ধিও।

বললাম, তুমি খাও তো? খুব ধোরো খেয়ো।

সে বলে, মাছ আমিও খাই না। শুনেছি সাহেবরা ওখানে ট্রাউট-মাছ ফেলেছিল। এখনও মাঝে মাঝে ফেলা হয়। বিলেতী মাছ, একটামাত্র কাঁটা, খেতে সুস্বাদু। টাটকা, চলন্ত জলে ওরা নাকি থাকে ভালো।

হেসে বললাম, ভালো মানে মৎস্যাশীর লোলুপ দৃষ্টিতে থাকে ভালো। যেমন, কচি ঘাস খাইয়ে অতি-যত্নে পোষা কল্য-ভক্ষ্য ছাগ-শিশু।

মনে পড়ল, কয়বছর আগে পাঞ্জাবে কুলু-ভ্যালিতে ট্রাউট-মাছের চাষ দেখেছিলাম। বিয়াস্-নদীর অর্থাৎ বিপাশার উপত্যকা। ঘননীল জল। স্ফটিকস্বচ্ছ। তরঙ্গোচ্ছল। পাথরে আঘাত পেয়ে জলস্রোত সাদা-সাদা ঢেউ-এর পাল তুলে চলেছে। কোথাও বা নদীর স্রোত বহু ধারায় বিভক্ত হয়েছে, ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। নদীর ধারেই পাইন ও চীর্ গাছের বন। জলের একটা ধারাকে সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই ধারার পথে মাঝে মাঝে বাঁধানো চৌবাচ্চা। সেখানে জল জমে আবার বয়েও যায়। সে-সব জলাধারের দুই মুখে ছোট ছোট দুয়ার। প্রয়োজন মত সেগুলি খোলা বা বন্ধ করা যায়, জলের গতিবেগ সংযত করা হয়। তারি মধ্যে বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন আকারের মাছ। কোন্‌টিতে কত বছর বয়সের মাছ আছে, পাশেই সাইন-বোর্ডে লেখা।

শিখ-অফিসারটি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন, সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

মাছ বিক্রিও হয়। আমার সঙ্গীরা কিনতে উৎসুক হলেন।

সবচেয়ে বড় মাছগুলি যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে অফিসরটি বললেন, হাত দিয়ে আপনারা নিজেরাই ধরতে পারেন, কোন ভয় নেই।

যতীনবাবু মৎস্যাশী। তবুও মাছ ধরার উৎসাহ বা ধৈর্য তাঁর কোনকালে নেই। মাছ-ধরার এমন সহজ সুযোগ পেয়ে চৌবাচ্চার পাশে থপ্ করে বসে পড়ে তিনি জলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটি বিশেষ মাছের উপরই তাঁর লোলুপ দৃষ্টি। অনেক করে সেটি ধরলেনও। হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরেছেন। ধরেই আমাদের দিকে উৎফুল্ল নয়নে তাকালেন। মুখে বিজয়ী বীরের জয়োল্লাস। কিন্তু, নিমেষে মাছটা হাত থেকে সড়াৎ করে পিছ্‌লিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। 'এই পালালো'-বলে যতীনবাবু চিৎকার করে উঠলেন।

শিখ ভদ্রলোকটি কিন্তু দেখলাম খুব খুশী। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

বললেন, ভালোই হয়েছে। অপর আর একটি ধরুন। আপনার উৎসাহ দেখে বাধা দিতে পারছিলাম না-ওটি মৎস্য-নারী, ওগুলি ধরার এখানে নিয়ম নেই। অত মাছের মধ্যে ঠিক ঐটিই আপনি বেছে ধরেছিলেন।

সবাই আমরা হেসে উঠি। যতীনবাবুও। বলেন, আমার ভাগ্যই এইরকম!

সেই দেখেছিলাম ট্রাউট-চাষ।

কিন্তু, গাড়োয়ালে-উত্তরাখন্ডে-এ চাষ হল কি করে? এ যেন মন্দিরে মৎস্য-ভোগ!

মায়ের মন্দিরে মায়ের অনুচরদের জন্যে, হয়তো নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এ তো শিব-স্থান!

এর কারণও আছে। বিরহী-তাল প্রাকৃতিক হ্রদ নয়। আবার মানুষের সৃষ্টিও নয়। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার মধ্যে এর জন্ম-কাহিনী।

বিরহী-গঙ্গার পৌরাণিক প্রাচীনত্ব আছে। সতীর দেহাবসানের পর বিয়োগ-বিধুর শঙ্কর এই তরঙ্গিণীর তটে বসে নিদারুণ তপশ্চর্যা করেন। সেই তপস্যার তপোফলে দেবী চন্ডিকা পার্ব্বতীরূপে আবার অবতীর্ণা হন-এই পুরাণকাহিনী। বিশ্বের ঈশ্বর তিনিও বিরহ-কাতর। সেহ বিরহী শিবের বিগলিত অশ্রুর পূতধারার সূত্র ধরেই নদীর নামকরণ হল বিরহী-গঙ্গা। পরমপাবনী নদী। 'ব্রীহিকা নাম বিখ্যাতা'।

শুনেছি এ-অঞ্চলে কোথাও বিরহীশ্বর শিবের মন্দিরও আছে।

কিন্তু বিরহী-হ্রদের সে ঐতিহ্যময় গরিমা নেই, পুণ্যের মাহাত্ম্যও নেই। তবে প্রসিদ্ধির ভৌগোলিক কারণ আছে।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এক গভীর রাত্রে হঠাৎ গোণা-গ্রামের নিকটে এক বিরাট পাহাড়ের অর্ধাংশ ভেঙে পড়ে। সেই ধসে-পড়া পাহাড়ের বিপুল স্তূপে নদীর গতিপথ সম্পূর্ণ রোধ করে ফেলে। ফলে, নদীর জল ক্রমে জমতে থাকে এবং একটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। মাসের পর মাস নদীর জল সেখানে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে জমতে লাগল, অথচ সে জল নিকাশের কোন পথ নেই। কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, জল নিকাশের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। অবশেষে, এগারো মাস পরে সেই ক্রম-প্রসারমাণ বিপুল বারিরাশি আত্মশক্তির প্রভাবে নিজেই এ সমস্যার সমাধান করে নিল, — প্রচন্ড বেগে সেই ভগ্নস্তূপের বাঁধ ভেঙে এক

ক্ষুরধারা নদী নেমে এল। সংহারিণী তার মূর্তি। সর্বপ্লাবিনী তার শক্তি। দেবী চন্ডিকা বুঝি আবার কলিযুগে প্রচন্ড নদী-রূপেই নেমে এলেন!

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'

প্রবল বন্যায় চারিদিক ভেসে গেল। অলকানন্দাও সে-জলভারে স্ফীত হল। গাড়োয়াল —রাজধানী শ্রীনগরের শ্রী লুপ্ত হল.নগর ধ্বংস পেল। হরিদ্বারের দ্বারদেশেও সে-বন্যার নির্দয়, ক্রুদ্ধ আস্ফালন আঘাত হেনেছিল। এখনও সে সব দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী লোকমুখে শোনা যায়।

ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করে নদী শান্ত হল। অবরুদ্ধ নদী মুক্তিপথের সন্ধান ফিরে পেল।

তাই আজ দেখি তার উচ্ছল জলধারার সহজ সুন্দর গতিবেগ। নৃত্যভঙ্গে ছুটে চলেছে।

হ্রদের জল কিন্তু কমে গেলেও থেকে গেল।

হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে পাহাড়-ঘেরা হ্রদ, সাহেব কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সুইজারল্যান্ডের স্বপ্ন-বিলাসী সৌন্দর্য-পিয়াসী মন নিয়ে পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে চলে এলেন এখানে। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। আনন্দ-ভোগের লিপ্সা জাগল। জলে মাছ ভাসল, নৌকা চলল, তীরে বোট-হাউস তৈরি হল।

স্বাধীনতার পর এখন সাহেবরা বিরল। তবুও যে-ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যেই জনকয়েকের এখনও গোণা-লেকে আনাগোনা। আর যান সরকারী কর্তৃপক্ষের কয়েকজন মাত্র।

কিন্তু, সে-মাছ ধরার মৎস্যগন্ধী গল্প ভাল লাগে না।

হিমালয়ের বিরাট সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে মন চায়।

অমরনাথের হালকা শরীর। যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে সে চলে। অত দ্রুত চলা আমার স্বভাব নয়। তাকে বলি, তুমি এগিয়ে চলো। আমি ধীরে ধীরে যাব। ভয় নেই, পথ ভুলব না; পিছনে তো তোমার চাপরাসীরা আসছে।

সে এগিয়ে চলে তার রেঞ্জারের সঙ্গে কথা কইতে-কইতে। পথের দু-পাশের গাছের পাতা দেখে, ফুল দেখে, টেনে ছেঁড়ে, গন্ধ নেয়-গাছের নাম বলে দেয়। রেঞ্জারকে কখনও বা প্রশ্ন করে, তোমাদের ভাষায় একে কি বলে?

আমার দিকে ফিরে বলে, এদেরও একবছর এসব বিষয়ে পড়তে হয়েছে, ট্রেনিং নিতে হয়েছে।

গাছ, ফুল, পাতা-বন জঙ্গল-সবাই যেন জানতে পারে এসেছে তাদের বন-কর্তা। তাদের জন্মপরিচয়,নাড়ী-নক্ষত্র তাদের নখ-দর্পণে।

আমার মন, কিন্তু আন্‌মনা।

আমি পেছিয়ে পড়ি। ইচ্ছা করেই, — আরও। একা চলায় আনন্দ অনেক। একা তো নয়, — নিজেকেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া, চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, আবার নিজের মনমুকুরে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখা। এ যেন একান্ত অন্তরঙ্গের সঙ্গে এক অভিনব লুকোচুরি-খেলা।

বন-পথ। বিশাল সব বনস্পতি। তারি ফাঁকে ফাঁকে পথের ধারে নদীর নীল ধারা চোখে পড়ে। উপরে সবুজ পাতার জালি-পথেও দেখা যায় ফালি ফালি নীল আকাশ। গায়ে লাগে হেমন্তের প্রশান্ত বাতাস। সকালের রোদে চারিদিক ঝলমল্ করে। বর্ষার পরে প্রকৃতির শুচি স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা। যেন স্নান সেরে পুষ্পপাত্র হাতে জননী বসুন্ধরা স্মিত বদনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

বাড়িতে দুর্গাপূজা। মা নিজের হাতে সব ভোগ রাঁধেন। আর কেউ রাঁধলে চলবে না। বলেন, সাহায্য করতে হয়, তরি-তরকারি এগিয়ে দাও। ঐ পর্যন্ত।

ভোরে স্নান সেরে গরদের শাড়ি পরে রান্নাঘরে ঢোকেন।

মাথায় চূড়া করে চুল বাঁধা, খুলে গেলে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পড়ে। মুখের রক্তিম আভা আগুনের তাপে আরও রাঙা হয়ে ওঠে। উনুন তো একটা নয় সারি সারি কয়টা জ্বলছে, সব-কটিতেই রান্না চড়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার মা তো নন — জগজ্জননী দশভূজা। হাতে দশ-প্রহরণ নয়, রন্ধনের দশ প্রকরণ। আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা যেন দশ-হাতে রন্ধন করছেন।

একটু দূরেই পূজামন্ডপ। নিজেই ভোগ বয়ে নিয়ে যান। প্রকান্ড সব থালা। ভারে দেহ নত হয়েছে। মাথায় ঘোমটা। বাড়ির অন্দরমহল, তবুও লজ্জা। বলেন, পুরুতঠাকুর রয়েছেন যে!

নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁট চেপে ফুঁ দেন। হাওয়ায় ঘোমটার কাপড় অল্প ফাঁক হয়। তারি মধ্যে দিয়ে আড়চোখে দেখে পা ফেলে চলেন।

আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখি। শুচি-স্নিগ্ধ মায়ের রূপ। রূপের ছটা যেন ঠিকরে পড়ে। ভাইবোনে বলাবলি করি, দেখছ; — মায়ের মুখখানি ঠিক প্রতিমার মুখ বসানো — এক্কেবারে।

কথা শুনে মা রাঙা-মুখে চোখ রাঙান। ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধমধুর হাসি,-বলেন, ছিঃ! বলতে আছে! জ্বালাসনে কাজের সময়। ছুঁবি না'কি। ছেলেবেলার সে-ছবি ভোলবার নয়। আজ প্রকৃতির রূপের মাঝে সেই ছবিরই প্রতিচ্ছবি দেখি। চারিদিক সুরভিত সুন্দর।

অনাবিল আনন্দে মন ভোরে ওঠে।

পথ চলেছি। ধীরে ধীরে। চলার কষ্ট নেই। পথ-শ্রান্তিও নেই। কেননা, দুরারোহ চড়াই-এর অকস্মাৎ সাক্ষাৎ-ও নেই।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে-আসা ঝরনাধারা পথের স্বচ্ছন্দ গতি অবরোধ করে। পুল নেই। ছোট-বড় ঝরনা। ছোট ধারাগুলি পার হওয়ার অসুবিধা নেই। জলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত পাথর। সেই সব পাথর ঘিরে জলের ধারা ছুটেছে। মাথা-উঁচু-করা পাথরগুলির উপর পা রেখে ডিঙিয়ে জল পার হই।

বড় ধারাগুলিরও জলের ভিতর নানান আকারের পাথর। কিন্তু, পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে যাওয়া সব জায়গায় সম্ভব নয়। কোথাও বা সম্ভব হলেও সাহস ও শক্তির প্রয়োজন। সাবধানী মন কখনও বা সে —আত্মবিশ্বাসের অন্তরায় হয়। মনে ভাবি, অযথা সাহস প্রকাশের প্রয়োজন কি?

পায়ের জুতা মোজা খুলে ফেলি।

সঙ্গের পাহাড়ীরা বলে, কাঁধে উঠে পড়ুন, পার করে নিয়ে যাই।

হেসে বলি, কাঁধে চাপবার সময় যখন হবে নিশ্চয় উঠব। কিন্তু এ সময়ে নয়।

তারপর বলি, তোমারও হেঁটেই পার হবে, তবে আমি-ই বা যাব না কেন?

সাবধান করে দেয়। বলে, তবে দাঁড়ান। চট্ করে জলে নামবেন না। জলের মধ্যে বড় বড় পাথরগুলির কাছে কতখানি জল জানা নেই। কোমর-জলও কোথাও হতে পারে। ওপর থেকে দেখে বোঝবার জো নেই। আগে আমরা পার হয়ে দেখি কোন্‌খানে জল কম।

হাঁটুর উপর পায়জামার কাপড় তুলে একজন লাঠি-হাতে জলে নেমে পড়ে।

ঘুরে-ফিরে দেখে বলে দেয় কোথা দিয়ে পার হব।

তারপর, আবার সতর্কবাণী। দাঁড়ান জলের বড় টান। হাত ধরে চলুন।

সেইমত যাই-ও। পায়ের তলায় জলের ভিতর কোথাও বা পিছল পাথর, কোথাও বা পাথরে রুদ্ধগতি **নদীর প্রবল** প্রবাহ। হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে সহজেই পার হই। পাহাড়ী কর্কশ কঠিন **মুষ্ঠি। বন্ধুর** পথে প্রকৃত বন্ধুর স্পর্শানুভূতির তৃপ্তি আনে।

ছয় মাইল পথ চলে এসেছি। মাত্র তিন মাইল আর বাকি। বেলা এগারোটা বেজেছে।

অমরনাথ বলে, সামনে ঐ একটা নদী দেখছি, বিরহী-নদীতে এসে মিশেছে। ওরই কাছে বসে কিছু খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। তারপর একটু বিশ্রাম করে অবার চলা।

সঙ্গী শিশিরবাবু বলেন, বিশ্রামে প্রয়োজন কি? মোটেই শ্রান্ত হই নি। ছ'মাইল পথ দু'ঘন্টায় চলে এসেছি —বাকি তিন মাইলও এক ঘন্টায় যাব। একেবারে যাত্রাপথ সাঙ্গ করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

অমরনাথ হেসে বলে, অঙ্কর খাতার পাতায় হাতের হিসাবে ওটা মেলে বটে, হিমালয়ের পাহাড়-পথে পায়ে ও-আঁক মেলে না। শুনেছি সামনে কয়েক জায়গায় এখনও পথ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কয়েক জায়গায় পাহাড়ও ভেঙেছে। এটুকু পার হতে সময় নেবে, একটু ক্লান্তিও হবে। তাই এঞ্জিনে কিছু জলকয়লা ভরে নেওয়া ভালো। আমি অবশ্য একটানা চলতে প্রস্তুত — চলার অভ্যাসও আছে।

কারণ শুনে অকারণ ক্লেশভোগে সকলেই নারাজ হই। নদীর ধারে বিশ্রামের আশ্রয় খুঁজি।

বিস্তীর্ণ বালি-ভরা নদী। স্বর্ণকান্তি বালুকারাশির উপর জলধারার সুনীল জাল বোনা। বড় ধারাটির হাত দুই-তিন উপরে দুখানা পাইনগাছের গুঁড়ি পুলের আকার ধরে শুয়ে আছে। তার উপর দিয়ে সাবধানে পার হলাম। পড়ার আশঙ্কা কম, ভয়ও করে না,-কেননা, পড়লে জামা-কাপড়ই ভিজবে, তার বেশী কিছু নয়।

জলের ধারে বালির উপর নানান্ আকারের পাথর। কালো বড় বড় পাথরগুলি দূর দেখে মনে হয় যেন অনেকগুলি প্রকান্ড কচ্ছপ নিশ্চল হয়ে রোদ

পোয়াচ্ছে।

দুটি সমতল পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে আরামে বিশ্রাম করি। পাথরের পাশেই জলের ধারা।

কল্‌কল্‌ স্বরে বয়ে চলেছে। স্ফটিক-স্বচ্ছ জল। জলের ভিতর সোনালী বালি চিক্‌চিক্‌ করে। ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে! এদিক থেকে ওদিকে যায়, আবার চকিতে এদিকে ঘুরে আসে। নদীর দুই তীরেই পাহাড়ের ঢালু গা। ধীরে ধীরে বহু উপরে উঠে গেছে! দুই দিকেই গভীর বন। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের মাঝে শ্যামলতার স্নিগ্ধ শোভা।

অমরনাথ তরুণ। পরিশ্রমের শ্রান্তি জানে না। বিশ্রামের শান্তি মানে না।

এরি মধ্যে গাছের কয়েকটি বড় পাতা সংগ্রহ করেছে।

হেসে বলি, ওগুলি হবে কি? বটানির স্পেসিমেন নাকি?

সে-ও হেসে উত্তর দেয়, সায়েন্স-সৎকার নয়, অতিথি সৎকারের আয়োজন হচ্ছে।

শিশিরবাবু নদীর জলে পাতাগুলি ধুয়ে নেন। পাথরের উপর বিছিয়ে দেন। অমরনাথের চাপরাসী খাবার-ভরা টিফিন-কেরিয়ার আনে।

অমরনাথ বলে, পাহাড়- পর্ব্বত বন-জঙ্গল আমার ঘর-বাড়ী। তাই এখানে আপনারা আমার অতিথি। আমার অকিঞ্চন আয়োজনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করছি।

আলুর সব্জি, রুটি ও মুগের ডালের নাড়ু। অমৃতভোগের আস্বাদন পাওয়া যায়।

আহারান্তে ক্ষণিক বিশ্রাম। নদীর ধারেই গাছের নীচে সামান্য একটু ছায়া। সেই ছায়ার স্নিগ্ধ প্রলেপ মেখে শ্রান্ত দেহখানি একটি পাথরের উপর এলিয়ে দিই। চোখে আলস্যের আবেশ আসে। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু জলধারার একটানা ছল্‌ছল্‌ শব্দ। সত্যই যেন 'রৌদ্রময়ী রাত্রি'।

মৃদু মধুর সুরধ্বনি তোলে জলতরঙ্গ।

প্রশান্ত প্রকৃতি মনে শান্তির পরিতৃপ্তি আনে।

কিন্তু পথের আহ্বান পথিক-চিত্তকে সজাগ করে তোলে। আবার পথচলা শুরু হয়।

মাঝে মাঝে জঙ্গল। মানুষ-উঁচু ঘাস, ছোট ছোট গাছ। লাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে চলেছি। কখনও বা উন্মুক্ত বনপ্রান্তর। তারি বুকে আঁকাবাঁকা পথরেখা।

হঠাৎ একজায়গায় পথ-চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। পাহাড়ের মাথার উপর থেকে নেমে আসা প্রকান্ড একটা ধস পথের ক্ষীণ রেখাও গ্রাস করেছে। খাড়া পাহাড়ের গা সোজা নদীর কূলে নেমে গেছে। অগ্রসর হবার উপায় নেই। পঁচিশ-ত্রিশ হাত নীচে নদীর ধারে নামতে পারলে জলের ধারে ধারে বালি ও পাথরের উপর দিয়ে চলা যাবে বটে, কিন্তু নামা তো এখানে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

রেঞ্জারবাবু বলেন, ভুলই হয়েছে। আর একটু আগে পথ ছেড়ে নদীর বুকে নামা উচিত ছিল,নামবার মত পথও ছিল। সেইদিকে ফিরে যাওয়া যাক্।

অমরনাথ চাপরাসী ও কুলিদের বলে, আবার ফেরা কেন? —দেখা না, এইখানেই কোথাও নামা সম্ভব কিনা।

আমরা অপেক্ষা করি। তারা গাছের ডালপাতার অন্তরালে অদৃশ্য হয়। কিছু পরে ফিরে এসে জানায়, নাঃ, নামার পথ নেই। সোজা পাহাড় ধসে গেছে-একেবারে গাছপালা সমেত। অবশ্য আমরা পাহাড়ী আদমীরা — কোন রকমে নেমে যেতে পারি, কিন্তু আপনারা পারবেন না।

পাহাড়ীরা যখন পথ খুঁজতে ব্যস্ত, তখন অমরনাথের সঙ্গে প্রায় ব্যবস্থাই করেছিলাম যে ফিরে গিয়ে সোজা পথে নদীতে নামা যাবে।

এখন, অক্ষমতার কটাক্ষপাতে তার আত্মসম্মান আহত হয়।

বলে, চলো দেখি-আমিও পারব, -- এখানেই নামব।

আমি সাবধান করি, দরকার কি অযথা দুঃসাহস-প্রকাশে? চলো ঘুরেই যাওয়া যাক।

সে তখনি গম্ভীরভাবে আমাদের জানায়, আপনারা দাঁড়ান এখানে, আমি দেখছি। পাহাড়ীদের ধারণা আমরা বুঝি ভীরু।

তারপর, গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়। আমরা অপেক্ষা করি।

কিছু পরেই দূর থেকে ডাক শুনি, চলে আসুন-সাবধান,কুলীদের হাত ধরে।

এলামও তাই। তাদের হাত ধরে, ভেঙে-পড়া গাছের ডালের উপর পা রেখে, আর একটা গাছের ডালে ঝুলে। কোথাও বা বসে বসে।

কেন জানি না, তবুও ভয় করে নি-উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ পেয়েছিলাম। গাছের ডালের স্পর্শ তো নয়, যেন মনে হয় ধরিত্রীমাতার হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে নেমে এলাম।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, জন্মগত স্বভাব ভোলবার নয়!

সম্মুখে নদীর ওপারে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে অমরনাথ বলে, ঐ পাহাড়টিরই অর্ধেক অংশ ভেঙে গিয়েছিল দেখা যাচ্ছে,-ও তেই বোধ করি গোণা-লেকের উৎপত্তি।

রেঞ্জারবাবু বলেন, ঠিক তাই। ঐটিই সেই পাহাড়। ওর পরেই গোণা-লেক।

প্রকান্ড ভগ্নাঙ্গ এক পাহাড়। এক অর্ধাংশ তার মাথা থেকে ভেঙে ধসে গেছে। মনে হয় যেন কোন্ এক দৈত্য বিরাটাকার একটা ফলের মাঝখান দিয়ে ছুরি চালিয়ে আধখানা কেটে ফেলে দিয়েছে। এত বড় পাহাড়-ধসা হিমালয়েও ক্বচিৎ দেখা যায়।

প্রকৃতির চারিদিকের শ্যাম-স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে ধ্বংসলীলার এ এক বিকট নিষ্ঠুর রূপ।

মনে পড়ে কয়েকবছর আগেকার একটি ঘটনা।

হাজারীবাগ-রাঁচির পথে রামগড়। তারি কিছুদূরে মোটরের বড় রাস্তা ছাড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে। রাজরোপ্পা। ভেড়ানদী ও দামোদরের তীরে ছিন্নমস্তার মন্দির। চারিদিকে ছোট বড় পাথর। তারি মাঝ দিয়ে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। বনের ধারে নদীর তীরে ছোট মন্দির। একে ছিন্নমস্তা, তায় জাগ্রতা দেবী। সবাই ভক্তি করে, ভয় করে। কিছুদূরে একটি গ্রাম। সেখান থেকে প্রতিদিন পূজারী এসে পূজা করে যায়। দিনের আলো হলে লোক আসে, সন্ধ্যার আগে ফিরে যায়। রাত্রিবাসের নিষেধ আছে। বলে, দেবীর মানা আছে।

মানা থাকার বিশেষ কারণও আছে। জীবন্ত প্রমাণের রূপ ধরে এক মানুষমূর্তি সুমুখে দাঁড়ায়।

কী বিকট বিকলাঙ্গ! মাথা থেকে মুখ-বুক শুষ্ক ক্ষতচিহ্নে ভরা। মূর্তিময়ী বিভীষিকা!

বলে, ভালুকের অত্যাচার। নখ দিয়ে চিরে এমনি করেছে!

বিকৃত ক্ষত-ভঙ্গ অঙ্গ নিয়ে তবুও সে প্রাণে বেঁচে আছে।

এখানেও প্রকৃতির অঙ্গে আঁকা এক নিষ্ঠুর করুণ কাহিনী।

কিছুদূর গিয়েই নদী ছেড়ে আবার পাহাড়ের গায়ে পথ। বড় বড় গাছ। ছায়াশীতল। পথের মাঝে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী। তুষার শীতল ধারা। আবার জুতা-মোজা খুলে পার হতে হয়। আরও খানিক এগিয়ে বিরহীনদীর পরপারে পথ চলে গেছে। পারাপারের সাময়িক ছোট পুল। পাইনগাছের গোটা দুই গুঁড়ি ফেলা। সাবধানে পার হই। বেশী বৃষ্টি হলেই নদীর স্রোত বাড়ে, পুলের কাছের উপর দিয়েই তখন জল ছুটে চলে কল্‌কল্‌ স্বরে। ফেরার পথে তাই হয়েওছিল। জুতা-মোজা-সমেত তারি উপর দিয়ে চলে এসেছিলাম। খুলি নি। কারণ, সেদিন ফেরার পথে বৃষ্টির মধ্যেই সারা পথ চলতে হয়েছিল। জলে সমস্ত ভিজে জব্‌ জবে হয়ে উঠেছিল। নতুন করে ভেজবার আর কিছু বাকি ছিল না। বর্ষার প্রচণ্ড প্রকোপে বর্ষাতির তলায় জামা-কাপড়ও সম্পূর্ণ ভিজে। যেন সদ্য স্নান সেরে উঠলাম। ভিজা জামা-কাপড়-জুতা-মোজায় পথ চলাতে নবীন আনন্দের আস্বাদ। চারিদিকে যেমন বর্ষাপ্লাবিত প্রকৃতি, হৃদয়াঞ্চলে তেমনি বর্ষণ-মুখর মন। মুখে চোখে বৃষ্টিধারার ছাট লাগে। চারিদিকে জলের স্রোত ছোটে। তারি মাঝে ছপ্‌ ছপ্‌ করে পথ চলি। সাবধানে পা ফেলি। সতর্কগতি ক্রমে সাহস সঞ্চার করে। দেখি,জলের মধ্যেও পথ চলার ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। মনে গুঞ্জরণ ওঠে ঃ 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে-ময়ূরের মত নাচে রে!' —হিমালয়ে বর্ষামঙ্গল।

আশ্চর্য লাগে এ সিক্ত-সজ্জায় পথ-চলায়। গায়ের ভেজা কাপড় গায়ে শুকায়। আবার পথে বৃষ্টি নামে-আবার ভেজায়, আবার শুকায়। দিনশেষে পথ-চলা সাঙ্গ হলে, জামা-কাপড় ছাড়ি। আশঙ্কা হয়, পরদিন এই বৃষ্টি-ভেজার অত্যাচারের দুর্ভোগ আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু কোন কিছুই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ পায় না। পাহাড়-পথে অভ্যস্ত জীবন-ধারা বৃষ্টির লক্ষ ধারাকে সানন্দেই গ্রহণ করে।

শিশিরবাবু বলেন, দেবতার কি মহিমা। কলকাতা হলে সামান্য একটু জলে ভিজলেই অব্যর্থ ফ্লু! আর এখানে? জলে এত ভিজি তবুও জ্বর নেই। এত চলি, এত খাই-মনে হয় পাথর পর্যন্ত হজম করতে পারি।

অনাচারে অত্যাচারে শুধু স্বাস্থ্য ভাঙেই না, অবস্থাবিশেষে স্বাস্থ্য গড়েও।

বিরেহী নদী পার হয়েই বাঁ দিকে একটু উপরে ছোট একখানি গ্রাম। গোণা গ্রাম,-তা থেকে হ্রদের নামকরণ গোণা-তাল। হ্রদটি এখান থেকে আধ মাইলের উপর দূর। হ্রদের উপরে অপর পারে আর একটি গ্রাম আছে, নাম তার ডোর্‌মা। সে গ্রামের

অধিবাসীরা হ্রদের নাম দিয়েছে —ডোর্‌মা তাল। বলে, গোণা-তাল নাম হবার কোন কারণ নেই। ও গ্রাম তো জল থেকে অনেক দূরে, আমরা থাকি জলের কত কাছে-এর ঠিক নাম আমাদের গ্রামের নামে।

দুই গ্রামে এই নাম নিয়ে বিরোধ।

আত্ম প্রাধান্য মানুষ-স্বভাব। হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলেও ঈর্ষার কীট সুযোগ বুঝে বাসা বাঁধে।

পাহাড়-ধসার সময় গোণা-গ্রাম বেঁচে গিয়েছিল। গ্রামের কিছুদূর দিয়ে পাহাড়ের ধস্ নামে। নদী পার হয়ে বাঁ দিকে গ্রামে যাবার পথ। আমাদের পথ গিয়েছে ডান দিকে হ্রদের অভিমুখে। পায়ের চারিপাশে পাহাড়-ধসার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। চতুর্দিকে ভাঙা পাথর, কাঁকর, বালি, মাটির বিরাট বিরাট স্তূপ। তারি মাঝে মাঝে পাথর-চাপা ঝরনার ক্ষীণ ধারাগুলি কোথাও বা আত্মপ্রকাশ করছে। সে-সব ধারার জলও ধ্বংসের মসী-মাখা। মলিন, কৃষ্ণাভ। কোথাও বা জলে গন্ধকের গন্ধ আনে। বাঁ দিকে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়। বিকৃত বিকট বিকলাঙ্গ। যেন অতিকায় এক দানবের বীভৎস কঙ্কাল।

কিন্তু, আশ্চর্য লাগে এই বিধ্বস্ত শ্মশানের মধ্যেও নবীন জীবনের স্ফুরণ দেখে। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ। তবুও সেই ঊষর ভূমি ভেদ করে নবীন তরুলতার সুশ্যাম সজীবতা।

বিরাট পাহাড় ধসে পড়ে, নির্মূল হয় বৃহৎ বনস্পতি। তারপর, একদিন আবার সেই ধ্বংসের মধ্যেও নবীন প্রাণের পুনঃ সঞ্চার হয়। হিমালয়ের পাথর ঠেলে নবজীবনের সবুজ পতাকা হাতে পাদপ-শিশু মাথা তোলে, নবীন প্রাণের আনন্দ আনে। কালের বিচিত্র ধর্ম। নিদারুণ শোকাতুর মানুষও একদিন তার সে-শোকের অসহ্য জ্বালা ভোলে। কালের কল্যাণময় কোমল প্রলেপ দগ্ধ-হৃদয়েও ভ্রান্তিময়ী শান্তি আনে। তাইতো, সংসারে মানুষ বাঁচে। এখানেও ধ্বংসের মধ্যে প্রকৃতি আবার নবীন সাজে হাসে।

অল্প গেলেই হ্রদের বিপুল বারিরাশি চোখে পড়ে। চারিদিকে ঘন-সবুজ বনময়-গিরিশ্রেণী। তারি মাঝে সুনীল জলরাশির প্রশান্ত বিস্তৃতি।

পাহাড়ের কিছু উপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি। পথ নেমে জলের ধারে লুপ্ত হয়েছে। তারই অল্প দূরে ডান দিকে ধ্বংসস্তূপের বাঁধ ভেঙে জলধারা হ্রদ থেকে বেগে ছুটে চলেছে। নিম্নগামী ধারা পাষাণ-কারা ভেদ করে উন্মাদনায় উন্মত্ত। এই

বিরহী-গঙ্গার ধারা ধরেই আজ সারাদিন এসেছি।

নদীর মুক্তিদ্বারের অল্প উপরে নূতন ধর্মশালা। বাসোপযোগী হলেও এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

অমরনাথ জানায়, ঐখানেই আমাদের রাত্রিবাস। দু'দিন এখানে আনন্দে কাটানো যাবে।

রেঞ্জারবাবু দূরে হ্রদের অপরদিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ ওপারে বোট্-হাউস্। গত বর্ষায় হ্রদের জল ঢুকে ক্ষতি করেছে। ওখানে থাকা এখন চলবে না।

সাদা-ধব্ধবে ছোট্ট একটি বাড়ি। দূরে নীল জলের ধারে সবুজ-পাহাড়ের গায়ে শ্বেতবিন্দুর মত মনে হয়।

পথটুকু শেষ হবার আগে ধর্মশালার কাছে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্র। সবুজ ঘাসের উপর হলদ-রঙের বিচিত্র শোভা।

আশ্চর্য বোধ হয়। হঠাৎ এত ফুল ফুটল কোথা থেকে?

অমরনাথ বলে, দূর থেকে দেখে সব 'মেরিগোল্ড' মনে হয়।

নামতে নামতে দেখি, সত্যই তাই। আমাদের চিরপরিচিত গাঁদাফুল। হঠাৎ দেখে মনে হয়,কারা যেন জলের ধারে গেরুয়া-কাপড় বিছিয়ে রেখেছে।

গাঁদাফুলে সরস্বতীপূজার কথা স্মরণ করায়। প্রতিমার সামনে পুষ্পপাত্রভরা গাঁদাফুল। অঞ্জলি ভরে অঞ্জলি দেওয়া-ছেলেবেলার ভয়-ভক্তি-মেশানো সে এক অপূর্ব অনুভূতি!

রেঞ্জার জানান, হ্রদের চারিদিকে অনেক জায়গায় ফুটেছে দেখবেন। এ-সব স্বামীজির হাতে-করা বাগিচা।

স্বামীজি! এখানে সাধু কেউ থাকেন নাকি?

শুনি, আজ বছর কয়েক হল একজন এসেছেন। তাঁরই একার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠা; নিজে থাকেন কিছুদূরে হ্রদের ধারে একটি গুহায়। স্থলপথে সেখানে যাবার পথ নেই। জলপথে নৌকায় যেতে হয়। বন-বিভাগের সরকারী নৌকা তো আছেই, স্বামীজির নিজেরও একটি আছে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের নৌকা এপারে এনে রেখেছে তো?

একটি পাহাড়ী সেলাম ঠুকে সুমুখে দাঁড়ায়। মলিন বেশভূষা। দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু, সবল স্বাস্থ্য, মুখে সরল হাসি। বলে, আমি চৌকিদারের ছেলে। বাবার বয়স হয়েছে, শরীরও ভালো নেই। তাই আমি এসেছি নৌকা নিয়ে।

ধর্মশালায় থাকার সব ব্যবস্থা করেছি।

ধর্মশালা দোতলা বাড়ি। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি। একতলায় কুলী ও পিয়নরা উঠেছে। আমরা থাকব দোতলায়। উপরে ওঠবার সিঁড়ি নেই। ভবিষ্যতে হবার ব্যবস্থাও নেই। একটা মই লাগানো আছে। তাই দিয়ে উঠলাম। সিঁড়ি না করার হয়তো কারণও আছে। পাহাড়ে বাড়ি তৈরি হয় সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়। এখানেও তাই উঠেছে। সেইজন্যে পাহাড়ের গা থেকে সোজা বাড়ির উপরতলায় যাওয়া-আসা করা যায়। এখানেও বাড়ির পিছন দিকে একটা কাঠ ফেলে পাহাড়ের সঙ্গে সোজা যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ, দোতলা হলেও সেখান থেকে এটা একতলা।

দোতলায় দুটি ঘর। তিনদিকে টানা বারান্দা। কাঠের রেলিঙ দেওয়া। সামনের বারান্দার নীচেই প্রাঙ্গণ। ফুলের রঙে রঙীন হয়ে আছে। মাঝখানে একটা শিমগাছ। শিম-এ ভরে আছে। আরও কিছু নীচে হ্রদ। ঘরের ভিতর বা বাইরের বারান্দায় বসে মনে হয় যেন স্টীমারে চলেছি। সামনে প্রসারিত হ্রদের বিপুল বারিরাশি। হ্রদের অপরদিকে দূরে দেখা যায় একটি পার্ব্বত্য নদী, হ্রদে এসে পড়েছে। এতোদূর থেকে জলের ধারা নজরে আসে না; বালি-মাটি-পাথর কুচির সাদা রঙ উজ্জ্বল দেখায়।

রেঞ্জার বলেন, ঐ বিরহী-নদী। অপর দিকে হ্রদে এসেছে, আর একদিকে হ্রদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওপারে নদীর যে সাদা ধারা-পথ দেখা যায় তার অনেকখানি হ্রদের জলে আগে ঢাকা ছিল। হ্রদের জল ক্রমে ক্রমে নেমে আসছে।

শিশিরবাবু বলেন, তাহলে তো কিছুকাল পরে হ্রদের অস্তিত্ব যাবে, শুধু নদীর ধারাই থাকবে।

অমরনাথ জানায়, তাই হবারই হয়তো সম্ভাবনা, কিন্তু সে 'কিছুকাল' এখনও দীর্ঘকাল। এখনও হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল হবে, চওড়াও প্রায় সওয়া-মাইল। জলের গভীরতা এখনও অনেক। নৈনীতাল হ্রদের দ্বিগুন আকার হবে।

বিরহী-নদীর উৎসমুখ চির-তুষার প্রদেশে হিমপ্রবাহে। তুষার-মৌলী সেই গিরিশ্রেণী হ্রদের অপরপারে বহুদূরে দেখা যায়। নন্দাঘুন্টি শিখর। বরফ-ঢাকা পাহাড়-চূড়া যেন আকাশ স্পর্শ করে। রাশি রাশি সাদা মেঘের পুঞ্জ ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। যেন অলক্ষ্যে বসে কোন্ এক ধনুরী তুলা পিঁজছে।

হ্রদের ডানদিকে অরণ্যময় সবুজ পাহাড়। তারই বহু উর্ধ্বে একটি বড় গ্রাম

আছে। নাম তার রাম্‌ণি। এখান থেকে দেখা যায় না।

বাঁ-দিকের উঁচু পাহাড়গুলির পিছনে 'কুয়ারী পাস'। তুষারাবৃত গিরিসঙ্কট।

ঐসব পাহাড়গুলির উপর দিয়ে একটি পথ আছে। পর্বত-চূড়া-আরোহণকারীদের অভিযান-পথ। ছাপার হরফে সে সব পথের সৌন্দর্যের বর্ণনা পড়েছি। ছবিও দেখেছি। আজ মানস-পটে সেই অদৃশ্য দৃশ্য কল্পনার রঙীন তুলিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গোণা-তালের তীরে দু'দিন কাটল। নৌকা করে লেকে বেড়ালাম।

প্রথমদিনেই বোট্‌-হাউস দেখে এসেছি। কাঠের ছোট্ট বাড়ি। দুখানি মাত্র ঘর। হ্রদের উপকূলে। গত বর্ষায় হ্রদের জল একটু বেশী বেড়েছিল। তাই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করে সব ভাসিয়েও দিয়েছিল। কাঠের দেওয়ালের গায়ে, কাঠের মেঝেতে জলধারার নিষিদ্ধ-প্রবল-প্রবেশের অত্যাচার-কাহিনী এখনও আঁকা আছে।

অমরনাথ সব পরীক্ষা করে দেখে। তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। মন্তব্য করে, খুব বেশী ক্ষতি করে নি। কয়েক শ' টাকা খরচ করলেই সংস্কার হতে পারে। চায়ের সেট-এর পাত্রগুলি খুব বেঁচে গেছে।

তারপর চৌকিদারের ছেলেকে হুকুম দেয়, চায়ের কেট্‌লি, কাপ ডিশ নিয়ে চলো-আমাদের জন্যে। লিস্টে ঠিকমত নোট করে রাখো, — আবার মিলিয়ে তুলে রাখবে।

সরকারী অফিসরের সতর্ক দৃষ্টি সজাগ আছে।

বোট্‌-হাউস্‌-এর কিছু উপরে ডোরমা গ্রাম। ছোট গ্রাম। কয়েকখানি মাত্র ঘর। চৌকিদার ঐ গ্রামেরই লোক। নৌকায় বসে দাঁড় হাতে চৌকিদারের ছেলে গল্প করে, বাবা এখন আর বেশী কাজকর্ম করতে পারেন না। নৌকা বাইতেও সাহস পান না। আমার কিন্তু চালাতে খুব আনন্দ লাগে। কেমন দাঁড়ের সঙ্গে নৌকা চলে!

কথা বলতে বলতে দুই হাতের দাঁড় ছপাৎ করে জলে ফেলে। জল ছিটকে ওঠে। ধীরে ধীরে হাত চালায়, জল কেটে নৌকা চলতে থাকে। শান্ত জলের উপর নৌকার গতিপথের বিচিত্র রেখা ফুটে ওঠে।

তারপর জানায়, আমরা তো এই জলেই মানুষ। জন্মে অবধি এমন দেখছি। গ্রামের বৃদ্ধরা কিন্তু এ-জলকে ভয় করেন। গল্প শুনেছি, চোখের উপর তাঁরা দেখেছেন এই জল জমতে। ক'দিন ধরে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নেমেছিল। তারপর

গভীর রাতে সে-নাকি এক অতি-বিরাট শব্দ করে পাহাড় ভেঙে পড়ে। সেই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও ঘর ছেড়ে আতঙ্কে গ্রামের সব লোক বেরিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, পৃথিবীর প্রলয় এসেছে। সারারাত পাহাড়-ধসার ধ্বংসলীলা চলে। তারপর দিনের আলো ফুটলে সব প্রকাশ পায়। তখনও সামনের ঐ পাহাড় ধসে-ধসে পড়ছে। তিনদিন ধরে এমনি করে পড়তে থাকে। প্রকান্ড বড় বড় পাথর সশব্দে এসে ছিটকে পড়ছে চারিদিকে-নদীর এ-পারেও-কামানের গোলার মত। যেমন তার প্রচন্ড বেগ, তেমনি ভয়ঙ্কর গর্জন। চারিদিকে আবছায়া-ধূলার ধোঁয়া। নদীর এ-পারের গাছপালা, মাঠ-সব ধূলায় মলিন, বিবর্ণ হয়ে গেছে, যেন ধূসর-বরফ-ঢাকা। পাহাড় থেকে চতুর্দিকে জলও নামছে। হ্রদের জল বাড়ছে। গ্রাম ছেড়ে সবাই পাহাড়ের আরও ওপরে বনের ভিতর আশ্রয় নিল। এমনিভাবে বছরখানেক কাটার পর হ্রদের বাঁধ ভাঙল। এখন এসব সুন্দর জায়গা,—আপনারা দেখতে আসেন; কিন্তু সে-সব দিনের গল্প বলতে বৃদ্ধদের এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

নৌকার উপর নিশ্চিন্ত আরামে বসে বিগত-কালের সেই ভয়াবহ কাহিনী শুনতে বেশ লাগে। যেন, বই-এর পাতায় পড়া রোমাঞ্চকর দুর্ঘটনা। অথচ যা শুনছি তার মধ্যে এতোটুকু অতিরঞ্জন নেই। Frank Smythe — এর Kamet Conquered বইখানিতে এর সরকারী অনুরূপ বিবরণ পড়েছিলাম।

পাহাড়টির নাম মৈথানা। ১১,১০৯ ফুট উঁচু পাহাড়ের অংশ ধসে পড়ে। দুইবারে। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ কিউবিক ফিট পাথর ভেঙে পড়েছিল। নদীর গতিপথ রোধ করে ভেঙে-পড়া পাথর ও মাটিতে যে বাঁধের সৃষ্টি হল, তারই উচ্চতা একহাজার ফুট! হিমালয়ের কোলে অবশ্য নবজাত শিশু-পাহাড়। তবুও, যেন হঠাৎ-বড়োর দম্ভে ভরা। উদ্ধত। কল্যাণী নির্ঝরিণীর সহজ গতিপথ অবরুদ্ধ করলে।

হ্রদের দীর্ঘতা হয়ে এল তিন মাইল।

তারপর, জল জমে বাঁধ ছাপাবার উপক্রম দেখে কর্তৃপক্ষ সময়মত গ্রামে গ্রামে বন্যার সতর্ক নির্দেশ পাঠালেন। অলকানন্দা ও ভাগীরথী গঙ্গার দুই তীরের গ্রাম ও শহর-বাসীরা নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের বহু উপরে আশ্রয় নিল। বাঁধ থেকে ১৪০ মাইল দূরে হরিদ্বার। সেখানেও সাবধান-রব উঠল।

১৮৯৪ সালের ২৫শে আগষ্ট। রাত্রি ১১টা ৩০। বাঁধ ছাপিয়ে-ভেঙে-জল

ছুটল। ঘন্টায় বিশ থেকে ত্রিশ মাইল গতিবেগ। বাঁধের মুখে গভীরতা হল ২৮০ ফুট। প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অলকানন্দার উপর চামোলী শহর। তার মাইল দশেক আগে অলকানন্দার সঙ্গে বিরহী-গঙ্গার সঙ্গম। বন্যার জলভারে অলকানন্দাতেও স্ফীতি আনল। চামোলীতে নদীর গভীরতা হল ১৬০ ফুট!

তারপর,দুইদিনেই হ্রদের জল ৩৯০ ফুট নেমে গেল, এবং পরে দেখা গেল বিরহী-নদীর·তলভূমি বন্যায় বয়ে-আনা প্রকান্ড পাথর ও মাটির প্রলেপে ৫০ ফুট উঁচু হয়ে গেছে।

১৯৩১ সালে হ্রদের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৯০০ গজ, প্রস্থ ৪০০ গজ, গভীরতা প্রায় ৩০০ ফুট।

এই প্রবল বন্যায় মানুষের অসামান্য ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয়েছিল সামান্যই। সময়মত সতর্ক-সংবাদে সকলেই সাবধান হয়েছিল। হয় নি শুধু একটি লোক। সে সপরিবার বাঁধের নীচেই বাসা বেঁধেছিল। বহু সতর্কবাণী সত্ত্বেও। বাঁধ-ভাঙার উপক্রম হলে তাদের জোর করে দুবার সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। তবুও, তরা সেখানেই ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকে। কোনরকমে আর সরানো যায় নি। বন্যার সেই ভয়ঙ্করী-মূর্তির কাছে শুধু এরাই আত্মাহুতি দেয়।

চৌকিদারের ছেলে গল্প করছিল, —শুনেছি, লোকে তার নাম দিয়েছিল গোণা ফকির। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকত। বলত, ভগবান-রাখবার, মারবারও তিনি। যদি জান্ নেবার মর্জি থাকে, তিনি নেবেনই, আমি পালিয়ে বাঁচব কোথায়! যাবই বা কেন? —কোন্ এক রাজার গল্প শুনিয়ে বলত, অতোবড় রাজা, সব ব্যবস্থা করেও সাপের কামড়ে মরার ভাগ্য-লিখন কাটাতে পারেন নি। আমি তো অতি সামান্য মানুষ, প্রাণ বাঁচাতে পালাব কোথায়? শেষ পর্যন্ত নড়েও নি। বন্যা শুরু হলে তাদের আর চিহ্ন পাওয়া যায় নি। লোকে বলে মস্ত ভক্ত ছিল। আমি বলি, আস্ত পাগল! নির্বাক হয়ে তার গল্প শুনি।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘ জমে আসে। মেঘের জটাজালে সূর্যকিরণ বন্দী হয়। আলোছায়ার খেলা চলে। দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। সুমুখেই রামধনুর রঙীন রেখা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আকাশের বুকে নয়, সবুজ পাহাড়ের গায়ে। অদূরে হ্রদের ভিতর সে-রঙীন-রেখার একপ্রান্ত বিলীন হয়।

লেঃ কর্ণেল সত্যেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রুদ্রনাথ

অবশেষে বিভীষিকাময় রাত্রির অবসান হয়। ভোরের আলো দেখা দিতেই সকলের মন আনন্দে ভরে ওঠে। বাইরের দিকে তাকাতে কিন্তু মন দমে যায়, আকাশে থরে থরে ঘন কাল মেঘ, বরফ অবিরাম পড়ে চলেছে বৃষ্টির মত, সূর্য্যদেবের দেখা নেই এবং মেঘগর্জন ভয়ের সঞ্চার করে। সঙ্গীগণ ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছেন, একটা বিষাদের ছায়া সকলের মুখে।

একজন বললেন যে এই বরফের ওপর দিয়ে দুমাইল যেতে হবে রুদ্রনাথ পর্য্যন্ত, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি বরফের নীচে কোন গর্ত্তে পা পড়ে যায় তবে কোথায় যে তলিয়ে যেতে হবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে অনসূয়ার পথে ফিরে যাওয়া যাক, রুদ্রনাথ দর্শন এবারকার মত স্থগিত থাক।

আমি রাজী হইনা, জানাই যে রুদ্রনাথ দর্শনে আমি যাবই, দরকার হলে একলাই।

তাঁদের বোঝাই যে অমঙ্গলের কথা চিন্তা করা উচিত নয়, রাস্তায় দুর্ঘটনা যে হবেই এমন কোন কথা নেই, আমাদের অপ্টিমিস্টিক চিন্তাধারা গ্রহণ করতে হবে, পেসিমিস্ট হলে চলবে না। ভালভাবে এবং অক্ষত শরীরে যাতে আমরা রুদ্রনাথ পৌঁছাতে পারি, সেই প্রার্থনাই আসুন আমরা সকলেই করি।

রুদ্রনাথ একাধারে রুদ্র এবং শিব।

একদিকে যেমন তিনি ভয়ানক অপর দিকে মঙ্গলময়।

ক্রুদ্ধ হলে যেমন তিনি ধ্বংস করেন, প্রসন্ন হলে তেমনই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

তাঁর এক নাম রুদ্রনাথ, অপরনাম আশুতোষ।

শীঘ্র, অতি সহজে এবং অতি অল্পে সন্তুষ্ট হন।

পুরাণ, মহাভারত, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে কোথাও কি এমন বর্ণনা আছে যে মহাদেব ভক্তের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হন নি?

রুদ্রনাথ আমাদের যেতেই হবে।

একটি গানের পদ কেউ যেন আমার অন্তরে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলে - উচ্চকণ্ঠে গান ধরি,

"এস দীনদয়াল জগতত্রাতা,
দীনজনগণ তারণকারী হরি।
মন সায়রে ডুবু ডুবু তরণী মোর,
কর পার পারাবার তুমি হরি।
সলিল অগাধ বহে উজান,
চলে ঈশান পবন বহি অবিরাম,
ডর লাগে থর থর কাঁপে পরাণ,
তুমি বিনে করে কে উপকার হরি।
তব পদে নিবেদন দয়াল প্রভু,
ত্বরি নাও দুস্তর সাগর পারে,
ডুবি যদি এ সংসারে ওগো দয়াময়;
ডুবে যাবে তব নাম মান হরি"।

প্রার্থনার ফলেই হোক বা গানের বলেই হোক, আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হতে দেখা গেল, তুষারপাতও বন্ধ এবং সূর্য্য দেব ও আকাশে দেখা দিলেন। সকলের মুখে হাসি। ঘড়িতে দেখি নটা বেজেছে, এত বেলা হয়েছে কেউ বুঝতে পারি নি।

দূর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসে, বাহাদুর শান্তারাম রুদ্রনাথ থেকে ফিরে আসছে আমাদের নিয়ে যেতে।

রুদ্রনাথ তাহলে হয়েছেন আশুতোষ।

শান্তারাম এসে জানায় যে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে নতুবা আবার বরফ পড়া আরম্ভ হলে আর এগন যাবে না।

সাজ সাজ রব ওঠে, কেউ বলেন "আমার মোজা "? অপরে বললেন, "আমার জুতো, লাঠি"? সব বরফে চাপা পড়ে গেছে, এখন খোঁজাও বিড়ম্বনা। বুদ্ধি করে আমি আমার জুতো , মোজা ও ছোট ছোট জিনিষগুলি ছাউনির ভেতর কম্বলের তলায় রেখেছিলাম, গরম থাকবে বলে। সবই হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। একজনকে বিছানার ভেতর রাখা আমার দ্বিতীয় জোড়া জুতো দিলাম, বললেন,

নিজের জুতোর চেয়ে ভাল ফিট হয়েছে।

ছাউনির বাইরে প্রায় ছ'ইঞ্চি বরফ জমে রয়েছে চারিদিকে, পাহাড়ের কোন স্থান বাদ পড়েনি।

জিনিষপত্র যা বরফে চাপা পড়েছে, এখানেই রইল, ফেরবার পথে বরফ গললে তুলে নিলেই হবে।

এবার আর চড়াই নেই, তবে এত উঁচুতে বরফের ওপর চলতে হাঁফ লাগে। খানিকটা পথ চলবার পর পেছনে তাকিয়ে দেখি যে আমাদের গত রাত্রের ছাউনির অস্তিত্ব বোঝা যায় না, দেখা যায় কেবল তুষার-ধবল প্রান্তর।

পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে এগতে হয়, পথের বুঝি আর শেষ নেই। শান্তারামকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, জিজ্ঞাসা করলেই বলে, ঐ বাঁকটা পেরলেই রুদ্রনাথ। পিপাসা মেটাবার জন্যে মুঠো মুঠো বরফ মুখে দিই।

আরও দু জায়গায় পাহাড়ের ঢালুতে লাঠি ঠুকে ঠুকে সাবধানে বরফের স্তূপ পার হবার পর দেখা গেল অজস্র রোডোডেন্ড্রন ফুলের গাছ, রাস্তার দুপাশে রয়েছে। ফুল অবশ্য এখন নেই, আরও কিছুদিন পরে ফুটবে। আরও এগিয়ে একটা বাঁকের মুখে এক ছোট নদী, পুল নেই, হেঁটে পার হতে হল। নদী পার হয়ে এক ফার্লং পথ চড়াই উঠতে হয়। চড়াই শেষ হতেই নজরে আসে রুদ্রনাথের পাহাড়। পাহাড়ের ঢালুর উপর মন্দির ও খানকয়েক ঘর। দূর থেকে মন্দির বলে বোঝা যায় না, যেন কতকগুলি প্রকান্ড পাথরের স্তূপ বলে মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে কিংবা আশে পাশে গাছ নেই, আছে কেবল ঘাসের চাবড়া। এখান থেকে সোজা রাস্তা, অতি সামান্য ঢেউ খেলান চড়াই উতরাই। প্রায় দুফার্লং এইভাবে অতিক্রম করবার পর ধর্ম্মশালায় পৌঁছাই বেলা একটার সময়।

ধর্ম্মশালা বলতে পাশাপাশি দুটি পাথরের ঘর, স্লেটের ছাদ, সামনে বারান্দা। ঘরের ভেতর জানলা নেই, একটা ঘুলঘুলি আছে বটে তবে আলো আসে না, ভেতরটা অন্ধকার। ছাদটা নীচু, দাঁড়ালেই মাথা ঠেকে। ধর্ম্মশালা থেকে মন্দির আরও এক ফার্লং দূরে।

শ্রীরাণা গতকাল সন্ধ্যায় এসেছেন, কিছু ঘাস জ্বেলে ঘরের ভেতর আগুন ধরিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। বাইরে খুব ঠান্ডা, হাওয়ার জোরও বেশ আছে। আকাশ মেঘলা তবে তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। ভাবলাম ঘরের ভেতরে

গিয়ে আগুনে হাত পা গরম করে আসি, কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকেই বেরিয়ে আসতে বাধ্য হই। একে এত উচুঁতে নিশ্বাসের কষ্ট তার উপর জানলা বিহীন ঘরে ধোঁয়াতে যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসে। বারান্দায় কিছুক্ষণ বসবার পর সহজ অবস্থায় ফিরে আসি। শ্রীরাণা ঘরের ভেতর মেঝেতে প্রচুর ঘাস যোগাড় করে পেতে রেখেছেন, তার ওপর বিছানা হবে। হামাগুড়ি দিয়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলাম।

রাণার কাছে শুনলাম যে রুদ্রনাথের পূজারী এখনও গোপেশ্বর থেকে এসে পৌছান নি, মন্দিরের দরজা বন্ধ। এত কষ্ট করে এসে শেষে কি রুদ্রনাথ আমাদের বিমুখ করবেন? শান্তারামের শরণাপন্ন হই। বলি, তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ, তুমিই দর্শন করাবার ব্যবস্থা কর।

কুলীরা জিনিষপত্র খোলাখুলি করতে থাকে। এরা সত্যিই অসম্ভব খাটতে পারে। বৃষ্টি-বাদলে, অসহ্য শীতে বরফের ভেতর দিয়ে এরা এক একজন দেড়মণ দুমণ বোঝা পিঠে করে অনায়াসে পথ অতিক্রম করে। এদের নিশ্বাসের কষ্ট হয় না, বোঝা নিয়ে এত উঁচুতে একটার পর একটা চড়াই পার হয়ে যায় অবলীলাক্রমে। দিনের যাত্রাশেষেও এদের বিশ্রাম নেই। কাঠ সংগ্রহ করা, জল নিয়ে আসা, থাকবার স্থান পরিষ্কার করা এতো আছেই, তাছাড়া রান্নার সাহায্য ও সকলের জন্যে রুটি তৈরী করাও আছে। রাত্রে আমরা যখন তিনটে করে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভাবি যে আরও দুএকটা হলে ভাল হত তখন এরা একটা মাত্র কম্বল মুড়ি দিয়ে পরম শান্তিতে নিদ্রা যায়।

রুদ্রনাথের মন্দির যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত তার উচ্চতা ১১৬৭০ ফুট। রুদ্রনাথ এক জনপ্রাণীহীন নিস্মল আকাশতীর্থ। পাহাড়ের ঢালুতে মন্দির, পাশে ছোট ছোট অন্য মন্দিরও আছে, মন্দিরের কাছেই পূজারীর ঘর। কাছে ঝরণা নেই, জল আনতে হয় পাহাড়ের নীচে প্রায় দু ফার্লং দূর থেকে। পাহাড়ের নীচে প্রায় একমাইল দূরে আরম্ভ হয়েছে নিবিড় জঙ্গল।

মন্দির যখন শীতকালে বন্ধ থাকে তখন রুদ্রনাথের পূজা হয় গোপেশ্বরে। গোপেশ্বরের রাওয়ালাই পূজারীর বন্দোবস্ত করেন। কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার কয়েকদিনের ব্যবধানে রুদ্রনাথের মন্দিরের দরজাও খোলা ও বন্ধ করা হয়ে থাকে। শীতকালে মন্দির সংলগ্ন স্থান বরফে ঢাকা পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে শান্তারামের গানের আওয়াজ শুনতে পাই। বুঝলাম, রুদ্রনাথ দর্শনের ব্যবস্থা করেছে শান্তারাম। অকারণে সে তো গান গায়না। সত্যিই তাই। শান্তারাম জানায় যে মন্দিরের দরজা ভেজান ছিল, ঠেলতেই খুলে যায়। এইরকম নাকি রাখা হয় যাতে যাত্রীরা কষ্ট করে এসে বিনাদর্শনে ফিরে না যায়। আবার জয়ধ্বনি ওঠে, জয় রুদ্রনাথের জয়।

মন্দিরে যাই, গর্ভমন্দির এক গুহার ভেতর, মন্দিরের ছাদ হচ্ছে একটা বিরাট পাথর।

রুদ্রনাথ হচ্ছেন মুখারবিন্দ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাঁদিকে একটু হেলান। মুখে হাসি লেগে আছে, সুন্দর দুই ঠোঁট, চোখ দেখে মনে হয় যেন ধ্যানে মগ্ন, মাথায় জটা বাঁধা। চারিদিকে একটা স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। ইনিই কি সেই ভয়াবহ, ধ্বংসকারী, সর্ব্বসংহারক ভৈরব রুদ্রনাথ, না অতি অল্পে তুষ্ট হয়ে ঈপ্সিত বরদান করেন যিনি সেই আশুতোষ?

দর্শন করি অনেকক্ষণ ধরে, প্রাণভরে। সষ্টাঙ্গে প্রণাম করি রুদ্রনাথকে, আশুতোষকে, পরিক্রমা করি দেবাদিদেব মহাদেবকে। যথাসাধ্য পূজা দিয়ে আলিঙ্গ ন করলাম রুদ্রনাথকে, বার বার হাত বোলাই দেবতার মাথায়, মুখে ও কপালে।

ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির পুত্র মহর্ষি কশ্যপ দক্ষপ্রজাপতির যে তেরটি কন্যাকে বিবাহ করেন, তার মধ্যে দিতি অন্যতম। দিতির গর্ভে দৈত্যকুল জন্মায় কিন্তু দিতির সব পুত্রকেই দেবতারা বধ করেন। দিতি সেজন্যে কশ্যপের কাছে এক অবধ্য পুত্রের কামনা করে। কশ্যপ সম্মত হয়ে দিতিকে আলিঙ্গন করায় এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্র অহঙ্কারে মত্ত হয়ে পরিভ্রমণ করত বলে নাম হয় অন্ধক। এর একহাজার হাত, দুহাজার চোখ ও দু হাজার পা ছিল। এর অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ট হয়ে দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হন। তিনি দেবতাদের উপদেশ দিলেন হিমালয়ে মহাদেবের আরাধনা করতে। দেবতাগণ হিমালয়ে এসে কঠোর তপস্যায় মহাদেকে তুষ্ট করেন। বর প্রার্থনা করতে বলায় দেবগণ আনন্দে জানালেন যে তাঁরা অন্ধক দৈত্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তাকেই বধ করবার বর চান। মহাদেব বললেন যে দুরাচারী অন্ধকদৈত্যকে তিনি স্বয়ং বধ করবেন কারণ ত্রিভুবনে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে অন্ধককে বধ করতে পারে।

দেবগণ দেবর্ষি নারদকে একথা জানাতে তিনি অন্ধককে কোনও রকমে

মহাদেবের কোপদৃষ্টিতে আনবার উপায় ভাবতে লাগলেন। পরে একদিন নারদ এক দুষ্প্রাপ্য মন্দারপুষ্পমালা ধারণ করে অন্ধকদৈত্যের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশ্নাদি করেন এবং দৈত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে মন্দারপুষ্পমালাটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। অন্ধক, মন্দার পুষ্পের জ্যোতি এবং মালার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে নারদকে জিজ্ঞাসা করে যে ঐ পুষ্প কোথায় পাওয়া যায়। হিমালয়ে যেখানে মহাদেব পার্ব্বতীর সঙ্গে বাস করতেন নারদ সেই স্থানের সন্ধান দেন। মন্দারপুষ্প সংগ্রহের লোভে অন্ধক হিমালয়ে উপস্থিত হয়। মহাদেব সেই সময়ে পার্ব্বতীর সঙ্গে রতিক্রীড়ায় রত ছিলেন। অন্ধক দৈত্যকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে শূলাঘাতে তাকে বধ করেন।

ইনিই হচ্ছেন সেই রুদ্রনাথ।

রুদ্রনাথের মূর্ত্তি বাঁ দিকে একটু হেলান আছে। কথিত হয় যে রুদ্রনাথ একদিন ধ্যানে মগ্ন থাকাকালে কোনও কারণে তাঁর তপোভঙ্গ হয়। দেখেন যে দুটি মেষশাবক পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নীচের দিকে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে অন্য কোন মেষ নেই। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ঘাড় বাঁদিকে কাত করে শাবকদুটির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন কারণ নীচেই শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য। সেই সময়ে মেষপালক শাবকের সন্ধানে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। দেবাদিদেব ঐ মানবকে দর্শন দেবেন না বলে ঐ অবস্থাতেই প্রস্তরে পরিণত হন। সেইদিন হতে মূর্ত্তি বাঁদিকে হেলান আছে।

জনশ্রুতি আছে যে ঐ দিন হতেই রুদ্রনাথের পাহাড়ে পশুচারণ নিষিদ্ধ।

রুদ্রনাথে আসবার পাঁচটি পথ আছে। প্রথম পথ, কল্পেশ্বরনাথ দর্শনের পর উর্গম ও দুমক হয়ে রুদ্রগঙ্গার পুল পার হয়ে যে পথে আমরা এসেছি সেই পথ। দ্বিতীয় পথ, দুমক্ থেকে রুদ্রগঙ্গার দিকে না গিয়ে অন্য পাহাড়ী পথে রুদ্রনাথ। এ পথটি খাড়া চড়াই এবং পথে এক নদী পড়ে। নদীব ওপর পুল নেই তবে একটা গাছের গুঁড়ি নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত পড়ে আছে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হতে হয়। কথিত আছে যে যদি কোনও সময় ঐ গাছের গুঁড়ি ভেসে যায় তবে অন্য একটি গাছের গুঁড়ি আপনা হতে এসে ঐ স্থানে আটকিয়ে যায়। তৃতীয় পথ, গোপেশ্বর হতে পাহাড়ি পথে। সাধারণ যাত্রীরা এই পথেই রুদ্রনাথ আসেন। উত্তরপ্রদেশ সরকার এই পথটি চলাচল করবার জন্যে উপযোগী করে দিতে মনস্থ করেছেন। চতুর্থ পথ, মন্ডলচটি হতে অমৃতগঙ্গার বাঁদিকে পাহাড়ি পথে, যেপথে

আমরা রুদ্রনাথ হতে পরে নেমেছি সেইপথ এবং পঞ্চম পথ,মন্ডল চটি হতে অমৃতগঙ্গার ডানদিকে পাহাড়ি পথে প্রথমে অনসূয়ার মন্দির ও পরে রুদ্রনাথ।

যাঁরা পঞ্চবদরি দর্শনের পর পঞ্চকেদার দর্শন করতে ইচ্ছুক তাঁরা প্রথম পথে এলে সুবিধা হবে কারণ তাহলে উর্গম থেকে হেলাং পর্য্যন্ত পথটি দ্বিতীয়বার অতিক্রম করতে হবে না, তাছাড়া হেলাং থেকে গোপেশ্বর কিম্বা যোশীমঠ যাবার বাসে স্থান পাওয়াও অনিশ্চিত। প্রথম পথে সময় লাগে তিনদিন, অন্যপথে দুদিন।

পঞ্চকেদারের মধ্যে রুদ্রনাথের পথই সবচেয়ে দুর্গম, যাত্রী সমাগম হয় না বললেই হয়।

দর্শনের পর ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম অতি আনন্দিত মনে, পথের কষ্ট মনেই নেই। রুদ্রনাথ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমরা হয়েছি কৃতার্থ।

কমলা মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মাশিখরের পাদদেশে

১৯৮০-৮১ সালে বেশ কয়েকটি ঘটনার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করার ব্যস্ততার কোন ফাঁকে দিল্লী ইউথ হস্টেলের পদযাত্রার বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। সিকিম, ব্রহ্মাশিখর বেস, মরগ্যান ও সিনথেন পাসে পদযাত্রার কর্মসূচী লিপিবদ্ধ ছিল ঐ বিজ্ঞপ্তিতে। সিকিম তো ঘরের পাশেই, সেখানে যে কোন সময় যাওয়া যায় বরং একটা নতুন জায়গা দেখে আসা যাক-এই মনোভাব নিয়ে দরখাস্ত ও টাকা পাঠিয়ে দিলাম দিল্লীতে। উত্তর-ও পেয়ে গেলাম কিছু দিনের মধ্যেই। ভাল করে মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখলাম, যাতায়াতে ১০ দিন লাগবে। রোজ ৭ কি.মি. থেকে ১৩/১৪ কি.মি. পথ হাঁটতে হবে, উচ্চতা ১২/১৩ হাজার ফুটের মধ্যেই। আমরা তো ব্রহ্মাশিখরে উঠতে যাচ্ছি না, পথ সহজ বলেই মনে হল। তাছাড়া বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নাই-"যে পার যাও নয়তো ফিরে চলে এসো" — এই মনোভাব ছিল সংগঠকদের। সে ক্ষেত্রে আমার বয়স বাধা হয়ে দাঁড়াল না কিন্তু বারবারই মনে হচ্ছিল একজন সঙ্গী পেলে ভাল লাগত। এ ধরণের ট্রেকিং-এ পঃ বঙ্গ থেকে কেউ যেতে চান না কারণ বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমেই পর্বত অভিযান হয়। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে "একলা চল রে" বলে বেরিয়ে পড়তে হল নির্দিষ্ট সময়ে। তখন জুন মাস।

জম্মুতে আগেও কয়েকবার আসার ফলে জায়গাটা মোটামুটি পরিচিত ছিল। সুতরাং ট্রেন থেকে নেমে সোজা বাসস্ট্যান্ডে চলে গেলাম। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে পায়ে হেঁটে বেড়ালেও জম্মুর এই এলাকায় আগে আসা হয় নি, তাই নতুনত্বর প্রতি একটু আকর্ষণ ছিল। সেই সাথে চিন্তাও ছিল — জেনেছিলাম নিজের বোঝা নিজেকেই বইতে হবে। এ পর্যন্ত গঙ্গোত্রী-গোমুখ(১৯৬১), রূপকুন্ড(১৯৬৩), মুক্তিনাথ (১৯৬৭), এভারেস্ট বেসক্যাম্প (১৯৭৫) প্রভৃতি হিমালয়ের বহু স্থানে গেলেও ৭/৮ জনের দলের সঙ্গে গিয়েছি, সর্বদাই ২/৪ জন কুলি সাথে থেকেছে মাল বইবার জন্য। তাছাড়া সঙ্গী যুবকরা তো থাকতেনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য। এবার তাহলে কি হবে! সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাস অফিসে গিয়ে

হাজির হলাম। জানা গেল যে রাত্রে বাস অফিসের উপর তলায় ২ টাকা দিয়ে সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক সময় রয়েছে হাতে এই ভেবে আমার পরিচিত জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণ বসুর কোয়ার্টারে চলে গেলাম এবং স্নানাহার সেরে ৫-টা পর্যন্ত বিশ্রাম-নিদ্রা দিলাম। ৫-টার পর জিনিসপত্র নিয়ে সেই ধরমশালার মত ঘরে পৌঁছে দেখি বেজায় ভিড়; সব ঘরগুলিই ভর্তি।

মালয়েশিয়া থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতা এক মহিলা তাঁর পুত্রকে নিয়ে পূর্ব পুরুষের দেশ দেখতে এসেছেন। তাঁর সাথে সহজেই আলাপ হল। রাত্রে কোনমতে একটু স্থান করে শুয়ে পড়লাম। অতি প্রত্যূষে উঠে সেই মহিলার সহযোগিতায় স্নান ইত্যাদি সেরে বিরাট স্ট্যান্ডের অসংখ্য বাসের মধ্যে কিস্তোয়ারগামী বাসে বসলাম। কাজটি খুব সহজ নয়-প্রতি মিনিটে ২/৩ খানা করে বাস ছাড়ছে দূর পাল্লার যাত্রীদের নিয়ে। ভোরের অন্ধকারে তারি মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট বাস খুঁজে বের করা কঠিন। ক্রমে ক্রমে বিকেলের দিকে বাস খালি হতে লাগল। তখন অন্যান্য পদযাত্রী যুবকরা আমায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৌতূহল ভরে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন আমি বুঝি বা পথ ভুল করে চলেছি ঐ বসে। আমি ইঞ্জিনের পাশে কোনমতে একটু জায়গা পেয়ে ছিলাম-চাকার উপরে গরমে আমার উলের জামা কিছুটা ঝলসে গেল। কিস্তোয়ায় পৌঁছে সংগঠক নরেন্দ্র শর্মার কাছে হাজিরা দিতে তিনি মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্প 'নন্দাদেবী'তে যাবার নির্দেশ দিলেন। তারি দূরে অনুচ্চ পর্বতঘেরা সুন্দর প্রশস্ত ময়দানে প্রায় ৪০ টি ক্যাম্প — প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন পর্বত ও পর্বতশৃঙ্গের নামে। আমার ক্যাম্প 'নন্দাদেবী'তে সকলেই স্কুল কলেজের ছাত্রী — সুতরাং সহজেই আমি আণ্টি হয়ে গেলাম তাদের। পদযাত্রীরা বেশির ভাগই পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতীয়। দিল্লী ছাড়াও আজমীঢ়. গুজরাট, বোম্বাই, কোলাপুর, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, কেরল প্রভৃতি স্থান থেকে এসেছে। ঐ সব দেশে পশ্চিমঘাট বা মৃদুমালাই পর্বত-সর্বোচ্চ। দিল্লী ইউথ হোস্টেল তাই চেষ্টা করে তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েদের দুঃসাহসিক অভিযানে তালিম দেওয়ার। তবে সব বয়সের লোকই সে তালিম গ্রহণ করতে পারেন। নরেন্দ্র শর্মার পুত্রও ছিল এই দলে-সে তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ঐ বয়সের আরো অনেকেই যোগ দিয়েছিল।

কিস্তোয়ার এ অঞ্চলে পর্বতাভিযানের বেশ উপযুক্ত কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

ক্যাম্প-ম্যানেজারের তাঁবুর সামনে যাত্রাপথের মানচিত্র বেশ বড় করে অঙ্কিত রয়েছে। যাত্রার দিন কবে তা আগামীকাল স্থির হবে। কিন্তু তাই বলে ক্যাম্পে শুয়ে বসে থাকার নিয়ম নেই; সকালে চা খাবার পরই মাঠে P.T. করতে হয়। বৈঠক, বুকডন, জগিং বা দৌড় হল -সব বয়সের লোকই অংশ গ্রহণ করছেন। দেখলাম অনেক ছেলেমেয়ের মা বাবাও এসেছেন-তাঁরা অর্থের বিনিময়ে ক্যাম্পবাসী হয়ে থাকবেন, পদযাত্রার শেষে সন্তানকে নিয়ে ঘরে ফিরবেন।

যাত্রীদের দুটি দলে ভাগ করা হল-একটি দল যাবে পূর্বে ব্রহ্মাশিখর বেসে বরফপ্রান্তর অবধি, অন্যদল যাবে মরগ্যান ও সিনথেন গিরিপথে। একদিনে পথ অতিক্রম করে নীচু সমতলে এসে শেষোক্ত দলটি মূলশিবির কিস্তোয়ারে ফিরবে- এই পথের আকর্ষণই বেশি। সকলেই ঐ পথে যেতে চান বিশেষ করে তরুণ- তরুণীরা। আমরাও ঐ রোমাঞ্চকর পথে যেতে চাই কিন্তু যাঁরা আগে এসেছেন তাঁদের দাবীই অগ্রগণ্য। এখন যেতে হলে আমাকে আরো ৫/৬ দিন আরো টাকা খরচ করে শিবিরে অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমরা ব্রহ্মাশিখর বেসক্যাম্পের জন্য নির্দেশিত হলাম।

সকালে যাত্রা করার আগে পরবর্তী-ক্যাম্পের নাম, পথ কি রকম, কি গ্রাম পড়বে ইত্যাদি বিবরণ পেলাম ক্যাম্প ম্যানেজারের কাছ থেকে। শিবিরে গিয়ে দুটি কম্বল পাবো অতএব শুধু প্রয়োজনীয় পোষাক ইত্যাদি ও খাবার জল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। রুকস্যাক নিজে বইতে পারব কি না সে চিন্তা ছিল-ই। যাত্রা করার আগে কিস্তোয়ার গ্রামে যাবার পথে এক বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি ভরসা দিলেন যে রুকস্যাক বহন করা কিছু কঠিন নয়। শেষ পর্যন্ত কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে Store Room থেকে রুকস্যাক আনতে গেলাম। ততক্ষণ হাল্কা নাইলন রুকস্যাক নিঃশেষ, অগত্যা ক্যানভাসের ভারি রুকস্যাকই নিতে হল। সেই রুকস্যাক নিয়ে একটু চলা অভ্যাস করার সময় হঠাৎ দেখি পাশে বিশাল চিনার গাছের তলায় শান্তিনিকেতনী স্টাইলে ক্লাস চলছে। তবে সকলেরই দৃষ্টি আমাদের দিকে-ছাত্রছাত্রীদের চোখে কৌতুক আব মাষ্টারমশাই-এর দৃষ্টিতে শুধুই ক্রোধ। পরদিন দেখি সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে ক্লাস আর হচ্ছে না।

যাত্রাশুরু ঃ দুইদিকের দুই অভিযাত্রীদল সকাল বেলা এক সাথে রওনা দিলাম। আকাশ ছিল তখন মেঘমুক্ত। আজকে যেতে হবে ৭/৮ কি.মি. তাই নিশ্চিন্তে

ধীরে ধীরে চললাম। কিছুটা যাবার পর মারাউ নালা বা ছোট নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা উপরে উঠে গেছে-পাথরে ভর্তি রাস্তা। পুলের উপর দিয়ে নদী পার হবার সময়ই দেখেছিলাম বাস রাস্তা তৈরি হচ্ছে, ফলে পায়ে চলার পথটি ছিল পাথরাকীর্ণ। পথ বোঝা যায় না, সঙ্গীরা কোন এক দিক নির্দেশ করে এগিয়ে চলে গেছেন; আবার এক ঘোড়াওয়ালাও অনির্দিষ্ট দিকে হাত দেখাল। ভাবলাম কিস্তোয়ারে ফিরে যাই; এই ভেবে নামা শুরু করতে সেই বাঙালী যুবকটির সাথে দেখা। নাম তার সুব্রত বসু। তিনি বেশ ধীর গতিতে আসছিলেন। তাঁর সঙ্গেই আবার যাত্রা শুরু হল। নিজেদের আনা খাবার নষ্ট হয়ে গেছে তাই পথে এক ভেড়াওয়ালার অস্থায়ী সংসারে গাছের ছায়ায় কিছু খাওয়া হল। তখন ঘড়িতে ২ টো বেজে গেছে। এর পর সোজা পাহাড়ী পথে উঠে প্রথম দিনের শিবির 'পালমার' গ্রামে পৌঁছালাম। শেষে অনেক সিঁড়ি উঠতে হল। নীচে তাকিয়ে দেখি ফসল ভর্তি ক্ষেত ও গ্রাম। আমাদের শিবির পড়েছে স্কুলের পাশে-চারপাশে ক্ষেত। তখনও বিকেলের রোদ রয়েছে। ফিরতি পথের অভিযাত্রীরা এসে পৌঁছেছেন ফলে দুই বিপরীত মুখী দলের সাক্ষাৎ পরিচয় চলতে লাগল। বিহার ও উড়িষ্যার কিছু ছাত্র ও কর্মরত যুবক এসেছেন। গ্রামবাসীরাও এলেন আলাপ করতে। জানা গেল যে এঁদের পূর্ব-পুরুষরা বাংলা দেশের কোন এক স্থান থেকে এস ছিলেন-এ রকমই তাঁরা পুরুষানুক্রমে শুনে এসেছেন। সুতরাং আমরা বাঙালী শুনে তাঁরা খুশী হয়ে উঠলেন। স্কুলঘরে সকলের জায়গা হয়নি, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবু পড়েছে, গল্পগুজব চলেছে। তাঁবু থেকে বেরোতে গিয়ে আমার 'হান্টার' খুঁজে পাইনা-দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। জুতো না থাকলে তো ফিরে যেতে হবে। পরদিন সকালেও হদিশ পাওয়া গেল না সেই জুতো জোড়ার। অবশেষে সুব্রত বসু স্বেচ্ছায় নীচে গিয়ে যেখানে রাস্তা তৈরি হচ্ছে তার কাছের এক দোকান থেকে আমার জন্য একজোড়া 'শু' নিয়ে এলেন। অগত্যা তাই পরেই রওনা হতে হল। এই চুরির ঘটনায় গ্রামবাসীরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। পঞ্চায়েত-প্রধান একটা লাঠি দিলেন স্মারক হিসাবে। বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে সেটি বেশ তৈলাক্ত ও মজবুত হয়েছে। লাঠিটি ছিল আমারি মাপের। গ্রাম, দোকান ও শস্যক্ষেত পার হয়ে কিছুক্ষণ চলার পর "৩২ মোড়ের" পাহাড় টপকাতে হল। অর্থাৎ ৩১ টি সিঁড়ি Zigzag হয়ে উঠেছে ও পাহাড়ের বিপরীত দিকে নেমেছে। এই চড়াই-এর কাছে অমরনাথের পথের 'পিশু' চড়াই তো নস্যি! গোঁসাই কুন্ডের

পথে এরকম একটা আস্ত পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছিল মনে পড়ল। চড়াই ওঠার পথে চারটি বাঙালী মেয়ের সাথে দেখা, তারা নেমে আসছিলেন। দম নিয়ে আলাপ পরিচয় হল, জানা গেল এঁরা লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের ছাত্রী। এ পথে মেয়েদের তথা বাঙালীদের সংখ্যা কম তাই বেশ আনন্দ হল বলা-ই বাহুল্য।

পিঠে রুকস্যাক নিয়ে চলতে ভাল-ই লাগছে, বেশ ভারসাম্য বজায় থাকছে। আজকের গন্তব্যস্থল "ইখালা"-তে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পৌঁছে একটি ডাকবাংলো ও তার চতুর্দিকে ছড়ানো শিবিরের একটিতে আশ্রয় মিলল। চা পান করার পর আশ্চর্য হয়ে দেখি আমাদের ছেড়ে আসা গ্রাম পারমার থেকে দুটি কিশোর ছাত্র আমার সেই হারানো 'হান্টার' জুতো নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। শোনা গেল যে, একটি ছাত্র চুরি করেছিল কিন্তু সকলের জেরার চোটে চেপে রাখতে পারে নি। হান্টার খানা পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সাধারণ জুতো পরে কি ভাবে পাহাড়ে চলব তাই নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। আগের কেনা জুতো ও কিছু টাকা সহ ছেলে দুটিকে ধন্যবাদ দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হল তাদের গ্রামে। ওদের সাথে আর আমার দেখা হয় নি, কারণ ফেরার পথে সোজা বাসে চেপে কিস্তোয়ারে ফিরেছি, পারমারে যাওয়া হয় নি।

শিবিরে সন্ধ্যে ৭ টার মধ্যে পৌঁছোবার কথা। খাওয়া দাওয়া সেরে রাত ৯ টায় Camp Fire হয়। রাত ১০ টায় শুতে যাওয়া। দেখা গেল Camp Fire - এ সুব্রত বসু অনুপস্থিত এবং রোজই ঐ ঘটনা ঘটতে লাগল। কখনোই তিনি ৭ টার মধ্যে ফিরতেন না, বহু সাবধান-বাণী শোনানো সত্ত্বেও। পথে নাকি কফি খেয়ে কীটপতঙ্গের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে, ঘুমিয়ে তাঁর দেরি হয়ে যেতো। এখন গ্রামের ভিতর বা কাছাকাছি দিয়ে চলেছি বলে হয়তো ভয়ের কিছু নেই। তবু তাঁকে বারংবার সাবধান করা হল। সেদিন রাত্রে Camp Fire এ স্থানীয় কিছু লোক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন-একজন চমৎকার বাঁশি বাজালেন আর একজন গেয়ে শোনালেন স্থানীয় প্রেমের লোকগীতি। কেউ বা বললেন "শায়র"। আমাদের শিবিরকর্তারা স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে লোক বেছে নিতেন রান্না, জল আনা, কাঠ সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য। তাই তাদের মাধ্যমে যাত্রাপথে গ্রামগুলিকে জানবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁরাও Camp Fire ও যোগ দিয়ে খুশী হতেন। এ ব্যবস্থা পরবর্তী অভিযানে অবশ্য সম্ভব হয় নি নানা কারণে। বিশেষত মালানাতে গ্রামবাসীদের প্রবল আপত্তির জন্য।

তৃতীয় দিনের গন্তব্য "সোন্দর"। পথ দীর্ঘ। মাঝে মাঝে গ্রাম, ডানদিকে পার্বত্যপথ। সে পথে একটা চায়ের দোকানও পাওয়া গেল। এসব পথে ঘোড়ার যাতায়াত খুব বেশি-উঁচু গ্রামগুলিতে মাল পৌঁছাবার জন্য প্রধানত ঘোড়া ব্যবহৃত হয়। জম্মু হিন্দুপ্রধান হলেও, ঘোড়াওয়ালারা মুসলমান। গ্রামবাসীদের বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে পাহাড়ীপথে বহু ওঠানামা করতে হয়। তাদের এক জন সাহস করে জিজ্ঞাসাই করে ফেলল কেন আমরা এত কষ্ট করে ঐ পার্বত্য পথে হাঁটতে এসেছি। শুনে লজ্জিত হলাম। আমাদের কাছে যা বিলাস ও আনন্দের, দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে তা-ই ক্লান্তিকর ও কষ্টসাধ্য।

'সোন্দর' গ্রামটি পাহাড়ের উপর। পাশ দিয়ে ছোট নদী বয়ে চলেছে। পৌঁছোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বিস্তৃত উপত্যকায় সারি সারি ক্যাম্প পড়েছে। গ্রামটি ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল-হিন্দুরাই গ্রামের প্রধান বাসিন্দা, সর্বত্র মন্দির ও দেবস্থান রয়েছে। ক্ষেতে ফলেছে ভূট্টা ও যব, টমেটো ও আলু। ঐ সন্ধ্যায় আশেপাশের গ্রাম থেকে বেশ কিছু লোক যোগ দিতে এলেন Camp Fire এ। এখানে ও মিলন হল আমাদের সাথে উপর থেকে নেমে আসা পদযাত্রীদের। একজন তো আমার বৃদ্ধাবস্থা দেখে জিজ্ঞাসাই করে ফেলল যে আমি ঘোড়ায় এসেছি কি না। আমার পাকাচুলের জন্য রোজ-ই কত না কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে তার ঠিক নেই।

Camp Fire চলল অনেক রাত্রি পর্যন্ত-গান কবিতা 'শায়ের' রচনার ধূম পড়ে গেল। ঐ রাতে সুব্রত বসুর প্রতিভা আবিষ্কৃত হল-একটি গান গেয়ে তিনি সভা মাত করে দিলেন। গানটি কে লিখেছেন বা সুব্রত বসু-ই লেখক কি না তা আমার জানা নেই। প্রথম লাইনটি এরকম "জরা ক্যাম্প মে আকর দেখো ক্যা হাল হামারা।" মর্মকথা হল-শিবিরবাসী অসহায় পদযাত্রী তার মা পিসি নানীকে দুঃখ করে বলছে, " এসে দেখো আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়ার কী হাল। বাড়ীতে কত আদর করে সেধেছ তখন খাই নি, এখন সদাসর্বদাই তোমাদের কথা মনে পড়ছে।" খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল গানটি, বলতে গলে সব Camp Fire এর Opening Song ছিল এটি । মনে হয় এই গানের দৌলতেই ক্যাম্পে সময় মতো না পৌঁছোনর অপরাধটি তাঁর মাপ হয়ে গেল বিনা শাস্তিতে। পরে গানের একটি স্তবক সংগ্রহ করে ছিলাম ঃ

'ইঁহা দুধ মিলে না পানী
ঔর রোটি পড়ে পাকানি
ফির ইয়াদ আতি হ্যায় নানি
জরা ক্যাম্প মেঁ আ-কর দেখো
রুকস্যাক উঠা কর দেখো
হোতি হ্যায় ট্রেণিং কৈসে
জরা ক্যাম্প মে আকর দেখো।"

'সোন্দর' গ্রামটির একটু উত্তরে নন্তনালা মারাউ নদীতে পড়েছে। এবং সেই মিলিত প্রবাহ দক্ষিণ পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে বয়ে গিয়ে "মারুসুদারে" এসে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলেছে। আমাদের গন্তব্য স্থল নন্তনালা-মনে হয় নদীটির নাম থেকেই গ্রামের ঐ নাম। যাত্রাপথ ১০/১১ কি.মি.। সোন্দর থেকে বেরিয়ে খানিকটা সমতল ভূমি। শোনা গেল, কাছেই উষ্ণ কুন্ড আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি ছেলেরা সেটা আগেই দখল করে বসে আছে, ফলে ঠান্ডা জলেই স্নান করতে হল। তবে দ্বিপ্রহরের রোদ ছিল বলে রক্ষা।

ক্রমশ গ্রামগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন শুধুই বনাঞ্চল আর পাহাড়ী পথ। পাকদন্ডী ধরতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম, কিছুদূর যাবার পরই কাঁটালতা দিয়ে বন্ধ। ২/৪ বার এরকম হবার পর একটা উঁচু পাথরে উঠে দাঁড়িয়ে পথের হদিশ পাবার চেষ্টা করলাম। চিৎকার করলাম। চতুর্দিক নির্জন নিঃশব্দ-আমার চিৎকার কে শুনবে! বেলা তিনটে বেজে গেছে, তখন ক্রমশ দুটি ঘন্টা কেটে গেল পথ খুঁজতে খুঁজতে। শিবিরকর্তা খোঁজ করতে না আসা পর্যন্ত এখানেই পড়ে থাকতে হবে নাকি এরকম দুশ্চিন্তা পাগল করে দিল। একমাত্র সান্ত্বনা ৭ টার আগে অন্ধকার হয় না। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পথের পাশের কর্দমাক্ত জল খেতে যাচ্ছি, এমন সময় আকস্মিক এক গ্রামবাসীর আবির্ভাব হল। তিনি জানালেন আর একটু এগোলেই পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ও কল পাওয়া যাবে, তারপরেই নন্তনালা গ্রাম শুরু হয়ে যাবে। শুনে ধড়ে প্রাণ এল। ঐ গ্রামবাসীটি সৈনিক, ছুটিতে বাড়ী ফিরছেন। তাঁদের বাড়ী যাবার অনুরোধ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

উঁচু টিলায় কয়েক ঘর বসতি চোখে পড়ল। এক মহিলা শিবিরের পথ দেখিয়ে দিলেন; এমন সময় শিবিরকর্তা উপরে উঠে এসে আমায় নিয়ে চললেন।

তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তিনি বোধহয় আমার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ পথে বরফও ছিল ঐ সময়।

শিবিরটি ছিল নীচে নদীর ধারে, জায়গাটাও স্যাঁতসেঁতে। শিবিরে সেদিন আটা ও পেঁয়াজ ছাড়া অন্য রসদ ছিল না। কিন্তু ঐ পেঁয়াজ দিয়েই চমৎকার তরকারি হল পুরীর সাথে। ঐ সব শিবিরকর্তাদের তুলনা নেই। অল্প বয়সের ছেলেরা ট্রেনিং নিয়েছেন, শিবিরের ভার নিয়েছেন। রসদ, জ্বালানী ইত্যাদি কষ্ট করে সংগ্রহ করা, শিবিরবাসী প্রত্যেকের সুযোগ সুবিধা দেখা সবই করেন যোগ্যতার সাথে। আবার কখনও কোন রাত্রে একাও থাকতে হয়-ঐ প্রান্তরে সাহস না থাকলে যা সম্ভব নয়। কেউ হারিয়ে গেলে খুঁজে আনতে হয়, প্রত্যেকে ফিরেছেন কিনা শিবিরে জানতে হয়। গ্রামবাসীদের সাহায্য নিতে হয়, যোগাযোগ রাখতে হয় সবার সাথে।

রাত্রে যথারীতি Camp Fire হল। ঐ রাত্রে কিছু সরকারী কর্মচারী যোগ দিলেন-এঁরা চাকুরিসূত্রে ওখানে এসেছিলেন। ওঁদের কাজ ছিল গ্রামবাসী ও জন্তুজানোয়ারদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া এবং তদারকী করা-যাঁরা গ্রাম ছেড়ে উঁচু পাহাড়ে ভেড়া চরাতে যেতো তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কষ্ট করে এঁদের Camp এ থাকতে হয়। কারণ নন্তনালার পরে আর গ্রাম নেই।

নন্তনালা থেকে পরদিন সকালে বার হয়ে দেখি অসংখ্য ভুর্জবৃক্ষের ছড়াছড়ি। এদিন আর পথে কোন গ্রাম নেই। নদী আর ওপারে পাহাড়। কত যে প্রান্তর পার হলাম! হঠাৎই এক প্রান্তরে বৃহৎ লাল নিশান উড়ছে দেখা গেল-পথের চিহ্নও দেওয়া রয়েছে। পশ্চিমে দূরের পাহাড় থেকে হিমবাহ নেমে এসেছে একেবারে পথের উপরে, প্রায় মাইল খানেক বিস্তৃত। ঐ রকম দুটি হিমবাহ পার হতে হল। তারপর এক নালার (নদী) মধ্যে দিয়ে পথ-প্রবল স্রোতে নুড়ির উপর দিয়ে হাঁটা কঠিন তাই সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করতে হল। এটি পার হয়ে পথ চলে গেছে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। শিবিরের আভাস পাওয়া গেল-অন্ধকার হয়ে আসছে তখন। ডানদিকে দেখা যায় ব্রহ্মাশিখর নং ২ এবং ৩। ১ নং এখান থেকে দেখা যায় না।

এক উপভোগ্য সন্ধ্যায় Camp Fire হল —ফিরতি দলের সাথে মিলে। সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যেককেই কিছু কিছু জ্বালানী সংগ্রহ করে আনতে হয়। ঐ দিন রাতের অনুষ্ঠানটি স্মরণীয়। গোয়া থেকে এসেছেন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ও তাদের কলেজের মিশনারী শিক্ষক দুজন। সকলেই হেমন্ত মুখার্জির গানের অনুরাগী। এঁদের

অনুরোধে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হল। সকলেই নানাভাবে অংশগ্রহণ করলেন।

পরদিন ভোরে পর্বতারোহণ শিক্ষক শ্রীনেগী আমাদের নিয়ে গেলেন রক-ক্লাইম্বিং অভ্যাস করাতে; তারপর বরফের উপর হাঁটা শেখাতে-সকালের ব্যায়াম হল সেদিন এটি। বেশ বেলা করে ফিরে খাওয়া, বিশ্রাম ও বনাঞ্চলে ভ্রমণ। জ্বালানী সংগ্রহ করতে এক ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এখানে একটি মন্দির মত আছে-চূণাপাথর ক্ষয়ে স্ট্যালাকটাইটের স্তম্ভ সৃষ্টি হয়েছে, আয়তনে ছোট। বিশেষ সময়ে গ্রামবাসীরা এখানে পূজা দেন।

আমরা ব্রহ্মাশিখর ২-এর নীচে রয়েছি, একটু দূরে ৩নং দেখা যাচ্ছে। দূরে তুষারের গলিত ধারা কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনো তা জমাট বাঁধা বরফ। এর নাম ত্রিসন্ধ্যা। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ত্রিসন্ধ্যা-অর্থাৎ দিনে তিনবার এরকম হয় এবং তা দেবতার লীলা। আমার নিজের ধারণা বরফ জমে ভারি হয়ে উপরের চাপে নীচে এলে তার থেকেই জলধারা সৃষ্টি হয়। সেটি শেষ হলে আবার নতুন বরফের স্খলন না হওয়া পর্যন্ত ঐ ধারার সৃষ্টি হয় না ---এর মধ্যে অলৌকিক কিছুই নাই। কিন্তু গ্রামবাসীদের অন্ধ বিশ্বাস কে ভাঙাবে?

যাত্রাশেষে ঐ এক পথ দিয়েই ফেরা। তবে পারমার থেকে না হেঁটে বাসে আসার নির্দেশ ছিল। সন্ধ্যাবেলা বিরাট জনসমাবেশে সুন্দর Camp Fire হল। গান, কবিতা, শায়ের, ম্যাজিক-সবাই নিজ নিজ প্রতিভা প্রদর্শন করলেন। আমিও বাদ গেলাম না। বহু অজানা লোকের সঙ্গে বিশেষ করে অন্য প্রদেশের তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। এর ফলে ভারতের সুদূর প্রান্তে যাবার সময় এঁদের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে কচ্ছ এলাকায় পরছামে বৃহৎ রণ ভ্রমণের সময়। এই যে চেনা জানা সেটা উপরি লাভ। মাসখানেক ধরে এত জনের ট্রেকিং-এর আয়োজন করা খুবই কঠিন ও ব্যয়বহুল। পরিশেষে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিবরণী শেষ করি। ফেরবার দিন ভোরে দেখলাম এব দম্পতি এসেছেন তাদের শিশুপুত্রকে নিয়ে। মরগ্যান ও সিনথেন পাশ অতিক্রম করে আবার glissading করে নেমে আসবেন যে রুটের কথা আগেই বলেছি। শিশুপুত্রকে মা-এর পিঠে শক্ত করে বেঁধে ওঁরাও যাবেন ঐ পথে ও ঐ ভাবেই নামবেন। খুবই ভাল লাগল ওঁদের উৎসাহ ও সাহস দেখে। যৌবনের ঐ দুঃসাহসই তো পৃথিবীকে উন্নতির পথে এনে দিয়েছে —তাই নয় কি?

জ্যোতি চৌধুরী

কিন্নর লোক

সকাল আটটায় কল্পা থেকে যাত্রীবাহী মোটরবাস ছাড়লো। পথ পরিষ্কার থাকলে আজই জিউরী অথবা রামপুর পৌঁছে যাবে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। এই সেদিন পর্যন্ত এই পথটুকু পার হতে সময় লাগতো অন্তত দশ-বার দিন। আর কি নিদারুণ কষ্ট ছিল সেই পথে। আহার নেই, আশ্রয়-স্থান নেই, তৃষ্ণা মেটাবার জলটুকু পর্যন্ত মেলে না। খাড়া পাথরের বুক চিরে, শতদ্রু অববাহিকার পাশ দিয়ে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোডে ক্যারাভানের সাথী হওয়া ছাড়া একক ভ্রমণ প্রায় অসম্ভবই ছিল। কত শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করে আজ সভ্যতার বাহন মোটর গাড়ী মাত্র কয়েক ঘন্টায় পার করে দেয় বিভীষিকাপূর্ণ পার্বত্য পথ। যোগাযোগের প্রথম পর্যায়ে এখনও কিছুটা অনিশ্চিত যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তবে সেটুকুও আগের তুলনায় নগণ্যমাত্র।

সকালের হাঁড়-কাঁপানো শীতে আপাদমস্তক গরম পোশাকে মুড়ে বসেছিলুম মোহনলালের পাশে। বারে বারে শুধু কিন্নর-কৈলাশের দিকে ফিরে তাকাই, আবার কবে দেখা পাবো জানি না। আর কোনও দিনই হয়তো আসা হবে না। কিন্তু আশা মেটে কই? রজত কিরীটী কৈলাশের শীর্ষদেশে প্রথম সূর্যের আলো পড়ে পেছন থেকে। অপূর্ব মহিমান্বিত শেতশুভ্র শিখর দেশে রঙের খেলা শুরু হয়। ওরা বুঝি হাতছানি দিয়ে ডাকে আমায়। বিদায় দেবার রীতি এখানে নেই। অনাদি অনন্তকালের আবাহন শুধু ইঙ্গিতে জানায়। ওই রূপের নেশায় পাগলের মতো ছোটে মানুষ সব কিছু ভুলে। কি যে যাদু আছে হিমালয়ের, দুর্নিবার আকর্ষণে বারে বারে ঘরছাড়া করে আমায়, টেনে আনে অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ভরা দেবতাত্মার চরণে।

চলেছি আজ কিন্নরের অন্যতম বিশিষ্ট অঞ্চল সাঙ্গলা উপত্যকায়। বসপা নদীর অববাহিকায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কিন্নরের প্রধান বসতি সাঙ্গলা। রামপুরের পথে কল্পা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বসপা শতদ্রুতে মিশেছে। সঙ্গম-স্থানটির নাম কারছাম। বেলা দশটার কিছু পরে মোটরবাস থেকে নেমে পড়লুম আমি আর মোহনলাল চৌহান। আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ী চলে গেল টাপরী অভিমুখে।

কারছাম শতদ্রুর ওপরে প্রকান্ড লোহার সেতু পার হয়েছে প্রধান সড়ক। তার আগেই আর একটা পথ বাঁ দিকে ঘুরে অল্প দূরেই বসপা নদীর ওপরে ছোট একটা ব্রীজ পার হলে ওপারে বসতি। মোহনার অদূরে শতদ্রু তীরে সদ্য নির্মিত সরকারী আবাসগুলি। বসপা নদীর ওপর দিয়ে, অর্থাৎ তার গতিপথের বাঁদিকে ধরে সরু পথ সাঙ্গলা অভিমুখে চলে গেছে। নদীর ডান তীর ধরে নতুন সড়ক তৈরি হচ্ছে। ওপারের পথ গাড়ী চলবার উপযোগী হবে। সাঙ্গলার দূরত্ব কারছাম থেকে বার মাইল। এ জায়গার উচ্চতা ছয় হাজার ফিট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে।

কারছামে কোন মোটবাহক পাওয়া গেল না। মোহনলালের পরিচিত স্থানীয় একমাত্র ব্যবসাদারের জিম্মায় রইল আমার সুটকেশ। শুধু পিঠের ঝোলাটা নিয়ে যাত্রারম্ভে চায়ের দোকানে ঢুকলুম। তাঁবুর মধ্যে চা রুটির হোটেল নতুন হাইওয়ের সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে সম্প্রতি। এগুলো হয়েছে প্রধানত বর্ডার রোডওয়েজ এবং পরিবহন কর্মীদের প্রয়োজনে। বিলাসিতা অথবা আরামের আশা নেই। বাহুল্যবর্জিত দীনহীন আয়োজন কেবলমাত্র উদরপূর্তির তাগিদে। মানুষের প্রাথমিক চাহিদা মেটানই এখানে অত্যন্ত দুষ্কর।

দু'টি সুন্দরী কিন্নরী ভেতরটা আলো করে বসে আছে। তাদের পোশাকে বিচিত্র রঙের বাহার। হাসিমুখে ছোটটি এগিয়ে এলো আমাদের আপ্যায়নে। অন্যতমা ভরা যুবতী শুধু নিরীক্ষণ করে আড়চোখে। পাহাড়ী পথে খালি পেটে পথ চলা কষ্টকর। হিমালয়ের সর্বত্র নদীপথ অবলম্বন করে পথ তৈরি হয়েছে। নদী যেমন লাফাতে লাফাতে পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে চলে, পথগুলোও তেমনি উঁচু নিচু অর্থাৎ চড়াই ও উৎরাইয়ে ভরা। গুরুতর শরীরিক পরিশ্রম হয় এইসব পথে পায়ে হেঁটে চলতে। কাজেই পরোটা আর চা সহযোগে পেট ভরতি করে রওনা হলুম বেলা এগারটার কিছু পরে। ঝাঁঝালো কড়া রোদের জ্বালায় গরমজামা ইতিমধ্যেই খুলে ফেলেছিলুম। মোহনলালের কাঁধে একটা ক্যামেরা আর জলের বোতল ঝুলিয়ে কিছুটা বোঝা কমিয়ে নিলুম।

দীর্ঘ পদ যাত্রায় ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছি দু'জনে। নদীর এপারে পাহাড়ের গা বেয়ে অপ্রশস্ত পথটি অশ্বতর চলবার উপযুক্ত। পাহাড়ে সবুজের সমারোহ। পাইন চিলগোজা প্রভৃতি যথেষ্ট বড় গাছ থাকলেও পথে ছায়া বড় একটা মেলে না। ওপারের নির্মীয়মান পথটা কিন্তু একেবারেই নেড়া পাহাড়ের গা

বেয়ে চলেছে। ওদিকে গাছপালার বালাই নেই। মাঝখান দিয়ে দুরন্ত বেগবতী পাহাড়ী নদী ধেয়ে চলেছে, নৃত্যপরা তন্বীর যৌবনোচ্ছল রঙ্গভঙ্গে। পাহাড়ের মাথায় দূরে দূরে দু'য়েকটা গ্রামের চিহ্ন নজর পড়ে। নদীর এপারে বিস্তীর্ণ এলাকায় তিব্বতী শুকনো হাওয়ার দাপট নেই। কাজেই ছায়াশীতল সবুজে ঢাকা পাহাড়গুলোতে মানুষের বসতি সম্ভব হয়েছে। যেমনটি আছে গাঙ্গেয় উত্তরাখণ্ডে কুলু কাংড়ায় আর হিমাচলের অন্যান্য অংশে।

পাহাড়ী পথে চলতে শত অসুবিধা। গুরুতর পরিশ্রম আর ক্লান্তি আছে। প্রখর সূর্যের তাপে শরীর পুড়তে থাকে। ঘন ঘন তৃষ্ণা পায়। বুকে হাঁফ ধরে। কিন্তু অল্পক্ষণ বিশ্রামেই শ্রান্তি দূর হয়। শরীর জুড়িয়ে যায় উঁচু পাহাড়ের ঠান্ডা হাওয়ার গুণে। আজীবন সমতলবাসী হয়েও পার্বত্যপথে পদযাত্রায় বড় আনন্দ পাই। সমতলের দিগন্ত প্রসারিত দূর পথে দৃষ্টি বাধা পায় না। আর পাহাড়ের পথ এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে চলার ফলে কত বৈচিত্র্য আর নব নব শোভায় পথশ্রমের কষ্ট ভুলে যাই। যেন রূপকথার বইতে পড়া বাল্যের কৌতূহল আর রোমাঞ্চকর জগতকে ফিরে পাই। তাই বুঝি বারে বারে ফিরে যাই হিমালয়ের অন্দরমহলে। কস্তুরীমৃগ যেমন আপন গন্ধে মাতাল হয়ে ছোটে, মনের আনন্দে বিভোর হয়ে হাঁটি হিমালয়ের পথে। পথের ধারে অজানা হাজারো রঙের ফুল আর পাখী আর পর্বতের বর্ণ সুষমায় পুলকিত হই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর অজানা অরণ্যের বিভীষিকায় ভীত হয়ে মাতৃনাম স্মরণও করি। বিশ্বরূপ দর্শনের মাঝে ভগবানের বিরাটত্ব অনুভব করি নানাভাবে।

বসপা নদীর বাঁ-ধার দিয়ে চলেছি। পথের ডানপাশে খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর। বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ এই পথে ছায়া নেই। প্রখর সূর্যের তাপে গায়ে ঘাম ঝরে। কারছামের চায়ের দোকানে দেখা যুবতী আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে। তার চলার পথে তাকিয়ে মোহনলাল বলে 'কেমন দেখছেন ওকে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকাই।

'ওই মেয়েটি এই অঞ্চলে বেশ বিখ্যাত', মোহনলাল বলে। 'সরকারী সংস্থার একটি কর্মচারীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ব্যাপারটা ক্রমে স্থানীয় আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক হাজার টাকা এই মেয়েটিকে দিয়ে লোকটি পরিত্রাণ পায়। সেই থেকে মেয়েটির নাম হাজারপতি।'

বেলা প্রায় সাড়ে বারটায় পৌঁছলুম তিন মাইল দূরবর্তী বরু গ্রামে। পোস্টাফিসের পাশে চায়ের দোকানে বসে শ্রান্তি অপনোদন করি। এক গেলাস চা খেয়ে আবার চলা শুরু হয় পনের মিনিট পরেই। দূরপাল্লার পদযাত্রায় বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে সাহস হয় না। পাহাড় জঙ্গলের পথে দিনের আলো থাকতে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানো দরকার। দুর্যোগ আর দুর্বিপাক তো সাথী হয়েই আছে। অতএব আবার পিঠের ঝোলা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলি। সামনের পথটুকুই শুধু নজরে পড়ে। পথের শেষে কি যে বিধাতার নির্দিষ্ট আছে জানি না। জানি শুধু আমায় চলতে হবে। ফলাফলের অধিকার তো তিনি আমায় দেননি। চলার পথ থেকে কুড়িয়ে নিই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ঝুলি আমার ভরে ওঠে নানা দেশের কত শত আভরণে! কত মানুষের আর কত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য স্মৃতির ভান্ডারে জমা হয়।

জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী পথে চলেছি নদীকে সাথী করে। হিমালয়ের সবত্র একই নিয়ম। পর্বতের শীর্ষ দেশ থেকে বরফ গলা জল ঝরনার আকারে ঝরে পড়ে অঝোর ধারায়। শত সহস্র ঝরনা একত্রে পাহাড়ী নদীর আকারে বন-জঙ্গল আর পাথরের অবরোধ ভেঙ্গে দুর্বার গতিতে নেমে চলে সমতলের দিকে। পর্বতের গভীরতর অঞ্চলে যাবার একমাত্র নিশানা এই নদীপথ। দুষ্টু মেয়ের মতো কতো ছলাকলায় বসপা নদী হাসি গান আর নৃত্যছন্দে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলে। বিচিত্র খেয়ালে রচা তার গতিপথে ঘুরে ফিরে আর এঁকে বেঁকে আমরা চলেছি পায়ে চলার সামান্য পথরেখা ধরে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখে। পাহাড়ের পথে ব্যস্ততার ফল ভাল নয়। ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলার নিয়ম মেনে না চললে, হয়রানির মাত্রা বেড়েই যায়। শাস্ত্রবাক্য 'শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনে' অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পালন করা কর্তব্য। অথচ দিনের আলো থাকতে থাকতেই কোনও নির্ভরশীল আশ্রয়ে পৌঁছানও দরকার। নইলে সমূহ বিপদ। সূর্যাস্তের পরে দ্রুত অন্ধকার নেমে আসে। পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিপত্তির নানা ব্যবস্থা একযোগে পথিকের সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। জীবনসংশয় অজানা অরণ্যের বিঘ্নসঙ্কুল পথে রাতের অন্ধকার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কারছাম থেকে ছয় মাইল দূরে সোঙ্গ (Shaung)। বেশ ভাল একটা হোটেল আছে এখানে পথের ধারে। বেলা দুটোর পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে সোঙ্গে পৌঁছে চায়ের দোকানে বসে কিছুটা বিশ্রামের অবসর খুঁজি। রোদের ঝাঁজে আর একটানা

চড়াই পথে পিঠে বোঝা নিয়ে ক্লান্তিকর পদযাত্রায় অবকাশ প্রয়োজন। এ জায়গাটা গন্তব্যস্থানের ঠিক মধ্যপথ। আরও ছয় মাইল দূরে সাঙ্গলায় পৌঁছাতে হবে সন্ধ্যার আগেই। ফলে এক কাপ চা পান করেই আবার চলা শুরু করতে হয়। সোঙ্গখাদ নামে একটা পাহাড়ী ঝরনার নদী পার হয়ে এগিয়ে চলি সাঙ্গলার পথে। বরু থেকে পাইনের আর দেখা নেই। এ অঞ্চলে চিলগোজা জন্মায় না। তার জায়গায় আখরোট গাছগুলো ভিড় করে আছে। বড় বড় গাছের জঙ্গলাকীর্ণ পথে এবারে চড়াইয়ের মাত্রা বেশ বেড়ে যায়। ক্লান্তিতে শরীরটা আপত্তি জানাতে শুরু করেছে। পিঠের বোঝাটাও যেন বড় বেশী ভারী মনে হচ্ছে। দেহকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে বেচারা সারাটা জীবন আমার দুর্দান্ত খেয়ালের ঠেলা সামলিয়ে চলেছে। হিমালয়ের দুর্গম পথে বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। বেচারার ওপরে যথেষ্ট অত্যাচার আর অনিয়ম হয়েছে। তার ফলও ভুগতে হয়। কিন্তু শিক্ষা হয়নি। ফাঁক পেলেই আবার বেরিয়ে পড়ি পিঠের ঝোলাটা নিয়ে। সেই দুর্গম আর অজানার পথে।

সোঙ্গ থেকে প্রায় তিন মাইল এগিয়ে প্রচন্ড খাড়াই পথের সাক্ষাৎ পেলুম। ঘন জঙ্গলে ভরা একটা পাহাড়ের মাথায় চড়তে হবে। গভীর অবসাদে ভরা দেহটাকে কোনও রকমে টেনে নিয়ে চলেছি। আর যেন পারি না। সঙ্গী উৎসাহ দেয়। বলে সামান্যই আর অবশিষ্ট আছে। বাকীটুকু দিনের আলো থাকতে শেষ করতেই হবে। কিন্তু বুকফাটা এই সামান্য চড়াইও যেন অসহ্য মনে হয়।

পাহাড়ের মাথায় চড়তেই চোখের সামনে সিনেমার পর্দায় ছবির মতো অপূর্ব সুন্দর এক উপত্যকা ঝলমল করে ওঠে। ঝিলাম নদীর ধারে কাশ্মীর উপত্যকার মতো শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি নজরে পড়ে। মাঝখান দিয়ে বসপা নদীর বিস্তৃত জলরেখা। পাহাড়ের দেশে এমন একটি দৃশ্য দেখবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। নদীর দুই তীরে প্রান্তরের উর্বর জমিতে সবুজ ফসল। দূরে মাথায় বরফের টুপি পরা পাহাড়ের শ্রেণী। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঘাস। আর এপারের পাহাড়ে বড় গাছের জঙ্গল। যতদূর দৃষ্টি চলে বসপা নদীর অববাহিকা ধরে দুই তীরে বিশাল উপত্যকায় নয়ন সুখকর দৃশ্য। সূর্যাস্তের লাল আলোয় রঙিন একখানি অপূর্ব মনোহর চিত্র।

পাহাড় জঙ্গলের পথে পায়ে হেঁটে চলার একটা বিশেষ আনন্দ আছে। আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গভীর রসানুভূতির সন্ধান। রূপ রস গন্ধেভরা বৈচিত্র্যময়

নগাধিরাজের পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে সব ভোলানোর যাদুমন্ত্র। সুন্দরী ধরণীর মনোহর রূপের নেশায় মাতাল হয়ে ছুটি কষ্টকর বন্ধুর পথে। প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে মন ভরে ওঠে পুলকে আর অনাবিল আনন্দে। ক্লান্ত পথিকের পরম পুরস্কার অতুলনীয় দৃশ্যাবলীর মাঝে। ডুব দিই দেবভূমির রূপের সাগরে। সংসারকে ভোলবার সুন্দর ব্যবস্থা সেকালের সাধু সন্ন্যাসীরা আবিষ্কার করে গেছেন। হিমালয়ের পথে পরিব্রাজনা তাই তাঁদের আবশ্যিক ধর্ম। নির্জনতার সুখ আর আত্মচিন্তার অবসর আর কোথাও এমনটি পাওয়া যায় কিনা জানি না। দুর্নিবার আকর্ষণে তাই তো হিমালয় আমাকে কাছে টানে। বারে বারে ফিরে যেতে চাই মর্ত্যের স্বর্গলোকে।

প্রচন্ড চড়াইয়ের শেষে পাহাড়ের ঢালু পথে নেমে পড়লুম উপত্যকার মধ্যে। বহুদূর বিস্তৃত প্রায় সমতল সাঙ্গলা উপত্যকাটি এখান থেকেই শুরু হয়েছে। গোটা কিন্নরভূমির সবচেয়ে উর্বর, সুজলা সুফলা এই অংশে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতও সর্বাধিক। অতএব লোকবসতিতেও এটি সর্বপ্রধান। খাস কল্পার লোকসংখ্যা তের শত। আর আশে পাশের গ্রামগুলো বাদ দিয়েএকমাত্র সাঙ্গলাতেই আঠার শ' লোকের বাস। দু' মাইলের কিছু বেশী পথ বসপা নদীর ধার দিয়ে চলে সাঙ্গলা গ্রামটার দেখা পেলুম। নদীর ওপারে গ্রাম। এপারে ঝাউবনের কোলের মধ্যে প্রশস্ত বাগানের ভেতরে বনবিভাগের ডাকবাংলো। পথে, মাইলখানেক আগে নদীর ওপারে পাহাড়ের মাথায় কামরু দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখেছি। সেটিকে ঘিরে ছোটো খাটো একটা গ্রাম আছে। তার নামও কামরু। এ অঞ্চলে রাজপুত রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। যোগাযোগের অভাব , প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সীমান্তবর্তী তিব্বতী দস্যুদের উপদ্রব প্রভৃতি নানা কারণে তাঁরা ক্রমশ পিছু হঠতে হঠতে অবশষে রামপুরবুশহরে স্থায়ী হয়েছিলেন। কারণ যাই থাকুক সাঙ্গলা উপত্যকাটি আজও তার পুরানো ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ঘন সন্নিবেশিত সুদৃশ্য কাঠের বাড়ীগুলো আর স্বর্ণ-কলস-লাঞ্ছিত মন্দির এখনও শ্রীহীন হয় নি।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কোনও রকমে ডাকবাংলোতে হাজির হলুম। সাহেবী কায়দায় রচিত বেশ আরামপ্রদ এই বাড়িটায় প্রকান্ড বড় বড় তিনটি শোবার ঘর, খাবার এবং বসবার ঘরও আছে। একসঙ্গে বেশ কয়েকজন পরম আরামে থাকতে পারে। শয্যাদ্রব্য কম্বল প্রভৃতিও আছে দেখলুম। বাংলোটি

ঘিরে উৎকৃষ্ট ফুল আর ফলের বাগান সযত্নে লালিত হচ্ছে। বাগানের প্রান্তে নৈসর্গিক শোভা দেখবার জন্য ছাউনি দেওয়া বসবার জায়গাও রয়েছে। নদীগর্ভ থেকে অনেকটা উঁচুতে এই বাংলোর অবস্থান এবং বিন্যাসে রুচিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার পরেই দুরন্ত পাহাড়ী শীতের ঠেলায় ঘরের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে পড়লুম। জঙ্গলাকীর্ণ নদীর এ- পাশটায় ঠান্ডা একটু বেশীই হবে। তাছাড়া প্রায় মাইলখানেকের মধ্যেই চিরতুষার অঞ্চল আর উচ্চতায়ও প্রায় সাড়ে আট হাজার ফিট। বরফের এত কাছাকাছি রয়েছি হাড়-কাঁপানো হিমের দাপটে সেটা বেশ মালুম করিয়ে ছাড়ে। দুধ ছাড়া কড়া কফির মধ্যে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে সান্ধ্য আসর জমাই দু'জনে। পঞ্চায়েতের কাজে মোহনলালকে মাঝে মাঝে সাঙ্গলায় আসতে হয়। তার মুখে শুনতে পাই স্থানীয় অধিবাসীদের কথা। তাদের জীবন ধারা আর সমাজব্যবস্থা। অতি প্রাচীন অন্ধকার যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের রীতিনীতি আর দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের ইতিহাস। মাত্র কয়েক বছর আগেও এই অঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি নগণ্যই ছিল। শতকরা আশি ভাগ নিরক্ষর মানুষ আদিম প্রথায় সামান্য চাষবাস আর পাহাড়ে ভেড়া চড়িয়ে গ্রাসাচ্ছদনের জোগাড় করতো অতিকষ্টে। দারিদ্র্যের নিত্য সঙ্গী আধিব্যাধির প্রকোপও ছিল ভয়াবহ। ভারতের সুন্দরতম প্রদেশে শত অসুবিধা সত্ত্বেও যারা জন্মায় তাদের রূপের ছটায় আজও চোখ ঝলসিয়ে যায়। আলস্যে আর অত্যাচারে পুরুষরা বিবর্ণ হলেও কঠোর পরিশ্রমরতা নারীদের সৌন্দর্য সারা ভারতে সত্যিই আর কোথাও মেলে না। টানা কালো চোখ সুতীক্ষ্ন নাসা আর পাতলা রক্তাভ ঠোঁট দুটিতে হাসি লেগে রয়েছে সর্বক্ষণ। কাঁচা সোনার বরণ রঙের সাথে ভ্রমরকৃষ্ণ চুলে ভুবনজয়ী রূপ তাদের যেন ফেটে পড়ছে।

কার্যব্যপদেশে মোহনলালকে রাত্রিবাস করতে হয়েছে স্থানীয় কিন্নরদের বাড়িতে। তাদের ঘরের মাঝখানে পাকা উনুনে রুটি বানানো আর শীত নিবারণের উভয়বিধ কাজই চলে। কাঠের আগুন আর প্রচন্ড ধোঁয়ার ফলে কালিঝুলি মাখা নোংরা কাঠের মেঝেতে রাতের শোবার ব্যবস্থাও উনুনটাকে কেন্দ্র করে যেখানে সেখানে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। শৌচাগারের বালাই কোন বাড়িতে নেই বলে বোধ হয়। ঘরের আনাচে কানাচে আর পথ ঘটের আশে পাশে ঐ অবশ্যিক কাজ করার ফলে দুর্গন্ধ আর মাছির উপদ্রব যথেষ্ট। নোংরামির চূড়ান্ত ওদের কথা

শুনে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার ইচ্ছেটা ত্যাগ করতে হয়। সুন্দর কাঠের কারুকার্যখচিত বাড়িগুলোর বাইরেটা যত সুন্দর অন্দরমহলের চিত্রটি তেমনি কুৎসিত।

এখানেও কল্পার মতো সামাজিক ব্যবস্থা। জমিতে লাঙ্গল দেওয়া আর পাহাড়ের কান্ডায় ভেড়া চড়ানো ছাড়া অন্য কোনও কায়িক পরিশ্রম পুরুষরা বড় একটা করে না। উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম আর রাতে পুরুষদের আসঙ্গ সেবায় মেয়েদের জীবনটা ঠাসা। সম্প্রতি স্কুলের শিক্ষায়ে মেয়েরাও কিছু উন্নত জীবনের আস্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু পরিবর্তনটা এতই ধীর মন্থর গতিতে আসছে মনে হয় এ শতকের শেষ পর্যন্ত হয়তো ওরাও জীবনের অধিকারে সমান অংশীদার হতে পারবে। সাঙ্গলাতেও পান্ডব বিবাহের মতো বহুপতিত্ব অব্যাহত রয়েছে। সবকয়টা ভাই মিলে একটা স্ত্রীকে পালাক্রমে ভোগ করবার ব্যবস্থা এক হিসাবে ভালই বলতে হবে। একটির অধিক পরের বাড়ি থেকে আনা মেয়ে না থাকার ফলে ঝগড়া-বিবাদ আর নিত্য জীবনের কচকচি কিছুটা কমই থাকে সাধারণত। অবশ্য এ অঞ্চলে পুরুষের প্রভুত্ব অসীম। একাধিক স্ত্রী রাখবার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। মেয়েরা রয়েছে কেবল মাত্র প্রয়োজনের খাতিরে। তাদের মনের খবর রাখবার সময় কারও নেই বলেই মনে হয়। এদের বিবাহব্যবস্থাও তেমনি অদ্ভুত। কন্যাপক্ষকে কিছু উপঢৌকন আর অর্থ দিয়ে মেয়েটিকে লাভ করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে লুঠ করে নিলেও দোষ নেই। কিছু ধরেই দিলেই অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেল।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসে সাঙ্গলায় বিশেষ আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে 'ফ্ল্যাচ' পরবে। শীতের প্রারম্ভে পাহাড়ের উচ্চাংশ 'কান্ডা' থেকে মেষপালকরা ঘরে ফেরে। হরেক রকমের দুর্লভ ফুল সংগ্রহ করে আনে তারা। ফ্ল্যাচ মেলার ফুলের হাটে নৃত্য গীত আর মদের স্রোত বইতে থাকে ক'দিন ধরে। সুর আর সুরার নেশায় জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন পর্বও হয়ে থাকে। ভাল লাগা কোনও মেয়ের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে বিবাহ কার্যটা সমাধা হয় সমাজসঙ্গত পদ্ধতিতে । হৃদয়ঘটিত বৈদিক বিয়ের বালাই এদের নেই।

কিন্নর কৈলাস পর্বতমালার ঠিক পশ্চাদভাগে সাঙ্গলা উপত্যকা। প্রায় সমতল সুদীর্ঘ অঞ্চলটির বুক চিরে বসপা নদী প্রবাহিতা। সাঙ্গলা ছাড়িয়ে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত আর মাত্র তিনটি গ্রাম আছে। আঠার মাইল দূরবর্তী সর্বশেষ গ্রামের নাম ছিৎকুল। গিরিসঙ্কটের ওপারে তিব্বতের ঠান্ডা মরুভূমি। অনুর্বর শুকনো মাঠ

আর বরফ। আর এপারে ভারতের সীমানায় পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা শস্যশ্যামলা সমৃদ্ধ জনপদ। তিববতী দস্যুদের লুব্ধদৃষ্টি বারে বারে পড়েছে সাঙ্গলার ওপরে। অতর্কিতে হানা দিয়ে লুটপাট করে তারা নিয়ে যেত খাদ্যসম্ভার। সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থায় বর্তমানে সরকার অবহিত হয়েছেন। বাহাদুরী আছে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। তুহিন বরফের রাজ্যে বছরের সব ঋতুতে ওরা প্রকৃতির দারুণ বাধা অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত হয়ে।

সাঙ্গলার বন সম্পদ প্রচুর। চিলগোজা না হলেও এ অঞ্চলে প্রচুর আখরোট গাছ আপনিই জন্মায়। বটপাকুড়ের আকৃতি এই বিশাল বড় বড় গাছগুলোর ফল আর মূল্যবান কাঠ কাজে লাগাতে পারলে, অধিবাসীদের দুঃখ দারিদ্র্য মোটেই থাকবে না। তাছাড়া বসপা নদীর মিষ্টি জলে অফুরন্ত মাছ। যোগাযোগের ব্যবস্থা এখনও সেই আদিম অশ্বতর বাহিনীর সহয্যেই চলেছে। দ্রুতগামী যানবাহন চলাচলের উপযোগী পথ নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলেছে। মনে হয় হিমাচল সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সাঙ্গলাবাসীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলবে । উন্নততর জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে ওরা যদি চলতে পারে, গোটা জেলার পুরোবর্তী হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব হবে না।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। কিন্নরের সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় সাঙ্গলায়। সে সময় জুলাই-আগষ্টে শেষ হয়েছে। এখন শীতের মরসুম। বরফ পড়ার পালা শুরু হয়েছে। পরিষ্কার নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো দু' এক মুঠো হালকা মেঘ ভেসে বেড়ায়। আশে পাশের পাহাড়গুলোর মাথায় এখন থেকেই বরফের সাদা প্রলেপ পড়তে আরম্ভ হয়েছে। অল্প দিনেই সারা অঞ্চলটা বরফে ঢেকে যাবে। নদীর ধারে ফসলের ক্ষেতগুলো সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে। ঘরের মধ্যে আগুনের পাশে কিন্নর-কিন্নরীরা গোল হয়ে বসে দিনরাতগুলো কাটাবে। থেমে যাবে বাইরের কোলাহল। ছিঁড়ে যাবে সমতলের যোগাযোগ। যোগমগ্ন মহাদেবের মতো হিমাদ্রিসুত কিন্নর নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবে সারা শীতকাল।

বাগানের প্রান্তে বাঁধানো ছাউনিটার নিচে বসেছিলাম। চারিদিকের দৃশ্য বসে দেখবার জন্যে কাঠের বেঞ্চ পাতা রয়েছে। ডাকবাংলোর সীমানা থেকেই জমি ঢালু হয়ে একেবারে নদীর কিনারায় ঠেকেছে। সামনেই কাঠের সেতু পার হয়ে গ্রামে ঢোকবার সদর রাস্তা ওপরের দিকে উঠে গেছে। সেই দিকে চেয়ে আনমনে

বসেছিলুম। এপারে স্কুলবাড়ি ডাকবাংলোর ঠিক নিচেই। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ক্লাস নিচ্ছিলেন একটি মহিলা। গ্রামের লোকেরা সেতু পারাপার করে। গলায় ঘন্টা বাঁধা অশ্বতর বাহিনী চলে পণ্যসামগ্রী নিয়ে। বাইরে থেকে চাল চিনি আটা আলু মসলা প্রভৃতি আনে। আর বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় পশুলোম, চামড়া, শুকনো ফল প্রভৃতি। পিঠে প্রকান্ড ঘাসের অথবা কাঠের বোঝা নিয়ে মেয়েরা চলছে নগ্নপদে। ওদের দেখলে কষ্টবোধ করি। গৃহস্থবাড়িতে গরু ঘোড়াও বোধ হয় এতটা কঠোর পরিশ্রম করে না। এমনকি আট-দশ বছরের মেয়েরাও চলছে গরুছাগল চরাতে। এখন থেকেই ট্রেনিং নিচ্ছে ওরা গার্হস্থ্জীবনে।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বাড়ে। সকালের বেশী ঠান্ডায় পথে বেরুতে ইচ্ছে করে না। ওই সময়টা মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে মৌজ করাই এখানকার রেওয়াজ। অবিশ্যি সেটা পুরুষদের বেলায়। ফলে রোমে এসে রোমানদের আচরণটাই গ্রহণ করেছিলুম। দ্বিতীয় প্রস্থ চা পান করে চললুম নদী পার হয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণে। নদীর ওপরে কাঠের সেতু পার হয়ে গ্রামে ঢোকবার সরু পথটি পাথরে বাঁধানো। অসমান ছোট বড় প্রস্তর খন্ড পাশাপাশি সাজিয়ে গাঁথা হয়েছে। কেবলমাত্র প্রয়োজন মেটানোই উদ্দেশ্য। কোন্য রকম রুচিজ্ঞানের পরিচয় নেই। পথটি ক্রমশ উঠে গেছে ওপরের দিকে। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা তোরণের ধাঁচে গেটওয়ে করা হয়েছে। তার পাশেই কয়েকটা দোকানে মুদিখানা থেকে জামাকাপড় জুতো প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মোটামুটি অতি ছোট্ট একটা বাজারের মতো। অল্পদূর উঠেই স্থানীয় হিন্দু মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কারুকার্যখচিত কাঠের মন্দির। বদরিনীথের বিগ্রহ স্থাপিত রয়েছে। কল্পায় যেমন দেবী চন্ডিকা হলেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এখানে তেমনি বদরিনাথ।

হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সমতল থেকে আগত হিন্দুদের রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। সেইসঙ্গে কৃষ্টি এবং ধর্মের মিশ্রণেও এক এক জায়গায় এক এক রকমের সংস্কার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনা আর অসংখ্য কিংবদন্তী সরল পাহাড়ীদের জীবনে গভীর শিকড় গেড়ে বসেছে। গাঙ্গেয় উত্তরাখন্ডে যেমন ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের আর্য সভ্যতা অবিকৃত অবস্থায় রূপ নিয়েছে। সে অঞ্চলের নদী পাহাড় ঝরনা আর দেবদেউলের নামগুলি আজও সেই সাক্ষ্য

বহন করে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে। এনমকি কুলু কাংড়া এবং কাশ্মীর উপত্যকাতেও আর্য সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল । কিন্তু কিন্নরের গভীরাঞ্চলে সম্ভবত হিন্দুদের আগমন ঘটেছে মাত্র কয়েকশ' বছর। মনে হয় মুসলমান আক্রমণে পীড়িত রাজপুতরাই প্রথমে হিন্দুসভ্যতা আনেন।

ধর্ম ও সংস্কৃতির হিসাব করলে দেখা যায় সমগ্র হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত। সিন্ধু বা বিতস্তার অববাহিকা থেকে শুরু করে শতদ্রু নদী পর্যন্ত প্রথম ভাগ, যমুনা আর ভাগীরথী উপত্যকা থেকে উত্তরপ্রদেশ ও নেপাল সীমান্তের কালি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি দ্বিতীয়। তৃতীয় ভাগ তিস্তা পর্যন্ত এবং সিকিম দার্জিলিং থেকে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদী পথটি চতুর্থ ভাগ। প্রথম দু'টিতেই আর্যধর্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তৃতীয় ভাগ শৈব-শাক্ত (তন্ত্র) এবং বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে সনাতন সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটেছে। যদিও নেপাল এবং আসামে হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনায় যথেষ্ট গোঁড়ামি আজও বর্তমান আছে। আপতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে যুগে আর্যহিন্দুরা কালি নদীর পূর্বদিকে বেশী মনোযোগ দেন নি।

সাঙ্গলায় বদরিনাথ মন্দিরের পেছনেই বৌদ্ধ অবলোকিতেশের গোম্ফা বা মন্দির। সেখানে যথারীতি লামারা রয়েছেন তাঁদের ধর্মকর্ম নিয়ে। বৌদ্ধ এবং হিন্দুয়ানীর এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর কোথাও বড় একটা দেখি না। ধর্মের গোঁড়ামি সমাজজীবনে বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় দেয় নি। মেলা আর পর্ব উপলক্ষে দু'টি মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হয়। সেই সময় লোকাচার আর নৃত্যগীতের আসরে ওরা দেবতার স্থানটি দিয়ে রেখেছে সব কিছুর পুরো ভাগে। নেগী সুন্দরদাস আর নেগী বুজুগ সেন বদরিনাথ মন্দিরের 'মাথস্' অর্থাৎ প্রধান ব্যবস্থাপক। পূজারী ছাড়াও তিনজন 'গ্রোকস্' আছেন। যাঁদের মুখ দিয়ে বদরিনাথ কথা বলেন। কৈতস্ বা কায়স্থ জাতের দু'জন কারদার মন্দিরের কাজকর্ম করে। ফাল্গুন মাসে বদরিনাথের বিশেষ মহোৎসব হয়। সে সময় আরও কয়েকজন কারদার নিযুক্ত হয়। তাদের বলা হয় 'চোখেস'। সাঙ্গলাতে পৈতে পরার পেওয়াজ নেই। কারদারেরা পরে। চোখেসরা পর্বের সময় কয়েকদিন কারও শরীর স্পর্শ করে না। কিন্নর কৈলাস থেকে অনীত পবিত্র জলধারায় স্নান করে পর্ব শুরু করে।

অপেক্ষাকৃত খর্বকায় পাহাড়গুলোর কোলের মধ্যে সাঙ্গলা গ্রাম নদীর ধার

বরাবর বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্রস্থে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি গাছপালার অভাবে। বরফ পড়ার আধিক্যে পাহাড়ের ঊর্ধ্বাংশে কোনও বড় গাছ টেকে না। গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট চুল্লি, আপেল আর আখরোট গাছ আছে। ভাল আপেলের চাষ কল্পার আশেপাশেই বেশী। এখানে চিলগোজা হয় না। কিছু ভাল জাতের আঙ্গুর জন্মায়। পাহাড়কে এরা বলে 'ঢাক'। ঢাকের ঊর্ধাংশের নাম কান্ডা। সেখানে গ্রীষ্ম কালে বরফ গলে ছোট জাতের ঘাস জন্মায়। ভেড়া-ছাগলের উৎকৃষ্ট খাদ্য। অতি দ্রুত ভাল জাতের পশম উৎপাদনে বিশেষ সহায়তা করে এই পুষ্টিকর ঘাস। চাষবাস ছাড়া পশু পালনই লাঙ্গলাবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

গ্রাম বাঙলায় চন্ডীমন্ডপের মতো এখানে প্রধান আড্ডাখানা হলো পঞ্চায়েত বাড়িটায়। সেক্রেটারীর সঙ্গে সামান্য কিছু আলাপ-আলোচনা হলো। মনে হয় এরা মোটেই আলাপী নয় আর বাইরের লোকদের বেশ একটু সন্দেহের চোখেই দেখে। খুব বেশী দোষও দেওয়া চলে না। অপূর্ব সুন্দরী ও সেবাপরায়ণা মেয়েদের সঙ্গে বিদেশীর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে উন্মুখ হওয়াটা নিতান্তই স্বাভবিক। স্ত্রী স্বাধীনতা যতটা সম্ভব ঠেকিয়ে রাখবার শেষ চেষ্টা করা ছাড়া ওদের আর গতিই বা কি?

গ্রামের মধ্যে পথঘাটগুলোর ছিরিছাঁদও নেই। তেমনি অপরিচ্ছন্ন আর দুর্গন্ধময়। পথের ধারে কাঁচা-পাকা নর্দমায় পায়খানার কার্যটি বিনা দ্বিধায় সম্পন্ন হয় সর্বত্র। সরকার থেকে এদিকে একটু নজর দিলে সাঙ্গলা ভ্রমণ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা আর চিত্র বিচিত্র কাঠের বাড়িগুলো অতি সহজেই লোকের মন হরণ করে। এ বিষয়ে গোটা কিন্নর জেলায় কল্পার পরেই সাঙ্গলার স্থান। আবহাওয়া অতীব আরামপ্রদ। ঝড়ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানে অনেকটা মৃদু। সর্বত্রই যেন একটা কোমলতার ভাব ছড়িয়ে আছে। আগেই বলেছি রামপুররাজের প্রথম রাজধানী এই উপত্যকাতে ছিল। কামরু দুর্গের আশেপাশে, বসপা নদীর দুই তীরে চাষবাস আর ফলফুলের অফুরন্ত ভান্ডার রাজপুতদের রাজ্যস্থাপনায় বিশেষ সাহায্য করেছিল। ক্রমে রাজ্য বিস্তার করে তারা সমগ্র কিন্নর এলাকা অধিকার করে নেয়। এবং পছন্দ মতো রাজধানী স্থাপনা করে রামপুরে। কারছামের কাছে একটা পাহাড়ের মাথায় প্রাসাদে রামপুর রাজের 'গুজেরানী'বাস করতেন। তিব্বত দেশের একটি রাজতনয়া রামপুর রাজের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। এখন অবশ্য রাজ্যপাট হিমাচল সরকারের অধীনে চলে যাওয়ায়

তাঁরা সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়েছেন। যদিও কিছু ভাতা, জায়গির প্রভৃতি ভোগ করছেন, কিন্তু একচ্ছত্র প্রভুত্ব আর নেই। গুজেরানীর প্রাসাদ যে স্থানটিতে আছে, সে জায়গার নাম সাপ্নি। কারছাম থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে।

সাঙ্গলায় বাস করবার মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হলুম লাটসাহেবের শুভপদার্পণের কারণে। মাত্র দু' রাতের অভিজ্ঞতা ঝুলিতে ভরে নিয়ে আবাব পথে নেমে পড়লুম। পেছনে পড়ে রইলো বসপা উপত্যকার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন। দুরূহ কঠিন পার্বত্য পথের পরিক্রমায় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন বিশ্রামের অবসর খোঁজে। সাঙ্গলার ডাকবাংলো এ পথের আদর্শ চিত্তবিশ্রাম। বাগানের প্রান্তে বসে শুধু নদীর আগমন পথের দিকে চেয়েই বহু সময় কেটে যায়। দৃষ্টির ভেতরে নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। আর মধুর বিশ্রাম। উত্তেজনার কোনও বিষয় নেই। নেই অকারণ দেহমনের পীড়ন। সমতলের চাঞ্চল্য এখানে নেই। নেই কোনও ব্যস্ততা। জীবনযুদ্ধে রণক্লান্ত সৈনিকের আদর্শ বিরামস্থান।

কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকবার পরোয়ানা নিয়ে তো আসিনি এখানে। স্বর্গবাসের পুণ্য সঞ্চয় আমার অদৃষ্টে নেই। তাইতো ফিরে যেতে হয় বারংবার। ফিরে যাই মর্ত্যের কারাগারে। জমার অঙ্কে সুকৃতির ভাগ যে বড়ই কম। তবু সান্ত্বনা পাই, অন্তত ক্ষণকালের জন্যও অমৃতলোকের আস্বাদ পেলুম। আনন্দোচ্ছল কিন্নরবাসের স্মৃতিটুকু সম্বল করে ফিরে চলি।

ভক্তি বিশ্বাস

হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ

প্রত্যুষে স্বামীজীর স্তোত্র পাঠের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। কাল রাত্রে তাঁর মাথা ধরা, জ্বর ভাব হয়েছে, তবু তিনি দিগন্ত মুখরিত করে গাইছেন

"দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়।
তস্মৈ-য কাবায় নমঃ শিবায়।
নমঃ শিবায়।
নমঃ শিবায়।।

সুরের মূর্ছনা কাঁপতে কাঁপতে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কিছুক্ষণ বাদে কুলিদের আওয়াজ এবং ক্রমে ক্রমে মেজর সাহেবের শীতার্ত কণ্ঠ শোনা গেল। কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা, কেউই বাইরে বেরুতে রাজী নই।

খানিক বাদেই দাদার কণ্ঠস্বর, বলছেন,"আজকের মতন এমন পরিষ্কার দিন এ পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যে জোটেনি।" অর্থাৎ দাদা ও মেজর সাহেব দুজনেই বাইরে বেরিয়েছেন। আমরা তাঁবুর দরজা ফাঁক করে একটু উঁকি মেরে দেখি। কিন্তু বাপস্ কি ঠান্ডা! দাদা ও মেজর আবার ভিতরে ঢুকেছেন।

রোদ্দুর আমাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছাতে বেলা সাড়ে আটটা বেজে গেল এবং আধঘন্টার মধ্যেই আমরা সবাই তৈরি। যাত্রার তোড়জোড় করতে শুরু করে দিয়েছি। আমাদের আজ কালিন্দী খাল (19,510 ফুট) পার হতে হবে। মনে মনে বেশ একটা উদ্বেগ অনুভব করছি সবাই।

সামনের ধস-সর্বস্ব পাহাড়টিকে দূরে রেখে আমরা হিমবাহের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে লাগলাম। উজ্জ্বল সূর্যালোকে সুবিশাল প্রান্তর যেন জ্বলছে। পথে চলতে চলতে অজস্র ফাটল পড়ছে পায়ের সম্মুখে। তাও আবার নরম তুষারে ঢাকা ফাটল! নীল ও শুভ্র তুষারের রেখা যেন! সে গুলি বাঁচিয়ে পথ চলা। কোন কোন ফাটল দিয়ে জলধারা বইছে, সেগুলি ডিঙিয়ে চলা। পদে পদে পদস্খলন হবার সম্ভাবনা। খুব সাবধানে পথ চলা। কারণ দিলীপের মতে বরফের উপর পথই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও বিপজ্জনক পথ। বিপদ যে কোথায় লুকিয়ে থাকবে তা

আগে বোঝা যায় না।

তবু অসতর্ক মুহূর্তে একটি পা ডুবে যায় ফাটলের মধ্যে। "সাবধান" দিলী' সতর্ক করে তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে তোলে। "খুব সাবধানসে চলো, বহিনজী চোট নেহি লাগা তো?" "না" বলেই শুকনো বরফ জামা কাপড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার চলতে শুরু করি। এবার সাবধানে চলেছি। একটি নীলাভ দাগও আর নজর এড়ায় না।

"শ্-শালা বরফ!"

দিলীপ এবার আছাড় খেয়েছে। ওর পা ডুবে গেছে নীলাভ তুষারে। আল্‌গা করে ধরা হাত ছেড়ে দিই তৎক্ষণাৎ-নইলে আমিও যে পড়ে যাবো।

বলি-"চোট্ লাগেনি তো? সাবধানে চলো" এবার আমার পালা। খুব সাবধানে হাসি চেপে বলি। "নেহি" দিলীপ মুখ বিকৃত করে।

মাঝে মাঝে জড় পাথরের উপর বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে দেখবার চেষ্টা করি, আর কে কতবার আছাড় খাচ্ছে। দমাদ্দম যে পড়ছে সবাই নিশ্চয়ই, সন্দেহ নেই। তবু দিলীপের Ice axe দিয়ে (ওইটিই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল) ঠুকে ঠুকে যে পথ তৈরি করে আসছে, তাতে খানিকটা সুবিধা হচ্ছে ওঁদের। দাদা ও সত্যেনবাবু একা একাই চলেন-সর্বদাই আমাদের পিছনে দিলীপের তৈরি পথে আসেন। উনি চলেছেন স্বামীজীর সাথে। স্বামীজী পথের তোয়াক্কা করেন না বিশেষ। চললেই পথ চলা হল, এইই বোধ হয় তাঁর মত। উনি স্বামীজীর মুঠোয় ধরা। ক্রমাগত ছবি তুলে চলেছেন তিনটে ক্যামেরাতে। মাঝে মাঝে বীর সিং এর কাছ থেকে ক্যামেরা চেয়ে নিচ্ছেন সত্যেনবাবুও। বীর সিং ওঁদের সাথে সাথে রয়েছে। অদ্ভুত সাহায্য করছে বীর সিং।

তুষার-প্রবাহ ক্রমেই খুব চওড়া হয়ে গেছে। আমরা সামনে দেখি শুভ্র তুষার পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। সামনেরটি দুটি কালো শৃঙ্গের মাঝখান দিয়ে উঁচুতে উঠে নীলাকাশের গয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্যটি আমাদের ডাইনে বেঁকে পূর্বদিকে চলে গেছে। স্বামীজী দেখান। আমরা ওই পূর্বদিকের পথ ধরব।

ধীরে ধীরে চলেছি। চড়াই বিশেষ নেই, পথও প্রায় সমতল। এগোনো-সহজ, তবু অক্সিজেনের অভাব বোধ করছি সবাই। একটানা বেশীদূর যাওয়া যাচ্ছে না। থেমে থেমে তুষার গলা তীব্র ঠান্ডা জল খাচ্ছি, কোথাও। কোথাও শুভ্র তুষার

মুঠি করে মুখে পুরে চুষে চুষে তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা করছি। তৃষ্ণায় সর্বশরীর শুকিয়ে উঠছে। তুষার পানে পরম আরাম হচ্ছে।

তুষার খাওয়াতে পাহাড়ীদের খুব আপত্তি। বলে, খেও না। পেট গরম হবে, অসুখ করবে। কিন্তু, জয় তৃষ্ণা রাক্ষসীর। আমাদের দেখাদেখি ওরাও তুষার মুখে পুরছে মাঝে মাঝে।

বেলা এগারোটা নাগাদ আমরা কালিন্দী খালের পাদদেশে পৌঁছলাম। এখন আমাদের দক্ষিণপূর্ব দিকে চলতে হবে।

যে তুষার প্রবাহ ধরে আমরা এসেছি, সেটা দক্ষিণ পূব দিকে চড়াই পথ বেয়ে এগিয়ে গেছে। উত্তর দিকে তুষার বিহীন কৃষ্ণবর্ণ পাথরের পাহাড় চলেছে। তার গা-বেয়ে উপর থেকে তুষার গলা জল পড়ছে-আর সাথে সাথে পড়ছে পাথর-বালি ঝর্‌ঝর্ করে। দক্ষিণ দিকে কালিন্দী পর্বত শৃঙ্গ (21,140 ফুট) চিরতুষারাবৃত। মাঝখানের তুষারপ্রবাহ দুটি পর্বতের মাঝ দিয়ে উঠে গেছে। ওই, ওই তো তার শেষ দেখতে পাচ্ছি। শুভ্র তুষারপ্রবাহ থেমে গেছে নীল আকাশের গায়ে! কালিন্দী পর্বতের চূড়া থেকে শুভ্র তুষার নীচ অবধি এগিয়ে এসে তুষারপ্রবাহর সাথে একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমরা তুষারপ্রবাহের এই চড়াই পথটুকু উঠে গেলেই আজ কালিন্দীখাল পৌঁছাবো। অদ্ভুত দৃশ্যের মাঝখান দিয়ে চলেছি।

স্বামীজী বলেন, কালিন্দী খালের চড়াই উঠবার আগেই আমরা নাস্তা খেয়ে নেবো। ওই ওখানে চা বানাচ্ছে ওরা, আমাদের জন্যে। এগারোটা বেজেছে। কিন্তু কোথায় ওরা? বিশাল তুষারপ্রান্তর পেয়ে যে যার খুশীমতন পথে চলেছে। আমাদের জন্যে তো কেউ চা বানিয়ে বসে নেই। দুটি অচল মূর্তি সম্মুখের পাথরের উপর বসে ছিল। আমাদের দেখে নেমে এলো।'ওরা কোথায়? আমরা আজ চা খাবো না?'' তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্বামীজী ওদের সাথে কথা বলেন। আমরা বুঝতে পারি না। একটু বাদে আমাদের কাছে ফিরে এসে হি হি করে হাসেন স্বামীজী।

বলেন,''আজ একেবারে কালিন্দীখালের উপর উঠে চা খাওয়া হবে। ওরা সবাই মালপত্র নিয়ে ওপরে উঠে গেছে। মনে হয় ওখানেই চা বানাবে ওরা।''

কোন্ পথে যে গেল ওরা দেখতেই পেলাম না। আর স্বামীজী? সারাদিন অভুক্ত থাকলেও কি তাঁর কিছু যায় আসে না?

অগত্যা কি আর করা। চায়ের আশা ত্যাগ করে কালিন্দীর চড়াই উঠতে

থাকি। এইতো এইটুকু মোটে পথ — ওই তো তুষার পথের শেষ দেখছি, ওখানে উঠেই চা খাবো না হয়।

কিন্তু পাহাড়ের দেশে দূরত্ব বোঝা সহজ নয়,তার উপর পথটি বেশ চড়াই। দিলীপের সাথে আমি আজ সর্বাগ্রে পথ চলেছি। দেহে, মনে প্রচন্ড উত্তেজনা অনুভব করছি। তাই এগিয়ে চলেছি সর্বাগ্রে। তুষার ভয়ে ভীত দিলীপ বলে,"বহিনজী থোড়া ধীরে চলো, বাবু লোগকো আনে দেও। একসাথ সব চলো।"

ঠিক আছে। কিন্তু আজ আমি সব থেকে এগিয়ে চলবো। আজ আমার তেজ সব থেকে বেশী। আমি সর্বপ্রথম কালিন্দী খালে পৌঁছব কিন্তু। ছেলেমানুষের মত বলে উঠি। দিলীপের ভাবলেশহীন মুখেও হাসি জেগে ওঠে।

" ফিকর মৎ করো," প্রশ্রয়ের সুরে বলে। ওরা কাছে এলে সকলে চলতে শুরু করি।

কিন্তু আজ এ পথের কঠিনতম চড়াই উঠছি। দম থাকে না। ক্রমাগত ফাটল পেরিয়ে পেরিয়ে জলধারা এড়িয়ে এড়িয়ে নিয়ে চলেছেন, স্বামীজী ও দিলীপ। Ice axe দিয়ে প্রয়োজন মত পথ তৈরি করে চলা। কোথাও কোথাও লাফিয়ে ফাটল পার হওয়া। কিছুদূর এগিয়ে থেমে যায় দিলীপ। বরফের মধ্যে ফাটল এত বেশী সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে এবং সেগুলি এত গভীর ও বিপজ্জনক যে এ পথ পরিত্যাগ করাই সমীচীন। আমরা বাঁদিকের কালো রং-এর পাহাড়ের কাছে এগিয়ে যাই। সেদিকে ফাটল খুব কম, কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে সর্বত্র জলধারা বয়ে আসছে — সাথে আসছে বালি ও পাথরের ধারা। পাহাড় থেকে কয়েক হাত ব্যবধান রেখে আমরা অগ্রসর হই।

তবু চলা কঠিন। অক্সিজেন অভাবে দম পাচ্ছি নে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলছি সবাই। মাঝে মাঝেই বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। এটুকু মোটে পথ কিন্তু তাও যে ফুরাচ্ছে না।

অবশেষে এও শেষ হোলো। আমরা কালিন্দী খালের শেষ প্রান্তে উঠে দাঁড়ালাম।

না, না, উঠে তো দাঁড়াই নি, বসে পড়লাম, শুয়ে পড়েছি পাথরের উপর মাথা রেখে। সবাই প্রচন্ড ক্লান্ত। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে উঠে শেষ প্রান্তে দাঁড়ালাম সকলে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে সামনের দৃশ্য দেখি। যে তুষার প্রবাহের চড়াই বেয়ে উঠে এসেছি, তা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। খাড়া পাহাড়ের এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো দেয়াল নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে। দুদিকে দুটি শৃঙ্গের মাঝখানে। দূর দিগন্তে, ঘিরে দাঁড়িয়েছে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সারি সারি শৃঙ্গরাজি — হিমাচল প্রদেশের কতো বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ আমাদের সম্মুখে। পর্বত শৃঙ্গগুলি ও আমাদের মাঝখানে রয়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত তুষার-প্রান্তর-"অর্বাতাল"-দক্ষিণদিকে তার ঢাল নেমে গেছে বহুদূরে। অর্বা নদীর জন্ম হয়েছে আরও দূরে আরও নীচে — ওই তুষার-গলা জলে। চারিদিকে শুভ্র তুষারের আচ্ছাদন। যেদিকে তাকাই কিছু কিছু পর্বতাংশ ছাড়া সর্বত্র শুভ্র তুষার ধব্ ধব্ করছে।

উনি আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সূর্যালোকে চারিদিক এখন ঝল্‌মল্ করছে, একটু বাদে আলো কমে যাবে, ছবি তোলা চাই। সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। স্বামীজীর হাতে ক্যামেরা, দাদার হাতে ক্যামেরা। মেজর সাহেব ওঁর সাথে সাথে আছেন। সবাই ছবি তুলছেন। হাসি-খুশী সবাই, চঞ্চল হয়ে উঠেছি। আমরা কালিন্দী খালের (19,510) ফুট উঁচুতে আছি এখন। কিন্তু আমাদের শারীরিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তিনটের সময় আমরা কালিন্দী পৌঁছেছি-সারাদিন জল ও বরফ ছাড়া খাদ্য কিছু জোটে নি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর আমরা। খাবার জল নেই এখানে। এ রাজ্যে সবই তুষার। তুষার গলানোর উপায় নেই, চা করবার উপায় নেই, আগুন জ্বালাবার একমাত্র স্টোভটি এসে পৌঁছায়নি। আমাদের তাঁবুও এসে পৌঁছায় নি। সব কুলি এসে পৌঁছতে পারে নি। যারা এসে পৌঁছেছে তারা খুব ক্লান্ত-মাথা ধরেছে, বমি করছে তারা, অসুস্থ হয়ে কান্নাকাটি করছে। "মব্ গিয়া মাইজী-একদম মর্ গিয়া"— জ্যোতি সিং এর হাসি গান আজ চোখের জলে রূপান্তরিত।

আজ আমরা কালিন্দীখালের উপর রাত কাটাবো। উত্তর দিকের পাথর ছড়ানো শৃঙ্গের (20,020 ফুট) উপর অসমতল পাথরের গায়ে আমাদের তাঁবু লাগানো হবে, আজ রাতের মত। কিন্তু সাড়ে চারটে বেজে গেল, বাকি কুলিরা নীচ থেকে এলো না তো! একজনকে উঠে আসতে দেখা গেল-বাকি দুজন নীচে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মাল নিয়ে বসে বসে কাঁদছে। ওদের মধ্যে হরচাঁদ একজন। বীর সিং ইতিমধ্যে নীচে নেমে গেছে। খানিকটা নীচে পাহাড় থেকে বরফ গলা জলধারা পাওয়া গেছে, সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে এনেছে। পরম উপাদেয় তৃষ্ণার জল

আমাদের মুখের সামনে এগিয়ে দিয়েছে। চায়ের জলও বসানো হয়েছে স্বামীজীর তাঁবুতে।

নেমে গিয়েছে দিলীপও। পাহাড়ী রীতিতে গালি গালাজ করে কুলিদের মনোবল দৃঢ় করে উপরে তুলে আনতেই হবে। নইলে ওখানে তুষারের মধ্যে ওদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। আমাদের কথা নাই বা বললাম! ঘন্টাখানেক পরে, দিলীপ উঠে এলো। দুটি তাঁবু বয়ে এনেছে। পিছন পিছন দুটি প্রাণী যেন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। বোঝা তাদের হালকা হয়েছে, দিলীপই বয়ে আনছে, তাই আসা তাদের সহজ হয়েছে।

তাঁবু লাগানো হতে হতেই সকলে ভেতরে ঢুকে পড়ি। বাইরের সুন্দর দৃশ্যের লোভ ছেড়ে ভেতরে ঢোকা কঠিন-কিন্তু রৌদ্র কমতেই প্রচন্ড শীতে যেন হাড়ে কাঁপুনি ধরে গেল। রাত কাটলো মন্দ নয়। সকলেই বলছি বেশ ঘুম হয়েছে সবারই। ঠান্ডার ভয়ে সবগুলি গরম জামা-কাপড় পরেই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছিলাম, মোজা, বালাক্লাভা শুদ্ধ! তাছাড়া আমাদের চারজন যাত্রীর শারীরিক কষ্ট বেশী নেই। আমার সামান্য মাথাব্যথা ছিল —এ্যাস্পিরিন খেয়েই সেরে গেছে।

পরদিন বেশ বেলা হলে সকলে তাঁবু থেকে বের হলাম। অপূর্ব সুন্দর প্রভাত। নীলাকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। চারিদিকের তুষারাচ্ছাদিত শিখর, শুভ্র প্রান্তর ঝক্‌ঝক্ করছে। সামনে পিছনে চারিদিকে শুভ্র তুষারের উপর আলোর ঝিলিমিলি খেলে যাচ্ছে। সূর্যালোক কোথাও এখনো পড়তে দেরী আছে। নীলাভ ছায়া, অদ্ভুত এক মায়ালোকের সৃষ্টি হয়েছে যেন। মনে হোল, এই তো শুভ্র নিষ্পাপ স্বর্গপুরী! মনে হোল আমরা কত ভাগ্যবান।

আজ নীচের দিকে তুষারের উপর দিয়ে কেবল নামবার পালা। দক্ষিণ দিকের কালিন্দী পর্বতের গা বেয়ে নীচে নামবার পথ। কঠিন বরফের উপর নরম তুষারের আস্তরণ। সবাই মাঝে মাঝে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাই। কপালের জোর যে সশরীরে পাতালে যাই না। স্বামীজী ও দিলীপ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। তবুও হঠাৎ নরম তুষারে পা পড়া ওদেরও বন্ধ হয় না।

কিছুদূর তুষারের উপর দিয়ে চলার পর দেখি, আমাদের দলবল দু'শ আড়াইশ' ফুট নীচে একটা তুষারের প্রান্তরে বসে আছে। দাদাও তাদের একপাশে বসা। ওরা হাত নেড়ে, ইশারা করে কি বলছে। অনেক দূর বলে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু ইশারা করা দেখে আন্দাজে বুঝলাম-বরফের খাড়া দেয়াল দিয়ে

এরা glissade করে নেমেছে। আমাকেও এইভাবে নামতে বলছে। বরফের উপর glissade করার দাগ দেখলাম।

কিন্তু দিলীপ বড় শক্ত ঠাঁই। ছাড়বে না কিছুতেই। ওইভাবে নামা বিপজ্জনক, যদি বেকায়দায় পড়ে যাই। "nylon rope নিকালো, হরচাঁদ"।

বলি, যাই বলো বাপু glissade করে আমি নামবই-বলে বরফের উপর বসে পড়ি। আমার কোমরে দিলীপ ইতিমধ্যেই দড়ি বেঁধে ফেলেছে। লম্বা দড়ির বাকি অংশ ওর হাতে। কিন্তু আজ আমাকে আটকানো কঠিন। হাত পা ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ছর্ ছর্ করে দ্রুত নামতে থাকি। দিলীপ বাধ্য হয়ে দড়ি ছেড়ে দিলে। আঃ কি আনন্দ!

নীচে নেমে দেখি. উপরে উনি ও সত্যেনবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে স্বামীজী। ওঁরাও ওই একই উপায়ে নামবেন। নামতে নামতে সত্যেনবাবু বেঁকে গিয়েছিলেন। নীচে থেকে সবাই চেঁচাচ্ছি, কারণ বাঁকা পথ ধরে নামলে তিনি একটা তুষার গহ্বরের মধ্যে পড়বেন। আমাদের চেঁচামেচি শুনে, তাঁর বিপদ বুঝতে পেরে সত্যেনবাবু গতি সংযত করে সোজা নামলেন। স্বামীজী একটি ঝোলা পিঠে, ওটি বুকে চেপেই উনি নামলেন।

কালিন্দী খালের উপর থেকে যে তুষার-প্রান্তর দেখেছিলাম, অতি অল্পসময়ের মধ্যে সকলে সেখানে নেমে এলাম। এবার শক্ত বরফের পথে চলা। মাঝে মাঝে ফাটল আছে, নীলাভ তুষারে ঢাকা সরলরেখা প্রান্তরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। সে গুলি সাবধানে পার হয়ে চলেছি। বড় বড় ফাটলের দূর দিয়ে সেগুলি এড়িয়ে যাচ্ছি।

বেলা বারোটা নাগাদ সকলে মিলে বিশ্রাম কবতে বসেছি। তুষারের প্রান্তরের শুকনো তুষারের উপর। উনি সেখানেই শুয়ে পড়েছেন-ওঁর ও-ই নিয়ম। বিশ্রাম মানেই শয়ন, শয়ন মানেই নিদ্রা!

বিশ্রামের ফাঁকে সত্যেনবাবুর ফরমূলা মাফিক আজ শরীরে তেজ করা হোল। অর্থাৎ সকলে এক একটি করে তুষারের গোলক তৈরি করে, তাতে গর্ত করে ধরে হাত পেতে বসে রইলাম। স্বামীজী এক এক চামচ করে মধু দিলেন। তাই-ই খাওয়া। অপূর্ব আস্বাদ। কোথায় লাগে কুলপী মালাই। খাওয়ার পরে মনে হোল নতুন করে শক্তি পেলাম, দেহে।

যেখানে বরফের উপর বসে আছি, তার সামনেই বেশ বড় বড় দুটো পুকুরের মত। সবটাই প্রায় জমে রয়েছে। ও-ই অর্বাতাল বা অরোয়াতাল। বিস্তীর্ণ তুষারপ্রান্তরে অজস্র ধারা তির তির করে বয়ে চলেছে, জলের ধারার সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। ওগুলি একটার সাথে একটা মিশে ক্রমশঃ আমাদের চোখের সামনেই আরোয়া নদীতে পরিণত হোল। অরোয়া তলাও-এর তুষারপ্রান্তর পার হয়ে কিছুদূর এগিয়ে একটি পাথর ছড়ানো প্রান্তরে আমরা চা খেয়ে নিলাম। চারিদিকের পাহাড় থেকে যেমন জলধারা নামছে-নামছে পাহাড়ের অংশও। গড়িয়ে গড়িয়ে নেমেছে উপত্যকাতে। তারই স্তূপাকার পাথর দিয়ে আমাদের চলবার পথ। যত এগিয়ে চলেছি, পথও ক্রমশঃ কঠিনতর হচ্ছে। বিরাট বিরাট অসংখ্য পাথরের উপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। খুব কষ্ট করেই চলেছি। বিশেষ করে দিনের শেষ ভাগে যেন আর চলা যায় না। পাথরের উপরে দিলীপের পথ দেখানোর ভঙ্গিটি অপূর্ব। বাঁ হাতে ধরা Ice axe টির ডগা দিয়ে পাথরের মাথায় মাথায় দেখিয়ে দেয় কোন পাথরে পা রাখতে হবে। পাথরের রাজ্যে পথপ্রদর্শক হিসাবে ওর জুড়ি মেলা ভার। প্রতিটি পাথর যেন ও চিনতে পারে। তাদের গঠন-বৈচিত্র্য, স্বভাব, স্থিরতা বা অস্থিরতা ওর নখদর্পণে! পাহাড়ের পাথরের উপর দিয়েই সবাই চলেছি। স্বামীজীর সাথে অন্যরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। দিলীপ তখন একটু নীচে নেমে বা উঁচুতে উঠে ঘুর পথে এগিয়ে গেল ওদের পিছনে ফেলে, তাও আমাকে সাথে নিয়ে, অর্থাৎ দলের দূর্বলতম ব্যক্তিটির হাত ধরে। দিলীপের হাত ধরা-অর্থে টেনে নিয়ে যাওয়া নয়। কেবল আল্‌গোছে স্পর্শ করে ধরে চলা। যখনই প্রয়োজন হয়েছে আল্‌গা মুঠিও লৌহকঠিন হয়ে উঠেছে। ধরণীর কোলে পড়বার হাত থেকে রক্ষা করছে সে।

তবু, নিজের পায়ের উপরই ভর করে চলা তো। খুবই কষ্ট হচ্ছে। দিলীপ দেখাচ্ছে-ওই দেখ ! ওরা বসে আছে আমাদেরই জন্য। স্বামীজীর গেরুয়া বস্ত্রাংশ দেখা যাচ্ছে। সকলেই বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু একটা প্রচন্ড ফেনিল ঝরণা বয়ে চলেছে-তীব্র বেগে ছুটে চলেছে বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে। ওপারে পাথরের উপর বসে স্বামীজী, দাদা, উনি, সত্যেনবাবু ও হরচাঁদ। দু পায়ের মস্ত মস্ত দুটো পাথর দেখিয়ে ওরা বলে, পার হতে হবে তার উপর দিয়ে। কি ভীষণ! আমার পা-ই যে পৌঁছবে না, এক পাথর থেকে অন্য পাথরে। ঠিক কথা! বলে হরচাঁদ দুটো লাঠি পেতে দিলে, দুই পাথরের উপর। দাদা বালন," কিন্তু লাঠি

যে ভেঙে যাবে!" "না ভাঙবে না", হরচাঁদ আশ্বাস দেয়,"লাঠিতে আস্তে ভর দিয়ে চলে এসো বহিন্‌জী, জোরে চাপ দিয়ো না যেন। আমরা তো আছিই।"অখন্ড বিশ্বাসে ওদের নির্দেশমত লাফ দিয়ে পার হই। ওপারে হরচাঁদ ধরে ফেলেছে, ধরতে না পারলে পাথরে চুরমার কেবল নয়- নীচের ঝরণার উন্মত্ত স্রোতের মধ্যে পড়ে মুহূর্তে কোথায় যে তলিয়ে যেতাম! দাদা কাছেই উৎকন্ঠা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। এখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছিলেন। আর আমার স্বামী পিছন ফিরে বসে, হয়তো স্ত্রীর এহেন অপঘাত মৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে চান না।

সারাদিন প্রায় না খাওয়া। শেষে বিরাট পাথর স্তূপের উপর অনেকটা চলে আরওয়া নদীর ধারে সমভূমিতে ঘাসের উপর তাঁবু ফেলা হল। স্বামীজী আগেই পৌঁছেছেন। আজ আমাদের শরীর খুব ক্লান্ত। শেষের এক ঘন্টা চলতে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। মেজরও আমার সাথে সাথেই প্রায় পৌঁছেছেন।

বিরাট একটা পাথর-বেশ চমৎকার শোয়া চলে। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বাইরে রৌদ্রে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে আছি। কথা কইবার সামর্থ লোপ পেয়ে গেছে। স্নেহপ্রবণ দাদা, তিনিও নিশ্চয় আমারই মত ক্লান্ত-তাঁর ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর নিজের একখানা ভারি গরম চাদর এনে আমাকে ভালো করে ঢেকে দেন। নিজের Air pillow এনে মাথার নীচে গুঁজে দেন। আঃ! কি আরাম! কিন্তু চোখে জল এসে যায় যে! শুয়ে শুয়ে উনি মেজর সাহেবের সঙ্গে উচ্চস্বরে আলোচনা করছেন-এখানে এই নদীতে স্নান করা যায় কিনা! করুক ওরা স্নান। আমি আর তার মধ্যে নেই।

পরদিন সবুজের ছোঁয়া লেগেছে পথের গায়ে এখানে ওখানে। ছোট ছোট ফুল গাছ ছড়িয়ে আছে। পাথরের ফাটলেও ফুল, নীচেও ফুল। চরিদিকে সবুজ ও নানা রঙের সমারোহ। খানিকটা পথ সমতল, চারিদিকে উঁচু উঁচু পাথরের মাঝখান দিয়ে অরোয়া নদী চলেছে, তারই ধারে ধারে পথ। তারপর যে পথ দিয়ে চলতে হোল তা ধারণাই করতে পারি নি। এই পাথর টপকে, সেটা বেয়ে উঠে বা নেমে, আর ঠিক তাক্ করে যে পাথরে ভর দেব সেটাতে পা পড়তেই নড়ে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে গিয়ে এখানে ওখানে চোট লাগতে লাগলো। সকলেই অল্প বিস্তর জখম হোল। দুর্ভোগ আর কষ্টের সীমা নেই আজ। একেই বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা, তার উপর পদে পদেই বড় বড় ঝর্ণা পার হওয়া। পাহাড়ীরা

ঝর্ণা পার হতে ওস্তাদ। তারা আগে আগে পার হয়ে, ওপারে মালপত্র রেখে আসে। তারপর পিঠে করে আমাদের পার করে।

দাদার বয়স ষাটের উর্ধ্বে —কিন্তু অসীম ক্ষমতা। আগাগোড়া রাস্তা প্রায় বিনা সাহায্যে হেঁটেছেন, একটা নদীও পিঠে পার হননি। জলের ভিতর আন্দাজে পাথরের উপর পা ফেলে, পাহাড়ী ঝর্ণার উদ্দাম স্রোতের মধ্য দিয়ে, হাঁটুর উপর পর্যন্ত তুহিন শীতল জলের ধাক্কা খেতে খেতে তাল সামলে নদীগুলি পার হওয়া খুবই বাহাদুরী। সত্যেনবাবুও একবার কেবল নিজে পার হয়েছেন এবং অন্যান্যবার ওঁর চেষ্টাকে ধমকে থামিয়ে দিলীপ পার করেছে। সত্যেনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন,"জলটা ঠিক ঠান্ডা মনে হয় না, মনে হয় অজস্র বিচ্ছু অনবরত কামড়াচ্ছে।"

দিলীপের ধমক কিন্তু চেঁচামেচি নয়। একবার মেজর সাহেব জুতো মোজা খুলে, লম্বা প্যান্ট গুটিয়ে একটা নদী পার হবার মুখে জিজ্ঞাসা করলেন,"দিলীপ সিং ইস্ নদীকো তর্নে হোগা আভি?" ও দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলো —"হাঁ মেজরসাব"— বলে নিজের পিঠ পেতে দিলে, মেজর সাহেবের জুতো মোজা তুলে নিলে-মেজর সাহেব পিঠে চড়ে নদী পার হলেন।

অরোয়া নদীটি অনেকগুলি ধারাতে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে একটি উপত্যকার মধ্যে। চারিদিক পর্বতঘেরা, কোন কোনটির শৃঙ্গ তুষারমন্ডিত। এখানে নদীর ধারাগুলি পার হয়ে একটি পাথর ছড়ানো, সমতল ভূমিতে নাস্তা করা গেল। দুধের অভাবে কেবল চিনি দিয়ে তৈরি চা। চকোলেটের সাথে সকলে তাই-ই খেলাম।

উনি এই সুযোগে স্নান করতে গেলেন। সাত আট দিন স্নান করা হয়নি কারুর। সে সুযোগই হয়নি। বেলা বারোটায় রৌদ্র স্নাত নদী জলে পরম পরিতৃপ্তিতে স্নান করে বরফের টুকরো কামড়ে খেতে খেতে উঠে এলেন। আমাদের জন্য নদী জলে ভেসে আসা বরফকুচি তুলে এনেছেন। চা খাবার পর ঐ ভীষণ পথে চলা শুরু হল।

পাথর-পাথর-পাথর, আর নদীর পর নদী। আমাদের শক্তিতে আর কুলায় না। এদিকে আমার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে — জুতো পায়ে দিতে পারছি না। কিন্তু ফোস্কাও পড়ে নি। ডান পায়ে বুট জুতো পরে, বাঁ পায়ে একজোড়া মোজা পরে দিলীপের হাত ধরে চলছি-লাঠিও নেই। দিলীপ আর ঝক্কি নিতে রাজী নয়।

সে এই পথটুকু পিঠে নিয়েই পার হতে চলেছে। আমি তাতে রাজী নই। কাজেই ধীরে ধীরে সকলের পিছনে এগুচ্ছি।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় দেখি, এগিয়ে যাওয়া কুলিরা অরোয়া নদীর ধারে, সুন্দর নীল ঝর্ণার ধারে, সবুজ ঘাসে ঢাকা ফুলে ভরা ময়দানে রুটি বানাচ্ছে। আমাদের দেখেই উল্লাসে এগিয়ে এল সকলে। আবার তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। গান গাইছে ওরা। কেউ কেউ বলছে-"ধন্য! ধন্য !" আমরা পাহাড়ী না হলেও যে ভীষণ কঠিন পথ নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসেছি, তার জন্য ধন্যবাদ! আমরা যেতেই দুখানা করে রুটি ও তার সঙ্গে চাটনী খেতে দিলো। চাটনী সামান্য টক্। কি এক বুনো-টক্ পাতার তৈরি। প্রচন্ড ঝাল। দাদার আনা এক শিশি আচার বাকি ছিলো, সেটার সৎকার করা হোল। দুধ বিনা চা দিয়ে রাতের মত খাওয়া পর্ব শেষ হ'ল বলে মনে হোল।

স্বামীজী বললেন, আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমরা থাকবার ভালো জায়গা পাব। কিন্তু দুই ঘন্টা হাঁটবার পরও ভালো জায়গা মিললো না। চঞ্চল স্বামীজী ওঁর হাত ধরে যেন টেনে নিয়ে চলেছেন। একবার ওঁকে সামলাতে গিয়ে একটা বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে স্বামীজীর হাঁটুটা বোধ হয় সরেই গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতের দুটো আঙুল কেটে দরদর ধারে রক্ত পড়তে লাগলো। সকলেই স্তম্ভিত। উনি অপ্রস্তুত, বোধ করি বা একটু ভীতই! স্বামীজী না থাকলে এই দুর্গম পথে কে সাথে করে নিয়ে যাবে ওঁকে। দিলীপ আমাকে ছেড়ে এসে তাড়াতাড়ি টেনে টুনে হাঁটুটা ঠিক করে দিল। দাদার পকেট থেকে ওষুধ ও sticking plaster বেরুল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বামীজী উঠে চলতে শুরু করলেন, যেন কিছুই হয় নি।

এদিকে সাড়ে ছ'টা বাজে। এ পথ ওদের পক্ষে সরল বলে কুলিরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু চলৎ-শক্তি-রহিত। স্বামীজী আমাদের অচল অবস্থা লক্ষ্য করে একটা মোটামুটি সমতল জায়গায় থামিয়ে রেখে ওঁকে বল্লেন-" এখানেই আজ camp করবো। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এগিয়ে গিয়ে কুলিদের ফিরিয়ে আনছি।" স্বামীজী একটু যেতেই দিলীপের সাথে আমরা তিনজনা হাজির। দিলীপ বল্লে —"এ জায়গা খতর্নাক্ আছে। পত্থর গিরতে পারে, আরও এগিয়ে চলো।" কিন্তু এগিয়ে চলো বললেই তো আর চলা যায় না। প্রচন্ড ক্লান্ত চারটি প্রাণী, তার মধ্যে একটি খোঁড়া। তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। দিলীপ পথ দেখাচ্ছে।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে, পাথরের খাঁজে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটে রয়েছে- সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সামর্থ্য নেই। তবু মনটা ডেকে বলে- দেখো, দেখো। আর তো জীবনে এ পথে আসবে না, দু'চোখ ভরে দেখে নাও। ডাকে সাড়া দিয়ে হঠাৎ থেমে যাই। দিলীপ বলে "ক্যা হুয়া বহিনজী!" "ফুল"— বেশী শব্দ বের হয় না মুখ দিয়ে।

"হাঁ ঠিক! বহুৎ কিসিম্ কা ফুল মিলতে হেঁ ই জায়গায়। ই দেখো কস্তুরী! ইস্‌কো হম্‌লোগ কস্তুরি বলতে হেঁ।" বলে ফুল তুলে দেবার চেষ্টা করে। বলি "ফুল তুলোনা, তুললেই এর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। গাছে থাকুক, আমরা দেখতে দেখতে চলি।"

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি হরচাঁদ আর যোধসিং ফিরে আসছে। তারা এসে বল্লে, সুন্দর একটা জায়গায় camp করা হয়েছে —— একটু এগিয়েই। ওরা আমাদের ধরে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

যোধসিং আমার ভার নিলে। কখনো পিঠে করে কখনো হাত ধরে নিয়ে চললো। দিলীপ দাদা ও মেজরের সাথে চললো। হরচাঁদের বড় অনুকম্পা ভরা মন। ওঁকে বলল-"ডাক্‌টর সাব। কই ফিকর নেহি, আব তো চলেঁ আঁয়ে, আউর ক্যা। হাম্ আপকো পাকড়কে লে যায়েঙ্গে ধীরে ধীরে আউর বীর কা এক কহানী ভি চল্‌তে চলতে শুনায়েঙ্গে।" এই বলে সে শীতের রাত্রে গলা জলে পুকুরে ডুবে থাকা গরীব ব্রাহ্মণের দূরে জ্বলা-আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে গরম হবার গল্পটা বলল।

camp এ পৌঁছাতে পৌছাতে অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে কেবল পাথরের রংগুলি বোঝা যায়। পাতলা কুয়াশার মধ্যদিয়ে চতুর্থীর চাঁদের আবছা আলোতে আমরা অরোয়া নদীর ধারে সুন্দর একটা মাঠে তাঁবুতে পৌঁছে গেলাম। দূর থেকে দেখি পাহাড়ীরা জুনিপার গাছ জ্বালিয়ে camp fire তৈরি করে মৌতাতে বসেছে। সেখানে পৌঁছাতে আমাকে আদর করে বসালে। চা তৈরি হল, লবণ ও মাখন সহযোগে। অপূর্ব তার আস্বাদ!

দুর্গম পথের আজ শেষ রাত্রি। স্বামীজী আজ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

সকালে উঠে camp site দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রায় চৌদ্দ-সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে সবুজ ময়দানটি, ফুলে ফুলে ঢেকে আছে। পাশ দিয়ে

অরোয়া নদী ভীষণ বেগে বয়ে চলেছে। দুই দিকে পাহাড়ের সারি, নদীর ধারার পাশে পাশে চলেছে। তাঁবু গুটিয়ে গোছগাছ করে রওনা হতে বেশ বেলা হয়ে গেল। পায়ে ব্যথা সকলেরই-কিন্তু ময়দানের উপর হাঁটতে ভালই লাগছে। অপরূপ রূপের মেলা, ছোট ছোট নানা রঙের পাথর ছড়ানো সবুজ; এর মধ্যে গোলাপী, হলদে,নীল, বেগুনী, লাল ফুলের সমারোহ। চারিদিক অরুণালোকে ঝলমল করছে।

একঘন্টা হাঁটবার পর দেখি অপর পারে দূরের দুটি উঁচু পর্বতশৃঙ্গের মাঝখান দিয়ে উদ্দাম বেগে সরস্বতী নদী আসছে, অরোয়ার সঙ্গে মিশতে। অল্প এগিয়ে একটি নীল স্বচ্ছ জলধারা পার হলাম। সে-ও কলস্বরে অরোয়াতে মিলতে চলেছে, যেন সবুর সয় না! ফুলে ফুলে পাহাড় ঢেকে আছে। ঝর্ণার নীল জলধারা ফুলগাছ গুলি ঘিরে ঘিরে বয়ে চলেছে। অপূর্ব সুন্দর স্থানটি। বড় বড় পাথর জলের উপর মাথা জাগিয়ে আছে। তার উপর পা ফেলে পার হয়ে চলেছি। লোকালয়ের অনেক কাছে এগিয়ে এসেছি। কিছু কিছু পায়ে চলা পথ নজরে পড়ছে।

আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা ঘাসতৌলীর (13,000 ফুট) ময়দানে পৌঁছলাম। সরস্বতীর ধার দিয়ে উপরে মানা পাশের রাস্তা গেছে। এই পথে বদ্রীনারায়ণের পথে এই-ই প্রথম গ্রাম, কিন্তু গ্রামবাসী দেখতে পেলাম না। কেবল একদল ভেড়া কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল।

P.A.C. র সর্দার এক সুবাদার সাহেব নিজে এসে রাস্তা থেকে আমাদের ডেকে তাদের Camp এ আমাদের বিশ্রাম করতে নিয়ে গেলেন। ঠান্ডা জল ও চা পানে আপ্যায়িত করলেন। গত মহাযুদ্ধে চার বছর তিনি বন্দী হিসাবে ইউরোপের বহু জায়গায় থেকেছেন। মেজর সাহেবের সাথে এ সম্পর্কে অনেক গল্প গুজব হোল। তিনিও প্রায় এক বছর শত্রুশিবিরে বন্দী ছিলেন।

প্রায় ঘন্টা খানেক কাটিয়ে আবার পথ চলা। "বদরী বিশাল কি জয়" বলে বদ্রীনাথ ধামের পথে রওনা হলাম। বদ্রীনাথ (10,244 ফুট) এখান থেকে এখনো দশ মাইল--- তবে চলার ভালো পথ আছে। মানুষের হাতের তৈরি পথ দিয়ে আজ নয় দিন পর চলেছি। কখনো পাহাড়ে উঠছি, কখনো নাবছি। তবে বেশীর ভাগই উৎরাই। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘাসে ঢাকা মাঠ। আগাগোড়া রাস্তার ধারে নানা রঙের নানা ঢঙের ফুল ফুটে রয়েছে। অজস্র Blue Poppy দেখছি। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে স্বচ্ছ সলিলা ঝর্ণা বয়ে চলেছে পথের উপর দিয়ে।

আকাশ মাঝে মাঝে মেঘলা, মাঝে মাঝে পরিষ্কার-কখনো ঝির্ ঝিরে শীতল হওয়া বইছে। তার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে যায়।

সরল পথে দাদা অনেক এগিয়ে গেছেন। মেজর তাঁর সঙ্গ নিয়েছেন। আমার খোঁড়া পা। অনুকম্পা ভরে উনি আমার সঙ্গ নিয়েছেন। বোঝার জিম্মাদার দিলীপ সঙ্গেই আছে। আমি থামলে ওরা থামছে, চললে চলছে। মাঝে মাঝে ঝর্ণার মিষ্ট জলে তৃষ্ণা দূর করছি। ঘাসতৌলীর পথে আসা দুই চার জন লোকের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে। তারা অবাক হয়ে প্রশ্ন করছে আর আমাদের চলার পথের খবর জেনে অবাক হয়ে "ধন্য! ধন্য" করছে।

সরস্বতী নদীর তীর ধরে ধরে চলবার পথ। নদীর ওপারে দূরের ঘন সবুজ পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে রূপালী ঝর্ণা নাচছে, জলপ্রপাত পড়ছে। এখান থেকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে নীচের দিকে নদীর ধার ঘেঁষে চাষের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। ধাপে ধাপে উঠে গেছে ক্ষেতগুলি। কোনটি সবুজ, কোনটি সোনালী। পাহাড়ীরা ওখানে কি বুনেছে কে জানে।

দুপুর বারোটা নাগাদ দিলীপ দেখায়, ওই মেজর সাব চলেছেন। সত্যেনবাবু সরস্বতীর উপর natural rock bridge পার হচ্ছেন। সঙ্গে দাদা নেই, তিনি এগিয়ে গেছেন। এতক্ষণে হয়তো মানা গ্রামে পৌঁছে গেছেন। পরে জানলাম উনি ততক্ষণে বদ্রীনাথ পৌঁছে গেছেন। উনি চলেন পাহাড়ীদের মত। মেজর সাহেব তাল রাখতে পারেন নি। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরাও সরস্বতী নদীর উপর পৌঁছালাম। প্রকান্ড একটি পাথর স্বাভাবিকভাবে পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে গড়িয়ে এসে আটকে আছে। যদিও সাবধানতার জন্য তার উপরে একটি কাঠের পোল করা আছে।

এখানে সরস্বতীর নদীর কি ভীষণ দৃশ্য। প্রবল বেগে আড়াই'শ ফুট নীচে পড়ছে পাহাড় থেকে। আর নীচে পড়তে পড়তেই জলকণা ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীও এমনি করে গৌরীকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তবে সে এতো নীচে নয়। তার শেষ দেখা যায় সাবধানে শুয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে। একমাত্র অন্ধকার অন্তরায়। কিন্তু সরস্বতীর নৃত্য দেখা যায় না, নীচু অন্ধকার এবং বিশেষ করে বাষ্পের জন্য।

দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে ক্ষেতের সারি দেখেই বুঝতে পারি মানাগ্রাম পৌঁছতে আমাদের দেরী নেই। লোকালয় এগিয়ে এসেছে অর্থাৎ কিছু খাবার পাওয়ার

সম্ভাবনা আছে। অচল পা দুটিকে জোরে চালাবার চেষ্টা করছি।

বেলা দুটোয় মানা গ্রামে পৌঁছলাম। এখানকার check post এ খবর পাঠানো হল। কিন্তু কর্তা দিবানিদ্রায় ব্যস্ত, জানিয়ে দিলেন —"সব ঠিক হ্যায় যানে দেও।" আমাদের আগমনের খবর আগেই পৌঁছে গেছে। স্বামীজী ও দাদা আগে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব জানিয়ে গেছেন, পরে জানলাম।

আমরাও কালক্ষেপ করি না। এগিয়ে চলি। ডাইনে অলকানন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গম দেখা গেল। দূরে খুব উঁচু একটি পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে একটি ঝর্ণা। তার মাথার দিকে একটু দেখা গেল। পরে শুনলাম, ওইটি বিখ্যাত "বসুধারা" জলপ্রপাত। এটি 400 ফুট উঁচু থেকে পড়ছে।

মানা গ্রামের মাঝপথে একটা ঝোলান পুল পার হলাম। পুল পার হয়েই আমরা নারায়ণ পর্বতে পৌঁছলাম। চারিদিকে ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছে। রাস্তার মোড় ঘুরতেই দেখি একটা দোকান। অনেকক্ষণ থেকেই খাবারের দোকানের খোঁজ করছি। দোকানের ভিতরে ঢুকে দেখি মেজর সাব, আরও জনাকতক কুলি বসে বসে চা পকৌড়া আর প্রাপেল খাচ্ছেন। আমরাও ক্ষুধা নিবৃত্তির শুভ কাজে যোগদান করলাম।

বদ্রীনারায়ণ আর দূরে নেই। দেহ সুস্থ বোধ করতেই আবার চলা শুরু করেছি। অলকানন্দার কলগুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। দু'পাশে ফসলভরা ক্ষেত, তার মাঝখান দিয়ে চলার পথ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটির। ছোট ছোট মেয়েরা খেলা করছে। বাড়ির গৃহিণীরা সংসারের কাজের পাট চুকিয়ে দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে রৌদ্রে বসে বিশ্রাম করার ফাঁকে গল্পের আসর জমিয়েছেন।

পথের একটা বাঁক ফিরতেই বদ্রীনারায়ণের মন্দিরের চূড়া, তার চারিদিকের ঘরবাড়ি, দোকান পাট সব দেখা গেল। ওই তো পরিচিত স্থানগুলি দূর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওই তো নদীর বাঁধানো ঘাট, বদ্রীবিশালের পদতল ধৌত করে অলকানন্দা বয়ে চলেছেন। ওই তো ব্রহ্মকপালের বাঁধানো চত্বর। বাঃ, বেশ সুন্দর বাঁধানো ঘাট হয়েছে তো! ওই তো বরাহ শিলা। ওর পাশেই তপ্তকুন্ড। তপ্ত কুন্ডের তপ্তজলে অবগাহন করে তৃপ্তি লাভ করব।

মন সতেজ হয়ে উঠেছে। আর তর সইছে না। বদ্রীনাথের সাদর আহ্বান কানে আসছে যেন! এসো! এসো! তোমরা কঠিন দুর্গম পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম

করে এখানে এসেছ, এসো! এখানে এসে এবার আরাম করো। সব সুখ সুবিধা আরাম, তোমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছি এখানে।

কৃতজ্ঞতায় যেন পা দুটি জড়িয়ে জড়িয়ে আসে। এক পা এক পা করে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। আর তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। মনে মনে বদ্রীনারায়ণকে সহস্র প্রণাম করে ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

গৌরকিশোর ঘোষ

নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি

২ নং শিবির। ২২ শে অক্টোবর। বেলা সাড়ে-এগারোটা। মদন আর বিশ্ব সকাল থেকে পাঁচিলের উপর বসে আছে নন্দাঘুন্টির দিকে চোখ রেখে। ওরা বলেছিল, আজ উঠবে চূড়ায়। দেখা যাক ওদের দেখা যায় কিনা? আবহাওয়া এতক্ষণ বেশ পরিষ্কার ছিল। নন্দাঘুন্টির চূড়া ভালই দেখা যাচ্ছে। কোন পথ ধরে উঠবে ওরা?

বেলা বারোটা। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। এখনও নন্দাঘুন্টির শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোন অভিযাত্রীরই দেখা নেই। বরফ পড়তে শুরু করল। প্রবল হাওয়া। বিশ্ব আর মদন ক্ষুণ্ণ মনে শিবিরে ফিরে এল। তুষারঝড় চলল কিছুক্ষণ। তারপর আবার আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না। জমাট মেঘে অন্ধ হয়ে থাকল আকাশ। তুষার-ঝড় থামতেই বিশ্ব আর মদন আবার ২নং শিবিরের সেই পাঁচিলটায় উঠে বসল।

বেলা দেড়টা। নন্দাঘুন্টি পাহাড় মেঘে ঢেকে আছে। এখান থেকে কিচ্ছু দেখা যায় না। আর কতক্ষণ বসে থাকবে মদন আর বিশ্ব? শীতে ওরা জমে যাচ্ছে। উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠছে। ওরা কি আজ চূড়ায় অভিযান চালিয়েছে, না কি এই দুর্যোগে বের হয় নি? আর যদি বেরিয়ে থাকে?

এতক্ষণ মেঘ নন্দাঘুন্টির গায়ে যেন জমাট বেঁধে ছিল। এখন ওরা দেখল, মেঘ সচল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ধাক্কায় মেঘ উঠছে নামছে, কুন্ডলী পাকাচ্ছে। হঠাৎ মেঘের আবরণ এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে নন্দাঘুন্টির চূড়ায় নীচেকার অনেকখানি জায়গা বিশ্ব আর মদনের চোখ ভেসে উঠল। সাদা বরফ আর তার গায়ে —

আরে ও কি? ওগুলো কি? ঐ কালো কালো বিন্দুগুলো? বিশ্বদেব দেখল। মদন দেখল। বিশ্ব চেঁচিয়ে উঠল। মদন চেঁচাল। দেখ দেখ, ঐ যে ওরা উঠছে। ওরা চূড়ার খুব কাছে গিয়ে পড়েছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছয়টা বিন্দু। নড়ছে। উঠছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভারী এক মেঘের যবনিকা ঝপ করে কে যেন ফেলে

দিল। সে পর্দা আর উঠল না। নন্দাঘুন্টি দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না। কাউকে না।

বেলা আড়াইটে। কিচ্ছু দেখা গেল না। শুধু মেঘ।

বেলা সাড়ে-তিনটে। শুধু মেঘের কুন্ডলী। আলো বিবর্ণ হয়ে আসছে।

বেলা চারটে। নন্দাঘুন্টি পূর্ববৎ অদৃশ্য। মেঘেরা ক্রুদ্ধ মল্লের মত পাঁয়তারা কষছে।

বেলা সাড়ে-চারটে। দৃশ্যের কোন পরিবর্ত্তন নেই। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

বেলা সাড়ে-পাঁচটা। অন্ধকার নেমে এল। আর কিচ্ছু দেখার আশা করা বাতুলতা।

একরাশ উদ্বেগ নিয়ে মদন আর বিশ্বদেব তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল।

৩নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। সুকুমার চা খেয়ে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিল। আজ সু-কভারও পরল সে। তাবপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। আঙ শেরিং, আজীবা, টাসী আর নরবু প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীপ তখনও তাঁবুর ভিতরে। দুটো মোজা পরে বাঁ পায়ে জুতো গলাতে পারছে না। পা কষে ধরছে। নানাভাবে চেষ্টা করল দিলীপ। জুতোকে জুত করতে পারল না।

"দিলীপ, আয়।" সুকুমার ডাকল। "দেরী করছিস কেন?"

দিলীপ এবার অধৈর্য হয়ে উঠল। তারপর ধুত্তোর বলে নিতান্ত গোঁয়ারের মত এক কাজ করে বসল। একটানে একটা মোজা বাঁ পা থেকে খুলে ফেলল। তারপর একটা মোজা পরেই জুতোর মধ্যে বাঁ পা গলিয়ে দিল। সু-কভার বাঁধল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ওরা আজ ক্রাম্পনও পরেছে।

বেশ সুন্দর আবহাওয়া। আকাশ একেবার পরিষ্কার। রোদ ফুটেছে। সুকুমারের মনটা খুশীতে নেচে উঠল। টাসী, আজীবা আর নরবু আগে বেরিয়ে গেল। আজ কারো কাছেই বিশেষ বোঝা নেই। প্রথম দলটা 'কল' এর উপর উঠল। তারপর এদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

এবার সুকুমাররা যাত্রা করল। প্রথমে আঙ শেরিং তারপর সুকুমার, পিছনে দিলীপ। দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা 'কল'-এর উপরে পৌঁছে গেল। হাওয়া নেই। চলতে ফূর্তিই লাগছে। 'কল'-এর পশ্চিম দিকটা একেবার ফাঁকা। ওদিকে যে-সব

পাহাড় আছে, তাদের কারোরই চূড়া 'কল' এর উপরে ওঠে নি। পাহাড়গুলোকে কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে। 'কল'-টা এত উঁচু যে, নীচু দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। অনেক দূরে পাহাড়-পর্বতের ফাঁক দিয়ে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে। এদের মনে হল, কেউ যেন এক কাপ জল রেখে দিয়েছে।

দক্ষিণে নন্দাঘুন্টির গিরিশিরা। টাসী, আজীবা আর নরবুকে দেখা গেল। ওরা পাহাড়ের গায়ে গজাল পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি খাটিয়ে খাটিয়ে পথ বানিয়ে চলেছে। আজ শুরু থেকেই ওরা দড়ি বেঁধে চলেছে। এক দড়িতে টাসী, আজীবা আর নরবু, অন্য দড়িতে আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। দিলীপকে ছবি তুলতে হচ্ছে, তাই সে আছে সবার পিছে।

ওরা নন্দাঘুন্টির উত্তর গিরিশিরার পূর্ব দিকের পথ ধরে উঠতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে প্রথম কুঁজটার নীচে এসে পৌঁছাল। পথটা এত খাড়া, এক দিকে আবার অতলস্পর্শ খাদ যে, টাসীরা এ পথে দড়ি খাটিয়ে অর্থাৎ 'ফিক্সড রোপ' করে গিয়েছে।

সুকুমাররা নিজের নিজের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সেই ফাঁসের সঙ্গে ক্যারাবিনা দিয়ে ফিক্সড রোপ যুক্ত করে দিলে। তারপর বাঁ হাতে ক্যারাবিনা ধরে ধীরে ধীরে সেই ভয়াবহ খাড়া কুঁজের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ওদের আন্দাজ সেই কুঁজটার উচ্চতা ৭০০ ফুট হবে। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একেবারে সরাসরি উঠতে দম বেশী লাগে। তাই ওরা একটু একেঁবেঁকে চলতে লাগল। চলার গতি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসছে। হাঁপ ধরছে বেজায়। তৃষ্ণা পাচ্ছে। গলা বুক শুকিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ওরা এই কুঁজটার উপরে উঠল। দেখল আজীবা, টাসী আর নরবুও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছে। ওরাও বসে পড়ল। এই ৭০০ ফুট চড়াইটা উঠতে ওদের সময় লাগল পুরো আড়াই ঘন্টা। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওরা যখন আবার উঠতে শুরু করল,তখন ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ জমতে আরম্ভ হয়েছে। ওরা সেদিকে চাইল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। আরও ৪০০ ফুট উঠল। বেলা তখন বারোটা।

সামনে, দূরে, বেথারতলির পিছন দিয়ে নন্দাদেবীর সূতীতীক্ষ্ণ শিখর একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে। নন্দাদেবীর মাথায় মেঘ জমছে। দিলীপ ফটো নিল। উত্তর দিকে রন্টি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রন্টি হিমবাহটাকে মনে হচ্ছে বরফের নদী। দুধের নদীও বলা যায়। পূর্ব দিকে এর আগে বিশেষ কিছু দেখা যায় নি। এবারে

বিরাট এক ফাটল দেখা গেল। নিমাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, এমন জায়গাতে বিরাট বড় এক ফাটলের দেখা মিলবে। কী আশ্চর্য, তার কথা হুবহু মিলে গেল। দিলীপ থেমে থেমে ফটো তুলছে। আঙ শেরিং বার বার ওকে তাড়া লাগাচ্ছে। এত দেরি করলে পৌঁছতে পারা যাবে না।

আবার ওরা ভসভসে নরম বরফে এসে পড়ল। এতক্ষণ দুটো দড়ি আলাদা আলাদা যাচ্ছিল, এখান থেকে ওরা দুটো দড়ি একসঙ্গে জুড়ে নিল। এবার ওরা ছয়জন একসঙ্গে চলতে লাগল। প্রথমে যাচ্ছে টাসী; তারপর আজীবা, তারপর যথাক্রমে নরবু, আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। আজীবা টাসীর পিছনে থাকলেও সে-ই প্রকৃতপক্ষে আজ পথ দেখাচ্ছে। আজীবার মত এত ভাল আর বুঝি কেউ বরফ চেনে না। আজীবার নির্দেশেই টাসী পথ বানিয়ে চলেছে।

ওরা আবার বিশ্রাম নিতে বসল। দিলীপ একাগ্র মনে ফটো তুলতে লাগল। সে নীচের দিকে চেয়ে ২নং শিবির দেখতে পেল না বটে, তবে আশেপাশের জায়গাগুলো চিনতে পারল।

আপন মনে ছবি তুলে যাচ্ছিল দিলীপ। অন্য সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় কান ফাটানো প্রচণ্ড এক শব্দ শূন্য আকাশ থেকে ওদের মাথায় ভেঙে পড়ল। দিলীপের পিলে চমকে গেল। হাত থেকে ক্যামেরা ছিটকে গেল। ভাগ্যিস, ক্যামেরাটা গলায় ঝোলানো ছিল, না হলে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেত।

ধক ধক বুকে হাত চেপে দিলীপ নিজেকে সামলে নিল। তারপর আকাশের দিকে চাইল। ততক্ষণে অন্য সকলেও আকাশে চোখ তুলেছে। ওরা মুহূর্তের মধ্যে দেখল ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানা জঙ্গী জেট বিমান ছোঁ মেরে ওদের দেখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ পেল না। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া, জেট বিমানের ধোঁয়া তার পিছনে কুটিল কালো মেঘের দল, তার পিছনে তীব্রগতি তুষার-ঝটিকা সবেগে ওদের আঘাত করল। এই তীব্র, হিংস্র, অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অভিযাত্রীরা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার কথাও যেন ভুলে গেল সব।

অবশেষে সংবিৎ ফিরে আসতেই সুকুমার নির্দেশ দিল," শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, বরফে মুখ গুঁজে শুয়ে পড় সব, জলদি।"

মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব না করে সকলে নেতার নির্দেশ পালন করল। তারপর পনেরো মিনিট ধরে চলল তুষার-ঝড়ের অবর্ণনীয় তান্ডব। সুকুমারের মনে হল, নরক বুঝি জেগে উঠেছে। নিস্তার পাওয়া শক্ত। তাপমাত্রা হুহু করে নেমে যাচ্ছে। শরীরের অস্থিমজ্জায় শীত যেন ঢুকে পড়েছে। চোখে-মুখে তুষারঝড়ের হিংস্রতম ঝাপটা এসে লাগছে। মুখের গালের অনাবৃত অংশের চামড়া বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই হাওয়ার বেগ কমে এল। শুরু হল তুষারপাত। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। ২০/২৫ ফুটের বেশী আর দৃষ্টি চলে না। ওরা এবার উঠে বসল। সুকুমার বোধ করল, তার পা যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে। সে গ্রাহ্য করল না।

আজীবা আর আঙ শেরিং দুজনেই পোড়-খাওয়া শেরপা। ওদের চোখে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এল। আবহাওয়ার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। বাহাৎ খতরনাক হ্যায়। হিসেব করে দেখল এখনও ১৬০০ ফুট উঠতে হবে, তারপর ২৭০০ ফুট নামতে হবে। এই দুর্যোগে। সাব্‌রা নতুন লোক। যদি ফিরতে না পারে? তা হলে অবধারিত মৃত্যু। মৃত্যু যদি নাও হয়, বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। অতএব-

আঙ শেরিং পরামর্শ দিল, ফিরে যাওয়াই ভাল।

আজীবা পরামর্শ দিল, ফিরে চল সাব্। নরবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। প্রৌঢ় শেরপা পেম্বা নরবু। সে বরাবরই চুপ করে থাকে। এতদিনের মধ্যে একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ শোনে নি। হঠাৎ সে মুখ খুলল।

বলল, "শুনো সাব্, বাঙালকা ইজ্জৎ তুমহারা হাত মে হ্যায়। উঠো, চলো উপর,আগু বাঢ়। বাঙালকা ইজ্জৎ বচানেকে লিয়ে হামলোগ জান দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়।"

সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। সে দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "উপরে চল।"

দিলীপের বুক ফেটে যাচ্ছে, সুকুমারের বুক ফেটে যাচ্ছে। আজীবা, আঙ শেরিং, টাসী, এমন কি নরবুও কাহিল হয়ে পড়েছে। জল চাই এখন, এক ফোঁটা জল। না হলে দিলীপ বুঝি মরেই যাবে। অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। প্রায় আড়াইটা

বাজে। দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর একটা পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে। না, এবার একটু জল খাবে সে। দিলীপ চট করে জলের বোতল খুলে গলায় উপুড় করে ঢেলে দিল। কিন্তু এ কী, এক ফোঁটা জলও তার গলায় পড়ল না। অথচ বোতলে জল ভর্তি। দিলীপ দেখল বোতলের জল ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

আঙ শেরিং দেখল দিলীপ ওর জলের বোতলটা উপুড় করে ধরে বোকা-বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল ওর বোতলে বোধ হয় জল নেই। তাড়াতাড়ি নিজের বোতলটা এগিয়ে দিল। দিলীপ কালবিলম্ব না করে, ছিপি খুলে বোতলটা গলায় উপুড় করে দিল। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এক ফোঁটা জলও গলায় পড়ল না। আগের মতই ভিতরের জল জমে শক্ত বরফ হয়ে গিয়েছে। বার বার একই বিড়ম্বনা। তবু দিলীপ বিরক্ত হল না, এত দুঃখে হেসে ফেলল।

আঙ শেরিংকে বোতলটা ফেরত দিয়ে সে উঠতে শুরু করল। বেলা আড়াইটা। আকাশে এখনও মেঘ, তবে আগের মত হিংস্র কুটিল নয়। মাঝে মাঝে মেঘ ছিঁড়ে আকাশ বেরিয়ে পড়ছে। ওদের দৃষ্টির দূরত্বও বেড়ে যাচ্ছে। মাঝখানে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ১০/১৫ ফুট দূরে কি আছে, তাও দেখতে পাচ্ছিল না। এখন অবস্থা একটু ভালই দেখতে পাচ্ছে। তার বেশী না।

দুটো কুঁজ পার হয়ে আসার পর থেকে দিলীপের মনে হচ্ছে, চড়াইটা যেন আর তেমন খামখেয়ালিপনা করছে না। একইভাবে উঠে যাচ্ছে। এ তবুও ভাল। এ যেন চেনা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা। খামখেয়ালি শুরু করেছে বরফ। বরফ কখনও বেশ শক্ত। এমন শক্ত যে, ক্রাম্পনের কাঁটা বেঁধে না। ওরা যেই সেইমত, অর্থাৎ পায়ে চাপ দিয়ে দু-চার কদম এগিয়েছে, অমনি ভস্‌ভস্ — অতর্কিতে নরম বরফের মধ্যে জানু পর্যন্ত তলিয়ে গেল ওদের। মহা ঝামেলা।

ধীরে, অতিশয় মন্থরগতিতে ওরা উঠে চলেছে। সকাল সাড়ে-আটটায় ৩নং শিবির থেকে বেরিয়েছিল। ছয় ঘন্টা অবিরাম উঠেছে। উঠছে। তবু চূড়ার দেখা নেই। 'ফিক্সড রোপ' করতে করতে ওদের দড়ি ফুরিয়ে গেল, তবু রাস্তা ফুরোল না। কখনও কি ফুরোবে? ওরা কি পৌঁছতে পারবে নন্দাঘুন্টির শিখরে? সুকুমার যেন প্রশ্ন করল নিজেকেই।

মাঝে মাঝে এখনও হাওয়া বইছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া। সুকুমার বুঝতে পারছে ওর সহ্যশক্তি আত্মসমপর্ণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রবল যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সুকুমারের। কিন্তু কোথায়? দেহে না মনে? পায়ের ফোস্কায়, না ব্যর্থতার আশঙ্কায়, সুকুমারের শ্রান্ত ক্লান্ত চৈতন্য সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না। মনে-মনে শুধু একটা কথা আওড়ে চলেছে, ভেঙে পড়ো না সুকুমার, পথ এখনও বাকী আছে!

সুকুমার স্বেচ্ছায় আর চলছে না। এক অন্ধ শক্তি, একটা প্রবল ইচ্ছা, স্বয়ংক্রিয় এক তাড়না তাকে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভেঙে পড়ো না সুকুমার, ভেঙে পড়ো না, পথ এখন বাকী। থেমো না সুকুমার। আগে চল।

কে আমি? আমি সুকুমার, সুকুমার রায়, খিদিরপুরের সুকুমার। এখানে কেন? পর্বত অভিযানে। কোথায় যেন একটা ব্যথা লাগছে? আমার শরীরে কি? আমার গায়ে? আমার পায়ে? নাকি হাতে? নাকি বুকে? ফুসফুসে? হৃদপিন্ডে? প্লীহায়, যকৃতে, অন্ত্রে? নাকি মনে? আত্মায়? নাকি জগৎচরাচরে অথবা কোথাও না?

এ কী, থামলাম কেন? আমি থেমে গেলাম নাকি? ওরাও যে থেমেছে। ওরা? হ্যাঁ এতক্ষণে মনে পড়ল সুকুমারের, ওর সঙ্গীরাও আছে। সে একা নয়। মনে পড়ল, সঙ্গে দিলীপ আছে। কোথায় দিলীপ? ঐ যে দড়ির শেষ প্রান্তে বাঁধা। দড়ির অগ্রভাগে কে? এতক্ষণ আজীবা ছিল। ঐ যে আজীবা, গুরুতর পরিশ্রমে কাতর আজীবা, দড়ি খুলে ফেলছে। এবারে এগিয়ে গেল কে? টাসী। ঐ যে, আজীবার জায়গায় নিজেকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।

থেমো না, সুকুমার, আগে চল। আবার চলা শুরু হল। আবার উঠতে লাগল ওরা। উঠছে, উঠছে, একজন পিছনে পড়ল, পিছনের লোক তাকে সামাল দিল। উঠছে, উঠছে, একজনের পা ফসকাল, পিছনের লোক ধরে ফেলল। উঠছে, একটু একটু করে উঠছে। থেমো না থেমো না, ওঠো।

টাসী উঠছিল সবার আগে। বহু অভিযানের পোড়-খাওয়া টাসী। দৈত্যের মত ক্ষমতাধর টাসী। সাতাশ বছরের জোয়ান টাসী। সকলের আগে আগে উঠছিল। চড়াইটা একটা সুষম ঢালুতে অবস্থান করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একটা বেপরোয়া লাফ দিয়ে খাড়াভাবে উঠে গেল। টাসী থমকে দাঁড়াল সেখানে। খাড়াই-এর উচ্চতা বেশী নয়। ফুট ছয়েক হবে। উপরে একটু কার্নিসের মত। গোদের উপর বিষফোড়া।

টাসী আজীবার মুখের দিকে চাইল। আজীবা পলকে তার ইঙ্গিত বুঝে নিল। পা ঠুকে ঠুকে বরফের কঠিন ভিত্তি তৈরি করে দুটো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর শক্ত মুঠোয় দড়ি ধরে 'বিলে' করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। আজীবা চোখ ইসারায় টাসীকে ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ়।

টাসী সেই বিপজ্জনক উচ্চতার অস্তিত্ব কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে অসাধারণ তৎপরতায় লাফ মেরে বরফের কার্নিস ধরে ঝুলতে লাগল। একটা মুহূর্ত মাত্র। টাসী তার আঙুলের জোর ফিরে পাবার আগেই তাকে কেউ যেন প্রবল ধাক্কায় ফেলে দিল। আজীবা এই মুহূর্তটির জন্যই যেন সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিল। চোখের পলকে সে দড়ির কেরামতিতে টাসীর টলমলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল। টাসী শিশুর মত হেসে উঠল। আজীবাও।

আজীবা আবার ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ় টাসী। টাসী আবার এক লাফ মেরে সেই বরফের কার্নিসে ঝুলে পড়ল। কিন্তু সে বরফ এত নরম, এতই পলকা যে, এবার কার্নিসের খানিকটা অংশ ভেঙে নিয়ে টাসী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আজীবা এবারও তাকে সামাল দিল। বার বার কয়েকবার টাসী লাফ দিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল। বার বার সে ব্যর্থ হল। মাঝে মাঝে মেঘ ফাঁক করে ওদের ব্যর্থতা এক ঝলক দেখে নিয়েই আবার চকিতে মেঘের আবডালে লুকিয়ে পড়ছিল।

ওরা বুঝতে পারল, নন্দাঘুন্টির এইটেই হল শেষ প্রতিরোধ এবং সে সহজে পথ দেবে না। আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা শুরু হল। তুষারবর্ষণও আরম্ভ হয়ে গেল। আবার ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। যেটুকু আলোও এতক্ষণ ছিল, তাও কমে যেতে থাকল।

আজীবা দক্ষ সেনাপতির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, কোথায় নন্দাঘুন্টির দুর্বলতা। সে এবারে টাসীকে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে, সেখান থেকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিল। টাসী আজীবার নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক প্রবল লাফে কার্নিস ধরে ফেলল। তারপর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে শরীরটাকে একটা দোল খাইয়েই উপরে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কার্নিসের একটা বড় অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ভীষণ বেগে কোন্ অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল। অজস্র তুষার-কণিকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টাসী তার আগেই বিদ্যুৎগতিতে একটা গড়া মেরে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে।

এবার টাসী উপর থেকে দড়ি নামিয়ে দিল। আজীবাও উঠল। তারপরে নরবু, তারপরে আঙ শেরিং তারপর সুকুমার, দিলীপ। দিলীপের মুভি ক্যামেরা আঙ শেরিং-এর হাতে। দিলীপ হাত কামড়াতে লাগল।

চড়াইটার উপর একটা চাতাল। প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল। গোটা দুই তাঁবু অনায়াসে টাঙানো যায়। পশ্চিম প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই ওদের খেয়াল হল, আরে, আর তো ওঠার জায়গা নেই! এই তো চূড়া!

এই তবে চূড়া! চূড়া, চূড়া, নন্দাঘুন্টির চূড়া!!! হা ঈশ্বর। যাক বাবা, বাঁচা গেল, আর উঠতে হবে না। সুকুমার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দিলীপের বুকের ভিতরে প্রবল এক বিপ্লব। ব্যথা-বেদনা, আনন্দ, যন্ত্রণা, সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে। একটা আওয়াজ, প্রচন্ডভাবে একটা চিৎকার করতে চাইছে দিলীপ। তাহলে সে স্বস্তি পাবে। কিন্তু দিলীপের মুখ দিয়ে একটু সামান্য শব্দও বের হল না।

কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপরেই শেরপারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এ ওর বুকে। কোলাকুলির পর কোলাকুলি। কে যে কার সঙ্গে কতবার কোলাকুলি করল, তার হিসেব রাখল না কেউ। এমনি করে আবেগের উত্তাল ঢেউগুলো ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত হয়ে এল। এরই ফাঁকে দিলীপ ঘড়ি দেখে নিয়েছে-৩-৫ মিঃ। এরই মধ্যে দিলীপ অল্টিমিটার দেখে নিয়েছে-২০৮০০ ফুট। ২০৮০০! ওদের অল্টিমিটারে তাই বলল। তবে যে সে পড়েছিল নন্দাঘুন্টির উচ্চতা ২০৭০০ ফুট। যাক গে। নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

দিলীপ কালবিলম্ব না করে ছবি তুলতে শুরু করল। শেরপারা ততক্ষণে নিয়মরীতি পালন করতে লেগেছে। অশোককুমার সরকার যে জাতীয় পতাকাটি হাওড়া স্টেশনে সুকুমারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সুকুমার সেই পতাকাটি নিজের তুষারগাঁইতিতে বেঁধে পুঁতে দিল চূড়ায়। শেরপারা রমের বোতল খুলে খানিকটা রম ঢেলে দিলে। কলকাতা থেকে কারা যেন নারকেল সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ভেঙে তার জল ঢালতে গিয়ে দেখা গেল, সেই জলও বরফ হয়ে গিয়েছে। দিলীপ আশা করেছিল, নারকেলের জল খেয়ে তেষ্টা মিটাবে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অভাগা যেদিকে চায় সাগরও জমিয়া যায়।

সে ক্ষুণ্ন মনে রোলিকর্ড ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডার খুলে ছবি নিরিখ করতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভিউ-ফাইন্ডারটি বরফের গুঁড়োয় ভরতি হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে আন্দাজে সেরেফ চোখের নিরিখেই ছবি তুলে গেল।

ওরা এক বান্ডিল দড়ি ওখানে গোল করে পুঁতে দিল, তার মধ্যে একখানা জাতীয় পতাকা পেতে, তার উপর সকলের নাম লেখা কাগজখানা রেখে তার উপর পিটন চাপা দিয়ে রেখে দিল।

আঙ শেরিং দিলীপকে ডাক দিল। একটা মগ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "লেও, পিও।"

দিলীপ দেখল তরল পদার্থ। ওর তেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এক চুমুকে সেটা খেয়ে নিল। হায় ভগবান। এ যে রম। নির্জলা রম। ওর গলা বুক জ্বলে গেল। মাথা ঘুরে সেখানেই বসে পড়ল। শেরপাদের সে কী হাসি! দিলীপের মনে হল সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি সে খানিকটা বমি করল। তারপরে টুপি খুলে ফেলল। মাথায় খানিকক্ষণ বরফ পড়তেই সে খানিকটা চাঙ্গা হল।

তারপর ওরা নামতে শুরু করল।

দিলীপ ঘড়ি দেখল। বেলা তখন ৩ ৪০ মি·। আরোহণ যতটা কষ্টসাধ্য, অবতরণও প্রায় তাই। ওরা উঠবার সময় যে রাস্তা বানিয়ে রেখে গিয়েছিল নতুন বরফ তা ঢেকে দিয়েছে, আবার নতুন করে পথ বানাতে হল। ফলে গতি খুব শ্লথ হয়ে এল। ওরা যে সময় বড় কুলোর উপর এসে পৌঁছাল, তখন গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। কিছু দেখবার উপায় নেই। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে সেই বিপজ্জনক ৭০০ ফুটের খাড়া উৎরাই। বিপদের উপর বিপদ, ওরা যে 'ফিক্সড রোপ' করে গিয়েছিল, বরফ পড়ায় তার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। আঙ শেরিং এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সে বললে, এই অন্ধকারে, এই নিদারুণ বিপজ্জনক পথে নামা ঠিক হবে না। এসো আমরা এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই। কাল সকালে নামব। নরবু বলল, আমাদের সঙ্গে তাঁবু নেই, সাবদের যা পোষাক, তাতে রাত্রে এখানে থাকলে পাষাণ হয়ে যাব। মৃত্যু অবধারিত। নামবার সময়ও মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয় এখানে থেকে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার চাইতে নামবার চেষ্টা করাই উচিত। তাতে যদি মৃত্যু হয়, তাও ভাল।

নরবুর কথাতে সকলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে 'ফিক্সড্ রোপ' পাওয়া গেল। তারপরে শুরু হল এক দুঃসাহসিক অবতরণ। টাসী আগে আগে নামছে। তার হাতে দড়ি, মুখে টর্চবাতি। সে কয়েক ধাপ নেমে একে একে পিছনের লোকেদের নামতে সাহায্য করছে। সুকুমার দেখল একটা টর্চের আলো তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। হাওয়া নেই। দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। আছে শুধু শীত। প্রচন্ড ঠান্ডা। আর আকাশে অজস্র তারা।

দিলীপের অদ্ভুত লাগছিল। কী নিস্তব্ধতা! এই অন্ধকার রাত্রির মতই ঘন সেই নৈঃশব্দ্য। ওর কানে কেউ ভারি সীসে ঢেলে দিয়েছে। আর এই উজ্জ্বল তারাগুলো কত নীচে ঝুলে আছে। ও যেন ইচ্ছে করলেই একটা তারা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলতে পারে।

আরে, ও কী! দিলীপ চমকে উঠল। ওর দড়িতে ঝাঁকুনি লাগল। একটা টর্চের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা অতি দ্রুত খাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সর্বনাশ! সেই শীতেও দিলীপের গায়ে ঘাম দেখা দিল। টাসী পড়ে গিয়েছে।

'ফিক্সড্ রোপ' ধরে নেমে যাচ্ছিল টাসী। হঠাৎ গোটা কয়েক পিটন উপড়ে গেল। নিমেষের মধ্যে সে ২৫/৩০ ফুট নীচে সোঁ করে তলিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সে দড়ি ছাড়েনি। তাই বেঁচে গেল। ওকে তুলে আনা হল। পিটনগুলো আবার পোঁতা হল ভাল করে। তারপর অতি সাবধানে নামতে নামতে, রাত্রি সাড়ে-নটার সময় ৩নং শিবিরে পৌঁছে গেল। তের ঘন্টার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সবাই তখন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে খানিকটা সুরুয়া গরম করে নিয়ে কোনমতে গিলে ফেলল। তারপরে তলহীন নিদ্রার সুগভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল সবাই।

বিশ্বদেব না, মদন না-২নং শিবিরে ঘুমুতে ওরা কেউ-ই পারে নি। ২৩ শে অক্টোবর, ভোরে, আলোর রেখা ফুটে উঠতেই, চা খাওয়ার তরও কারো সইল না, বিশ্ব আর মদন বেরিয়ে পড়ল ৩নং শিবিরের উদ্দেশ্যে। শেরপাদের বলে গেল, পরে আসতে।

কিছুদূর এগিয়েছে, এমন সময় দূরে দেখল, ওরা আসছে। সকলের আগে সুকুমার। তার হাতের তুষার-গাঁইতিতে বাঁধা উড্ডীন জাতীয় পতাকা। বিশ্ব আর

মদনকে দেখতে পেয়ে সুকুমার তুষার-গাঁইতিটা তুলে ধরল। পতাকা সকালের বাতাসে সতেজে উড়ে সংকেতে জানাল, ওরা সফল হয়েছে। ওদের সব কষ্ট, পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। বিশ্বদেব আর মদন আনন্দে লাফাতে থাকল। সুকুমার কাছে আসতেই বিশ্ব তাকে জড়িয়ে ধরল। ফুর্তির চোটে চোখে জল বেরিয়ে এল দুজনের। দিলীপ তার ক্যামেরা বাগিয়ে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিল। সে এই 'মহামিলনের' সাক্ষী রেখে দিল তার ফিল্মে। এই সময় সুকুমারের আবার মনে হল, কোথায় যেন তার যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু সে এখন আবেগে অন্ধ। ভ্রূক্ষেপ করল না বিশেষ। মদন, দিলীপ আর শেরপাদের সঙ্গে আলিঙ্গনের পালা শেষ করল। তারপরে দ্রুত নেমে চলতে লাগল নীচে। ২নং-এর শেরপাদের বলে এল, তারা যেন ৩নং- এর মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে আজই নেমে আসে।

সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ওরা প্রায় ডবল-মার্চ করে, সেইদিনই যখন অ্যাডভান্স বেস-এ এসে পৌঁছাল, তখন বেলা সাড়ে-চারটে বেজে গিয়েছে। সন্ধ্যে হতে বাকী নেই। বীরেন সিংহ ছুটিয়ে ছবি তুললেন। হৈ-হুল্লোড় হল। ঘুমুতে যাবার সময় সুকুমার টের পেল যন্ত্রণা হচ্ছে তার পায়ে। আঙ শেরিং, এমনকি দিলীপও বোধ করল, পা যেন টাটাচ্ছে।

২৭শে অক্টোবর বেলা দশটার মধ্যেই বীরেন সিংহ আর ডাঃ অরুণ কর বেস-ক্যাম্পে পৌঁছে সুখবরটি দিলেন। আনন্দে সবাই অধীর হয়ে উঠল। ডাঃ কর পায়েস রাঁধতে বসে গেলেন। বাকী সবাই প্রায় সাড়ে-এগারোটার সময় এসে পৌঁছাল। সমস্ত মালবাহককে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হল মাল নামিয়ে আনতে। সুকুমার আর চলতে পারছে না। আঙ শেরিংও না। ওরা পা পাততেই পারছে না, এমন টাটানি। ডাক্তার সুকুমারের পা খুলে ফেলল। দু পায়ের আঙুল কটা ফুলে গিয়েছে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল নীলবর্ণ। ডাক্তার মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে সুকুমারকে বললে, কিছুই না, ফোস্কা পড়েছে মাত্র। ধ্রুবকে এসে চুপি চুপি বলল, দুজন লোক ঠিক কর। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আঙ শেরিং এর পা খুলে দেখা গেল, ওর পায়ের আঙুলগুলো কাটা। পায়ের পাতাই আছে শুধু। ডাক্তার অবাক হয়ে ভাবল, এই লোকটা এই পা নিয়ে এতখানি উঠল কি করে? আঙ

শেরিং- এর পা-ও জখম হয়েছে। দিলীপের ফাঁড়া একটা আঙুলের চোটের উপর দিয়েই কেটেছে। ডাক্তার ওদের চিকিৎসায় মন দিল।

লেখকের দিনলিপি থেকে ঃ

বেসক্যাম্প থেকে, ২৪শে অক্টোবর। আজ আমরা ফিরে যাবার গোছগাছে ব্যস্ত। সুকুমার বিষণ্ণ। ওর পা নিয়ে খুব ভাবছে। আমি টেলিগ্রাম লিখে ফেললুম। পুরো রিপোর্টটা উনুনের পাশে বসে শেষ করলাম। বিস্তারিত বিবরণ ডাকে পাঠাব। জয়ের সংকেত পাঠাব তারে। কেদার সিংকে আজ ছাড়লাম না। কাল সে আমাদের রন্টি নদীর প্রবাহ ধরে, নতুন পথে মোরনা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে দেবে। তারপর তার ডাক নিয়ে ছুটবে যোশীমঠ। পরশুই তাকে টেলিগ্রাম লাগাতে হবে।

নোটবুক খুলে সংকেতটা বার বার করে পড়লাম। তারপর লিখলাম ঃ

Editor tell mother returning twenty second repeat editot tell mother returning twenty second repeat editor tell mother returning twenty second stop Gour.

২৬শে অক্টোবর। বেস ক্যাম্প তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু হল। আসবার আগে সকলে মিলে পাহাড়ের গা পরিষ্কার করে দিয়ে এলাম। কোন জিনিষ, এক ফোঁটা ময়লাও আমরা রাখতে দিলাম না। পর্বতারোহীদের এই দস্তুর। যে পাহাড় পরম সহিষ্ণুতায় আমাদের সব উৎপাত সহ্য করেছে, আজকের প্রার্থনায় তাকে অন্তরের সমস্ত সততা দিয়ে ধন্যবাদ জানানো হল।

২৭শে অক্টোবর। মোরনার ঠিক নীচে আমরা রাতের শিবির স্থাপন করলাম। গ্রাম থেকে লোক ভেঙে পড়ল। ডগদর সাহেবের জন্য। এরা ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে পাত্তাই দিল না।

২৮শে অক্টোবর। সকাল সাড়ে-সাতটায় উঠেই সুকুমার, ধ্রুব, মদন, বিশ্ব, দিলীপ, আঙ ফুতার আর নরবু লতা গ্রামের দিকে রওনা দিল নন্দাদেবীর মানত শোধ করতে। তাদের সঙ্গে মানতের ভেড়াটাও লাফাতে লাফাতে চলল। একটা ভেড়া

নিয়ে **পথ** চলা কঠিন। গড্ডালিকা ছাড়া ওরা চলতে চায় না। কিন্তু মালবাহকেরা বলেছিল, এই ভেড়া নিয়ে কোন মুশকিলে পড়তে হবে না। মানতের ভেড়া নিজের তাগিদে পথ চলে। সত্যিই এই ভেড়াটা আমাদের পথ দেখাতে দেখাতে চলে এসেছে। একবারও ঝামেলায় ফেলেনি। আমি, বীরেনদা আর ডাক্তার দশটার সময় অন্যান্য শেরপাদের সঙ্গে তপোবন যাত্রা করলাম।

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে ঃ

চটির দোতলায় রাতের সংবাদ শোনার জন্য রেডিও খুলে বসে আছি। কাল কেদার সিং দু দিনের পথ এক দিনে দৌড়ে টেলিগ্রাম লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। যদি আজ কাগজে খবরটা বেরিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই রেডিওতে বলবে। সাড়ে-সাতটায় খবর বলা শুরু হল। একেবারে শেষের দিকে সংবাদঘোষক নন্দাঘুন্টি বিজয়ের খবর দিল। তারপর হিন্দী বুলেটিনেও খবরটা প্রচারিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে তপোবনের আবহাওয়া বদলে গেল। দলে দলে লোক ছুটে এল সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে। প্রথমে এলেন একজন গাড়োয়াল কবি। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে আমাদের অভিনন্দন জানালেন।

"হে বীরপ্রসবিনী ভারতমাতার সন্তানগণ, তোমরা মাতার গলায় গৌরবের এক চন্দ্রহার ঝুলিয়ে দিয়েছ, তোমরা ধন্য।"

"মাতার ললাটে গৌরবের উজ্জ্বল সিতারা (তারকা) লটকে দিলে, তোমরা ধন্য।" তারপর বাঁধভাঙা বন্যার মত লোক ছুটে এল। আমাদের টেনে নীচে নামাল। শুরু হল সমবেত নৃত্য। রাত দুটো পর্যন্ত নৃত্য চলল। তারপর নেহাত করুণাবশেই-কারণ আমাদের প্রাণ ততক্ষণে ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে-যেন আমাদের রেহাই দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এরকম সংবর্ধনা আর গোটাকতক কপালে জুটলেই পৈতৃক প্রাণটি যে কলকাতায় ফিরবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম।

২৯শে অক্টোবর। যোশীমঠ। পথে বড়গাঁওতে শোভাযাত্রা করে স্কুলের ছাত্ররা বিদায় সংবর্ধনা জানাল। পোষ্ট অফিসে এসে তিনখানা তার পেলাম। অভিনন্দন। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি, সুকুমারের ভগিনীপতি আর প্রবোধ সান্যাল অভিনন্দন জানিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীযোগেন সেন টাকাও

পাঠিয়েছেন। দুর্ভাবনা গেল। কেদার সিং বিদায় নিল। গোরা সিং আগামীকাল যাবে। এখন একে একে সকলেরই যাবার পালা।

লেখকের দিনলিপি থেকে ঃ
২রা নভেম্বর। যোশীমঠ। আজ বদ্রীনাথ থেকে ফিরেই তিনখানা টেলিগ্রাম পেলাম। দুখানা বার্তা সম্পাদকের, একখানা দিল্লী থেকে আমাদের কাগজের শ্রী অশ্বিনী প্রতিনিধি শ্রী অশ্বিনী গুপ্তের। দিল্লী যাবার আমন্ত্রণ। রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাতের আমন্ত্রণ। সুকুমারের হাতেও টেলিগ্রামের বোঝা। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। প্রথমে দিল্লী, তারপর দিল্লী থেকে কলকাতা। অভিনন্দন। অভিনন্দন। অভিনন্দন।

৪ঠা নভেম্বর। পিপুলকোটি। এক মাস ছয় দিন পরে আবার এখানে ফিরে এলাম। মালবাহকদের দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দেওয়া হল। ওরা ছলছল চোখে বিদায় নিল। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সারা দিন ধরে আমাদের জামা-কাপড় কেচে দিল। বাস ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। রাত থাকতেই বাসে উঠতে হবে। প্রথম গেটেই বাস ছাড়বে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর, কফি খাইয়ে, বাসনপত্র মেজে হরি সিং আর লালুও বিদায় নিল। লালুর চোখে জল।

"সাব্।" চমকে উঠলাম। হরি সিং।

"সাব্, মোটা সাব্, আগর কুছ কসুর হুয়া তো মাফ কর দেনা।"

বেস ক্যাম্পে সারা রাত জুয়া খেলে বহু টাকা হেরেছিল হরি সিং। ওকে খুব বকেছিলাম। ওর কি সেই কথা মনে পড়ল?

"হরি সিং!" ডাক্তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করতে গেল। পারল না। অ্যাডভান্স বেসে এইটেই ছিল ডাক্তারের প্রচলিত রসিকতা। ডাক্তার নাটুকে সুরে হাঁক পাড়ত, "হরি সিং, উজীর!" হরি সিং হাত জোড় করে জবাব দিত, "হু-জু-র।" ডাক্তার বলত, "তুমকো বরখাস্ত কিয়া গিয়া হ্যায়।" "জী হুজুর।" হরি সিং হাত জোড় করে থাকত। ডাক্তার হাঁকত, "তুমহারা তনখা বাজেয়াপ্ত হো গিয়া হ্যায়।" "জী সরকার।" "লেকিন তুমকো কাম করনে পড়েগা।" "জী সরকার।" "যাও,

চা বানাও।" "জী সরকার, আভি লাতা হুঁ।"

ডাক্তার তেমনি করেই হাঁক ছাড়তে গেল। পারল না। ওর গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

"হরি সিং! মন্ত্রী!"

"জী সরকার।"

ডাক্তারের চোখে জল। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, "ভগবান তেরা ভালা করে, হরি সিং।" হরি সিং এর দু' চোখে জলের ধারা নেমেছে। জনে জনে হাতজোড় করে বলে চলেছে,'ইয়াদ রাখ্না সরকার। তুমহারা হরি সিংকো ইয়াদ রাখ্না।"

কালকূট

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

কত দিনের সাধ, পাহাড়ে উঠবো। একবার হিমালয়ে যাব। তাই বোধ হয় ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে ঘুরিয়ে, হিমালয়ের তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ করে, আমার পথ চলার নিয়তি আজ এখানে টেনে নিয়ে এল। এর আগে বিন্ধ্যাচল পাহাড় দেখেছি। আরাবল্লীর রেঞ্জ দেখেছি। কিন্তু পর্বতের পরিপূর্ণতার এই অনুভূতি ছিল না। আর আমার মনের সঙ্গে তাল দিয়ে যেন, পাহাড়ে গা বেয়ে এই বিচিত্র রেলগাড়ির চলমান স্রোতের মধ্যে, বিস্মিত আনন্দের কলকল ধ্বনি বাজছে। অপরূপ! দূরে নীল আকাশের গায়ে কৃষ্ণনীল পাহাড়ের সীমা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে, মেঘ সরে গিয়ে, নতুন নতুন নীল পাহাড়ের চূড়া ভেসে উঠছে। কী বিশাল! যাত্রীদের কলগুঞ্জন ক্রমে আমার কাছ থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছিল। অরণ্যের নিবিড়তা, অথচ মুক্ত আকাশ ও স্তব্ধ পাহাড় এবং চলমান সাদা মেঘের খেলায় আমি আস্তে আস্তে যেন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

হিমালয়ের কত ছবি দেখেছি, কত বই পড়েছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপস্থিত এ অনুভূতি কখনো বোধ করি নি। এই গাম্ভীর্য, অথচ প্রসন্নতা অসীম বিশালতাকে যেন আমি ছুঁতে পারি নি। আমার স্তব্ধবাক্ নিবিড় বিস্ময়, গভীর এই আনন্দের অনুভূতির জন্যে, এই মুহূর্তে, কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কার কাছে?

আর এমন আশ্চর্য আরণ্যক, এমন শিলাস্তৃত পার্বত্য, সীমীহীন সমতল, এবং সমুদ্রবেষ্টিত, এই ভারতের যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই মুগ্ধ বিস্মিত আনন্দের আবেগের মধ্যে, কেন জানি নে, আমার বুকে দুলে উঠে একটি জলধারার জোয়ার দু'চোখ ভাসিয়ে এসেছে। মনে হয়েছে, সীমাহীন আকাশের জল, এই সীমাহীন ঐশ্বর্যের দুয়ারে দাঁড়িয়েও, প্রাত্যহিকতার কোন্ ছোট একখানি হাটের কাঙাল হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। কেন আমি জানিনে সেই মন্ত্র। কেন আমার হয় না সে সাধন, আমি ডুবে যাব নীরবে নিঃশব্দে, আমার সকল বিস্ময় আনন্দ অশ্রু নিয়ে। এই মহাপ্রকৃতির মধ্যে।

এ কি বৈরাগ্যের বিলাস? জানি নে। কিন্তু বিষণ্ণতা কোথাও নেই। মনে হয়,

এ মহাবৈভবের মধ্যে কোথাও যেন একটি ঘর ছাড়া প্রসন্ন বৈরাগ্যের সুর বাজে। এ বৈরাগ্য কি ভারতেরই মৃত্তিকার দান? কে জানে। সংসারের নিবিড়তার, সদাই কর্তব্যের আহ্বানও তো এ মৃত্তিকায় সদাজগ্রত।

এইরূপ অরূপের মাঝখানটায় সদাই দোলা খাই। তাই ছুটে ছুটে বেরিয়ে পড়ি। পথের ধূলার ডাক শুনি। দূর দূরান্তের নয়, সে ডাক নিতান্ত দৃশ্যান্তরের,নতুনের বৈচিত্র্যের। শহর থেকে রেলে চেপে একটা ষ্টেশন পেরিয়ে গেলেই সাধ মিটতে পারে। একটু বা শরতের সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে কিংবা শত শত মাইল দূরেও ক্ষতি নেই। এ পথের আহ্বান শুধু বিচিত্রের বৈভব লুটে নেবার হাতছানি।

তাই লিখতে বসে সঙ্কোচ হল, পাছে একে কেউ ভ্রমণকাহিনীর অহঙ্কার বলে বোঝে। একে কি বলব, তার সংজ্ঞা আমার জানা নেই। প্রাণের মাঝখানে আছে যেন এক রূপ রসিকের বাস। বলতে হয়, এ শুধু রূপের ক্ষুধা মেটাবার এক অতৃপ্ত অনুভূতির প্রকাশ। বিচিত্রের স্বাদ পাবার সাধ। ঘর ছাড়া, পথ চলা, করতালির শব্দ। আনন্দের একটু কাঁদন। ব্যথার একটু হাসি। এইটুকুই মাত্র।

অরণ্য গভীর। ছেলেবেলায় বইয়ে পড়া সেই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠছে চোখের সামনে। অরণ্য আবৃত, প্রস্তরগাত্র। কিন্তু সেই প্রস্তর যে এমন বিরাট বিচিত্র আকৃতির, আগে তা জানি নি। আগে জানি নি, সেই অরণ্য এমন নিবিড়, এমন ছায়াঘন আঁধার আঁধার, শতাব্দীর প্রবীণ বনস্পতিদের লতাগুল্মের জটার বাঁধনে,সবুজের কি বিচিত্র বর্ণের সমারোহ। প্রস্রবণের দেখা এখন পায়নি। পাবো , সে খবর আমি পাচ্ছি, ওই দূরে, বাঁয়ে মহানদীর দিকে তাকিয়ে। আমি যে চলেছি, সকল মহানদীর জন্মভূমিতে। সকল মহানদীর স্রষ্টা হিমালয়ের, সোনার শিখরে বেষ্টিত এক বর্ণাঢ্য অঙ্গনে। নদীরা সেখানে প্রস্রবণ হয়ে নেমে চলেছে, হিমালয়ের আপন ঘরোয়ানার নাচের ছন্দে, গানে সুরে।

এ গাড়ির শব্দ বড় বিচিত্র। মনে হয়, অরণ্য-পর্বতের দিগন্ত থেকে দিগন্তের ঘুম ভাঙানোর একটা জেদ আছে তার শব্দে। আবার কখনো কখনো, সে শব্দ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। কেন বুঝতে পারি নে। তখন ঝিঁঝির ডাক তীব্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঝিল্লীমুখরিত বনপরিপূরিত পর্বত বাহুর এই বিচিত্র যানে বসে মনে হয়, আমার সমতলের চিরচেনা রাজ্য থেকে কোন্ এক অবাস্তব লোকে এসে পড়েছি। দু'পাশের গভীর বনের দিকে একটু নিবিষ্ট হয়ে তাকালেই, বোঝা যায়, এ অরণ্য

শ্বাপদ-সঙ্কুল। আমরা এখনো পাদদেশে তরাইয়ের অরণ্যের গভীরে। কিন্তু চলেছি কত নিঃশঙ্ক চিত্তে।

জানিনে, বিদেশীরা শুধু বাণিজ্যের লোভে লুটের আশায় এই সরীসৃপতুল্য হাওয়া গাড়ি আর রাস্তা তৈরি করেছিল না। কিন্তু শতসহস্রের সহজ শৈল বিহারের আনন্দের পুণ্যি কি তাদের একটুও স্পর্শ করবে না? শুনেছি, একদা সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন ছিল। সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে গরুর গাড়ি নয়তো পালকিতে করে সুদীর্ঘ দুশো মাইল রাস্তা পার হতে হত। রাস্তার নাম ছিল, 'গ্যাঞ্জেস্ হিমালয়ান রোড'। পূর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ, তিতিলিয়া আর শিলিগুড়ি পার হয়ে দার্জিলিং এর শিখরে। যারা ঘোড়ায় চাপতে পারতো, তারা ঘোড়ায় যেত। তারপর শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেল হয়েছিল। শিলিগুড়ি থেকে টাঙ্গায় দার্জিলিং। তারও অনেক পরে, ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্টজ এর পরিকল্পনায় এই দার্জিলিং হিমালয়ান রেললাইন তৈরি হয়েছিল। সেটা আঠারো শো উনাশি। আঠারো শো আশিতে তিনধরিয়া, একাশিতে দার্জিলিং পর্যন্ত লাইন পাতা হয়েছিল।

কিন্তু তখন বাঙলাদেশ, শুধু বঙ্গদেশ ছিল। হয়তো তার পূর্ব-পশ্চিমের জীবন ধারণের রীতিনীতির ফারাক ছিল কিছু। কথার সুর, উচ্চারণ, আর সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্রণের বিভিন্নতায় কিছু গরমিল ছিল। কিন্তু দুই রাষ্ট্র ছিল না। রাজনীতি কি বিচিত্র, বহুমুখী সাপের মতো তার প্রতিটি কুন্ডলিত বাঁকে বাঁকে বিষাক্ত দাঁত উদ্যত। বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে সে চিরকাল নারাজ। তার নিজের বিশ্বাসই বিশ্বাস। তাই বাঙলাকে পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান দুই রাষ্ট্রে ভাগ হতে হয়।

রং টং। আশ্চর্য নাম স্টেশনের, রং টং ? এই পাহাড়ের মানুষের ভাষায় হয়তো এই শব্দের মানে আছে। আমরা সমতলের লোকেরা তা জানি নে। না জানলেও, নামের মধ্যে একটা ধ্বনি আছে, ঝংকার আছে। যে ঝংকারের মধ্যে বাজছে এক অচেনা সুর। অচিন দেশের দূরত্ব আনন্দ যেন বেজে উঠলো সেই সুরে। নিজের ভাষায় বলতে হয়, রং তো বটেই। যদি রেগে টং হয়ে আছে না বলে, রং এ টং হয়ে আছে বলা যেত, তবে বোধ হয় ঠিক হতো। এই রৌদ্রজ্জ্বল হিমালয় যেন সমতল ও আকাশের রস পান করে, প্রমত্ত হয়ে উঠেছে।

ভেবেছিলাম এক, দেখছি আর এক। যেদিকে তাকাই, বর্ণবহুল সবুজের বন্যা বইছে চারিদিকে। সমগ্র হিমালয় কি এমনি অরণ্যে ঢাকা! আর এত ফুল!

লাল, নীল, হলুদ, সাদা, চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি। না জানি গাছের নাম, না জানি ফুলের। তবু বাংলাদেশের সমতলের ছেলে। বনগাঁদা চিনতে ভুল হয় না। বন জুঁই, কুরচি আর দেবকাঞ্চন চিনতে ভুল হয় না। আর বড় বড় সাদা অজস্র ওই ফুলগুলো, কী ফুল? ধুতুরা? যদি তাই, তবে সবুজ রঙের সেই গোল কাঁটা ফল দেখতে পাই নে কেন?

যতই উঠছি, ততই, পাহাড়ের গা বেয়ে চা বাগান উঠছে সঙ্গে সঙ্গে। দূর পাহাড়ের ঢালু গা দখলে, হঠাৎ মনে হয়, মোয়িং মেশিনে ছেঁটে দেওয়া সবুজ লন দেখছি। মোয়িং মেশিনে না হোক,চা বাগিচার ঝাড়েও ছাঁটাই যন্ত্র পড়ে। তাই দূর থেকে সমান আর মসৃণ মনে হয়। আসলে সবই চা বাগান। প্রতি পদে পদে ফার্ণ এর ছড়াছড়ি। আর অরণ্যের ঘাস এবং ফুল ছাড়াও পাথরের এক আশ্চর্য গন্ধ। হিমালয়ের গন্ধ ফুসফুসে ঢুকছে, রোম কূপে কূপে, রক্তের শিরায় শিরায়। হিমালয়ের নেশা লাগছে। মাতাল হচ্ছি। কথা ভুলে যাচ্ছি। অনুভূতির মধ্যে এক আনন্দদায়ক স্তব্ধতা নেমে আসছে। অথচ উদ্বেল হয়ে উঠছি। সে উদ্বেলতা বুকের মধ্যে যেন এক পূর্ণ জলাধারে টলটল করছে। ছলছলিয়ে উঠছে।

সিঙ্গলীলার এক বাহু বেয়ে চলেছি। এক একটা লুপ বেয়ে, চক্রাকারে ঘুরছি আর উঠছি। কেন, এ গাড়ির কি বাফার বলে কিছু নেই? এ কি সত্যি সরীসৃপ, লুপ এর চক্রে যেন গাড়ির ল্যাজা মাথা এক হয়ে যাচ্ছে। চক্রাকারে উঠছি, রিভার্স এ উজান বেয়ে উঠছি। সিঙ্গলীলা পর্বতের বাহু ক্রমে ওপরে উঠছে। এই সিঙ্গলীলা নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে গিয়ে মিশেছে। সীমানা ভাগ করে দিয়েছে নেপাল আর সিকিমের। সিকিম এবং দার্জিলিং এর। আর সামনে, এই কি সেলিম পাহাড়? যার চূড়ায় এখন সকল দিগন্ত ঢাকা পড়ে গেছে।

বাঁয়ের সেই দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ফাঁকের জানালা কখন ঢাকা পড়ে গেছে। মহানদীকে আর দেখতে পাচ্ছিনে। ডাইনে, মাঝে মাঝে, বহু দূর নিচে একটি ঝাপসা আয়না যেন চিকচিকিয়ে উঠছে। তিস্তা চলেছে সমতলে।

কিন্তু তরাই কি শেষ হল না? অরণ্য যে এখনো নিবিড়, নিবিড়তর। স্তব্ধ মহীরুহ, ঋজু গম্ভীর। পার্বত্য পাইনের অরণ্য। প্রস্তর-গাত্র আছে, প্রস্রবণও দেখলাম, তবু, গভীর অরণ্যই যেন সুমহান গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, হিমালয়ের ক্রমশ আবরণমুক্ত যে রূপ দেখে আমি এক মৌন

আবেশে ডুবে যাচ্ছিলাম, সহসা শব্দের চকিত চমকে তবু বিরক্ত হতে পারলাম না। নিজের ভিতরটাকেই বা কতটুকু চিনি। কে জানতো, আমার মৌন স্তব্ধতার অন্তর্স্রোতে, প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ দর্শনের খুশি চঞ্চলতায়, এমনি এক উদ্দাম তাল মান লয়, সুর ও ছন্দের ঝংকার আবর্তিত হচ্ছিল। এর কোনো ব্যাখ্যা আমি জানি নে। শুধু অনুভব করলাম, ওদের সুরের দোলা, বেগের ছন্দ, আমার প্রাণে ঢুকেছে চুঁইয়ে। আমার মৌন আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। আমার মনে হল, চারপাশের ছোট ছোট উপত্যকায়, গিরি সঙ্কটের অরণ্যানীতে ওদের গানের সুর আর তাল ছন্দিত হয়ে উঠলো। এই খেলাঘরে ছোট্ট গাড়িটাও যেন দুলতে লাগলো তালে তালে। ছুটতে লাগলো, উঠতে লাগলো ওদের সুরের বেগে। স্বয়ং হিমালয় যেন প্রসন্ন হয় উঠলেন। রৌদ্র আর মেঘের আলো ছায়ার বিচিত্র খেলা তার দিগ্‌দিগন্তে।

গাড়ি ইতিমধ্যে সিঙ্কলের পাদদেশ দিয়ে, ঘুমবাজার পেরিয়ে ঘুম স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। অল্প কুয়াশা ছড়ানো চারিদিকে। সোনাদার মতো ভরী গাঢ় নয়। সবই দেখা যায়, অথচ সবই যেন ঝাপ্‌সা আব্‌ছায়ায় মাখানো। এ কুয়াশার রূপ আলাদা। গাড়ির শব্দ থেমে গেছে। ঘুম স্টেশনকে আমার নির্জনতম স্টেশন বলে মনে হল। নীরবতম বটে। দার্জিলিং এর পথে সর্ব্বোচ্চ স্টেশন। দার্জিলিং এখান থেকে নীচে নেমে গেছে। সব মিলিয়ে, ঘুম যেন কি এক ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্যে মৌন। আর হালকা অনড় কুয়াশার আবছায়া যেন গাম্ভীর্যের মধ্যে কী এক অলৌকিকতায় ঘিরে রেখেছে। কী একটা পাখি ডাকছে, আমি তার নাম জানি নে।

মনটা যেন বিস্ময়ে ও নিঃশব্দ আনন্দে ভরে উঠলো। সবাই তো সমতল থেকে আসছি। তবে একলা কেন এত বিস্ময় মানি। এই বিশাল গম্ভীর অপরূপ রূপ দেখে কী? মনের মধ্যে কোথায় একটা অচেনা রহস্যময় দরজায় আমার ঘা পড়ে কেন? কেবলি মনে হয়, দেখতে পেলাম না। কী যেন দেখতে পাচ্ছি নে। এই সকল কিছুর মধ্যে , কোথায় যেন সেই কিছু মিশে আছে। আমি তাকে চিনতে পারছিনে। তাই আনন্দের নিবিড়তার মধ্যে, একটি ব্যাকুলতাও অনুভব করি। একটি মধুর বেদনা অনুভব করি।

এই প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে, আব্‌ছায়ায় দেখতে পাচ্ছি বিশাল পপ্‌লার শ্রেণী, শান্ত মৌন কিন্তু জীবন্ত। বিরাট বার্চের মাথা ওপরের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। পাইনের নিবিড়তা ঘিরে রেখেছে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই একক মহানুভবতায়

মহীয়ান হয়ে উঠতে পারে না। মানুষ এবং প্রকৃতি, কিছুই নয়। ন'জনের মহানুভবতার যোগফল, দশমকে মহীয়ান করে তোলে। একজনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। হিমালয়ের এই বিচিত্র বাহ্য প্রকৃতির অপরূপ রূপ মিলে মিশে তাকে মহীয়ান করেছে।

গাড়ি আবার এগিয়ে চললো। কামরার মধ্যে গন্তব্যে পৌছানোর, যাত্রা শেষের গুঞ্জন উঠেছে। দেখতে দেখতে গাড়ি বাতাসিয়ার শেষ চক্রে (লুপ) প্রায় বৃত্তাকার হয়ে গেল। দেখলাম গাড়ির সামনে পিছনে দুটি এঞ্জিন কাজ করছে। আবার রোদ হেসে উঠেছে।

সহসা কে যেন চীৎকার করে উঠলো, 'কাঞ্চনজংঘা'! 'কাঞ্চনজংঘা'!

চকিত হয়ে দৃষ্টি ওপরে তুললাম। চোখের ওপর ভেসে উঠলো শ্বেতমর্মরের মতো দুটি তিনটি চূড়া। দূর উত্তরের আকাশে, রৌদ্র চকিত নীলাম্বরের বুকে, প্রায় যেন সাদা মেঘের মতো। কিন্তু একমুহূর্ত চোখ রাখলেই টের পাওয়া যায়, মেঘ নয়, আর কিছু! শুধু মৌন শ্বেতশির তুষারের বুকে হাল্‌কা নীল ও সবুজ ও হলুদের ছোঁয়া লেগেছে ভাঁজে ভাঁজে । কিংবা ঠিক যেন সে রং ব্যক্ত করতে পারিনে। ভাষার থেকে, শিল্পীর তুলিতেই হয়তো তার রঙের ব্যাখ্যা হয়।

দুটো দিন কোথাও বেরুলাম না। প্রত্যহের অনেক কোলাহল, অনেক ব্যস্ততা, জটিলতা, তিক্ততার বাইরে এসে বার্চহিল রোডের এই নির্জনতা, হিমালয়ের এই আরণ্যক স্তব্ধতায় ডুবে গেলাম। এই দুদিনের মধ্যে কাঞ্চনজংঘার সঙ্গে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাত্র দুবার দেখা হয়েছে। যেন শুধু মাত্র নিয়ম রক্ষার্থে দিনে একবার । কয়েক মুহূর্তের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছে। দর্শনার্থীদের একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে। অনেক প্রার্থনার ব্যকুলতায়, একটু উন্মোচন। এবং আশ্চর্য, আকাশ-জোড়া সেই দরজা, সূর্যোদয়ের সময়েই একটু খুলেছে। তারপরে, সারাদিনের মধ্যে ঘষা কাঁচের মতো ধূসর আকাশটা গম্ভীর ভবলেশহীন অটুট থেকেছে। বিশ্বাস করা যায়না, উত্তরের ওই ধূসরতার কোথাও সেই আশ্চর্য দরজা রয়েছে।

সেই আশ্চর্য দরজা, যার অন্তরালে রয়েছে তিব্বতীয়দের সকল পার্থিব সংসারের খাজাঞ্চিখানা। ওদের ভাষায় কাং-ছেন-দ্‌-জাং-গা, যার থেকে আমরা উচ্চারণ করছি, কাঞ্চনজংঘা। কাং-ছেন-দ্‌-জাং-গা-এর বাংলা মানে দাঁড়ায় 'বরফ্-বড় খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ'। কাঞ্চনজংঘার পাঁচটি শিখরের তারা এই নাম দিয়েছে। যে উচ্চতম শিখরটি আছে, সূর্যাস্তের রক্তিম ছটায় সে সোনার বর্ণ ধারণ করে।

তাই সে সোনার খাজাঞ্চিখানা। দক্ষিণের চূড়া সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত ধূসর, সূর্য ঝলকলাগলেই রুপোলী হয়ে ওঠে, সে রুপোর খাজাঞ্চিখানা। বাকী তিনটি চূড়াকে বলা হয়েছে রত্ন, শস্য আর অস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা। বিশাল হিমালয়ের চূড়ায় তারা তাদের সকল পার্থিব জীবনের প্রতীক দর্শন করেছে। কাঞ্চনজংঘার কাছে তারা আবহমান কাল ধরে প্রার্থনা করে এসেছে জীবনধারণের সকল সার, ধর্ম, খাদ্য, ঐশ্বর্য। কাঞ্চনজংঘা তাদের কাছে সকল রাজার রাজা। বাস্তব জগতে মানুষের সকল শাসন মেনে নিয়েও কাঞ্চনজংঘা রাজ্যের বশংবদ প্রজা তারা। তাই পূর্বদিকে শিখরের নাম দিয়েচেন পানদিম। যার অর্থ রাজমন্ত্রী। কাঞ্চনজংঘার পাশে পানদিম রাজমন্ত্রীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ বোধ হয় এজন্যেই বিচিত্র, এজন্যেই মহৎ, সে অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্রে নদীতে বিশ্বপ্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যে জীবনের অর্থকে খুঁজেছে। তার সকল পার্থিব জগতের মধ্যে তৃষ্ণার্ত হৃদয় অপার্থিবকে সন্ধান করেছে।

দুদিন কয়েকমুহূর্তের জন্য কাঞ্চনজংঘাকে দেখেছি। কিন্তু সেই পাঁচ খাজাঞ্চিখানায় একক মহারাজ যেন বড় কৃপণ। চোখ মেলে দেখবার আগেই দূর আকাশে, নিঃশব্দে তার ধূসর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এমন কথা মনে করতে পারি নি, ধূসর দরজার আড়ালে সে মজা করে হাসছে। বরং মনে হয়েছে তার সময় নেই। নির্বিকার মহাকালের মতো, সে যেন কি এক মহান কর্মে ব্যস্ত। এই পৃথিবীর মতোই, সময় নেই, সময় নেই।

যতীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীকৈলাশ দর্শন

আমরা বেশ খানিকটা যাবার পর একটা ছোট গ্রাম এল। নাম টয়ো (Toyo) গ্রাম অর্থে দু'চারখানা ঘর। কিছু ছাগল ভেড়া চরে বেড়াছে। আজ এইখানেই থাকা। জব্বুদের চরতে ছেড়ে দেওয়া হবে। একজনের ঘরে আমাদের ব্যবস্থা হল। লম্বাটে ঘর, দুভাগ করা। ভিতরের দিকে আমাদের দেওয়া হল। মাঝখানে আগুনের জায়গা, তার উপরে কাঠের ছাদে ধোঁয়া বেরোবার জন্য খোলা। কমলসিং আমাদের জিনিষ ভিতরে নিয়ে এল। ঘরের ভিতর হাওয়া নেই, তেমন ঠান্ডা বোধ হচ্ছিল না। তারপর তিনটে পাথর নিয়ে তার উপর রান্না আরম্ভ হল। রান্না বলতে তো তিনজনের মত খানকতক পুরি ভাজা। সকালের জন্যও কখানা রাখা হল। নিকটে একটি সরু ঝরণা ছিল। বাহিরে এমন ঠান্ডা হাওয়া যে খাওয়ার পর বাহিরে হাত ধুতে যাওয়া অসম্ভব। রান্নার আগে কমলসিং যে জল এনেছিল সেই জলেই হাত মুখ ধুয়ে নেওয়া হল।

সকালে যখন রওয়ানা হলুম তখন রোদ উঠেছে। তিব্বতে পরিষ্কার আকাশ আমার বড় ভাল লাগত। রোদ উঠলেই ঠান্ডা বাতাস সত্ত্বেও বেশ লাগে। আমরা উঁচু নিচু ঢালু ময়দানের উপর দিয়ে চলেছি। মাইলের হিসাব নেই, চলে চলেছি। সামনে একটা পাহাড়, ঢালু জমির উপর দিয়ে উঠতে লাগলুম। বিস্তৃত পাহার আকাশে এক দিক থেকে আর এক দিক পর্য্যন্ত রেখা কেটে রেখেছে। এ পাহাড়ের নাম গুরলা (Gurla)। পাহাড়ের উপর পাস (Pass) যেখান থেকে পার হওয়া যায় তাহাকে লা (La) বলে। ক্রমান্নয়ে উঠে চলেছি। বালি ও মাঝে মাঝে পাথর। কি একরকম ছোট ছোট গাছও মাঝে মাঝে আছে। উঠতে উঠতে এসে পড়লুম গুরলা লা (Gurla Pass) র উপর। উচ্চতা ১৬২০০ ফুট। এর সামনে যা দেখলুম তা কখনও ভুলতে পারব না, আর মনে যে কি এক আবেগ এল তা বলতেও পারব না। সামনে কৈলাস, ঠিক শিবলিঙ্গ। শুভ্র তুষার মন্ডিত; দুধারে নিচু পর্বত মালা। নিচে মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল। দুই সরোবরের মাঝ দিয়ে অল্প উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়ে কৈলাশ যাইবার পথ। মা জব্বু থেকে নেবে পড়লেন ও আমরা এবং

আর সকলেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে কৈলাশকে প্রণাম করলুম। সে প্রণাম করে যেন মন ভরে না। উঠে আবার এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কতদিনের আকাঙ্ক্ষার পূরণে মন গভীর আবেগে ভরে উঠল। পিছনে স্বচ্ছ নীল আকাশ, তার উপর এই বৃহৎ শিবলিঙ্গ। অপূর্ব্ব দৃশ্য। Camera দিয়ে এ ছবি তোলা যায় না, মনের উপরই ইহা গভীরভাবে অঙ্কিত হতে পারে। Camera র ফটো ফিকে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, মনে যে ছবি অঙ্কিত হয় তা গভীরতরই হতে থাকে। কতদিন হয়ে গেছে, কিন্তু আজ লেখবার সময় সামনে সেইরকমই সেই দৃশ্য, সেই ছবি, সেই অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ দেখছি যেমন সেদিন দেখেছিলুম। একটুও সে দৃশ্য ম্লান হয়নি। কৈলাশের ফটো যাঁহারা দেখেন তাঁহারা দেখেন যেমন তাঁহারা সিনেমার পর্দায় বা ছবির বইতে দৃশ্য দেখেন সেইরকমই একটা দৃশ্যের মত। দেখিবার সময় যে অবর্ণনীয় আবেগ সেদিন আমাদের মনে এসেছিল সে আবেগ তাঁদের মনে আসে না, আসতেও পারে না। সেইজন্য তাঁহারা সত্যকার জাগ্রত কৈলাশ দেখেন না। দেখেন মাত্র একটা পাহাড়ের দৃশ্য যে পাহাড়ের শৃঙ্গ শিবলিঙ্গের মত।

যেমন কৈলাশ সেইরকম অপরূপ মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল। মানস সরোবর পঞ্চাশ মাইলের অধিক ঘেরা হ্রদ। উত্তরে কৈলাশ ও কৈলাশের পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে বিস্তৃত সৈকত, তার পিছনে অভ্রভেদি তুষারমন্ডিত মান্ধাতা। পূর্ব্বে যতদূর দেখা যায় ছোট ছোট পর্ব্বত তরঙ্গ, পশ্চিমে ক্ষীণ পর্ব্বত আড়ালে বিস্তৃত রাক্ষসতাল। এই মানস সরোবরের দৃশ্যও কেবল ফটোতে দেখবার নয়, অনুভবের, যে অনুভব গুরলা লার উপর দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে চেয়ে থাকলে হয়। রাক্ষসতালও এইরূপ অপরূপ , কেবল তার পরিধি মানস সরোববের চেয়ে কিছু কম নয়। মানস সরোবরের তট চারিধারেই একরকম সোজা, সেজন্য উপর থেকে কতকটা চতুষ্কোণের মত দেখায় কিন্তু রাক্ষসতাল সেরকম নয়, কোথাও সরু কোথাও বিস্তৃত। রাক্ষসতালের মধ্যে দুটি দ্বীপও আছে। রাবণরা তিন ভাই এর উপকূলে তপস্যা করেছিলেন সেইজন্য এর নাম হয়েছে রাক্ষসতাল। মানস সরোবর ব্রহ্মার সৃজিত। জলের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি এই সরোবর সৃজন করেন মানসিক শক্তি দিয়া।

জব্বুওয়ালারা চলিতে বলিল। মাকে জব্বুতে বসাইল। পথ নিচে মানস সরোবরের তট পর্য্যন্ত গড়িয়ে চলেছে। আমরা উত্তরে কৈলাশ অভিমুখে না গিয়ে মানস সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে পূর্ব্ব মুখে চলিলাম ঠোকরমন্ডিতে। ঠোকরমন্ডি

মানস সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে। গুরলা-লা থেকে মানস সরোবরের তটে নেবে এলুম। বিস্তৃত বালির সৈকত। এগিয়ে চললুম। সামনে দেখি লোকের জনতা। বড় আশ্চর্য বোধ হল। এখানে এ জনতা কেন! ঠোকরের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে নরনারী সারি দিয়ে চলে আসছে। তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়ে, জব্বু, ভেড়া, ছাগল, মোট, বোঝা, সবই আছে। আরও কাছে এসে দেখলুম তাদের মুখেচোখে ভয়, সন্ত্রাস, ব্যাকুলতা। জব্বুওয়ালা এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা কয়ে এসে বলিল "ডারচিন হয়ে মানস সরোবরের উত্তরে ডাকাত আসছে, সেদিক থেকে গ্রাম ছেড়ে এরা সব পালিয়ে এসেছে, তোমরা শীঘ্র মানস সরোবরে স্নান করে নাও, এখনি পালাতে হবে।" আমি ব্যগ্র হয়ে বললুম, " এখনি কি করে ফিরব? সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, জোর তীব্র ঠান্ডা বাতাস, এখন মানস সরোবরের জলে নেবে কে স্নান করবে?"জব্বুওয়ালা আমার কথায় কান দিল না, সে তখন ব্যগ্র , ত্রস্ত। যারা চলে আসছে তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে আরও ডাকাতদের বিষয় জানিতে লাগিল। তারা কতজন, কোনদিক দিয়ে আসছে, মারছে, ধরছে, কেড়ে নিচ্ছে, কি করছে। যতই শুনছে ততই তার মুখে ভয়, উদ্বেগ, চঞ্চলতা বেড়ে উঠছে। জব্বুদের জোরে হাঁকিয়ে চলল ঠোকরের দিকে। যতই আগে যাচ্ছি ততই দেখছি সামনে থেকে আরও লোক পালিয়ে আসছে। ছেলে মেয়ে যে যা পেরেছে নিজেদের মোটঘাট নিয়ে ক্রমান্বয়ে চলে আসছে। ঠোকরমন্ডীতে আরও ভীড়। এখানে একটা মঠ, বাহিরে সরোবরের ধারে অনেকগুলি ভোটিয়াদের ঘর, কিন্তু ঘরগুলি খালি, কেহই তাতে নেই, কেবল ঐ দিক দিয়ে কুকুরের ডাক আসছে। আমি এক জায়গায় জব্বু থেকে জিনিষ নাবিয়ে মাকে ও কমলসিংকে দাঁড়াতে বলে নন্দরামের ছেলের সন্ধান করলুম। নন্দরাম তার নামে যে চিঠি দিয়েছিল তাই নিয়ে মঠের ভিতর ঢুকলুম। সেখানে লোকের এত ভীড় যে ভিতরে যাওয়াই কঠিন। মঠ চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, প্রবেশের একটি মাত্র ফটক। প্রাঙ্গণের একধারে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা ছোট ছাদ পার হয়ে একটা ঘরে ঢুকলুম। জিজ্ঞেস করতে করতেই এখানে এসেছি। এখানে নন্দরামের ছেলে নেপালসিংকে পেলুম। সে স্কুলে কয়েক ক্লাশ পড়েছে, ইংরিজি কিছু জানে। নন্দরামের চিঠি তাকে দিলুম, সে খুলে পড়ে বললে, "আমি কি করব? এখান থেকে সকলে পালাচ্ছে আর তোমরা এখানে আসছ।"

সে তখন বড় ব্যস্ত ও উত্তেজিত। তার পাশে একটা বন্দুক আর পিছনে

কয়েকটা Package. আমি বললুম, "তোমার বাবা বন্দোবস্ত করে পাঠিয়েছেন।"

"বাবা পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি কি করব? আমিই ত ঘর ছেড়ে এখানে এসেছি। সকলেই ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। আমার ঘরে গিয়ে তোমারা থাক।" আমি বললুম, "সেখানে তো কেউ নেই, আমাদের এ মঠেই থাকা ভাল।"

"না, তোমার মা আছেন, মঠে স্ত্রীলোক থাকতে পারে না।"

"আমার মা ত মা, স্ত্রীলোক নন, সকলেরই উনি মা।"

"না, মঠে লামাদের কড়া নিয়ম, কোন স্ত্রীলোককে সন্ধ্যার পর এখানে থাকতে দেওয়া নিষিদ্ধ। তোমরা আমার ঘরে গিয়ে থাক।"

আমি নেবে এলুম। নেপালসিংয়ের ঘর জেনে সেখানে গিয়ে আমরা বসলুম। মাইল চৌদ্দ আমরা এসেছি, পথে কিছু খাওয়া হয়নি। বোজকা বুজকি খুলে রান্নার জোগাড়ে লেগেছি, মা পাথর সাজিয়ে উনুন করছেন এমন সময় জব্বুওয়ালারা জব্বু নিয়ে এসে বল্লে, "চলো, চলো. অভি যায়েগা, ডাকু আতা।"

তাদের মুখে, কথায়, ভয়, উত্তেজনা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলুম। মাকে বললুম,'মা কি করবে?' জিনিষপত্র খোলা হয়েছে, সেসব গুটিয়ে বেঁধে ছেঁদে নিতে সময় লাগবে। সকলেই পালাচ্ছে, চারিদিকে ভয় উত্তেজনা। যেখানে বসে আছি তার আশেপাশে কেহ নেই, সবাই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। দূর থেকে পালিয়েও ক্রমান্বয় লোক আসছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মঠে নেপালসিং আর কজন লামা ব্যতিরেকে অল্পক্ষণের মধ্যে আর কেহ থাকবে না, শূন্য হয়ে যাবে। মাকে বললুম মা চল, কিন্তু আমাদের ইতস্ততা ভাঙ্গবার আগেই জব্বুওয়ালারা চলে গেল। কমলসিং ভীত হয়ে বলিল, "তোমাদের কেবল খাওয়া খাওয়া, ডাকু এলে কি করব?" আমি বললুম, "কমলসিং, তুমি ইচ্ছে কর ত ওদের সঙ্গে চলে যেতে পার, আমাদের জন্য তোমাকে আট্‌কাব না। তবে যিনি বাঁচাবার তিনি এখানেও আছেন। সেই কৈলাশ-পতিকে স্মরণ করে এখানেই থাকতে পার।"

কমলসিং তাহাই করিল, গেল না। ফিরে যাওয়াও অত্যন্ত কঠিন ছিল। চৌদ্দ মাইল এসে সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় ও অন্ধকারে কিছু না খেয়ে আবার তখনি চৌদ্দ মাইল হেঁটে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ভয়ে উত্তেজনায় আমিও ব্যস্ত হয়ে বলেছিলুম, 'মা চল'। কিন্তু যাওয়া যে সম্ভব ছিল না তা তখন ভাবিনি, ভাবা তখন সম্ভবও ছিল না। কমলসিং কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল, তারপর রান্নার জল আনতে গেল।

রান্না খাওয়ার পর নেপাল সিং-এর ঘরে ঢুকলুম। ভিতরে দুটো বড় বড় Package বোজকা ভিন্ন আর কিছু ছিল না। ঘরটা বড়ই। দরজা বন্ধ করিবার একটা ঝাপানের মত, সেটা লাগিয়ে কমলসিং দরজা বন্ধ করিল। হুহু করে বাতাস আসছে। ঝাপানের পিছনে ঐ দুটো বোজকার একটা টেনে এনে ঠেকনো দিতে কমলসিংকে বললুম। হ্যারিকেনের বাতিটা একটু কম করে রেখে আমরা বিছানা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। যে কম্বল ও বালাপোষ ছিল তা এক করে মা ও আমি তাই মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুলুম। ল্যাম্পের ওপাশে কমলসিং শুল। বললুম, "কমলসিং কৈলাশপতিকে স্মরণ করে শুয়ে পড়।"

দূর থেকে দু-একটা কুকুরের ডাক আসছিল, আর মাঝে মাঝে দু-চারজন লোকের গলা। সেই উদ্বিগ্ন স্বর যা বাইরে কিছুক্ষণ আগে শুনেছি। এখনও দূর থেকে লোকে পালিয়ে আসছে ও চলে যাচ্ছে। কিন্তু জব্বুওয়ালাদের চলে যাবার সময় যে রকম মনে ভয় উদ্বেগ এসেছিল, এখন সেরকম নেই, নিশ্চিন্ততা এসেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ ঘুম আসছিল না, বোধ হয় ঠাণ্ডার জন্য, কারণ গায়ের আচ্ছাদন তেমন ছিল না। কমলসিং এর নাকের ডাকে মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভয় উত্তেজনা এদের মনে যতই আসুক না, তার প্রতিক্রিয়া আমাদের মত তাদের মনে বেশীক্ষণ থাকে না। সেইজন্য আমাদের মত তারা অভিভূত হয় না। কমলসিং শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কখন ঘুম এসে গেছে জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঝাপানের বাইরে থেকে কে যেন বলছে দাই দাই, ধরম ধরম, আর কিছু বুঝতে পারলুম না। মনে হল ডাকাত, চুপ করে রইলুম। দুচার বার ঐরকম কি বলে তারা চলে গেল। তখন সন্দেহ হল ওরা কি ডাকাত ছিল। ডাকাত হলে ঐরকম কবার ডেকে কি চলে যেত! ঐ রাত্রে আর কে হতে পারে। যারা পালাবার তারা ত পালিয়ে গেছে। হয়ত রাত্রে কেহ পালিয়ে এসেছে, আমাদের ঘরে আলো দেখে ডেকেছে রাত্রে এখানে থাকবার জন্য। কিন্তু যখন তার ডাকে চম্‌কে উঠেছি তখন এত কিছু ভাবিনি। ডাকাত বলে মনে হয়েছিল। আত্মভয়ে লোকে বিচার বুদ্ধি হারায়। আত্মরক্ষা, স্বার্থরক্ষা ছাড়া আর তখন কোন কথাই মনে থাকে না। নীতিজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, কর্তব্য, উচিত অনুচিত বোধ দ্বারা জীবের প্রকৃতিগত বৃত্তি কতকটা চাপা ও সংযত রাখা সম্ভব হইলেও তাকে উচ্ছেদ করা যায় না। ভিতরে চাপা থেকে যায়। বিপদ সম্মুখীন হলে স্বতঃই তাহা সক্রীয় হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষা জীব মাত্রেরই স্বভাবধর্ম্ম, ইহার দ্বারাই জীব নিজেকে রক্ষা করে। সৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতি

জীবের মধ্যে এই বৃত্তি দিয়ে দেয়, তাকে রক্ষা করিবার জন্য। মানুষ মুখে যতই বলুক, যতই চেষ্টা করুক, যতই ধর্ম্মকথা পড়ুক বা শুনুক তার প্রকৃতিগত স্বভাব যায় না। আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষা বোধ ও চেষ্টা তার স্বভাবে অপরিহার্য্য ভাবে অন্তর্ভুক্ত। তবুও সে রাত্রে সেই কাতর ডাকে সাড়া না দেওয়ার জন্য তীব্র অনুশোচনা, নিজের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, আত্মরক্ষার্ত্ত অন্যের বিপদ ও কাতরতায় উদাসীন থাকার জন্য তীব্র আত্মগ্লানি মনে হলেই আজও মনের ভিতর জ্বলে ওঠে। আর তার ঐ দু-চারটে কথা— দাই, দাই, ধরম, ধরম— কানে বেজে ওঠে। পরে শুনে বুঝলুম দাই অর্থে ভাই। সে বোধ হয় এই বলছিল— ভাই খুলে দাও, ধর্ম্ম হবে। তখন তাহা বুঝিনি। পরে যখনই বুঝেছি তখনই মনে তীব্র ক্ষোভ ও অনুশোচনা এসেছে।

সে চলে যাবার পর ঘুম আসে না, মনে অস্বস্তি। তারপর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার কার ডাক। এ ডাকে নম্রতা, কাতরতা নেই। জোর ডাক, সাড়া না পেয়ে আরও কড়া জোর ডাক। তারপর ঝাপানের উপর জোর আঘাত ও ঠেলাঠেলি। আমি কমলসিংকে বললুম দরজার পিছনে ঠেকনো দেওয়া বোজকা সরিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দিতে। দরজা খুলতেই দুজন ছুটে ঘরে ঢুকে পড়ল। একজনের হাতে ছোট একটা লাঠি। তাই দিয়ে কমলসিংকে এক ঘা দিল, জোরে নয়, তবু কমলসিং মর গেয়া, মর গেয়া বলে শুয়ে পড়ল। তারা আর কোন দিকে না চেয়ে দেয়ালের পাশে দুখানা কম্বল পড়ে ছিল তাই নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি উঠে কমল সিংয়ের হাত যেখানে তারা মেরেছিল ঘসে দিলুম। সে শুয়ে পড়ল, আমিও শুয়ে পড়লুম। বুঝলুম এদের কম্বল ঘরে ছিল, তারা তা নিতে এসেছিল, কম্বল নিয়ে রাত্রেই পালাবে।

রাত কাটল। বাহিরে বেরিয়ে এলুম। সামনে মানস সরোবর, বিস্তৃত প্রশান্ত জলরাশি, একূল ওকূল যেন দেখা যায় না। ওপারে কৈলাশ পর্ব্বতমালা; তার মধ্যস্থলে উচ্চ শৃঙ্গে শুভ্র তুষারাবৃত শিবলিঙ্গ। মা ও আমি এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে সে সময় কোন ভাব, ভাবনা, চিন্তাই বোধ হয় ছিল না। সব যেন নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল। সামনে প্রকৃতিও নিস্তব্ধ, পাহাড়, জল, আকাশ সব স্তব্ধ, সময়ও অচল। ব্রহ্মা নাকি এই সরোবর সৃষ্টি করে তটে বসে ধ্যান করেছিলেন। একাগ্র ধ্যানের উপযুক্ত স্থানই বটে।

সরোবরে স্নানের জন্য এগিয়ে গেলুম, কিন্তু জল স্পর্শ করে পেছিয়ে এলুম। কি ঠাণ্ডা জল। তখন সূর্যোদয় হয়নি। কৈলাশকে প্রণাম করলুম। মা ঘিয়ের বাতি জ্বেলে আরতি করলেন।

রামওয়াড়া থেকে কেদারনাথ

আহারান্তে আবার যাত্রা। এবেলা চার মাইল। গৌরীকুন্ড থেকে রামওয়াড়া। কিন্তু একেবারে খাড়াই-এর পথ। তিল তিল করে এগিয়ে চলেছি। উপরে উঠছি যে তা ক্রমশ মালুম হচ্ছে। রামওয়াড়ার দিকে যতই উঠছি তখনই শীতের তীব্রতা বেড়ে চলেছে। হিমেল হাওয়ায় ভয় করছে। উপরে না জানি কী প্রচন্ড শীত! পাহাড়ের গায়ে খাঁজ-কাটা পথ। বেশ চওড়া। অধিকাংশ জায়গাতেই ছয়-আট-ফুট। কমপক্ষেও চার ফুট। তাও অল্প দূরত্ব। সাবধানে চললে ভয়াবহ নয় কিছু। তবে বৃষ্টি হলে বিপজ্জনক। আর সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। উপর থেকে কখন ঘোড়ার দল নামবে কেউ জানে না। মন্দাকিনী বরাবর রয়েছে আমাদের দক্ষিণে। অর্থাৎ নদীর দক্ষিণতীর ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা উজানে। কুন্ড চটিতে মন্দাকিনীর বাম-তীর ছেড়ে সেই যে দক্ষিণ-তীরে এসেছি আর নদী পার হইনি। বাসুকী নদী পার হয়েছি বটে, কিন্তু মন্দাকিনী নয়। পান্ডাজী বললেন, কেদারনাথের মন্দির কিন্তু ওপারে। কেদারনাথে পৌঁছে নদী পার হতে হবে আমাদের। নদী ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পাহাড়ের মাথায় সাদা সাদা চুনা পাথর। না, চুনা পাথর নয়-বরফ! সরল বৃক্ষের শ্রেণী। মাঝে একটা বরফের নদী পড়ল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছিল ঝরনা-প্রায় প্রপাতের মত খাড়া। তলা দিয়ে এখনও জল চলেছে-উপরে জমাট বরফ। তার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে পার হতে হল। লাঠির খোঁচা মেরে দেখলাম বরফ বেশ শক্ত।

প্রসঙ্গত বলি, অনেকে সেপ্টেম্বরে কেদারবদ্রী করার পক্ষপাতী। শুনেছি তখন আকাশ আরও পরিষ্কার থাকে- বৃষ্টির ভয় থাকে কম; কিন্তু তখন তাঁরা এই বরফের নদীগুলি দেখতে পান না। সমতলের মানুষ আমরা-এটার থেকে বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করে না।

রানা যে আগে আগে গেছে সারা পথেই তার প্রমাণ পথের উপর লাঠি দিয়ে ধুলোয় লেখা আছে তার নাম। বয়-স্কাউটের নানা চিহ্ন দিয়ে পশ্চাৎগামী বাপকে সে নির্দেশ দিতে দিতে গেছে। কোন্ দিকে জল, কোন্ দিকে ভুল রাস্তা ইত্যাদি।

দূর থেকে মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পাই। পথের দূরতম প্রান্তে বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে। বিশাল পাহাড়ের পশ্চাদপটে ছোট্ট একটা মানুষের চিহ্ন। লাল পুরোহাতা সোয়েটার, লাল গ্লাভস, মাথায় টুপি, ফুলপ্যান্ট, পিঠে স্কুল ব্যাগে ওয়াটারপ্রুফ, মিছরি-লজেন্স, কাঁধে জলের বোতল, হাতে লাঠি। সাধুজী বলেন- ক্ষুদে তেনজিং।

জুড়ানি বাগানে ফলের রস খেয়ে দোকানদার ভদ্রলোককে বলেছিলুম-এক বোতল নিয়ে যেতে চাই বোতলের দাম জমা রেখে।

উনি বলেন-কেন বলুন তো?

বলি-আমার ছেলের জন্য। সে আগে আগে গেছে।

ভদ্রলোক হেসে বলেন-রানাবাবু তো? আপনাকে ভাবতে হবে না। সে ফলের রস খেয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বলি-সে কি?

ভদ্রলোক বলেন-ইনি রানার মা তো। দেখেই চিনেছি। রানাবাবু ঘন্টাখানেক আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এসে ফলের রস খেয়ে গেছে। অনেক গল্প হয়েছে যে তার সঙ্গে।

বুলবুল কিন্তু তার ভাইয়ের মত নয়। হাজার হ'ক সে মেয়ে। মা বেচারিকে একা ফেলে সে কেমন করে এগিয়ে যায়? ফলে রানার ভাষায় সেও গুড়গুড়িয়ে পাহাড়ে উঠছে।

রামওয়াড়ায় যখন এসে পৌঁছান গেল তখনও দিনের আলো একেবারে মুছে যায় নি। সন্ধ্যা তখন পৌনে আটটা। এখানে বরাবরই দেখছি রাতের তুলনায় দিনটা বড়।

আমাদের আগেই সবাই এসে পৌঁছেছেন। এক্সপ্রেস-ফুলদি ইতিমধ্যে বিছানা খুলে ফেলেছেন। কেউ বসেছেন পায়ে সরষের তেল মালিশ করতে। কেউ উইন্টোজেন। কেউ শুয়েছেন গরম জলের ব্যাগ ভুঁড়ির খাঁজে নিয়ে। সিনিয়ার দিদিমাকে একটু উদভ্রান্ত মনে হল। খবর নিয়ে শুনলুম, সিনিয়ার দাদু আজ বেশ কাবু। ভদ্রলোকের ব্লাড-প্রেসার আছে। তবু জোর করে এসেছেন। মনের জোর আছে তাঁর। মুখে স্বীকার করছেন না যে, কষ্ট হচ্ছে কিছু। বারিন্দা জনে জনে ওষুধ খাইয়ে চলেছেন। একে এলকোসিন, ওকে ভেগানিন, তাকে পাইলেক্স! কোম্পানীর

ডাক্তার পাত্তাই পাচ্ছে না। আমরা বলি-ও বারিন্দা, আপনিই যদি সব ওষুধ খাওয়াবেন তা হলে কুন্ডু কোম্পানী খরচ করে ডাক্তার এনেছে কেন?

বারিন্দা তাঁর ঝুলির গহ্বরে কি একটা ট্যাবলেট খুঁজতে ব্যস্ত। কথাটা তাঁর কানে গেল না ভাল। অন্যমনস্কের মত বলেন-কে? ডাক্তারকে তো? ওকে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া খাওয়াতে হবে। মনে আছে আমার।

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। বারিন্দা বলেন-কি হল রে বাবা? সবাই হাসছে কেন এত?

ওদিকে সাধুজি পড়েছেন রানাকে নিয়ে-আচ্ছা বড়বাবু, আমরা সবাই হাঁপিয়ে পড়ছি, কিন্তু তুমি হাঁপাচ্ছ না। এর ব্যাপারটা কি?

— আমি হাঁপাচ্ছি না আমার লাঠির গুণে।

— লাঠির গুণে? তা লাঠি তো সবারই আছে।

— আমি যে একটা তুক করি।

— তুক কর! কি তুক?

রানা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে-কাউখ্যে বলবেন না বলুন।

— কাউকে বলব না।

— আমি যখনই পাহাড়ে ঝরনা দেখি লাঠির ডগাটা চুবিয়ে দিই জলে। ঠিক ঘোড়ার মত চোঁ চোঁ করে লাঠিটা জল খায়। তেষ্টা পায় তো? আপনিও লাঠিকে খাওয়াবেন । দেখবেন গুড়-গুড়িয়ে উঠে যাবেন চড়ায়।

দেখ্ না দেখ্ খাবার এসে গেল। কারও লুচি, কারও রুটি, কারও ভাত। আশ্চর্য ওদের ক্ষমতা। আমরা গৌরীকুন্ড থেকে যখন বার হয়েছি দুপুরে তখন দেখে এসেছি ওরা এঁটো বাসন ধুচ্ছে। তারপরে পদব্রজেই আমাদের অতিক্রম করে এসে তৈরি করেছে বিকালের চা-খাবার। খাবারও করে এক একদিন এক এক রকম। সিঙারা, কচুরী, ডালপুরী, নিমকি, আলুমরিচ, চিঁড়েভাজা। সেটা মিটতে না মিটতেই রাতের রান্না। লুচিওয়ালাদের জন্য একরকম। তরকারী, ভাতের জন্য অন্যরকম। আবার মিষ্টি। বাজার থেকে কেনা নয়, নিজেরাই বানায়।

দাদু ও প্রান্তে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

— ও দাদু, উঠুন, খাবার দিয়েছে।

কে কার কথা শোনে। শীতে ভদ্রলোক একেবারে জবুথবু হয়ে পড়েছেন।

ওষুধ বলে তাঁকে আধ আউন্স ব্রান্ডি খাইয়ে দিলুম। গরম জলের ব্যাগ গুঁজে দেওয়া হল তাঁর বিছানায়-কিন্তু না। দাদু কিছুতেই উঠে বসে খেতে রাজী হলেন না। ডাক্তার সরকার এসে পরীক্ষা করলেন। জ্বর নেই, রক্তচাপ স্বাভাবিক। অন্য কোন উপসর্গ নেই। শুধু শীতের প্রাবল্যে এই অবস্থা। ঠাকুর একবাটি তরল পায়েস করে এনে খাইয়ে গেল তাঁকে।

সব কটা গরম জামা গায়ে শুয়ে পড়লাম কম্বলের তলায়। পান্ডাজি খানচারেক লেপ কোথা থেকে ভাড়া করে এনেছেন। লেপ পিছু মাত্র আট আনা ভাড়া।

হে কেদারনাথ, কাল সকালে যেন ঝলঝমলে রোদ ওঠে।

১৮-৫-৬৪। বারিন্দার হাঁকাহাঁকিতে উঠতে হল সেই কাক-না-ডাকা ভোরে। উঠেই সেই লাগ্ লাগ্ মাৎ মাৎ। প্রাতঃকৃত্য সারব, না, চা খাব, না বিছানা বাঁধব তাল পাই না। ওদিকে হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া। রানা বুলবুলকে টেনে তুলি। রানা উঠেই বলে-মাথা ঘুরছে।

সর্বনাশ! সকালেই মাথা ঘুরছে! সামনে যে খাড়া চড়াই।

বারিন্দা বললেন-এই বড়িটা খাইয়ে দাও।

বললুম-দিতে হয় দিন। কিন্তু আজ ওকে ঘোড়ায় যেতে হবে।

রানা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়। চোখ দুটো জলে ভরে আসে তার। শেষ-লেংথে হোঁচট খাওয়া ঘোড়ার চোখের আর্তি। এতখানি পথ এসেছে নাচতে নাচতে। আর মাত্র তিন মাইল বাকি। রানা চট করে উঠে দাঁড়ায় বিছানা ছেড়ে। বলে-মাথা ধরা সেরে গেছে বাবা।

বললুম — তা যাক। তোমাকে ঘোড়াতেই যেতে হবে।

মনে পড়ল উমাপ্রসাদবাবুর 'হিমালয়ের পথে পথে'র একটি অনুচ্ছেদ। বদ্রীনারায়ণের ডাক্তারবাবু গ্রন্থকারকে বলছেন-' তিনি নিজে খুব ভক্ত-সারাপথ স্ত্রীকে হাঁটিয়ে এনেছেন। তা আনুন। কিন্তু, ছোট ছেলেমেয়ে দুটো-সাত আট বছর মাত্র বয়স হবে-তাদেরও সমস্ত পথ হাঁটিয়ে এনেছেন। ... ছেলেটার পায়ে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে গেছে-তবুও হাঁটিয়ে এনেছেন, এখন এসেছেন ঘা সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। ...আমিও দিলাম দু' কথা শুনিয়ে, - বাপ, না-'

উদগত অশ্রু গোপন করে রানা অন্যদিকে ফিরে বললে- বলছি তো আমার

মাথাধরা সেরে গেছে।

বারিন্দা বলেন-আচ্ছা এখনই ঘোড়া করার কি দরকার? পথে যদি মাথা ধরা বেড়ে যায় ঘোড়া করে দিও। পথেই তো পাওয়া যায়। হয়তো রোদ উঠলে মাথাধরা সেরেও যেতে পারে।

কি করব স্থির করে উঠতে পারি না।

গোঁসাইজি বলেন-এখান থেকে তো মাত্র তিন মাইল। কত আর নেবে? বড় জোর তিনি দেড়ে সারে চার টাকা। ও কটা টাকার মায়া আর করবেন না মশাই। ঘোড়াই করে দিন।

দাঁত দিয়ে জিবটাকে চেপে ধরলুম। এ পথে রাগ করতে নেই। কেউ কটু কথা বললেও নাকি তা সহ্য করতে হয়।

রানার মায়ের দিকে ফিরে বলি-কি করব বল?

রানার সঙ্গে তার মায়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। রানার চোখে দেখলুম করুণ মিনতি। যেন দু-চোখ দিয়ে বলছে-মা, লক্ষীটি তোমার দুটি পায়ে পড়ি। বাবাকে বল, আমি হেঁটেই যাব।

জবাব দিতে ওর একটু সময় লাগল। মন স্থির করে বললে-রানা হেঁটেই যাবে। তবে এগিয়ে যাবে না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রানার। আর পাঁচটা লোক না থাকলে মাকে জড়িয়ে ধরে সে চুমু খেত নিশ্চয়।

গোঁসাইজি রসকলি সমেত নাকটা কুঁচকোলেন। গোবিন্দ জানেন,বোধকরি বদ্রীনারায়ণের ডাক্তারবাবুর ভাষায় মনে মনে বললেন-মা, না-

ওদিকে আর এক ফ্যাসাদ। দলের সবাই তৈরি, কিন্তু দাদু এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি।

— সে কি? ও দাদু, উঠুন উঠুন। সবাই যে রওনা হয়ে গেল!

দাঁতে দাঁত চেপে দাদু বলেন-যায় যাক। আমি যাব না।

— যাবেন না মানে? এখানে কোথায় থাকবেন?

দাদু জবাব দেন না।

কী মুশকিল! আবার দাদুকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তারবাবু। না, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। এ শুধু মানসিক বিকার। নার্ভাস ব্রেকডাউন।

সবাই মিলে কত অনুরোধ, উপরোধ, ভাল কথা, ধমক। কিন্তু না। দাদু আপন সংকল্পে অটল ঃ 'আমি যাব না।'

আমাদের মন্ত্রণাসভা বসল। বিনয়বাবু কোন এক ডান্ডিওয়ালার সঙ্গে কথা বলে এলেন। তারা তাদের সোয়ারিকে কেদারে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে এবং দাদুকে নিয়ে আবার যাবে। মিসেস চৌধুরী বলেন-দাদুর ঘোড়া আমি নিচ্ছি, এটুকু পথের খরচ তাহলে তাঁর দুবার লাগবে না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। দাদু তাতেও রাজী নন। বলেন-কেন জ্বালাতন করছেন খামোখা। আমি এখানেই থাকব। ফেরার পথে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন।

চৌধুরী বললে-এসব ক্ষেত্রে শক্‌থেরাপিই হচ্ছে ওষুধ। ওঁকে ভয় দেখাও।

আমি বলি-দুত্তোর ভয়! ধরে বেঁধে ওঁকে ডান্ডিতে বসিয়ে দেওয়া হক।

বারণ করলেন পান্ডাজী-বাবুজি, এইসা কাম মৎ কর না-

— কেন? কি হবে তাহলে? মরে যাবে?-আমি ব্যঙ্গ করি।

পান্ডাজীর শরীরে কিন্তু রাগ নেই। হেসে বলেন-বাবুজি! তাও বিচিত্র নয়। এমন ঘটনা প্রতি বছরই দু'একটা হয়। জোর করে নিয়ে যেতে ও দেখেছি-মৃতের সৎকার করতে ফিরে আসতেও দেখেছি।

দমে গেলুম। হ্যাঁ, তাও তো বটে। একটি মানসিক রোগীর কথা পড়েছিলুম বিলাতী ম্যাগাজিনে। রোগী আর সব বিষয়েই সম্পূর্ণ ছিল স্বাভাবিক,- শুধু কেমন করে জানি না, তার ধারণা হল, ওর পিঠটা রক্তমাংসের নয়,কাচের। সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে না, তোয়ালে দিয়ে পিঠ মোছে না। কাচের পিঠ যেন ভেঙে না যায়। লোকে কত বোঝাল, আয়নার ভিতর দিয়ে দেখাল-কিন্তু রোগীর দৃঢ় ধারণা বদলায় না। শেষে ওর এক বন্ধু বিরক্ত হয়ে বললে-দুত্তোর কাচের পিঠ। এই দেখ তোর পিঠ কাচের নয়-বলেই ওর পিঠে মারলে এক চড়। বললে-দেখলি তো?

জবাবে রোগী বলে — ভেঙে দিলি!

এবং চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ল তার মৃতদেহ। আতঙ্কে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়েছে রোগীর।

পান্ডাজি বলে — বাবুজি, মাত্র গত বছরের কথা। এই রামওয়াড়াতেই, এই চটির এই ঘরেই। ছাপরা জেলা থেকে এসেছিল একটা দল। আমি তাদের পান্ডা। একটা বুড়ির ধারণা হল, সে আর যেতে পারবে না। সারাটা পথ লাঠি ঠুকঠুক করে

সে হেঁটেই এসেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ, কিন্তু সেই যে এ ঘরে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল, আর তাকে ওঠানো গেল না। ঘোড়া এল, ডান্ডি এল-কিন্তু না। বুড়ি নির্বাক। শুধু মাথা নাড়ছে। মুখ ফুটে কিছুই নাকি সে বলতে পারছে না। শীতে তার নাকি বাক্‌রোধ হয়ে গেছে, দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

দলের সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে। ওদের দলপতি এসে বুড়িকে ঝাঁকানি দিয়ে বললে-ডরো মৎ মাঈ! একবার বোল 'জয় কেদার!' জাড়া সব তুরন্দ্‌ চলা যাঈ! বোল্‌ 'জয় কেদার'! বোল্‌!

বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে বললে-এৎনা বাৎ ময় কহনে নেহী সেক্‌তি!

কর গুণে পান্ডাজী বলে, সোচিয়ে বাবুসাব! ছে বাৎ বুড্‌ঢিনে কহি থি, লেকিন দো বাত কহনে নহি সেকি! 'জয় কেদার' উসকি মু'সে নহী নিক্‌লি! বাবুজি-ইয়ে হ্যয় উনকি খেল!

হাত বাড়িয়ে তুষারাবৃত কেদার শৃঙ্গকে সে দেখিয়ে দেয়।

অগত্যা দাদুকে ফেলে রেখেই যেতে হল আমাদের। চটির নীচে চায়ের দোকান। দোকানদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দায়িত্ব নিল। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বুড্ঢাকে দেখ ভাল করবে সে। প্রতি বছরই নাকি এমন কাজ দু-একবার করতে হয়।

রামওয়াড়া থেকে পথ উঠে গেছে সোজা উপরে। উৎরাইয়ের রাজ্য পিছনে ফেলে এসেছি আমরা। এখন শুধু চড়াই, চড়াই আর চড়াই। টিকটিকির মত সেই খাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠছে যাত্রীর দল। আহা কী কষ্ট ওদের। কত যাত্রীর গায়ে জামা নেই, চট জড়িয়েছে, খালি পা ন্যাকড়া জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে, কারও বা গায়ে শতছিন্ন কাঁথা। ওরাই প্রকৃত তীর্থযাত্রায় এসেছে। শনের দড়ির মত পাকাচুল বুড়ি, গোদে-ফোলা-পা প্রৌঢ়। দেখলুম একজন খঞ্জকেও। লাঠি নেই, ক্রাচে ভর দিয়ে টুক টুক করে উঠছে। তাকে অতিক্রম করে যেতে সঙ্কোচ হচ্চিল। কিন্তু তার কী স্ফূর্তি। হাত নেড়ে বললে-ঠাহ্‌রিয়ে মৎ বাবুজি. চলিয়ে! ম্যয় ভি আ-রাহা হুঁ! জয় কেদারনাথ কি!

যাব, আমিও যাব। তোমার মত দুখানা পা নেই আমার। না থাকে নেই। তা বলে কি খোঁড়া ছেলেকে বাপ ঘরে ঢুকতে দেয় না? আমিও এক সময় পৌঁছাব

মন্দিরে। হয়ত কিছু দেরী হবে।

চড়াই, চড়াই আর চড়াই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। পথের পাশে সাইনবোর্ড। আট-হাজার ফুট।

বুলবুল এগিয়ে গেছে আজ। রানাকে নিয়ে সস্ত্রীক আমি চলেছি ধীরে ধীরে, পায়ে পায়ে। বিস্মৃত অতীতের সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে। ঠান্ডা হিমেল হাওয়া বইছে উত্তর থেকে। হাত পা জমে যাচ্ছে যেন। হঠাৎ দেখি পথের বাঁকে পান্ডাজি চুপটি করে বসে আছেন।

— কি হল? বসে আছেন যে?

— আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

— চলুন।

দেখলুম পান্ডাজি পিছন ফিরে কি যেন-একটা সতৃষ্ণ নয়নে দেখছেন।

— কি দেখছেন অমন করে?

— কিছু নয়। তারপর আবার নিজেই বলেন-পথের এইখানে একটা কালো বড় পাথর ছিল। সেটা দেখছি না। গত বর্ষায় নেমে গেছে।

নীচে খাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকেন।

বললুম — সে পাথরখানার সঙ্গে কোন স্মৃতি বিজরিত ছিল বুঝি?

পান্ডাজি হাসলেন। বললেন — বাবুজি, এ পথ হচ্ছে আমার কাছে চাষীর ক্ষেত, কুমোরের চাক, তন্তুবায়ের তাঁত। এ পথের প্রতিটি বাঁক আমার কণ্ঠস্থ। গুপ্তকাশীতে আমাকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিন-আমি ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ঠিক চলে আসব। খাদে পড়ব না, পাহাড়ে ধাক্কা খাব না। এ পথের প্রতিটি পাথর আমার আবাল্যের বন্ধু, প্রতিটি ঝরণাধারা আমার শৈশবের বান্ধবী। শুধু আমারই বা কেন, আমাদের সাত পুরুষকে অন্ন জুগিয়েছে এই দুর্গম পথ। তবে এই আমিই শেষ।

বললুম-শেষ কেন?

— ছেলেদের এ কাজ পসন্দ্ নয়। লিখাপঢ়ি শিখেছে তো! পান্ডাজি ডাকলে তাদের অপমান হয়।

বলি — অপমান কিসের! এ তো গৌরবের কাজ! আপনি ওদের বোঝান না কেন?

পান্ডাজি বলেন — নাঃ! ওদের যা মন চাইছে ওরা তাই করুক। এরপর এ

কাজে আর গৌরব থাকবে না। শুধুই টাকাপয়সার ছেঁড়াছেঁড়ি হবে। তার চেয়ে ওরা চাকরি-বাকরিই করুক।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বুঝতে পারেন কথাটার অর্থ আমি ধরতে পারি নি। বুঝিয়ে বলেন সব কথা।

কেদার-বদ্রীর পান্ডা ভূ-ভারতের আর সমস্ত পান্ডার থেকে পৃথক। গয়ায় যাও, কাশীতে যাও, বৃন্দাবনে যাও — সেখানে পান্ডা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যা পারে শুষে নেবে তোমার কাছ থেকে। এখানে মাথা ঠোক, পয়সা দাও; ওখানে জল স্পর্শ কর, পয়সা দাও; সেখানে পূজা কর, পয়সা দাও। ক্রিয়াকলাপ লক্ষ রকম কিন্তু মূল ধুয়ো সেই-পয়সা দাও! কেদার-বদ্রীর পান্ডা কিন্তু তা নয়। সে তোমাকে বাসের কাছে এসে ধরবে। যে দুর্গম পথ তুমি তিল তিল করে অতিক্রম করবে সে পথে তোমার যাত্রা-সহচর। এ দুর্গম পথে সে তোমার বন্ধু। তোমাকে মাথা গোঁজার আশ্রয় খুঁজে দেবে- শীতে লেপ এনে দেবে-আহার্য বানিয়ে দেবে। সে তোমাকে সাহস দেবে, ভরসা দেবে,শক্তির জোগান দেবে। সে তোমার অভিভাবক। ধমকাবেও তোমাকে-ফিন্ ব্যয়ঠ গিয়া! উঠ্ চল্, বোল্ জয় কেদার!

তার আলাদা মর্যাদা। সেই সাতপুরুষের মর্যাদা কেড়ে নিতে নীচে থেকে উঠে আসছে একটা লোলজিহ্ব অজগর। শুকুলজীর বাবা বৃদ্ধ পান্ডাই ওকে বলে গিয়েছিল-ঐ পাহাড়কে পাকে পাকে জড়িয়ে যে অজগরটা উঠে আসছে ওই কেড়ে নেবে আমাদের সাতপুরুষের অন্ন। সে অজগর বদ্রীনারায়ণ পাহাড়কে পাকে পাকে জড়িয়ে উদরস্থ করেছে। এ পথে তার লেলিহজিহ্বা পৌঁচেছে কুন্ড চটি পর্যন্ত। যেদিন সে কেদার তীর্থকে উদরস্থ করবে সেদিন আর এই পায়ে-চলা পথে যজমানের হাত ধরে চলতে হবে না পান্ডাজিকে। কেদার-বাস স্ট্যান্ডে এসে থামবে বাস। যাত্রীরা নামবে। মোটা মোটা খেরো খাতা বগলে আসবে পান্ডার দল। বলবে — এখানে জল স্পর্শ কর,-পয়সা দাও; ওখানে মাথা ঠোক, পয়সা দাও; সেখানে পূজা কর, — পয়সা দাও।

পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে চোখটা মুছে নিয়ে পান্ডাজি বললে-হে কেদারজী! তোমার সে দশা দেখবার জন্য আমি যেন তখন বেঁচে না থাকি।

আমি বললাম — পান্ডাজি, এ পথে মৃত্যুর কথা ভাবতে নেই। এসব তাঁরই খেলা। শুধু নয়নভরে দেখে যান।

চলেছি, চলেছি আর চলেছি।

— জয় কেদারনাথ জী কি! ফেরার পথের যাত্রীরা হাঁকছে।

— আর কতটা পথ বাবা? শুধাই কাতরভাবে।

— এই তো এসে গেছেন! মোড় ফিরলেই গরুর চটি। সেখান থেকে মন্দির দেখতে পাবেন।

প্রাণে উৎসাহ জাগে। তবে কি ভুল দেখেছি? ওটা কি দশ হাজার নয়, এগারো হাজার ফুটের বিজ্ঞপ্তি? তখন জানতুম না, পরে জেনেছি। এ মিথ্যাভাষণ এ পথের অলিখিত আইন। যাত্রীকে বলতে নেই সামনে বিরাট চড়াই, বলতে নেই- পথ এখনো অনেকটা বাকি।

রানা বারে বারে বসে পড়ছে পাথরের উপর। রানার মায়েরও পা টলছে। পরিশ্রমের জন্য ততটা নয় যতটা অলটিচুডের জন্য। দার্জিলিঙের প্রায় দেড়গুণ উপরে উঠে এসেছি। অক্সিজেনের অভাব বোধ হচ্ছে। জলের বোতলে আজ ব্রান্ডি মেশানো আছে। তাই খাইয়ে দিচ্ছি। মাঝে মাঝে বরফের নদী। তার উপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। রোদ উঠেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নার মত ম্লান সে আলো। উত্তাপ নেই তাতে।

পথের ধারে দেখি শুয়ে পড়েছে এক বুড়ি বললে-জল আছে বাবা?

বললুম আছে, নিন।

জল খেয়ে বলে —- কি যেন ওষুধের গন্ধ!

অম্লানবদনে বলি — ক্লোরিন দেওয়া আছে।

মনে মনে বললুম — হে বাবা কেদারনাথ! তোমার দোরে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বললুম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ওটুকু ব্রান্ডি পেটে না গেলে তোমার ও ভক্ত পথেই পড়ে থাকত।

বুড়ি উঠে বসে হাঁপাতে থাকে।

— কই উঠুন, একেবারে মন্দিরে গিয়ে বসবেন, চলুন যাই। আমি ডাকি।

— বড্ড মাথা ধরেছে বাবা।

— এই ওষুধটা খেয়ে ফেলুন।

ট্যাবলেটটা হাতে নিয়েও মুখে দেয় না, বলে-তীর্থের পথে প্রতিগ্রহ যে নিতে নেই বাবা!

বললুম, এ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ওষুধ মা। আমি পয়সা দিয়ে কিনি নি।

হোক মিথ্যা, এই মিথ্যাই আজ আমার কাছে সত্যের চেয়ে বড়।

সমস্ত ভারতবর্ষকে একটা পাহাড় বেয়ে উঠতে দেখেছ কখনও! পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ! চলেছে সবাই। টলতে টলতে; এঁকেবেঁকে। শিশু ভোলানাথের ভক্তশিশু সব। হাঁটি-হাঁটি-পা-পা। সবার মুখে এক বোল-জয় কেদার, জয় কেদার! একলা তুমি পথে চলেছ-তন্ময় হয়ে গেছ পথের সৌন্দর্যে, পাহাড়-পর্বত, নদী-নির্ঝর, গাছ-ফুল-পাখি।কিন্তু মন ব্যাটা ভারী পাজি। কখন এসব বহির্দৃশ্য ছেড়ে সেঁদিয়ে গেছে অন্তরের গভীরে। মনে পড়ছে-বাড়িতে রেখে এসেছে স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের, বড় মেয়েটির শ্রীরামপুর থেকে যে সম্বন্ধ এসেছিল যাত্রা করার আগেই তার জবাবটা দিয়ে আসনি-এতদিনে সে পাত্র নিশ্চয়ই হাতছাড়া হয়ে গেল। মনে পড়ছে, ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসের নোটিশ পেয়েছিলে-তার ব্যবস্থা করা হয় নি। মনে পড়ছে, ফিরে গেলেই বাড়িওয়ালা এসে দাঁড়াবে-দু মাসের ভাড়ার তাগাদায়। মনটা বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শোন ডাক-জয় কেদারনাথ কি! হ্যাঁ, তোমাকেই বলছে ওরা। ফেরার পথের যাত্রী,। সব ভুলে তুমি বলে ওঠ-জয় কেদার!

সংসারের কথা ওরা তোমাকে চিন্তা করতে দেবে না। বার বারে ওরা শোনাবে কেদারের জয়ধ্বনি। শুধু শোনাবে নয়, তোমাকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়বে। সংসার তোমার কেউ নয়-আজ ওরাই তোমার সব-ঐ পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠার অচেনা আত্মীয়, অজানা বন্ধুর দল।

— একটা বিড়ি হবে বাবা? বড় শীত।

হাতে একতারা, নাকে রসকলি, মাথায় কানঢাকা গেরুয়া টুপি। বৈরাগী। পকেট থেকে বার করে দিলাম সিগারেট। ধরিয়ে দিলাম। শীতে কাঁপছে।

— বাড়ি কোথায় বৈরাগী মশাই?

— নদে শান্তিপুর বাবা, অনেক দূর!

— শান্তিপুর? কোন গাঁয়ে?

— বাঘ-আঁচড়া।

আরে, এযে আমাদের দেশের লোক! শুনে বৈরাগীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে-গেছেন কখনও বাঘ-আঁচড়ায়?

বলি — কতবার। ওখানে যে হেলথ সেন্টার হয়েছে তা আমারই তত্ত্বাবধানে তৈরী। তখন আমি কৃষ্ণনগরে পোস্টেড।

— হেলথ সেন্টার কি বাবা?

— কী আশ্চর্য! নতুন হাসপাতাল গো। আজ বছর দশেক হল যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী হয়েছে, তার কথা বলছি আমি। দেখেন নি অতবড় হাসপাতাল?

বৈরাগী সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলে-দশ বছর? তা আমি যে আজ ত্রিশ বছর গাঁ ছাড়া। কেমন করে জানব বাবা?

তা বটে। তিন ধাম সেরে এসেছে বৈরাগী তার একতারা বাজিয়ে। এই শেষ ধাম। মালাচন্দন হয়েছিল যে বৈষ্ণবীর সঙ্গে সেও ঘুরেছিল পথে পথে মাধুকরী করে। শেষমেশ দেহ রেখেছে শ্রীবৃন্দাবনে। তা সেও আজ দশ বছর। তারপরে এই একতারাই ওর সঙ্গিনী। একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে-রাইকমলিনীর নাম নিয়ে। কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন, কেন্দুবিল্ব-কন্যাকুমারী-দ্বারকা।

ন'দের দেশের মানুষ পেয়ে বৈরাগী খুব খুশী। এক নাগাড়ে বক্‌বক্ করতে থাকে। বলে-হ্যাঁ বাবা, তাল দিঘির পুবে সেই বুড়োশিবের মন্দিরটা আছে? আর তার দক্ষিণে সেই তেঁতুল বট?

বহুবার বাঘ-আঁচড়ায় গেছি কাজ দেখতে। কিন্তু ঐ হাসপাতাল ছাড়া গাঁয়ের আর কিছু দেখবার সুযোগ হয় নি কোনদিন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই যখন মিথ্যা কথার ঝড় বইছে তখন এবারও বলতে হল-হাঁ হাঁ, সেই ত্রিশুলওয়ালা মন্দিরটা তো, আর তার দক্ষিণে সেই ঝুরি-নামা বট গাছ!

লাফিয়ে ওঠে বৈরাগী।

— আর সেই তেঁতুলবটের পুবে সেই খড়োচাল ঘরখানা? দেখেন নি? কঞ্চির বেড়া-দেওয়া বাগান, তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যামণির চারা, সেই যে ঢুকতেই মাধবীলতার কুঞ্জ, বাঁ-হাতি লাউয়ের মাচা —

হা ঈশ্বর! মিথ্যার লগিতে যে আর এক বাঁও মেলে না! ত্রিশ বছর আগেকার সেই বাস্তুভিটাকে দেখেছি বলি কোন লজ্জায়? ত্রিশ বছর আগেকার সন্ধ্যামণির চারা আর লাউয়ের মাচার নির্দেশ-মাথা নেড়ে বলি-ঠিক মনে পড়ে না।

দগ্ধপ্রায় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বৈরাগী বলে-বুঝেছি, সেই নিতাই সাধুখাঁর কীর্তি। নিলেমে ক্রোক করে নিয়েছে সব। আর নেবে নাই বা কেন-

ছেলেপিলে হল না, ভাইপোটা বয়ে গেল-

হে কেদারনাথ! তুমি আজ হেরে গেলে! তোমার তুষারমৌলী পর্বতকে ছাপিয়ে উঠেছে এক ছোট্ট তুলসীমঞ্চ, তোমার অযুত পুষ্পিতবৃক্ষের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ত্রিশ বছর আগেকার এক ছোট্ট সন্ধ্যামণির চারা।

অবশেষে গরুড় চটি। সেখানে বাঁক ঘুরতেই-ঐ তো মন্দির!

আহা কী অপূর্ব দৃশ্য! তুষারমৌলী পর্বতের একটি চালচিত্র। তারই সামনে পাথরের মন্দির। সত্যই আর চড়াই নেই। সোজা পথ। পাথরে বাঁধানো। ছড়িদার অমর সিং দাঁড়িয়ে আছে। আর সবাই পৌঁছে গেছে। শুধু খোকাবাবু আসে নি বলে সে এতখানি ফিরে এসে অপেক্ষা করছে। বারে বারে বলে-বহু পরিসান হ'ল মাঈ, বহুৎ কষ্টো হইয়েছে। আসেন,হামি লইয়ে যাই।

হাত বাড়িয়ে জলের বোতল, ব্যাগ সব নেয়। যেন আমাদের পদব্রজে আসার সংকল্প তারই অপরাধ।

শেষ পর্যন্ত পৌছালুম মন্দিরে। প্রথমেই মন্দাকিনী স্পর্শ করতে হয়। তারপর মন্দিরে প্রবেশ। হর-হর-বোম্-বোম্! সদলবলে মন্দিরে ঢুকলাম। বাবা কেদারনাথের ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার নেই। ঢাল জল, মাখাও ঘি, আলিঙ্গন কর, জড়িয়ে ধর-কোন বাধা নেই।

পান্ডাজি বলেন-বলুন, মনের যা বাসনা তা বাবাকে বলুন।

বাসনা? বাসনার কি অন্ত আছে? কিন্তু বাবাকে তা জানিয়ে কি হবে? এতটা পথ অতিক্রম করে এসেছি কি রূপং দেহি, ধনং দেহি বলতে? এসেছি তোমাকে দেখতে, এসেছি তোমার মহিমা উপলব্ধি করতে, এসেছি জানতে কোন্ আকর্ষণী শক্তিতে তুমি কন্যাকুমারী থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত যাত্রীকে টেনে আনছ এখানে সহস্রাব্দী ধরে!

হ্যাঁ, তা দেখেছি। দু চোখ ভরে দেখেছি। প্রাণ পরিপূর্ণ করে দেখেছি। অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে। মন্দিরের ভিতর তোমাকে আমি দেখতে পাই নি, সে দৃষ্টি আমার নেই-কিন্তু মন্দিরের পথে তোমাকে দেখেছি। দেখেছি পাখির গানে, ফুলে-ভরা গাছে, পাহাড়ের চূড়ায়। ফেনোচ্ছল জলধারায়। দেখেছি খঞ্জের স্ফূর্তিতে, বৈরাগীর একতারায়, বুড়ির চোখের দু-তারায়। তোমাকে প্রণাম।

কতদিনের মন্দির জানি না-পৌরাণিক কাহিনী মানি আর না মানি-এ কথা

তো ঠিক সুদূর অতীতে এ-মন্দির যখন ছিল না তখন কোন একজন মানুষই এ মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন। কে সেই মহা-মানব? সাধু-সন্ন্যাসী? মুনি-ঋষি? তিনি যেই হন-সর্বাগ্রে তাঁকে প্রণাম। ভারতবর্ষে লক্ষ কোটি মন্দির আছে-তাদের কারুকার্য বিস্ময়ের বস্তু। তাদের প্ল্যানিং, স্থাপত্য, তাদের ভাস্কর্য বিহ্বল করে দেয়-কিন্তু এমন একটা সাইট-সিলেকশন্ কে করতে পেরেছে আসমুদ্রহিমাচলে? এ মন্দির যখন ছিল না, এ পথও তখন ছিল না। তাহলে সেই প্রথম পরিকল্পনাকার কেমন করে সন্ধান পেলেন হিমালয়ের নিভৃততম কন্দরে এমন একটি অপূর্ব স্থানের? সেই আদিযাত্রী এসেছিলেন কোন পথে? কেমন করে বার বার পার হয়েছিলেন সেতুহীন ভাগীরথী-অলকানন্দা-মন্দাকিনী? কেমন করে ডিঙিয়ে এসেছিলেন লক্ষ পাহাড়ের প্রাচীর?

তিনদিকে ধ্যানস্তিমিত তুষারমৌলী পর্বত। একদিকে প্রবেশপথ। যে পথে এলাম, সে পথে ফিরে যাব। কলনাদিনী মন্দাকিনী বয়ে চলেছে মন্দিরের চরণ স্পর্শ করে। আর এই বিশাল পর্বতশ্রেণীর সম্মুখে ছোট্ট মন্দির। কী অপূর্ব সে মন্দিরের স্থাপত্য। কী প্রপোর্শান-জ্ঞান। মন্দিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার যে ছন্দ, সামনের দোচালা অংশটির সঙ্গে পিছনের মন্দিরশীর্ষের উচ্চতা ও আয়তনের যে আপেক্ষিক মাপ তাতে বারে বারে প্রণতি জানাতে ইচ্ছা করে পরিকল্পনাকারকে।

হে আদি পরিকল্পনাকার, প্রণাম, তোমাকে বারংবার প্রণাম।

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভিলাঙ্গনা

আমরা সমতলের লোকেরা চিরকাল আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়েই হিমালয়কে দেখে এসেছি। হিমালয়ে সাধু মহাত্মারা বাস করেন, হিমালয়ে দুর্গম তীর্থ পর্যটনে জীবন ধন্য হয়, মন পবিত্র হয়। তাই দীর্ঘকাল ধ'রে হিমালয়ে আমাদের তীর্থ যাত্রা। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সাধনক্ষেত্র. নানা বিগ্রহ ও মন্দির হিমালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আছে শিখদের তীর্থক্ষেত্র এবং ইস্‌লাম ধর্ম-সংস্কৃতির পরিচয়ও। তাই এতকাল আমরা হিমালয়কে দেবভূমি ও ধর্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান বলেই জেনে এসেছি। নিশ্চয়ই এই জানার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সাধনার ক্ষেত্রে হিমালয়ের দান অপরিসীম। কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনকে ঋদ্ধিমান করার জন্যে হিমালয় তার বুকে যে অসীম ঐশ্বর্য ধ'রে রেখেছে সে দিকে আমরা বিশেষ তাকাই নি। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী থেকেও হিমালয়ের এই ঐশ্বর্যের কথা অনেক জানা যায়। শিবের কথাই ধরা যাক। তিনি যে শুধু মহাদেব নয়- মহাযোগী, মহাজ্ঞানী। এই অবৈদিক দেবতার আর একটি নাম বৈদ্যনাথ- অর্থাৎ বৈদ্যদের মধ্যে প্রধান - সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার। হিমালয়ের এই সব গাছ গাছড়ার অসীম মাহাত্ম্যের কথা জানতে পারলে বোঝা যাবে মহাদেব কি ভাবে ডাক্তারী করতেন। এ ব্যপারে দেখেছি কিছু কিছু সাধু সন্ন্যাসী খুব ওয়াকিবহাল, আর কিছু পাহাড়ী লোকও। একজন স্বামিজীর কথা পড়েছি যাঁকে একবার একটা ভাল্লুকে আক্রমণ করে। তিনি কোনো মতে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কুটিরে ফিরে যান। তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। কুটিরে ছিল নানা গাছের ছাল, মূল, পাতা ইত্যাদি। তাঁর নির্দেশে সে গুলি থেকে কিছু কিছু নিয়ে, কী সব হিসেব ক'রে গঙ্গাজল দিয়ে বেটে ক্ষত স্থানে প্রলেপ লাগানো হয়; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত ঝরা বন্ধ হয়। এই প্রলেপ অ্যান্‌টিসেপ্‌টিক হিসেবেও কাজ করে এবং ক্ষতস্থানগুলোর বেদনা সারিয়ে পরের দিনই স্বামীজীকে চাঙ্গা ক'রে তোলে। যে ফুলের গন্ধে লোকের মাথা ঘোরে বা লোকে অজ্ঞান হয়ে যায় সেই ফুলের বাগানের মধ্যেই তার অ্যানটিডোট আছে। একধরণের ছোট ছোট গাছ হিমালয়ের দশ বারো হাজার ফুট

উচ্চতায় অনেক দেখেছি যেগুলোর কচি কচি সবুজ পাতা একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ধরলেই জ্বলে যায়। একধরণের গাছের পাতা আছে যেগুলো শুকনো ক'রে চায়ের জলের সঙ্গে একটু ফুটিয়ে নিলে প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও শরীর কিছুটা গরম রাখা যায়। এমনতর কত কী যে হিমালয়ে আছে কেউ তার হিসেব রাখে না। শুধু সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত যোগী এবং জ্ঞানী-গুণী তাঁদের কারো কারো এ সব খবর বা তত্ত্ব কিছু কিছু জানা আছে।

অবশ্য কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশেও সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় হিমালয়ে বিভিন্ন গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। এই সব 'জড়িবুটি' নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। যে বনরক্ষীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো তার অন্যতম দায়িত্ব জঙ্গল পাহারা দেওয়া, দেখা যাতে বাইরের লোকজন এই জঙ্গলে এসে লতাপাতা, শিকড় বাকড় চালান দিতে বা এগুলোর কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

এ সব ব্যাপারে বিদেশীরা আজকাল রীতিমতো চর্চা করছে। তারা হিমালয়ে আসে শুধু বিভিন্ন শৃঙ্গ বিজয়ের জন্য নয়। অভিযানের সঙ্গে তারা নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চালিয়ে থাকে। কোনো কোনো দলতো পুরোপুরি গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। কিছুকাল আগেই তো এসেছিল একটা আমেরিকান দল নেপালের অঞ্চলে। তাদের সম্বন্ধে 'হিমবন্ত' পত্রিকায় সাম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল—

"A significant scientific expedition was carried out in Autumn last in the open laboratory of Arun Valley in East Nepal, closed to the drums of publicity. Several hundred reptiles, amphibians, bords and mammals collected by an American team are being studied at Field Museum of Natural History in Chicago. Numerous species new to Napal has already been identified and more are expected"

('Himavant' – Vol. VII, 2. June, 1975.)

আশা ও আনন্দের কথা, আজকাল আমাদের দেশেও যাঁরা পর্বতাভিযানে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো দল অভিযানের সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণার কাজও চালাচ্ছেন। তবে অন্য দেশের মত উৎসাহ এখনো জাগেনি। এ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারকেও সাহায্যের ব্যাপারে আরও উদার হতে হবে। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে উৎসাহী ও যোগ্য ব্যক্তির অভাব হবে

না, যদি অর্থাভাবটা দূর হয়। ধার দেনা ক'রে আর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বিত্তবানদের দরজায়-দরজায় ঘুরে এ সব কাজ হয় না। তবু যে হচ্ছে একি কম কথা!

আমরা চলতে চলতে এসে পড়লুম বিরাট বিরাট পাথর ছড়ানো একটা বিস্তীর্ণ এলাকার কাছে। একটু নিচেই ভিলাঙ্গনা বয়ে চলেছে। বোধ হয় ওপরে কোনো বড় পাথরে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় এখানে স্রোত খুব প্রবল। আমরা কয়েকটা পাথরের ওপর ছ ড়িয়ে ছিটিয়ে বসলুম। কারণ এখানে কিছু জলযোগ করা দরকার। খালিপেটে বা সামান্য কিছু পেটে দিয়ে ট্রেকিং, বিশেষ ক'রে চড়াই এর পথে একেবারে নিষিদ্ধ। তাহলে পেটের মধ্যে টান ধরে, নাড়ীভুঁ ড়ির মধ্যে একটা অঘটন ঘটে, হাঁপ ধরে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর অবসন্ন হয়ে যায়। আমরা অবশ্য যতটা পেরেছি খেয়েই সকালে বেরিয়েছি। তবু এর মধ্যে আবার একটু খিদে-খিদে ভাব জেগেছে। তা ছাড়া সামনে কোথায় আবার খাওয়ার সুবিধে হবে তা তো জানি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আবার রওনা হলুম। ওপারে যেতে হবে। কিন্তু যাবো কী ক'রে। সেতু কোথায়? আজ আমাদের সঙ্গে নতুন একজন লোক চলেছে- পিয়ার সিং। পঁচিশ-ছাব্বিশের এক যুবক। ও-ই খার্টলিং পর্যন্ত গাইড্। কিছু মালপত্রও ঘাড়ে নিয়েছে।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। কোন দিকে কী ভাবে যাবো বুঝতে পারছি না।

পিছন থেকে পিয়ার সিং এসে বলল — 'চলিয়ে সাব, চলিয়ে। চলিয়ে তো। কিন্তু যাবো কোথায়? সেতু কই? ভিলাঙ্গনার বুকের ওপর দিয়ে কি হেঁটে যেতে হবে? এই প্রবল স্রোতে পা ডুবিয়ে? সম্ভব নাকি?

পিয়ার সিং বললে — ঐ তো সেতু, ওর ওপর দিয়েই যেতে হবে।'

— 'ওটা সেতু নাকি?' দিলীপ অবাক হয়ে জিগেস করলে। সে দিকে তাকিয়ে বিমলের চোখ দুটোও বড় বড় হয়ে উঠলো — 'ওটা সেতু'!

পিয়ার সিং বললে —'এখানে নদীর ওপর দিয়ে আগে একটা খুব লম্বা তক্তা ফেলা ছিল। নদীর জলের তোড়ে সেটা ভেসে গেছে। এখন পাহাড়ী ভেড়াওয়ালারা ঐ লম্বা গাছটা কেটে ফেলে রেখেছে- অব্ তো ও-হি পুল হ্যায়'।

পাড়াগাঁয়ে কোথাও কোথাও সরু নদী বা খালের ওপর বাঁশের সাঁকো থাকে। সে সব সাঁকোর ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছি। কিন্তু এই বিচিত্র সেতুর সঙ্গে

সেগুলোর পার্থক্য হলো, সে সব সাঁকো থেকে যদি কেউ হঠাৎ পা পিছলে জলে পড়ে যায় তা হলে তার সামান্য আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু মৃত্যু ভয় থাকে না। আর এই গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে যদি কেউ হঠাৎ নিচে পড়ে যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ সে নিত্যধামে গমন করবে, দুনিয়ার মায়া কাটাতে তার একমুহূর্তও দেরি হবে না।

কিন্তু 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। পরমার্থ লাভের একটাই উপায় আছে ঋষিরা বলেছিলেন। আর পিয়ার সিং বললে, পরপারে যাবার এখানে একটাই উপায়—এই গাছের গুঁড়ি। সুতরাং ভেবে লাভ নেই। দুর্গা বলে পা বাড়াও।

কে যেন একটা আছেন যিনি নাকি পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করান। আমরা একে একে সেই সেতুর ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে ওপারে পৌঁছলুম। সবায়ের ধড়ে প্রাণ এলো।

সাপের সঙ্গে হিমালয়ের অবশ্য একটা আলাদা সম্পর্ক আছে। পৌরাণিক-নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক। মহাভারতে এবং কোনো পুরাণে ভারতের প্রান্তবাসী কয়েকটি মানবগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। সেগুলির মধ্যে শক, হুন, নাগ, কিরাত ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক ছিল হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চলের সঙ্গে। নাগ ও কিরাত গোষ্ঠী দুটি গাড়োয়াল অঞ্চলেও বসতি বিস্তার করেছিল। যতদূর জানা যায় কিরাত গোষ্ঠীর কোনো মানুষই আর গাড়োয়ালে নেই। কুমায়ুনের পূর্বাংশে 'রাজি' নামে এক শ্রেণীর লোক ছিল। কেউ কেউ মনে করেন তারাই নাকি কিরাতগোষ্ঠীর লোক। অনেককাল আগে ই. টি. অ্যাটকিন্‌শন্ তাঁর বিখ্যাত 'নোটস্ অন দ্য হিসট্রি অফ্ রিলিজিয়ন ইন্ দ্য হিমালয়' গ্রন্থে রাজিদের কথা লিখেছিলেন। তবে এদের এখন আর কুমায়ুনে দেখা যায় না।

গাড়োয়ালের নাগ জাতি সম্পর্কেও নানা কিংবদন্তী ও উপাখ্যান আছে। অলকানন্দার উপত্যকা অঞ্চলই ছিল এই নাগেদের বাসভূমি। এরা ছিল সর্প ভক্ত ও সর্প পূজক। এক সময় গাড়োয়ালে সর্পদেবতার যে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তার প্রমাণ এখনো কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে আছে! যেমন বদ্রীনারায়ণের পথে পাণ্ডুকেশ্বরে 'শেষ নাগ', পৌড়ির কাছে 'নাগ দেও' এবং গঙ্গোত্রীর পথে ভাটোয়ারির কাছে কালীনাগ। এ সব জায়গা এখন বাসরাস্তায়। তা ছাড়া কোনো কোনো গ্রামেও সর্পদেবতার মন্দির আছে। এগুলিকে বলা হয় 'নাগরাজ তোক্'।

গাড়োয়ালীর মধ্যে এখনো কেউ কেউ নিজেদের নাগবংশী বলে মনে করে। এই সর্পপূজক জাতিটি সম্পর্কে ই. সেরম্যান্ ওক্‌লি তাঁর 'হোলি হিমালয়াস ' গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এরা নাকি এক সময় হিমালয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। শিব বা বিষ্ণু মন্দিরের অনেকগুলোই নাকি গোড়াতে নাগ-মন্দির ছিল-অর্থাৎ সর্পদেবতার মন্দির। আমাদের এই সর্পদেবতার মতো চীনাদেরও একটা দেবতা আছে-ড্রাগন লুনাং উয়াং-চীনা সমাজে যার দারুণ প্রতিপত্তি।

নাগ মানে সাপ। আবার নাগ একটা জাতিও বটে যারা সাপ পূজা করতো। এখন তারা নেই। তাদের জায়গায় আছে সাপ। সর্পদেবতা এখন পুরো জাতটাকেই একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলেছেন। কোনো কোনো পন্ডিতের কাছে- যাঁরা নাগেদের একটা পৃথক জাতি বলে মনে করেন.'সর্প' এবং 'নাগ' শব্দ দুটি সমার্থক নয়। অন্তত আগে ছিল না। একথাও শোনা যায় প্রাচীন ভারতে নাগ বলতে গন্ধর্ব. কিন্নর বা ঐ শ্রেণীর কোনো মানবগোষ্ঠীকে বোঝাতে। মহাভারতে অবশ্য নাগ আর্য-বিরোধী একটি বিশিষ্ট জাতি। আর্যেতর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জীবিত সাপ পুজোর প্রচলন ছিল পরবর্তীকালে কোনো সময় থেকে তা নাগ জাতির সংস্কারের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে এবং তারাও আসনে উন্নীত হয়। না হলে একটা বিশিষ্ট প্রাচীন জাতির অধিপতি বাসুকি সর্পরাজ হিসেবে পূজিত হবেন কেন। বোধ হয় এই ভাবেই মহাভারতের একটি মানবগোষ্ঠী পরবর্তী কালে সর্পরূপ ধারণ করেছে।

আমরা তিনজনে তিনটে পাথরে বসেছি। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা। রোদ চলে গেছে। একটা ফ্যাকাসে আলো এখনো ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে। এই আলো[illegible]য়ুও আর কিছুক্ষণ। নাথু আর রণজিৎ জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ ক'রে এনেছে। বেশ মোটা কতগুলো ডাল। ভূর্জপত্রের। এর আগে ভূর্জপত্রের গাছ বেশি চোখে পড়েনি। এ জায়গাটায় অনেক আছে।

বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠান্ডা সোজা হাড়ের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলো। আমরা যা গরম জামা-কাপড় এনেছি সর্বাঙ্গে চাপিয়ে নিয়ে আগুন পোহাতে লাগলুম। হাতে গরম কফির গেলাস। কিন্তু মনে হচ্ছে তার উষ্ণতাটুকু কে যেন কেড়ে নিয়েছে। আহা, এক গেলাস তরল আগুন যদি পান করা যেত!

খাওয়া সেরে যখন আমরা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম তখন সাড়ে সাতটা।

মাঝখানে আগুন জ্বলছে। তার একদিকে আমরা তিনজন, অন্য দিকে ওরা তিনজন। নাথু আর রণজিৎ ডুয়েট ধরেছে। সেই প্রথম রাতের মতো। এদ্ভুত মানুষ এরা। দুঃখ কষ্ট অভাব-বেদনা এদের কাছে বিশেষ পাত্তা পায় না। মনের দরজায় এসে ধাক্কা দেয়, দরজা ঠেলে হয়তো একটু ঢুকেও পড়ে ভেতরে। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। জীবনকে এরা সহজভাবে নিয়েছে, তাই অভাব- বেদনার চেহারাটা এদের কাছে বড় হয়ে উঠতে পারে নি। এদের মধ্যে নাথুকেই আমাদের বেশি ভালো লাগে। খুব সাধাসিধে এবং হাসিখুশি। এক সময় গাড়োয়ালীদের প্রায় সকলের সম্বন্ধেই এ কথা বলা যেতো। এইচ.জি. ওয়ালটন তার গেজেটিয়ারে এদের সরলতার খুব প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু এখন আর এরা তেমন নেই। যুগ বদলেছে। সমাজ বদলেছে। মানুষও বদলেছে। কিন্তু বদলটা কী রকমের। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের সেই আক্ষেপ —"সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমশ ইতর হইয়া আসিয়াছে"। তাই এদের সম্বন্ধে—এই ভিলাঙ্ উপত্যকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, এরা নাকি চতুর এবং ফন্দিবাজ। কিন্তু এমন একটা বিরূপ ধারণার দড়িতে সবাইকে বাঁধা যায় না। কোনো একটা অঞ্চলের কিছু খারাপ লোকের সংস্পর্শে এসে, তাদের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে যদি কেউ বলে এরা সবাই এক গোয়ালের গরু, একই পালকের পাখি তাহলে তা হবে রাগের কথা, সত্য কথা নয়। আমরা এই কয়দিনেই তো অনেক ভালো লোকের সংস্পর্শে এসেছি — দিলখোলা, পরোপকারী। শ্রী কুন্দন সিং একজন কনট্রাকটর। ঘাংসালির লোক। তার সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক নিজের কাজ ফেলে দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সঙ্গে নানা আলোচনা করেন, এদিকের চলার পথের অনেক তথ্য উপহার দেন। বালকৃষ্ণজীর অযাচিত সাহায্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভালাবাসার কথা তো চিরকাল মনে থাকবে; বদোনিজী, শ্রীপ্রেম সিং, ঘুট্টুর পথের গ্রামসেবক এঁদের সকলেরই ব্যবহার ও সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

অবশ্য নোংরা লোক যে আজকাল এখানেও সংখ্যায় বেড়েছে সে কথা ঠিক। কোথায় বাড়ে নি? তবে হ্যাঁ, 'দেবভূমি' হিমালয়ের লোকেরা চোর-বাটপাড় আর চিটিংবাজ হলে আমাদের গায়ে লাগে। হিমালয়ের তো একটা বহুকালের 'ইমেজ' আছে-সেটা চোট খায়। অথচ আমরা ভাবিনা যে ভূমি বা আলয়েরই লোক হোক এরাও মানুষ। এদেরও বোধ শক্তি আছে। আর এ যুগে সে শক্তিটা

সকলের মধ্যেই প্রখর হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন আর তার অভাব ও যন্ত্রণাকে ভাগ্য ব'লে মেনে নিতে রাজী নয়। কেন অভাব? কেন যন্ত্রণা? —ওরা তো বেশ ফূর্তিতে আর বাহাল তবিয়তে আছে। তবে? আমরা কী দোষ করলুম? এ যুগের এই জ্বলন্ত প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে এরাও শুরু করেছে। যাদের বোধশক্তি একটু প্রখর তারা বুঝেছে যে জামানা বদলে গেছে বটে কিন্তু আড়াইশ তিনশ বছর আগের সেই শোষণ আজো চলেছে। পুরোনো জামানার পাপ এখনো নতুন জামানার ঘাড়ে চেপে আছে।

এক সময় এখানকার সমাজ কাঠামোর চারটে অংশ ছিল-ঠোকদার, প্রধান, হিস্‌সাদার ও ডোম। বড় বড় জমির মালিকরা তাঁদের পছন্দ মতো একজনকে ঠোকদার নিযুক্ত করতেন। তাঁর কাজ ছিল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং টাকা পয়সা অর্থাৎ কর আদায় করা। কালেকটর ও মেজিস্‌ট্রেটের কাজ বলা যেতে পারে। এই কাজের জন্য অনেক রকম 'ভেট' ও তাঁর প্রাপ্য ছিল। এঁরা এখন আর নেই। ঠোকদারদের অধীনে থাকতেন প্রধানরা। এঁরা এখনো আছেন, এবং প্রধানদের প্রাধান্যই গ্রাম সমাজে সবচেয়ে বেশি। তিনি হলেন গ্রামের কর্তাব্যক্তি। সবাইকে তাঁর কথা শুনে চলতে হতো এবং এখনো হয়। পারিবারিক সমস্যা, ঝগড়া-বিবাদ এ সবের মীমাংসার ভার প্রধানদের ওপর । আগে প্রধানরাও মনোনীত হতেন, এবং এ ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের কথাই সকলে মেনে নিত। আজকাল অবশ্য এ ব্যপারে নির্বাচনের মোটামুটি একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনেক জায়গায় দেখা যায়। প্রধানদের পরে হিস্‌সাদার এবং তার পরে ডোম। হিস্‌সাদাররা কোথাও কোথাও আছেন-না থাকারই মতো; কারণ এখন ওঁদের কাজও প্রধানরাই করে থাকেন। কিন্তু যতদূর জানি ডোমশ্রেণী এখন আর কোথাও নেই। নেই তবু আছে। নামে না থাকলেও এই শ্রেণীর মানুষ আজো গাড়োয়ালের পাহাড়ী সমাজে যথেষ্ট। এক সময় এখানকার সমাজে দাসত্ব সাংঘাতিক রূপ নিয়েছিল। ডোম শ্রেণীর উদ্ভব হয় সেই সময়েই। এরা দাস-কৃষক। জমির মালিক, গ্রামের প্রধান-ওপর মহলের এই রকম সকলেরই মন রেখে আর আজ্ঞা বহন করে এদের চলতে হতো। এইচ্. জি. ওয়ালটন এদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন — " Slavery. however, under a respectable disguise, still exists. "

ওয়াল্‌টনের বইটা ছাপা হবার পর আজ সাতষট্টী বছর কেটে গেছে। আজো

দেখলুম ভিলাঙ্ উপত্যকার অনেক গ্রামে ডোমরা না থাকলেও আছে। এরা গাড়োয়ালী সমাজের নির্যাতিত শোষিত মানুষ। ডোম এদের বলা না হলেও এরা ডোমদেরই উত্তরপুরুষ। এদের দৈহিক শক্তি যখন চলে যায়, যখন সমাজের অবস্থাপন্ন ক্ষমতাবানদের খিদমৎ করার আর এদের অবস্থা থাকে না তখন কোনো রকম সাহায্যই কারো কাছ থেকে এরা আর বিশেষ পায় না। রোগ আর যন্ত্রণার কামড়ে ছটফট করতে করতে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। তবু কাউকে এরা দোষ দেয় না।-

"স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার —
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।"

অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি না পেলে মানুষ কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না। এবং সাধারণ মানুষের মনের জগতটা যতদিন অন্ধকার থাকে বা অন্ধকার ক'রে রাখা যায় তত দিন সব দেশের সব সমাজেই সুবিধাবাদীদের সুবিধা।

অবশ্য গাড়োয়ালের অন্যত্র অবস্থা ঠিক এক রকম নয়। সামাজিক অবস্থা ও অধিকার সম্পর্কে নিম্ন শ্রেণীর মানুষও সচেতন হতে শুরু করেছে। ভিলাঙ্ উপত্যকাতেও সে সচেতনতা এসেছে। তবে কম। মধ্যযুগীয় সামাজিক শোষণ সম্পর্কে এই যে সচেতনতা এ একটা মানসিব প্রতিক্রিয়ার ফল। এ-ফল যে সুস্বাদু হবে এমন কোনো কথা নেই। তাই সে — যুগের সরলতা এ--- যুগে হারিয়ে যাচ্ছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, প্রবঞ্চনা এদের মধ্যেও দানা বেঁধে উঠছে।

অগত্যা আমাকেই উঠে বসতে হলো। বরফ পড়ছে না বটে, কিন্তু যে পরিমাণ হিম পড়ছে তাতে কম্বলের ওপর দিকটা প্রায় ভিজে গেছে। কোনো উপায় নেই। এই ভাবেই রাত কাটাতে হবে-এই গহন-কঠিন রাত। কিন্তু কালকের সকাল এক নতুন রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে আমাদের সামনে; হিমালয়ের সেই শুভ্রসমুজ্জ্বল কান্তির স্পর্শ পাবো আমাদের দৃষ্টিতে। কারণ হিমবাহের খুব কাছেই আমরা এসে পড়েছি। একটা উর্দু শের মনে পড়লো-

"রাত যিত্‌নী ভী সঙ্গীন হোগী
সুব্‌হ্‌ উৎনি হী রঙ্গীন হোগী।"

রাত যতো ঘোরালো হবে, সকাল ততই রঙ্গীন হয়ে দেখা দেবে। সেই রঙ্গ
ীন সকালকে দেখবার জন্যে ঘোরালো রাতের এই অত্যাচার সহ্য করতেই হবে।

মনে হলো আগুনটা যদি একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে হিমের আক্রমণ একটু কমবে। আমি কিছু করার আগেই দেখলুম নাথু উঠে একটা বড় মোটা গাছের ডাল আগুনে ফেললো।

আমার বাঁ পাশে খাদের দিকে ঘন জঙ্গল। বন্য জন্তুর আস্তানা। চিতাবাঘও থাকতে পারে। শুনেছি এ-দিকে ওদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। ভাল্লুক তো থাকার কথাই। আর আমরা ছ'জন প্রাণী। তিন জনের ভরসায় তিন জন চলেছি।

তিনজনের ভরসায়? তাই কি?

সংসারে মানুষ মানুষের ওপর ভরসা রাখে। রাখতে হয়। না হলে চলা যায় না। কিন্তু ভেতর থেকে 'একজন'-এর আসল ভরসা যদি না পাওয়া যায়,তা হলে বাইরের কোন ভরসাই ঠিক মতো কাজে লাগে না। চিন্তা, শংকা, সন্দেহ মনকে দুর্বল ক'রে দেয়। কিন্তু কে এই 'একজন'? জানি না। অথচ মনে হয় আমাদের ইচ্ছার কেন্দ্রে এই 'একজন'— এর ইচ্ছা সব সময় কাজ ক'রে চলেছে।

কৃষ্ণ পক্ষের রাত। মাথার ওপরে অসংখ্য তারা। আকাশটা অবশ্য বেশী দূর দেখা যাচ্ছে না। সামনের উঁচু পাহাড়ের গায়ে ঠেকে গেছে। কী সাংঘাতিক ভয় দেখানো চেহারা ঐ পাহাড়টার। প্রকান্ড দৈত্যের মতো অন্ধকারে জেগে উঠে আকাশটাকে জাপটে ধরেছে।

ভয়! হিমালয়ের এই জনমানবশূন্য অঞ্চলে জঙ্গল ঘেরা এই ছোট চাতালের চারপাশে অসংখ্য ভয় তো আমাদের ঘিরে আছে। অথচ আজ মনের উপর ভয়ের কোনো প্রভাব নেই কেন? এখনই তো কোনো বন্য জন্তু এসে আমাদের আক্রমণ করতে পারে; ডানদিকের পাহাড়ের ঝুঁকেপড়া অংশটা থেকে একটা বিরাট পাথর আমাদের ওপর খসে পড়তে পারে-এমনি তো আরো কত কী হতে পারে। অথচ আজ ভয় মনটাকে একটুও নাড়া দিতে পারছে না। কেন? অন্য সময় তো কত তুচ্ছ কারণে ভয় আমাদের পেয়ে বসে। কিন্তু এখন যে আমরা ভয়ের ভেতরেই চলে এসেছি; ভয়কে তো আর বাইরে থেকে, দূর থেকে দেখছি না। আমরা এখন ভয়ের

অন্দরমহলের বাসিন্দা। ভয় এখন আমাদের আপনজন। তাই কোনো ভাবনা নেই, কোনো দুশ্চিন্তা।

আমার পাশের বন্ধুরা বোধ হয় এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। ওপাশে কুলিরাও কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছে। চারপাশে জমাট অন্ধকার। এ অন্ধকারের গায়ে বোধ হয় আঁচড় কাটা যায়। আমি হাঁটু মুড়ে বসে রইলুম আগুনের দিকে তাকিয়ে।

পিছনে একটা জীবন।

একটা জীবনকে পিছনে ফেলে এসেছি। চাকায় বাঁধা গতানুগতিক জীবন- যেখানে নানা ভুল অসংগতির কামড়ে চেতনা বিবশ হয়ে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায়- যেখানে সংশয়ের কালো থলি থেকে মনকে নির্মল আলোয় বার ক'রে আনা সহজ নয়-যেখানে গতি আছে অগ্রগতি নেই, আবর্তন আছে প্রবাহ নেই, শুধু একটা যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের চারপাশে অবিরাম পাক-খাওয়া- যেখানে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে থেকেও সকলকেই কেমন-যেন ঝাপ্‌সা দেখায়, আর একটা নিঃসঙ্গতার অনুভূতি সব সময়ই মনের ওপর সেঁটে থাকে। অনেকদিন আগে কোথায়-যেন পড়েছিলুম একটা কবিতা। তার শেষ চরণগুলো মনে পড়ছে —

"প্রেমেও শতেক জ্বালা, বিরহে-মিলনে প্রাণান্তক
স্বার্থ বিনিময়ে দ্বন্দ্ব অবিরাম চলে ঘরে,
জ্ঞানমার্গে কথা খোঁজে প্রেমরিক্ত বাচাল কথক।"

এই জীবনটাকে পিছনে ফেলে এসেছি। জানি, পালাবার কোনো পথ নেই। কিছু দিন পরে ফিরে গিয়ে আবার এই জীবনটাকেই কুড়িয়ে নিতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে, হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চলে, জঙ্গল ঘেরা এই ছোট চাতালের ওপর আগুনের সামনে বসে গভীর রাতে ছন্দে গাঁথা এই কথাগুলি আজ বার বার বলতে ইচ্ছে করছে —

" Better were this to roam in deserts wild,
On difficult mountains and desolate pools,
A savage life with wild beasts reconciled,
Than paradise itself mated with fools."

সকালে একটু আলো হতেই আমাদের আবার চলা শুরু হলো। ভিলাঙ্গনা নদীর উৎস খাট্‌লিং হিমবাহ আর বেশী দূরে নয়। ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে একটু ওপরে উঠতেই দেখা দিল সেই অপূর্ব মূর্তি-বাঁ দিকে হিমবাহের অনেকটা অংশ আর ডানদিকে স্ফটিক লিঙ্গ। এখনো পুরোটা দেখা যাচ্ছে না, তবে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা এগিয়ে চললুম।

এখানে হিমালয়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলার উপায় নেই। বাঁ দিকে কঠিন পাহাড়ের গা, ডান দিকে গভীর খাদ। অনেক নিচে দিয়ে ভিলাঙ্গনা বইছে। তাকে ভালো ক'রে দেখাও যায় না। প্রতি পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে এগোতে হয়। না হলে অনিবার্য বিপদ।

অথচ সামনে যিনি প্রকাশিত হচ্ছেন, অপাবৃত হচ্ছে যাঁর স্বরূপ তিনি যে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তাই চলতে চলতে বার বার দাঁড়িয়ে পড়ছি, দেখছি তাঁকে। এক জ্যোর্তিময় পুরুষ। নতুন আলোয় জেগে উঠছেন। বিরাট। মহান্। অপরূপ।

আর কিছুক্ষণ পরে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। সামনেই হিমবাহের বিস্তীর্ণ অংশ। উজ্জ্বল রজতকান্তি। ভিলাঙ্গনার উৎস। আমরা এই উৎস দর্শনেই এসেছি। —

"হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত,
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিমনীড়-পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি বাণীর সন্ধানে!"

সূর্যের আলো এখন তির্যকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সামনের তুষাররাজ্যে। এ রাজ্যে কেউ স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করে না। এখানকার শুভ্রতার গায়ে কখনো কালিমা লাগে না। এখানে হাহাকার নেই, যন্ত্রণা নেই, অপূর্ণতা নেই। এখানে সবই পূর্ণ।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

এখানে এটায় ওটায় কোনো তফাৎ নেই, অদঃ আর ইদং একই-দুই-ই পূর্ণ; আর পূর্ণ থেকেই তো এখানে পূর্ণের উদ্ভব। নয় কি? ভিলাঙ্গনার এই পূর্ণ নদীসত্তা

কোথা থেকে এসেছে? ঐ পূর্ণ হিমবাহসত্তা থেকে। অথচ এই যে পূর্ণ নদীসত্তাকে আমরা পেয়েছি তাতে ঐ পূর্ণ হিমবাহসত্তা একই আছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণকে গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। সৃষ্টির অন্তরের এই তত্ত্বকে হিমালয়ের এই মহান স্বরূপের সামনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা খুব শক্ত নয়।

আমরাও তো একটা পূর্ণ মানবসত্তা নিয়ে জীবনের চলা শুরু করি। রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন বলেছেন —" Living things start with this wholeness from the begining of their career "। তারপর সেই পূর্ণতার সঙ্গে আরো নানা পূর্ণতা সংশ্লিষ্ট হয়-কৈশোরের, যৌবনের, প্রৌঢ়ত্বের, বার্ধক্যের। এই হলো বিকাশ। জীবনের বিকাশ। এ-বিকাশ সমগ্র সৃষ্টিতে, যা না থাকলে জীবন বা সৃষ্টির কোনো মূল্য নেই, কোন অর্থ নেই।

পূর্ণতার চির-অমিলন এই দীপ্তির সামনে দাঁড়ালে সমস্ত সত্তায় একটা সুর বেজে ওঠে, যে সুরে মনটাকে বেঁধে নিতে পারলে জীবনে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কী ক'রে বাঁধবো? সে শক্তি কোথায়? দুদিন পরে স্বস্থানে ফিরেই তো পুনরায় মূষিক হতে হবে। তখন এই সুরকে কোথায় খুঁজে পাবো?

জানিনা। তবু এখন এই মুহূর্তে সমস্ত অন্তর সেই সুরেই ভ'রে উঠলো।

শম্ভুনাথ দাস

হরমুকুট গঙ্গা

'ত্রিলোকের মধ্যে রত্নপ্রসবিণী বলিয়া পৃথিবী শ্রেষ্ঠা, পৃথিবীর মধ্যে আবার উত্তর দিক শ্রেষ্ঠ। উত্তর দিকে আবার হিমালয় শ্রেষ্ঠতম স্থান। তাহার উপর এই কাশ্মীর রাজ্যের অবস্থান হওয়ায় ইহা অপূর্ব সুন্দর বলিয়া অতীব প্রশংসনীয়।' ১।৪।৩ কল্হন্ বর্ণিত সেই অপূর্ব সুন্দর দেশের উত্তর দিকেই আমরা চলেছি, এবারের লক্ষ্য কিসেনসর-বিষেনসর হ্রদ পরিদর্শন করে চলে যাবো হরমুখ শিখরের পাদদেশে নান্দকোল গঙ্গাবল সরোবরের তীরে।

শ্রীনগর থেকে চির পরিচিত পথ ধরে হাজির হই রোদে ঝলমল সোনামার্গের সোনারাঙ্গা সবুজ প্রান্তরে। গত শীতে বরফ বেশী পরিমাণে পড়েছিল তাই জুন মাসের শেষের দিকেও দেখি এত নিচে বরফ কেটে বাস পথ বের করতে হয়েছে। পাহাড়ের উচ্চ ঢাল থেকে গড়িয়ে আসার সময় বড় বড় গাছপালাকে উপড়ে নিয়ে বরফ নেমে এসেছিল পথের ওপর। বরফের মধ্যে গাছপালা সব এখনও সজীব। ১৯৭৯ সনের ২০শে জুন আমরা সোনামার্গের বনবিশ্রাম ভবনে প্রথম রাত কাটাই। অনুচ্চ এক টিলার ওপর সুন্দর বাংলো, অদূরে থাজিয়াজ হিমবাহের বর্ণ বৈচিত্র্য আর ঢেউ খেলানো তৃণভূমি। সোনামার্গ এক সময় হিমবাহের নিচে ছিল, তারপর হিমবাহ পেছিয়ে যাবার ফলে ফেলে যাওয়া নুড়ো-পাথরের ওপর মাটির আস্তরণ পড়ে পড়ে গড়ে উঠেছে এই সুন্দর উপত্যকাটি।

পরের দিন আমাদের পদযাত্রার শুভারম্ভ। সব কিছু যোগাড় করে বাংলো ছাড়তে একটু বেলা হয়। সোনামার্গের দিকে না গিয়ে আমরা বিপরীত দিকে শিত্কবি গ্রামের কাছে সিন্ধ নালার ওপর লোহার সেতু পার হই, তারপর পাহাড়ে র ঢালে আঁকাবাঁকা চড়াই পথে শুরু হয় আরোহণের পালা। যতই ওপরের দিকে উঠতে থাকি আমাদের পিছনের দিকে সোনামার্গের দূর শোভা বিচিত্রতর রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। থাজিয়াজ হিমবাহ এখন কি বল্তাল ছাড়িয়ে দূরবর্তী জোজিলা গিরিবর্ত্মের পথও আবছা কুয়াশায় ঢাকা, এক রহস্যময় জগৎরূপে মনে হয়।

রঙবেরঙের ফুল আর সবুজ ঘাসে ঢাকা মসৃণ প্রান্তরের ওপর দিয়ে পথ

একটানা চড়াই। কোন গ্রাম নেই, মাঝে মাঝে চৌপান-গুজরদের অস্থায়ী আবাস চাখে পড়ে। কখনও কখনও ঋজু দেওদার বনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক শীর্ণকায়া ঝরনা ধারা। হীরামন পাথরি ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি গল্‌ওয়ান পাথরির দিকে। চড়াইয়ের প্রথম পর্বের সমাপ্তি হয় লক্ষীবনের শেষে এক বিশাল তৃণভূমির প্রান্তে এসে। জায়গাটার নাম শক্‌ধর। এক কোণে একদল গুজর ইতিমধ্যে তাদের অস্থায়ী আবাসে হাজির হয়েছে। কিছুটা উপরের দিকে পাহাড়ের ঢালে গাছপালা তুষারাবৃত। আমরা প্রায় হাজার দশের ফুটের কাছাকাছি চলে এসেছি।

২২শে জুনের পথ প্রথম দিকটায় ছিল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তারপর নিচ্‌নই ধারার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলি তুষারে ঢাকা নদীর ওপরে। ডাইনে পড়ে থাকে বৃশকা পাথরির চারণভূমি। তুষারাবৃত নিচ্‌নই নালার ওপর দিয়ে অপর দিকে চলে যাই। মাঝে মাঝে শুকনো নালার অগভীর খাত পেরিয়ে পেরিয়ে হাজির হই নিচ্‌নই শিবিরস্থলীতে(১১৯০০)। এ পথে লেজকাটা ইঁদুর দু'একটা দেখা যায়। শেষে আবার হাজির হই তুষারাবৃত এলাকার প্রান্তে। বরফের ওপর দিয়ে একটানা প্রায় দু ঘন্টা চলার পর উপস্থিত হই নিচ্‌নইবর গিরিবর্ত্মের শীর্ষ বিন্দুতে(১৩৩৮৭)। এখনও ভেড়বকরীওয়ালারা এ পথের ওপর দিয়ে যায়নি, তাই সঠিক কোন পথ রেখা পাওয়া যায় না। পাঁচটি ঘোড়া আমাদের মালপত্র বইছে। এমন তুষারাবৃত পথ চলতে তাদের রীতিমত অসুবিধা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পা বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সহিসরা তাদের 'গুর' সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াকে এরা 'গুর' বলে এবং তাদের জীবনধারণের অন্যতম আয়কারী প্রাণী হিসাবে গুরের মূল্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সবসময়েই তারা ভীত, কোনো সময় বুঝি তাদের 'গুর' গড়িয়ে গিয়ে অঘটন না ঘটায়। উৎরাই পথে ঘোড়া আর সহিসরা তর তর করে নেমে নেমে যায়, আমরাও দ্রুত তালে নেমে যাই। বরফ শেষ হলেও বাধার শেষ নেই। এবার এক নদী পার হতে হবে। একে হিমশীতল জল তায় খরস্রোতা ধারাটি বেশ গভীর। শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার লেজ ধরে কেউ কেউ নিরাপদে নদী পার হয়ে যায়। তারপর নদীর ধার দিয়ে পথ। কাদা জলে পিচ্ছিল এলাকা শেষে পুষ্পশোভিত প্রান্তে এসে দাঁড়াই। কিসেনসর-বিসেনসর দেখা পাওয়া না গেলেও হ্রদদুটির পেছনের দিকে কিসেনসর-বিষেনসরের শিখরদুটি হালকা তুষারের নামাবলি গায়ে

এক বিচিত্র দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত। সেদিনের যাত্রা বিরতি ঘটে বিষেনসর থেকে আগত ধারার ধারে এক সুবিশাল তৃণভূমির মাঝে। জায়গাটির উচ্চতা বারোহাজার ফুটের ওপর।

আমাদের গাইড আর ঘোড়াওয়ালারা সন্ধ্যা থেকেই আগামীপথের ভয়াবহতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলছে। কিসেনসরের মাথায় গাডসরের গিরিবর্ত্মটি শুধু তুষারাবৃত নয়, হ্রদ থেকে গিরিবর্ত্মের পথের ঢাল প্রায় সত্তর ডিগ্রী হবে। সবটাই হালকা তুষারের আস্তরণে মোড়া। ঘেড়ো নিয়ে যাওয়া মারাত্মক হতে পারে কারণ যে কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে গেলে তাদেরকে রোখা দুস্কর। ঠিক হয়. কাল সকালে সরেজমিনে সব কিছু দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ভোর বেলায় বেরিয়ে পড়ি। গাইড আর সহিসরা সোজা গিরিবর্ত্মের দিকে আর আমরা বিষেনসর হ্রদ (১২৫০০´) পরিদর্শন করে ওপরের ধাপে কিসেনসর হ্রদদের (১৩০০০´) দিকে যাই। বিষেনসর আধা বরফ যুক্ত। সুবিশাল হ্রদের বুকে শুধুমাত্র তুষার চাঁই ভাসছে না তীরের দিকে জলের ওপর একটা বরফের আস্তরণ রয়েছে। তীব্রগতিতে একধার দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। গভীর হ্রদের জলে মাছও দেখা যায়। কিসেনসরের দৃশ্য অন্য। হ্রদ সম্পূর্ণ তুষারাবৃত, মাত্র একধারে কয়েক ফুট এলাকা জল দেখা যাচ্ছে। জলের পরিমাণ বাড়লে ঐ পথ দিয়েই জলধারা বিষেনসরে গিয়ে পড়বে। কিসেনসরের তীরভূমি তুষারে তুষারে ধপ্‌ধপে সাদা এবং প্রভাতী আলোয় ঝলমল করছে। উজ্জ্বলিত আলোর ঝরনা ধারায় উদ্ভাসিত দিগ্‌দিগন্ত। তুষারাবৃত ঢালে বরফ কেটে এগিয়ে চলি গিরিবর্ত্মের দিকে। কিছুদূর যাবার পর ফিরে আসি। মানুষের পক্ষে ঝুঁকি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও ঘোড়ার পক্ষে এপথ নিরাপদ নয়। ঠিক হয় আবার নিচ্‌নই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নেমে যাবো সোনামার্গের দিকে। ফিরতি পথে প্রথম রাত কাটে নিচ্‌নই শিবিরস্থলীতে এবং দ্বিতীয় দিনে দুপুরের আগেই নেমে আসি সোনামার্গে। অপরাহ্নের বাসে করে কঙ্গান এবং বাস পালটিয়ে বিকেলের মধ্যে ওয়ানগাট (৬০০০´)। বাস আপাতত ওয়ানগাট পর্যন্ত এলেও নরনাগ পর্যন্ত আরো মাইল তিনেক পথ নির্মাণ সম্পূর্ণ। বাস স্টপের কাছে কয়েকটি দোকান ঘর। সেখানেই আশ্রয় পাওয়া যায় এবং কুলি সংগ্রহ করা যায়। আগামী কাল সকালেই শুরু হবে আমাদের হরমুকুট গঙ্গা পথে শুভযাত্রা।

গঙ্গাবল থেকে আগত ধারাটি বর্তমানে ওয়ানগাট নালা রূপে কথিত। রাজতরঙ্গিনী ও নীলমত পুরাণে এটাই ছিল 'কনকবাহিনী' বা 'হরমুকুটগঙ্গা' রূপে চিত্রিত। ধারাটি কঙ্গানের কিছু নিচে সিন্ধুনালার সঙ্গে সন্মিলিতা। সঙ্গম পবিত্র, প্রাচীন যুগে সেই পবিত্র সঙ্গম থেকে এক ধর্মীয় শোভাযাত্রা ভাদ্রমাসে আরম্ভ করতো। বর্তমান হরমুখ শিখর (১৬৮৭২) বর্ণিত হয়েছে শিবালয় কৈলাস রূপে। সেই হরমুখের পাদদেশের হ্রদটি কোথাও কোথাও 'উত্তর মানস' এবং আগত ধারাটি 'উত্তর গঙ্গা' রূপে কথিত। কল্হন অসাধারণ প্রতাপশালী কাশ্মীররাজ গোনন্দ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'উত্তর দিক্ গঙ্গারূপ বসনধারিণী হইয়া কৈলাস পর্বতরূপ হাস্য বিকাশ করিতে থাকিয়া ভোগ্যা নায়িকার ন্যায় সতত তাঁহার সেবা করতেন।' ১।৫৭।। যাত্রীরা হরমুকুট গঙ্গা তীর্থ যাত্রার ফিরতি পথে বর্তমান ভূত্শের উৎরাই পথে নেমে আসতেন নরনাগের সুপ্রসিদ্ধ ভূতেশ্বর শিব মান্দির প্রাঙ্গনে। সেখানকার নরনাগ ঝরনায় তর্পণাদি সমাপন করে তীর্থযাত্রার সফল পরিসমাপ্তি ঘটতো। এই তীর্থযাত্রাকালে বহু যাত্রী তাদের পিতৃপুরুষদের অস্থি বা ভস্মাবশেষ বহন করে নিয়ে গঙ্গাবলে নিক্ষেপ করিতেন। আগেকার দিনে যাত্রাশুরু হত ছাতারকুল থেকে এবং পরিসমাপ্তি হত নরনাগে এসে। বর্তমান যুগে কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাওয়ায় গঙ্গাবল যাত্রায় তেমন কোনো বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। নিয়ম রক্ষার জন্য সীমিত সংখ্যক ব্রাহ্মণপন্ডিত প্রাচীন প্রথানুসারী পথে যাত্রা করলেও উৎসাহী পথযাত্রীরা ওয়ানগাট-নরনাগ ভূত্শেরের পথেই যাত্রা করে থাকে। সকালবেলায় ওয়ানগাট ছেড়ে দেড় ঘন্টার মধ্যে আমরা নরনাগে উপস্থিত হই। একটা বেশ বড় এলাকা জুড়ে যে নরনাগ ভতেশ্বর শিবএর বিশেষ প্রভাব ছিল তা এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ দেখে বেশ বোঝা যায়। শিব মন্দিরটিকে কোন রকম করে দাঁড় কারাবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মৃত্যুর দিন গুনছে। পুরোহিত পান্ডাও নেই, ভক্তজনেরও অভাব। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নীল সাইনবোর্ড থাকলেও কোনো লোকজন না থাকায় এলাকাটি ভেড়া বকরী চড়াবার মুক্ত অঙ্গন রূপে ব্যবহৃত। ধূলি ধূসরিত অতীত ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ছেড়ে বর্তমানের মুখোমুখী হই। সামনেই পাঁচহাজার ফুটচড়াই তায় রীতিমত খাড়াই। ওয়ানগাট থেকে আসার সময় শীর্ষদেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু পাদদেশে এসে পাহাড়ের মাথা আর

দেখা যায় না। দীর্ঘ পাঁচঘন্টা একটানা চড়াই ভেঙে দুপুরের পর পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়াই। এ পথে একফোঁটা জল কোথাও পাওয়া গেল না। মাঝে মাঝে পথ ছায়া সুশীতল হলেও শেষের দিকে রুক্ষ পাথুরে এলাকা পার হওয়া বেশ পরিশ্রম সাপেক্ষ। পাহাড়ের মাথায় এসে বৃক্ষসীমা প্রায় শেষ হলেও বাকী পথের ধারে উচ্চ হিমালয়ের বৃক্ষরাজি দেখা যায়। জলের সংবাদ যা পাওয়া গেল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। আরো মাইল খানেক চলার পর একটা ঝরনা পাওয়া যাবে। পাহাড়ের গা বেয়ে পাহাড়কে বেড় দিয়ে এগিয়ে চলি। পথরেখা সুচিহ্নিত। শেষে বাঁকের মুখে এসে থমকে দাঁড়াই, সামনেই হরমুকুট বা হরমুখ শিখর। পড়ন্ত রোদের সোনা রঙে মুকুট ঝলমল করছে। পূর্বদিকটা খাড়াই প্রায় পাঁচহাজার ফুটের ওপর। মাঝে ফুটিফাটা হিমবাহ ঝুলন্ত অবস্থায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে বুঝি ভেঙে পড়বে। এদিক থেকে কেউ হরমুখ শিখরে আরোহণ করে না। বলা যেতে পারে হরমুখের পূর্ব দিক থেকে আরোহণ অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।

আমরা দ্রুত পদে এগিয়ে চলি। ডানদিকে একটা ধারার পাশ দিয়ে পথরেখা নেমে গিয়েছে আর একটি বড় ধারার দিকে। বড় ধারাটির অপরতীরে বেশ কিছুটা ওপরে ট্রানকলের বাংলোটি ছবির মত সুন্দর দেখায়। কুলিরা তখনও এসে পৌঁছায়নি। তাই আমরা বাংলো ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি হরমুখের দিকে। সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া প্রান্তর আর তার মাঝেমাঝে রঙ বেরঙের ফুল। অলির গুঞ্জন আর হিমেল পরশ শীতের হাওয়া। বড় ধারাটির বুকের ওপর পাথরের বোঝা, নিচে দিয়ে জল বয়ে গেলেও পার হওয়ার কোন অসুবিধা হল না। তারপর সবুজ কার্পেটের ওপর দিয়ে সে রাতে আশ্রয় মেলে ট্রানকলের বাংলোতে(১১০০০´)। দোতল বাড়ি, ওপরের ঘরে সকলের শোবার মত জায়গা হয়ে যায়। কাঁচের জানালা দিয়ে রাতের হরমুখের শোভা অনন্য সাধারণ। নক্ষত্র খচিত চন্দ্রাতাপের নিচে চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ আলোয় হরমুকুট অসামান্য এক উন্নত শির শিখর।

২৬শে জুন সকালবেলায় আমরা হরমুখের দিকে যাত্রা করি। ঝুলন্ত হিমবাহের ঠিক নিচেই নান্দকোল সরোবর (১১৫০০´)। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা নান্দকোল পৌঁছে যাই। গোলাকৃতি হ্রদটি স্ফটিক স্বচ্ছ জলে টলমল করছে। হরমুখের দিকে বিস্তৃত তুষার ভূমি আর ঠিক তার বিপরীত দিকে আমরা দাঁড়িয়ে। হ্রদের জল তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে। সেই ধারা পার হয়ে অপর দিকে যেতে হবে, তবেই গঙ্গ

াবলের দর্শন পাওয়া যাবে। ফিরতি পথে আমরা নান্দকোলকে পবিক্রমা করে হরমুখের পাদদেশের তুষার ভূমির ওপর দিয়ে ট্রানকলে যাই। কারণ বিকেলের দিকে জলের পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে ধারা পার হওয়া নিরাপদ নয়। যাইহোক, আবার কিছুটা ওঠার পর চোখের সামনে গঙ্গাবলের (১১৭২০) সুবিশাল চেহারা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। পাঁচ মাইল পরিধি যুক্ত গঙ্গাবল কাশ্মীর হিমালয়ের এক অন্যতম সুন্দর হ্রদ। তীরভূমির বরফ এখনও গলে শেষ হয় নি। মাঝে মাঝে যেখানে বরফ মুক্ত সেখানে বিচিত্র রঙের ফুলের মেলা। এত তীব্র রঙ উজ্জ্বল কান্তি ফুলশোভা আগে দেখিনি, মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। ঋজু হরমুখের সৌম্য শান্ত চেহারা এক নির্মল পবিত্র পরিবেশ রচনা করে। একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে নিয়মিত পর্বতারোহণের বহু পূর্বে প্রখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত এম,এ, স্টাইন, যিনি রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদ তথা প্রাচীন কাশ্মীরের হারিয়ে যাওয়া নদ-নদী-জনপদ-তীর্থ সমূহকে ইতিহাসের আলোকে প্রতিষ্ঠা করে বিখ্যাত হন, তিনি ১৮৯৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হরমুখ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তবে তিনি গঙ্গাবলের দিক থেকে আরাহণ করেন নি। বান্দীপুর হয়ে এরিন উপত্যকা পথে দুধাখুট গিরিপথের পরে মিঃ স্টাইন ধাপে ধাপে উঠতে থাকেন শিখর শীর্ষদেশে। একজন মুসলমান কুলিসহ তিনি হরমুখ শিখরে (১৮৮৭২) আরোহণ করেন। পন্ডিতদের ধারণা কেউ শিবভূমি হরমুকুট-কৈলাসে আরোহণ করতে পারে না এবং মিঃ স্টাইনের দাবীকে তাই তারা সংস্কারের বশে সন্দেহ করে।

পরের দিন আমরা ভূতশেরের উৎরাই পথে নেমে আসি ওয়ানগাটে। কাশ্মীরের এক অন্যতম সুন্দর উপত্যকা রূপে খ্যাত হবার সব রকম বৈশিষ্ট্য এই উপত্যকার আছে। সুবিস্তীর্ণ উপত্যকাটি ফলে ফুলে, শস্যে পরিপূর্ণ। প্রাকৃতিক শোভার তুলনা নেই। যে সব যাত্রীরা সোনামর্গের দিকে যান ওয়ানগাট উপত্যকা তাদের চোখের বাইরে থেকে যায়। 'হরমুকুট গঙ্গা' পদযাত্রার পথে ওয়ানগাটের উদাস করা উদ্দাম সৌন্দর্য যে কোন পথিক মনকে উদ্দীপ্ত করবেই।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

কুয়ারি গিরিদ্বার

আশ্চর্য, চমৎকার ঘুম হল সেই রাতে। আর কার কি হয়েছিল জানি না, এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল আমার।

ভোরে অর্থাৎ তখনো রাতের রেশটুকু শেষ হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে আমাদের তুলে দিয়েছিল বীর সিংরা। বাবুজী. জলদি কিজিয়ে।

চারপাশে তখনো অন্ধকার। টর্চের ফোকাস মেরে ঘড়ি দেখলাম ভোর ছটা। এত ভোরে এই পাহাড়ের ঠান্ডার মধ্যে কখনো ওঠা যায়!

কিন্তু না উঠে উপায় নেই। কুয়ারি গিরিপথের শোভা যদি উপভোগ করতে হয়, তাহলে সূর্য ওঠার আগেই পৌছানো দরকার। সূর্য যতক্ষণ না ওঠে ততক্ষণ আকাশ পরিষ্কার থাকে। সূর্য ওঠতে শুরু করলেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। পাহাড়ের মেঘ আর যাই করুক গিরিচূড়াগুলোকে ঢেকে ফেলে।

বীর সিং বারবার করে বলছিল,কুয়ারি পাসের শোভা যদি দেখতে চান, জলদি করুন বাবুজী।

উঠে পড়তে হল। তাঁবুর বাইরে বেরুতেই বুঝতে পারলাম, আকাশ আবার বিলকুল পরিষ্কার হয়ে গেছে। গতকাল সন্ধ্যার সেই আকাশ আর এখনকার এই আকাশে কোন মিল নেই। ঝকঝক করছে চারপাশ। কিন্তু ঠান্ডাটা যেন আরো জমিয়ে বসেছে।

তত্ক্ষণে লাল সিংও চা বানিয়ে ফেলেছিল। চিনিহীন চা। গ্লাসে চা ঢেলে দিয়ে গেল রাম সিং। কেটলিতে আলাদা করে গরম জলও রেডি। কেউ যদি জঙ্গলের দিকে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য করতে চায়, গরম জলও নিয়ে যেতে পারে। লাল সিংয়ের সার্ভিসের তুলনা নেই।

তাঁবু ছেড়ে আমরা বেরুতেই বীর সিং তাঁবু গুটিয়ে ফেলার কাজে হাত লাগাল। মাল গোছগাছ করে খচ্চরের পিঠে চাপাতে শুরু করল খচ্চরওয়ালা। আমরাও দ্রুত তৈরি হয়ে নিতে চেষ্টা করছিলাম। তবু ডাকওয়ানি ছেড়ে যাত্রা শুরু করতে সকাল সাড়ে সাতটাই বেজে গেল।

বীর সিং বলল,বাবুজী, এই সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমাদের কুয়ারিতে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। মৌসুম আজও ভাল যাবে না বাবুজী। যে কোন সময়ে আবার সব কিছু মেঘে ঢেকে যেতে পারে।

খচ্চরওয়ালা তখনও মাল বাঁধাছাঁদা করছিল,বীর সিং বলল, চলুন বাবুজী আমরা উঠতে থাকি।

পিলঘুন্টার চড়াই ভাঙা শুরু হল আমাদের। একেবারে ন্যাড়া পাহাড়, গাছ গাছগাছালির চিহ্ন নেই। কোথাও কোথাও শুকনো পাথরেই যেন ঘাস গজিয়েছে। টানে ছেঁড়া যায় না,ভীষণ শক্ত!

চারপাশে কেবল পাথর আর পাথর। কোথাও কোথাও ঝুরো ঝুরো। পা ছোঁয়ালে ঝুর ঝুর করে গড়াতে শুরু করে। সাবধানে পা ফেলতে হয়। কখনো বা ঝুঁকে ঘাসের গোছা ধরে এগনো ছাড়া উপায় থাকে না।

এইভাবে খানিকটা ওঠার পরই মনে হল, এ তো বড় কঠিন ঠাঁই দেখছি। না আছে রাস্তা, না আছে তরতর করে ওঠার মতো পরিস্থিতি।

বীর সিং পাহাড়ী ইঁদুরের মতো খানিকটা খানিকটা ওঠে আর আমাদের দিকে তাকায়। বলে, আগে ওপরে ওঠার পায়ে চলা একটা রাস্তা ছিল বাবুজী। ধ্বস নেমে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এভাবে কসরৎ করে ওঠা ছাড়া উপায় নেই।

বারে বারে নির্দেশ দেয় বীর সিং,ওদিকে নয় এপাশে পা রাখুন, ওই যে ঘাস দেখছেন, ওখানে।

দম বেরিয়ে আসে উঠতে। ডাকওয়ানির সেই ঠান্ডাটা নিমেষে যেন উধাও হয়ে গেছে। পাহাড়টা এত খাড়াই যে সোজা হয়ে দাঁড়ানোও যায় না মাঝে মাঝে। অথচ ওই তো পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে আয় আয়। উঠে আয়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আটটা বেজে গেছে। অথচ পাহাড়ের সিকি ভাগও ওঠা হয়নি।

ওদিকে সত্য,বিমল,অজিত,সুরোনাথ সাঁ সাঁ করে অনেকটা উপরে উঠে পড়েছে। দেখে কেমন হিংসা হয়। সুরোনাথই উপর থেকে চেঁচায়, কি হল, অত আস্তে উঠলে বিকেল হয়ে যাবে যে।

তা হোক, উপায় নেই আমার। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে একবার একটু পা পিছলালেই হল, আর দেখতে হবে না। একেবারে গড়াতে গড়াতে কুই গাধেরা অবধি চলে যেতে হবে।

ধীরে ধীরেই উঠি। কাছাকাছি প্যানা, গান্ধী আর মনাও রয়েছে। মনা বলে,জীবনে আর তোমাদের সঙ্গে বেরুব না। বাপরে এত কষ্ট শরীরে সয়!

এ কথা তো প্রতিবারই শুনে আসছি মনাদা। অন্যবার যখন আবার কোন স্পট ঠিক হবে, তখন তুমিই সবার আগে খাতায় নাম লেখাবে।

মনা বলে, আর না। এই শেষ।

আমরা ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। সাবধানে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠেছিলাম, ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা বেজেছে,আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমতে শুরু করল। মেঘই তো, নাকি কী ওগুলো।

মেঘই। কেমন মুখ শুকিয়ে আসে। মেঘের দিকে তাকালে পাহাড়ের রাস্তায় মন খারাপ হবেই। শেষ পর্যন্ত আমাদের এ কদিনের পরিশ্রম সবই বুঝি বৃথা গেল। এত কষ্ট করে কুয়ারি গিরিপথে উঠে গিরিচূড়াগুলো বোধ হয় দেখা হল না। অথচ কুয়ারি গিরিপথে গিরিচূড়াগুলো না দেখা হলে এত কষ্ট করার কোন মানেই হয় না।

কিন্তু তখন আর আকাশের কথা ভেবে লাভ নেই। উঠতেই হবে। এগোতেই হবে।

এগোতেই থাকি আমরা।

আরো বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। আরো বেশ খানিকটা উঠেছিলাম, অজিতরা উঠে পড়েছিল প্রায় তিন পো ভাগ। এমন সময় সত্যি সত্যি মেঘ জমতে শুরু করল আকাশে। জমাট বাঁধা কুয়াশার মতো। মেঘ না কুয়াশা ওগুলো। কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এই ছিল কপালে!

কিন্তু তখন আর আকাশের কথা ভেবে লাভ নেই। বৃষ্টি হোক আর নাই হোক, পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখা যাক, আর নাই যাক, উঠতে তো আমাদের হবেই।

আকাশের দিকে তাকাই আর ধুঁকে ধুঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকি।

শেষ পর্যন্ত আমরাও যখন প্রায় তিন পো-টেক উঠেছি, অজিত, সুরো,

বিমল আর সত্য তখন একেবারে উপরে উঠে পড়েছে। নিধেকেও দেখা গেল উপরে উঠে দু' হাত তুলে দাঁড়িয়েছে। যেন রাজ্য জয় করে ফেলেছে।

ওদের দেখে গতি আমরা আরো বাড়াবার চেষ্টা করি। বীর সিংও উৎসাহ দেয়, উঠ্‌ন বাবুজী, আউর থোড়া।

শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘন্টা দুয়েক লেগে গেল চড়াইটা ভেঙে কুয়ারি পাসের উপরে উঠে দাঁড়াতে। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নয়।

কুয়ারিতে উঠেই অপূর্ব দৃশ্য। চোখের সামনে যেন একটা স্বর্গদুয়ার খুলে গেছে। যেন পৃথিবীর ছাদের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে কেবল বরফ আর বরফ। কোন গাছপালা নেই, ফাঁকা বরফের জমি। মাঝে মাঝে গেরুয়া, কালো নানান রংয়ের সব বিশাল বিশাল পাথর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোথাও সোনালি বর্ণের ঘাসের গোছা। আর আকাশের দিক থেকে নানান বর্ণের মেঘ যেন স্থির হয়ে ঝুলে রয়েছে চারপাশে। দূরের গিরিচূড়াগুলো সবই আড়ালে চলে গেছে সেই মেঘের।

বীর সিং বলল, নসীব খাবাপ বাবুজী, মেঘের জন্য চারপাশে শৃঙ্গগুলি সব ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা যদি ভোর ছ'টায় এখানে এসে পৌঁছতে পারতাম তাহলেও ওই চূড়া দেখা যেত কিনা সন্দেহ হচ্ছে বাবুজী। কাল রাত থেকেই মৌসুম গড়বড় করে ফেলেছে। শেষ রাতের দিকে আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছিল, কিন্তু ভোরে যে আবার এরকম হবে এই ভয়টাই করছিলাম।

কুয়ারিতে সারা বছর বরফ থাকে না। আসলে আমরা কলকাতা থেকে বেরুতেই দেরি করে ফেলেছি। আপসোস হতে থাকে, পুজোর আগেই কেন বেরিয়ে পড়িনি।

অক্টোবরের শেষদিক থেকেই বরফ জমতে থাকে কুয়ারিতে। সেই বরফই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ বরফ থাকে সারাটা শীত। এপ্রিল-মেতে আবার বরফ গলা শুরু হবে। তারপর থেকে সারা বছর ন্যাড়া পাহাড়।

অবশ্য পুজোর আগে বেরুলেই যে এখানে এসে গিরিচূড়াগুলো স্পষ্ট সব দেখতে পেতাম এমনও কোন ভরসা নেই। পাহাড়ের মরসুম সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না। এই এখন মেঘলা হয়ে আছে, আবার হয়তো ঘন্টা দুয়েক পরই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিংবা হয়তো টানা কয়েকদিন এ রকম

মেঘলাই থাকবে।

কুয়ারি গিরিপথের ওপর উঠে ঠান্ডাটা টের পাইয়ে দিচ্ছিল। বিশ্রাম করার জন্য খানিকক্ষণ সময় নিলাম। ছবি তোলারও হিড়িক পড়ে গেল। মুহূর্তগুলো ছবিতেই বেঁধে রাখা ছাড়া উপায় কি। এই ঠান্ডাতেই বরফের ওপর দিকে এবার আমাদের হাঁটতে হবে। প্রায় দু'কিলোমিটার পর্যন্ত কুয়ারির এই গিরিপথ। চকচক করছে সাদা, বরফে ঢাকা। এরই মাঝে কোথাও কোথাও ছোটখাট বেশ কষ্টকর চড়াই আর উতরাই। গোটা পথটাই যেন চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল।

বীর সিং তাড়া লাগায়, কুয়ারির ওপর বারিষ নামতে পারে বাবুজী। পাগল্‌া ঝড়ও উঠতে পারে। এখানে কিন্তু আশ্রয় নেওয়ার জায়গা পাওয়া যাবে না বাবুজী। তাই এখনই আমাদের দু-তিন কিলোমিটার পার হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু যতই তাড়া লাগাক বীর সিং, এই অপূর্ব দৃশ্য ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছেকরছে না। এখানেই তাঁবু খাটিয়ে একটা দিন কাটিয়ে যাওয়া যায় না?

যাবে না কেন, র‍্যাশন তো প্রায় খতম। পেটে কিল মেরে যদি থাকতে পার, থেকে যাও।

র‍্যাশন থাকলেও যে এখানে রাত কাটানো যেত, তা মনে হয় না। বীর সিংই বারণ করে। রাতে এখানে বরফ পড়া শুরু হলে খুব তখলিফ হবে বাবুজী। টুরিস্টরা এখানে কেউ রাত কাটায় না। রাত যদি কাটাতেই হয়, কুয়ারির পাস ছাড়িয়ে নিচের দিকে জঙ্গল পাবেন সেখানে থাকতে পারেন।

না না, আর থাকাথাকি নয়, আট-ন'দিন ধরে একটানা পাহাড়ে ঘুরছি, আর নয়।

অগত্যা আবার হাঁটা শুরু হল আমাদের। আকাশে মেঘের দিকে তাকাই আর হাঁটি। কখনো কখনো বরফের কাদা,কখনো বেশ পেছল। পা পিছলে যায়। ঘাসের গোছা ধরে এগোতে হয়। এখানতার এই শুকনো সোনালি রংয়ের ঘাস নারকেলের দড়ির চেয়েও কোন অংশে কম শক্ত নয়। ঘাসগুলিই যেন মাঝে মাঝে আমাদের বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছিল।

কুয়ারি পাসটা পুরোপুরি পার হতে সময়েলেগে গেল ঘন্টা দেড়েক। এরপরই শুরু হয়ে গেল ঢাল। বড় বড় পাথরের চাঁই আর ঢাল। প্রায় মাইল দুয়েক পেরিয়ে এসে বরফের পালা শেষ। শুরু হয়ে গেল আবার জঙ্গল। গভীর জঙ্গল।

কুয়ারি পাস থেকে তপোবন পুরোটাই ঢাল। তপোবনের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট, অর্থাৎ কুয়ারি ঢাল বেয়ে প্রায় সাত হাজার ফিট নামা।

ঢালে হাঁটতে বেশ ভাল লাগে এবার। পুরো ঢালটাই গভীর জঙ্গলে ঢাকা। বিশাল বিশাল গাছ। বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি, তাতে শেওলা জমে রয়েছে। পরগাছা ঝুলছে। দেখতে বেশ লাগে।

দেখতে দেখতে ক্রমশ নেমেই চলি আমরা। জঙ্গলের চেহারার কোন পরিবর্তন নেই। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে নির্দিষ্ট কোন পথ আছে, তাও মনে হয় না। এক্ষেত্রে বীর সিংই আমাদের ভরসা। বীর সিংকেই অনুসরণ করে নামতে থাকি। শেষটা প্রায় হাজার তিনেক ফিট নামার পরে একটু থমকে দাঁড়াতে হল। জঙ্গলের ভিতরেই ভেড়াওয়ালাদের কয়েকটা খালি ঝুপড়ি পড়ে আছে। এ ধরণের ঝুপড়ি আমরা সারতলীতে দেখেছি। মনে পড়ল, এরকম ঝুপড়িব ভিতরেই কিভাবে সেই রাতটা কাটিয়েছিলাম।

বীর সিং বলল, বাবুজী এখানে বসে একটু বিশ্রাম করে নিন। এ জায়গাটার নাম খুলারা। ইচ্ছে করলে এখানে আপনারা রাতও কাটাতে পারেন।

ঝুপড়িগুলোর সামনে খানিকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার। মাঝেমাঝেই এখানে লোক আসে বা থাকে বলে মনে হল।

ভেড়া চড়াবার জায়গা তো এখানে নেই বীর সিং? ভেড়াওয়ালারা তাহলে এখানে ঘর বানাল কেন?

বীর সিং বলল, জঙ্গলের মধ্যে আরো অনেক জায়গায় এরকম ঘর বানানো আছে, পথিকরা রাত কাটায়। ভেড়াওলারাও কোথাও যেতে আসতে রাত কাটায় বাবুজী। আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে রাত কাটাতে পারেন।

রাত্রি কাটাবার আর প্রশ্নই আসে না। এবার একটু লোকালয় দেখতে না পারলে যেন আর ভালই লাগবে না। তা ছাড়া ঘড়িতে এখন প্রায় বারোটা বাজে। বিকেল বিকেল যদি তপোবন অবধি পৌঁছে যাওয়া যায়, তা হলে আজই বাসে চেপে যোশীমঠ অবধি চলে যাওয়া যাবে।

সবাই বলল, আর বসে না থেকে আজই যোশীমঠ যেতে পারলে ভাল হয়।

ফলে খুলারা ছাড়িয়ে আবার নামা শুরু হল আমাদের। জঙ্গলের সেই একই চেহারা। আর এত বিশাল ঢাল বেয়ে জীবনে কখনো নেমেছি বলে মনে পড়ে না।

নামছি তো নামছিই। নামার যেন আর শেষ নেই।

অবশেষে বেলা আড়াইটা নাগাদ নেমে এলাম তপোবনের উপত্যকায়। ঢালেরও ইতি ঘটল যেন। তপোবন তখনো এক দেড় কিলোমিটার দূরে। উপত্যকায় মেলাই বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। তপোবন থেকে বেড়িয়ে আসা একটা পাকা সড়কও চোখে পড়ল, বেশ দূরে। এই রাস্তা ধরেই যোশীমঠ হয়ে বাস বদ্রীনাথধামে যায়। বাস রাস্তাটা কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে আছে।

আমরা একটা পাহাড়ী নালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। নালার ওপারে কিছু লোকালয়, গ্রাম।

বীর সিং বলল,এ গ্রামের নাম কাচ্চি। আর নিচে ওই যে গ্রামটি দেখছেন, ওটা রায়গবি। ভিন্নদিকে আর একটা গ্রামের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, ওটার নাম তোগাসি।

কাচ্চি গ্রামের লোকজন চোখে পড়ছিল। তপোবন যেতে হলে রায়গবি ছাড়িয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে হাঁটতে হয়। পায়ে হাঁটা একটা রাস্তাও চোখে পড়ছিল।

বীর সিং বলল,বাবুজী, এখনো অনেক বেলা আছে, এই নালার ধারেই খিচুড়ি পাকিয়ে আপনারা খেয়ে নিতে পারেন। খচ্চরওয়ালাও নেমে এসেছে.

প্রস্তাবটা খারাপ নয় খিদেয় পেট জ্বলছিল। রাজি হয়ে গেলাম আমরা।

নালার জল বেশ ঝকঝক করছে কাচের মতো পরিষ্কার। ওপরের দিকে ছড়ানো কিছুটা ঘাসের জমি। নালার উল্টোদিকে একটা গম পেষাই চাকি।

ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম সবাই। আকাশটা আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কে বলবে সকালের দিকে ওই আকাশেই অত মেঘ জমেছিল। নেহাতই আমাদের কপাল খারাপ, নইলে কুয়ারির ওপর যতক্ষণ ছিলাম আকাশটা কি এরকম পরিষ্কার থাকতে পারত না!

লাল সিং ততক্ষণে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

রহস্যময় রূপকুন্ড

প্রায় আটশো ফুট খাড়া পাঁচিলের ওপর আমাদের যাত্রাস্থল। ওইখানে পৌঁছতে হবে। কী করে পৌঁছতে হবে? আদৌ পারব কিনা পৌঁছতে জানি না। জানবার আগ্রহটা যেন নিষ্ফল। শুধু একটি চিন্তা-পৌঁছতে হবে। যে পথগুলো পেরিয়ে এসেছি দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে হেঁটে, সে পথের স্মৃতি টেনে নিয়ে আসতে ভাল লাগে না।

যে-দিনগুলো কেটে গিয়েছে শুকরি-বাগচোতে ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাতে — সব যেন একাকার হয়ে গেয়েছে। সেদিনগুলোর দিকে পেছন ফিরে তাকাবার সাহস হয়নি। রাইচাঁদ চিৎকার করে হুঁশিয়ারি করেছে কতবার। পাথরের গা হড়কে পড়তে পড়তে আটকে গিয়েছি, সামলে নিয়েছি নিজেকে। এই আটশো ফুট পাঁচিলের নীচে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য সব স্মৃতি বুঝি ফাঁকি দিয়ে গেল। রাইচাঁদ হাসল-এই পথ দেখছ, মালুম হচ্ছে বহুৎ বিকট। দেখবে উঠে গিয়েছ দিব্বি। রথীন গুপ্ত দেখছিল তাকিয়ে। উপরে চনোনিয়াকোট পর্বতমালার সানুদেশে গহ্বরের কিনারা। জিউন্‌রাগলিতে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়েছে। পেছনেই ত্রিশূল সূর্যতেজে উদ্দীপ্ত। ভাস্বর। হুনিয়া থর থেকে এইটুকু পথ আসতে সময় লেগেছে সোয়া দু-ঘন্টা।

ওঠবার শুরুতেই সবার মুখে গ্লুকোজের গুঁড়ো ঢেলে দিলাম। হাতে দিলাম টক লজেন্স। প্রাণপণে চিৎকার করে রাইচাঁদ নন্দাদেবী ও লাটুদেবতার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। ওঠা শুরু হল। সর্বশেষ চড়াই, সর্বশেষ আরোহণ। এক পা কোন রকমে ফেলে আর-এক পা ফেলবার জায়গা তৈরি করতে হয়। তবু অদ্ভুত ব্যাপার-অক্লেশে উঠে যাচ্ছি তর তর করে। রথীন আর রতন সিং সকলের আগে আগে। মাঝে মাঝে পরিশ্রান্ত হলেই চিৎকার করে সাহস জোগাচ্ছে রতন সিং। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দম নেবার উপায় নেই। বেশ খানিকটা এগুতে হচ্ছে চার হাত-পা দিয়ে বেয়ে বেয়ে। একবার দেখে নিলাম আর সামান্য একটু বাকী। হয়তো চল্লিশ ফুট মাত্র। কিন্তু সামান্য পথই অসামান্য হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। তবু মনের ভেতর অদম্য উৎসাহ। নিশ্বাস ছোট হয়ে

আসছে। দরদর করে ঘাম বেয়ে পড়ছে। তবু ক্লান্তির কষ্ট নেই। বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য যেন নেই। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। আকাশে মেঘ নেই। আশেপাশে কোথাও নেই কুয়াশা। ত্রিশূলের দ্বিতীয় শৃঙ্গ থেকে নেমে-আসা হিমবাহ যেন এগিয়ে আসছে ডানদিক থেকে। বেশ পুরু করে ঢালা রুপো-গলানো। ত্রিশূলের তৃতীয় শৃঙ্গ থেকে আসা হিমবাহের বরফ যেন উপচে পড়ছে ফোয়ারার মত। তন্ময় হয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে। চোখের সামনে সব যেন মুছে একাকার হয়ে গেল। উঠে চলেছি বুঝি অনন্তকালের জন্য। ও পথচলা শেষ না হলেও যেন ক্ষতি নেই। হঠাৎ রাইচাঁদের চিৎকারে থমকে গেলাম-আ গিয়া বাবুজী।

চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিচ্ছে রথীন। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। তার সঙ্গে চেঁচাচ্ছে রতন সিং আর রাইচাঁদ সিং। সে এক অদ্ভুত অব্যক্ত আনন্দ।

নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম। হ্যাঁ, সত্যি এসেছি রূপকুন্ড। সম্বিৎ ফিরে পেলাম যেন। প্রায় একশো ফুট নীচে নীলাভ জল। চার পাশে অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত চনোনিয়াকোট পর্বতমালার পাদদেশ। তার তলদেশে রহস্যময় রূপকুন্ড। ১৯৫৯ সনে অনেক স্বপ্ন আর কল্পনায় ঘেরা। দিনের পর দিন কত ভেবেছি। সে ভাবনায়, সে আগ্রহ-ভরা দিনগুলোকে যেন ফিরে পেয়েছি এই মুহূর্তে। খাড়া একশো ফুট ছুটতে ছুটতে নেমে গেলাম। নীচে গিয়ে বেগ না সামলালে হয়তো-বা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে হত জলে। ওপর থেকে যা দেখেছিলাম, ঠিক তা নয়। জল নীলাভ নয়, ফিকে সবুজ। তার ওপর সরের মত পাতলা বরফের চাদর। এই হ্রদের নাম রূপকুন্ড।

দেহে যেন অসম্ভব শক্তি ফিরে এল। কে বলবে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি-কত চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে! ক্লান্তি নেই একটুও। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছুটে গেলাম পাগলের মত পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে। হঠাৎ থমকে গেলাম। নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখলাম।

ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। কপাল বেয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরছে। অদ্ভুত উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে থর থর করে। সে এক অব্যক্ত বেদনাবোধ। ছ শো বছর অতীতের একটি দিনের মর্মান্তিক বেদনা। এই বেদনাই বুঝি আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। দীর্ঘপথের ক্লান্তি আর বিপদকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখেছে সারা পথ। কিন্তু রূপকুন্ডের তীরে এসে এ উৎকণ্ঠার পরিসমাপ্তি হল না।

আবও নতুন কবে জেগে উঠছে যেন।

১৯৫৯ সনেব কথা আবাব মনে পডল। ৰূপকুন্ড আমাব কৌতূহল জাগিযেছিল। দিনেব পব দিন স্বপ্ন দেখে যেতাম। হিমালযেব নিভৃতে ছোট্ট হ্রদ, বাবা মাস ববফেব অবগুণ্ঠনে লুকিযে বাখে নিজেকে, সেই বহস্যমযেব স্বপ্ন। চোখেব সামনে ঢলঢলে দৃষ্টি মেলে তাকিযে আছে যেন। দেখছে, সমতল থেকে কে এক আগন্তুক এসেছে। ১৯৫৫ সনেব পব এই উৎকন্ঠা-ভবা দৃষ্টি, এই অবগুন্ঠন উন্মোচন। তবু আমাব মনে আনন্দ কোথায। প্রথম দর্শনেব সেই চিব-আকাঙ্খিত মুহূর্তটি যা দীর্ঘ এক বছব ধবে নানা কল্পনায ভবিযে বেখেছি, সে মুহূর্তটি থমকে গিযেছে কখন যেন, কোথায কোন ফাঁকে লুকিযে পডেছে সে উত্তেজনা আব কৌতূহল।

অতীতে কোন এক দুঃসাহসী পথ ভুল কবে এখানে হযতো এসেছিল। পাহাডেব নেশায বিভ্রান্ত হযে সে পেবিযে এসেছিল এই দুর্গম পথ। কাছাকাছি এসে স্তব্ধ হযে গিযেছিল ভযে ও বিস্মযে তাব বোবা দৃষ্টিব সামনে রুদ্ধ বেদনাব ইতিহাস বযেছে আত্মপ্রকাশেব অধীব আগ্রহ নিযে। সভ্য জগতে এ আগ্রহেব বার্তা পৌঁছেছিল। তাই বিংশ শতাব্দীব মানষ এসেছিল দল বেঁধে। তাদেব তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিও বুঝি ঘোলাটে হযে গিযেছিল ক্ষণিকেব জন্য। ঝাপসা হযে গিযেছিল সব-কিছু।

অজস্র বিক্ষিপ্ত পাথব। জিউনবাগানি থেকে গডিযে পডেছে ৰূপকুন্ডেব চাব পাশে। ধূসব পাথব আব তাব মাঝে মাঝে সাদা তুষাবপাতেব চিহ্ন। পাথবেব ফাঁকে ফাকে সাদা সাদা হাড। দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যায। এত হাড কেন? সত্যি কি এগুলো মানুষেব হাড। শিডদাডা, দাতশুদ্ধ চোযাল মাথাব খুলি, হাত আব পাযেব অংশ, বক্ষঃপঞ্জব। একটা দুটো নয-অজস্র। পাথবেব ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে বিংশ শতাব্দীব মানুষেব পাযেব সাডা পেযে যেন পাথবেব স্তূপ ঠেলে চাইছে বেবিযে আসতে। কী এক মর্মান্তিক দিনেব কাহিনী বলবে বুঝি?

টপটপ্ কবে ফোটা ফোঁটা জল ঝবছে। চমকে উঠলাম। ৰূপকুন্ডেব তীব থেকে তিবিশ-চল্লিশ ফুট উঠে আসা হিমবাহ তাব তলা দিযে জল ঝবছে। টপ্টপ কবে সোজাসুজি জল পডছে ৰূপকুন্ডেব ভেতব। সন্তর্পণে হিমবাহেব উপবে দাঁডালাম। ববাবেব জুতো। সন্তর্পণে পা বাখলুম হিমবাহেব উপবে।

পা হডকে গেলেই পডতে হবে কুন্ডেব ভিতবে। হিমবাহেব কাছেই

এলোমেলো বিক্ষিপ্ত পাথর। দু-চারটে পাথরের খন্ড সরানো হল। বেশ কিছুক্ষণ কসরত করে তোলা হল বরফের চাপ। চমকে উঠলাম। বরফের তলায় মানুষের কোমর থেকে পায়ের কিছু অংশ মাংসশুদ্ধ। চামড়া উঠে গিয়েছে মাঝে মাঝে। ফ্যাকাসে সাদা রঙ। পাগলের মত এলোপাতাড়ি বরফ খুঁড়তে শুরু করেছি আমি আর রথীন। দু-হাত দিয়ে বড় বড় পাথ রের টুকরো টেনে সরিয়ে ফেলেছি। আরও বেরিয়ে পড়েছে মাংসশুদ্ধ হাত-পা। মাংসের তন্তুগুলো জলে ভেজা সুতোর মত ঝুলছে। রাইচাঁদ আর রতন সিং তাকিয়ে রয়েছে বিমূঢ়ের মত। কেমন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছি সবাই। হঠাৎ কী একটা শব্দ হতেই অস্ফুট চিৎকার করে রাইচাঁদ আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দিল। রতন সিং আর রথীন লাফ দিয়ে সরে গেল হিমবাহের ওপর। জিউন্‌রাগলি থেকে গড়িয়ে পড়ল বড় বড় পাথরের ডেলা। সমস্ত মুখটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। সরে না এলে পাথরের ডেলার তলায় চাপা পড়তাম আমরা। আবার হয়তো কখন অতর্কিতে গড়িয়ে পড়বে ডেলাগুলো। তবু মনের ভেতর অদ্ভুত লোভ এসে বাসা বেঁধেছে। আবার ওখানে যেতে হবে। বরফ খুঁড়ে দেখতে হবে অনেক নীচে। ছশো বছরের অতীতের ইতিহাস, আর কী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে!

জিউন্‌রাগলির ও-পাশ থেকে মেঘ উঠছে কুন্ডলী পাকিয়ে। গাঢ় মেঘ। রূপকুন্ডের ফিকে সবুজ জলের ওপর ভেসে-বেড়ানো পদ্মপাতার মত পাতলা বরফের আস্তরণ। শান্ত স্তব্ধ হ্রদ। মাঝে মাঝে পাতলা কুয়াশায় ঝাপসা হতে চায় হ্রদের চার পাশের বিক্ষিপ্ত পাথরগুলো। ধোঁয়াটে হয়ে যায় বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা খাড়া পাঁচিলের ধূসর রঙ। চোখের পলক পড়তে চায় না। আর দৃষ্টি ফেরাতেই মন চলে যায় অতীতে। প্রায় ছ শো বছর আগের এই মৃত মানুষের দেহাবশেষ। বরফের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে, তাই আছে অবিকৃত। কাছেই পাথর-চাপা-পড়া ভূর্জপত্রের ছতোলী (ছাতা), চপ্পল.তাঁবুর খুঁটি। কারা মরেছিল এখানে? জানবার প্রয়োজন নেই আপাতত। মানুষ মরেছিল। সুস্থ ও সবল একদল নরনারী ও শিশু। তারা যে মরবে এ কথা ভাবেনি। এই দীর্ঘ দুর্গম পথে মৃত্যুর চোখে ধূলি দিয়ে এগিয়ে এসেছিল। জিউন্‌রাগলি পৌঁছেই নিশ্চিন্ত হয়েছিল নিশ্চয়ই। আর বুঝি ভয় নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যু সরে গিয়েছে বহুদূরে। মাঝে মাঝে গাঢ় কুয়াশায় চেয়ে গিয়েছে চারদিক। সূচীভেদ্য অন্ধকার আর তুহিনশীতল বায়ুপ্রবাহ। কারও

মনে সন্দেহের রেখাপাতও করেনি। এমন তো পথে অনেক জায়গাতেই হয়েছে। কতবার গাঢ় মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, ঝোড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত হতে হয়েছে হয়তো। তার জন্য ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যায়নি কেউই। কিন্তু কখন যেন এই কুয়াশা গাঢ় হয়ে ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত আকাশ। বাতাসে কী এক অদ্ভুত রহস্য। তার পর শোঁ শোঁ শব্দ। তুষারঝড় আর শিলাবৃষ্টি। ঝড়ের ঝাপটায় উড়ে গিয়েছিল তাঁবু।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে অসহায় নরনারীর দল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, মৃত্যু বীভৎস রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সবাই বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টা করে। তারাও করেছিল। অপ্রশস্ত জিউনরাগলিতে ছুটোছুটি করেছিল। মৃত্যুভয়ভীত নরনারীদের আর্তস্বর চাপা পড়ে গিয়েছিল তুষারঝড় আর শিলাবৃষ্টিতে। সামনে অন্ধকার, তিন শো ফুট গভীর গহ্বর আর তার তলদেশে অবগুণ্ঠনে ঢাকা-রূপকুণ্ড। মৃত্যুর বীভৎস রূপের সামনে এই গাঢ় অন্ধকারে-ঢাকা রূপকুণ্ডকেই ভেবেছিল সমতলভূমি। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল নীচে, একজন আর-একজনের পর। তার উপরে পাথর ও শিলাবৃষ্টি। পাথর আর বরফের তলায় চাপা পড়েও অনেকেই শেষবারের মত পাঞ্জা লড়েছিল মৃত্যুর সঙ্গে। তার পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনন্তকালের জন্য।

ছ শো বছর আগের কঙ্কালগুলো আত্মগোপন করেছিল বরফের তলায়। এই শতাব্দীর মানুষ একদিন খবর পেয়ে ছুটে এল। তারপর এক দলের পর দল। সভ্য জগতকে আমন্ত্রণ জানাল রূপকুণ্ড। এই হতভাগ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে সভ্য জগতের। সেই অতীতের দিনটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবে আজকের জগতের। তথ্যের পর তথ্যের স্তূপ। যারা জনমানবশূন্য হিমালয়ের নিভৃতে নিরুপদ্রবে আত্মগোপন করে ছিল, তাদের নিয়ে যাওয়া হল বীক্ষণাগারে। অনেক পরীক্ষা আর নিরীক্ষার নিক্তিতে ওজন করা হল। চুল-চেরা হিসেব করা হল দিনের পরদিন। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। সন্ধানীর দৃষ্টিতে আড়াল হয়ে গেল রূপকুণ্ড। মানুষের মৃতদেহ নিয়ে ইতিহাস রচনা শুরু হয়ে গেল। শেষ হয়নি আজও।

রূপকুণ্ডের ইতিহাস ঘাঁটব বলে আসিনি। তথ্যের বোঝা বয়ে বেড়াবার মত সামর্থ্য আমার নেই। রূপকুণ্ড আমায় প্রলুব্ধ করেছিল। মৃত্যুর দৃষ্টি এড়িয়ে মানুষ কেন যায় রূপকুণ্ডের পথে? কী এমন সৌন্দর্য রূপকুণ্ডের, যার কাছে বেঁচে থাকবার লোভও ফিকে হয়ে যায়! তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম এপথে। সঙ্গতিব

অভাব, অভাব ছিল সামর্থ্যের। তবু নিরস্ত হইনি। দীর্ঘ একবছর ধরে রূপকুন্ড আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

কিছু কিছু নিদর্শন কুড়িয়ে নিলাম। বাহাদুর শাহ্ আলমের তাম্রমুদ্রা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সমসাময়িক তাম্রমুদ্রা। দাঁতশুদ্ধ নীচের চোয়াল। পাথর সরিয়ে ভূর্জপত্রের ছতোলী বের করেছিলাম। তোলবার চেষ্টা করতেই ভেঙে গেল। বরফ খুঁড়ে বের করেছিলাম একপাটি চপ্পল। পরিমাপ নয় থেকে দশ ইঞ্চি। এগুলো সঙ্গে করে আনবার ইচ্ছে থাকলেও আনা সম্ভব হল না রাইচাঁদ আর রতন সিংয়ের আপত্তিতে। ওয়ান গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে কুসংস্কার। তাই এগুলো নিয়ে গেলে গ্রামে রাত কাটানো অসুবিধা হবে! রাইচাঁদ ও রতন সিংও ভূতের ভয় পায়। তাদের মত অনেকেই ভয় পায়।

১৯৫৬ সনে মে মাসে অধ্যাপক মজুমদার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে রূপকুন্ড অভিযান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথমবারের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ওই বৎসরই ২০ শে সেপ্টেম্বর তাঁরা রূপকুন্ড পৌঁছন। বরফে-ঢাকা কুন্ডের তীর থেকেবহু পরিশ্রম করে শতাধিক মাথার খুলি, পরিচ্ছদের অংশ, তাঁবু ও ছতোলীর অংশ, মেয়েদের রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কার নিদর্শনস্বরূপ নিয়ে আসেন। অধ্যাপক মজুমদার কুন্ডের তীর থেকে বাহাদুর শাহ্ আলমের রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করেছিলেন। রূপকুন্ডে এই প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিযান। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য এই অভিযাত্রীদলের পথের শেষ অংশ তুষারাচ্ছাদিত ছিল। কুন্ডের ওপরও বরফ ছিল। ফলে সংগৃহীত নিদর্শনগুলি কুন্ডের তীর থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কুন্ডের উপরে জমানো বরফের পরিমাণ জেনে অনুমান করা যেতে পারে, এই অভিযাত্রীদলের সংগৃহীত নিদর্শন কুন্ডের তীর থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট উপরের অংশ খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল।

ওই বৎসরই ভারতের নৃতত্ত্ব-বিভাগের তরফ থেকে শ্রদ্ধেয় এন.দত্ত মজুমদার পর পর দুইবার রূপকুন্ড অভিযান করেন। প্রথমবারের অভিযান ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার অভিযানে শ্রদ্ধেয় মজুমদার রূপকুন্ডে পৌঁছন। কুন্ড তখনও বরফাচ্ছাদিত। তবু তাঁর সংগৃহীত নিদর্শন প্রচুর। সমস্ত নিদর্শন কলকাতার মিউজিয়ামে নৃতত্ত্ব-বিভাগে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রয়্যাল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটির সভ্য শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রণবানন্দও ১৯৫৬

সনেই রূপকুণ্ড অভিযান করেন। জীবনের অনেকাংশই ইনি কাটিয়েছেন হিমালয়ে। তাই হিমালয়ের রহস্য তাঁর মনকে সর্বদাই প্রলুব্ধ করে। তিনিও রূপকুণ্ডে গিয়ে প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করেন। রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ডের টোপোগ্রাফি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা তাঁর মনকে রূপকুণ্ডের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে ১৯৫৬ সালের পরও ১৯৬০ সন পর্যন্ত একাধিকবার রূপকুণ্ড-অভিযান করে প্রতিবারই প্রচুর নিদর্শন নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। ওয়ান গ্রামে একাদিক্রমে দু-তিন মাস থেকে রূপকুণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যালাড সংগ্রহ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি পাত্র; অল্পবয়স্কা মেয়েদের চুল ও জটা, রুদ্রাক্ষ, মেয়েদের অলঙ্কার, বাহাদুর শাহ্ আলমের রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা।

রূপকুণ্ডের তীর থেকে পর্যন্ত কোন অভিযাত্রীই অস্ত্র, বর্ম বা শিরস্ত্রাণ কিছুই পারেননি সংগ্রহ করতে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির অনেক-কিছুই ধর্মাচরণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। ১৯৫৯ সনে উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ সম্পূর্ণানন্দের সহায়তায় স্বামীজী রূপকুণ্ড-অভিযান করেছিলেন। কুণ্ডের ওপরকার পাতলা বরফের স্তর ভেঙে নৌকা নামিয়েছিলেন গভীরতা মাপবার জন্য। এই বৎসর আমারও রূপকুণ্ডে যাবার কথা ছিল, তাই স্বামীজী ওয়ান গ্রাম থেকে আমার কাছে পত্র লেখেন রূপকুণ্ড থেকে ফিরে এসে। পরে আলমোড়া থেকে তিনি তাঁর রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন। তাঁর রিপোর্টে রূপকুণ্ডের আকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

রূপকুণ্ডের আকৃতি অনেকটা অণ্ডাকার। তার চাপা অংশের ব্যাস ১৫০ ফুট ও দীর্ঘ অংশের ব্যাস ২৫০ ফুট। কুণ্ডের ডানদিকে জিউনরাগলি কল্ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত বরফমুক্ত গিরিবর্ত্ম। নন্দাকিনী উপত্যকায় নামবার পক্ষে উপযুক্ত এদিকের একমাত্র গিরিপথ। এই গিরিপথ থেকে কুণ্ড খাড়া ৩০০ ফুট নীচে। জিউনরাগলি থেকে সর্বদা পাথর গড়িয়ে পড়ছে কুণ্ডের তীরে। তাই অনুমান করা যায়, সুদূর অতীতে কুণ্ডের পরিমাপ হয়তো-বা অনেক বড়ো ছিল। তীর থেকে কুণ্ডের মধ্যস্থলের কিছু দূর পর্যন্ত সমতল। কেন্দ্রের দিকটা ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে গিয়েছে। সবচাইতে ঢালু অংশের গভীরতা ছ ফুট। কুণ্ডের তীরে প্রায় দু-তিন ... বর্গফুট পরিমিত স্থান চিরতুষারাবৃত। অনেক অভিযাত্রী এইটিকে ... বলে উল্লেখ করেছেন। উপকূলবর্তী চনোনিয়াকোট পর্বতমালা ... চাইতে উঁচু শৃঙ্গ ... দক্ষিণ-পূর্বে জিউনরাগলি, ১৬৫৮৬ ফুট। এ শৃঙ্গও তুষারাবৃত নয়। রূপ...

সেখান থেকে ত্রিশূল পর্বতের দ্বিতীয় শৃঙ্গের হিমবাহ অনেক দূর। তার সঙ্গে রূপকুন্ডের এই হিমবাহের কোন সংযোগ নেই। রূপকুন্ডের তলদেশে যদি অবিরাম প্রস্রবণের উৎস, থেকেও থাকে, তাহলেও এই হিমবাহও কুন্ডের জলের অন্যতম উৎস। সার্ভে ম্যাপে চনোনিয়াকোট পর্বতকে ত্রিভুজ বলে উল্লেখ করা আছে। এই ত্রিভুজের কাছে বেশ একটা ডিপ্রেসন। এই ডিপ্রেসনই রূপকুন্ড। ডিপ্রেসনের কিছুটা দূর থেকেই রূপগঙ্গার উৎপত্তি। রূপকুন্ড রূপগঙ্গার উৎস। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই জলধারা সরাসরি কুন্ড থেকে বের হয়নি। রূপগঙ্গার হাজার দেড়েক ফুট নীচে পাথরের ভেতর থেকে বেরিয়েছে। কুন্ডই যদি রূপগঙ্গার উৎস হয়ে থাকে তাহলে কুন্ডের তলদেশের কিছু অংশে প্রবেশ্য শিলাস্তর রয়েছে। যে শিলাস্তর দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়তে পারে এত নিচুতে। জিউনরাগলিকে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড বলা চলা না। কারণ এই অংশ ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টির সামনের গিরিশিরার ওপর অবস্থিত। অপ্রশস্ত গিরিপথ। এ ছাড়া ত্রিশূলের দ্বিতীয় শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা হিমবাহ এই গিরিশিরার উপরে। জিউনরাগলি থেকে হাজারখানেক ফুট উঁচুতে সেই হিমবাহ এগিয়ে এসেছে খানিকটা। কিন্তু নৈসর্গিক দুর্যোগে বরফের ধস নেমে গড়িয়ে জিউনরাগলির দিকে না আসাই সম্ভব। তবু এই গিরিপথের উভয় পার্শ্বই অসম্ভব ঢালু, যার জন্য এই অপ্রশস্ত অংশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন হলে উভয় পাশের যে কোন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়া বিচিত্র নয়। আর এ পতনের অর্থ মৃত্যু।

চার ঘন্টারও বেশী রূপকুন্ডে কাটিয়েছি। কুন্ড পরিক্রমা দুঃসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। কুন্ডের তীরে পড়ে থাকা নরকঙ্কালের মধ্যে তাঁবুর বাঁশ তুলে নিয়ে কুন্ডের জলের ভেতর খুঁচিয়ে দেখেছি। জিউনরাগলি থেকে গড়িয়ে পড়া অনেক পাথর জমা আছে কুন্ডের জলে। কুন্ডের জলের ভেতর থেকে কোন অভিযাত্রীরই নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, পূর্ববর্তী অভিযাত্রীদের কেউই কুন্ড বরফমুক্ত অবস্থায় দেখেননি। জিউনরাগলিতে উঠে দেখেছি, মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূ... লসমুদ্র হিমবাহ, তার কাছেই ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। শৈলসমুদ্র হিমবাহ থেকে আরও পাঁচ ... দরে হোমকুন্ড, বড়ি নন্দজাত তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্যস্থল। পরিষ্কার দেখা যায় আবহাওয়া ... থাকলে। ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টির পাদদেশে হোমকুন্ড। স্বামীজীর কাছে শুনেছি হোমকুণ্ডে ... করবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি শুরু হয়। তার

অবশ্য কারণ, নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলের খাঁজে জমা থাকে অনেক মেঘ। হোম করলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয় দহনের ফলে। এই গ্যাস মেঘের সরাসরি সংস্পর্শে আসে যার জন্য মেঘ ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি হয়। তীর্থযাত্রীরা কিন্তু একেই স্থানমাহাত্ম্য বলে মেনে নেয়।

জিউনরাগলি থেকে রূপকুন্ডের দিকে তাকালে সাড়ে তিনশো ফুট নীচে কুন্ডকে অপরূপ দেখায়। জিউনরাগলির ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর। সন্তর্পণে না হাঁটলে পা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর, একবার পা হড়কে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে রূপকুন্ডের গহ্বরে। গহ্বরের ধার খাড়া। তাই জিউনরাগলি থেকে অবতরণ অসম্ভব। এ ছাড়া বড় বড় পাথরের ডেলা যখন-তখন গড়িয়ে পড়ে। তাই অবতরণ বিপজ্জনক। কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ এই জিউনরাগলির নীচেই : কঙ্কালে পরিপূর্ণ এলাকার পাশেই ছতোলী, তাঁবুর খুঁটি : সেখানে মৃতদেহাবশেষের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। ঝড়ে ছতোলী ও তাঁবু উড়ে গিয়ে ঠিক নীচে গিয়ে না পড়ে একটু দূরে পড়েছে : সে এলাকায় তাই কঙ্কালের চিহ্নমাত্র নেই। খুব গভীরভাবে জিউনরাগলি থেকে এই বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করলে এ ধারণা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। সাধারণত ঝড়বৃষ্টিতে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা জিনিসগুলো বাতাসে উড়ে দূরে চলে যায়।

অধ্যাপক ডি.এন. মজুমদার রূপকুন্ড থেকে সংগৃহীত নিদর্শনগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এই রূপকুন্ড-রহস্যের ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি যে সমস্ত নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলো শুধু ভারতের বীক্ষণাগারেই পরীক্ষা করে তৃপ্ত হননি। কিছু কিছু ইংলন্ডে ও আমেরিকায় বিভিন্ন বীক্ষণাগারেও পাঠিয়েছিলেন।

১৯৫৯ সনে রূপকুন্ডের নাম প্রথম শুনি। রূপকুন্ডের তীরে একদল নরনারী ও শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে বরফ ও পাথরের তলায়। কোথাকার মানুষ এরা? কেন গিয়েছিল রূপকুন্ডে? এ চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটানোর দায়িত্ব তথ্যানুসন্ধানীদের। সে দায়িত্ব নিয়ে রূপকুন্ড যাবার মত সামর্থ্য আমার নেই। সন্ধানী দৃষ্টি শুধু কার্যকারণের পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়।প্রকৃতির অপরূপ রূপসম্ভার সে দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকে। তাই তথ্যানুসন্ধানীর দৃষ্টিতে রূপকুন্ড একটি সাধারণ হ্রদ। এই হ্রদের তীরের স্তূপীকৃত নরকঙ্কালের রহস্য উদঘাটিত হলেই তথ্যানুসন্ধানীরা

ভুলতে শুরু করবে রূপকুন্ডকে।

আমার দৃষ্টি সাধারণের দৃষ্টি। লোকালয়ের কোলাহলে আমার দৃষ্টি ক্লান্ত, অভাব অভিযোগ আর হতাশায় জর্জরিত। তাই হিমালয়ের নিভৃতে এই হ্রদ আমার দৃষ্টিতে রহস্যময়। এ রহস্য রূপকুন্ডের তীরের ওই বীভৎস দৃশ্যের জন্য নয়। তীর থেকে ওই বীভৎস দৃশ্যের সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেললেও রূপকুন্ড তার রহস্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখবে। চিরকাল ডাকবে হাতছানি দিয়ে। প্রলুব্ধ করবে নতুন নতুন রূপে। আমি শুধু রূপকুন্ড দেখতে গিয়েছিলাম। তাই রূপকুন্ড দেখে এলাম। দেখে এলাম," Time which antiquates Antiquities,and hath an art to make dust of all things, hath yet spared these minor monuments."

ধ্রুব মজুমদার

তুঙ্গনাথ

কেদারনাথ থেকে নালাচটি পর্যন্ত সবটাই উৎরাই পথ। খুব খাড়া উৎরাই। শ্বাসকষ্ট হয় না বলে এবং মাধ্যাকর্ষণের আনুকূল্যে, উৎরাই পথ একটু দ্রুত অতিক্রম করা যায়। তবে শ্বাসকষ্টের শোধ তুলে নেয় হাঁটুর ব্যথা। পাহাড়ীরা একে বলে বিখ লাগা-পায়েরমে বিখ লাগ যাতা। সে যে কি জিনিস তা যিনি জানেন না তিনি বুঝবেন না।

অবিশ্বাসীর হাঁটুতে এই বিখের ব্যথাটা যে একটু বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয় সেটাও ঠিক। কিন্তু সেসবের কিছুই মনে নেই। এমনকি গৌরীকুণ্ডের উষ্ণজলে হাঁটু ডুবিয়ে যে দুর্লভ আরাম লাভ হয়েছিল সেকথাও বেবাক ভুলে গেছি।—কেদারনাথের কি মহিমা!

নালাচটির পরে আরও মাইল তিনেক উৎরাই পথ একেবারে মন্দাকিনী নদী পর্যন্ত। নদী অতিক্রম করে আবার চড়াই। যাবার সময় ত্রিযুগী ঘুরে গিয়েছিলাম তাই নালাচটি আমাদের পথে পড়েনি। নালাচটি থেকে একটা রাস্তা উখিমঠ-তুঙ্গনাথ হয়ে বদরিনাথের পথে লালসাঙ্গা বা চমৌলি চলে গেছে। এপথে সবাই যায় না। অনেকেই কেদারনাথ থেকে আবার রুদ্রপ্রয়াগে নেমে যায় এবং সেখান থেকে বাস ধরে পিপুলকোটি। তুঙ্গনাথের উচ্চতা প্রায় তেরো হাজার ফুট। কেদারনাথের প্রায় বারো হাজার ফুট থেকে নেমে এসেই আবার তুঙ্গনাথের প্রায় তেরো হাজার ফুট। নীলমণি শুধু একবার বলেছিল, 'নেলো. তোর পেটেও এত ছিল।'

নালাচটির একটা ছবি কেন জানি না, আজও খুব স্পষ্ট মনে আছে। রাস্তার ঢালের দিকটায় সারবেঁধে দশ বারোটি দোকানঘর ও চটি। সময়টা ঠিক স্মরণ নেই, তবে দৃশ্যটা সকালবেলাকারই. তেরচা হয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে-সোনার চেয়েও উজ্জ্বল আলো। গাছের ছায়ায় বা যেখানে একটু ছায়া আছে সেখানেই ঘাসের ডগায় অথবা পাহাড়ের গায়ে শিশিরবিন্দু সাদা হয়ে জমে আছে। অন্যত্র সূর্যের আলোয় শিশির গলে গেছে, চারদিকে সবুজ ঝলমল করছে।

চটিটা খুব ছোট নয়। যেসব যাত্রীর ত্রিযুগীনারায়ণ যাওয়া হয় না তাঁরা

গুপ্তকাশী থেকে সকালে রওনা হয়ে এখানে এসে রাত কাটান। পরদিন গৌরীকুন্ড যান। দোকান বা চটির চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে ব্যবসাপত্র কেদারনাথজির কৃপায় মোটামুটি ভালই চলে। দোকানের সামনে উনান জ্বলছে। তার একটা মুখে ছোটবড় নানা আকারের অন্তত আধ ডজন জলের কেটলি গুঁজে দেওয়া হয়েছে, একটা মুখে বিশাল এক লোহার কড়াইয়ে দুধ ফুটছে, অন্য মুখগুলোয় ভাজাভুজি চলছে। দোকানদার নিজেই এসব সামলান। দোকানের অন্য সব কাজ, বয়-বেয়ারার কাজ করে বাড়ির ছয় থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা। এটাই এখানকার রীতি। ঘরওয়ালীরা কেউ জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনছে, কেউ ঝরনার ধারে ডাঁই করা কাপড় কেচেই চলেছে।

একটু সাফ-সুরত করে নিলে বাচ্চাগুলোকে দেবশিশু বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। পোশাক আছে কি নেই, তাও শতচ্ছিন্ন। হাত-পা ঠান্ডায় নীল হয়ে গেছে, নাক দিয়ে ফোটা গড়াচ্ছে। ফরসা গালগুলো লাল হয়ে আছে-সিকি ইঞ্চি মোটা নোংরা ভেদ করে যেকোন সময়ে ফেটে পড়তে পারে। ওসব নিয়ে কারো এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাই ছুটোছুটি করে কাজ করছে, হাঁসফাঁস করতে করতে দূরের ঝরনা থেকে কেনেস্তারা ভর্তি জল নিয়ে আসছে, আবার নিজেদের মধ্যে খুনসুটিও করছে।

দোকানগুলোর সামনে গাছ কেটে এনে বেঞ্চি বানান হয়েছে-যাত্রী-খদ্দেরদের জন্য। তবে উনানের পৈঠায় বসতেও আপত্তি নেই। চায়ের সঙ্গে নিমকি, সিঙারা, জিলিপি, বোঁদে-শেঠজিদের যার যেমন ইচ্ছা।

তুষার রাজ্য থেকে সদ্য নেমে এসে দেখেছিলাম বলেই হয়তো নালাচটি না[illegible] সেই লোকালয়টির কথা আজও এমন স্পষ্ট মনে আছে। সেই নালাচটির বুকের উপর দিয়ে এখন বাস চলাচল করে। আমাদের সেই নালাচটি কিন্তু আজও ঠিক তেমনটিই আছে —মোটর বাস তো দূরস্থান, কোন জেট রকেটেরও সাধ্য নেই সেখানে নাক গলায়।

নালাচটির থেকে আরও মাইল তিনেক গড়াতে গড়াতে পথটি মন্দাকিনীর ধারে গিয়ে পৌঁছেছে। উতরাই-তবে হাঁটুতে সয়।

এর আগে সেই রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আমরা যে ধরনের রাস্তায় হেঁটেছি এই রাস্তাটি তার থেকে একটু স্বতন্ত্র। এই রাস্তায় যাত্রী চলাচল অনেক কম। তুঙ্গনাথের

বাড়তি ঝুঁকি অনেকেই এড়িয়ে যান-কেদার-বদরিটাই তো আসল। যাত্রী সমাগম কম বলেই রাস্তাটির চেহারা আর চরিত্রও একটু অন্যরকম।

রাস্তাটি খুবই সংকীর্ণ। চওড়ায় কোথাও এক ফুটেরও কম, কোথাও আড়াই ফুটের বেশি নয়। পাথর আর মাটির রাস্তা, পীচের প্রসাধন নেই। রাস্তার দুই দিকে যাকে বলে নিবিড় অরণ্য। রাস্তার গা ঘেঁসে দুধার থেকেই বিশাল বিশাল গাছ পাহাড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। ছায়াচ্ছন্ন পথ মাঝে মাঝে একটু রোদের ঝিলমিল। সে এক মধুময় ব্যাপার।

এর আগেও রাস্তা খুব সুন্দর ছিল, খুব রোমান্টিক ছিল। সেটা হল গিয়ে মহাপ্রস্থানের পথ। ওই পথের সামনে দাঁড়ালেই চলার জন্য পায়ের তলা উসখুস করতে থাকে। কাব্যি নয়, হিমালয়ের তীর্থপথে গিয়ে পড়বার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা সবাই এটা জানেন। পথটা চব্বিশ ঘন্টা চোখের সামনে প্রসারিত হয়ে আছে। চটিতে আশ্রয় নিয়েও শান্তি নেই, চটি তো দু ঘন্টার। ওই রাস্তার মেজাজটাই ওই রকম-খালি চলো, আর চলো।

এই রাস্তায় তেমন কোন তাড়াহুড়ো নেই। তুঙ্গনাথ তো আর কেদার-বদরীর মতো ডাকসাইটে তীর্থ নয়, রাস্তার মেজাজটিও তাই বেশ ঢিলেঢালা। চলতে চলতে এই হারিয়ে যাচ্ছে, এই আবার সামনে হাজির।

মন্দাকিনীর পর আবার মাইল চারেক চড়াই। বেশ খাড়া চড়াই-তবে দম নিয়ে নিয়ে উঠে যাওয়া যায়। তারপরে উখিমঠ।

শ্রীকৃষ্ণের ছেলে অনিরুদ্ধ নাকি উষাকে হরণ করে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সুশীলবাবু বললেন,'হবেও বা। কার ছেলে দেখতে হবে তো। হরণ করে এমন জায়গায় এনে রেখেছিলেন যে কাকপক্ষী তো দূরস্থান, লালবাজারের গোয়েন্দারাও পাত্তা খুঁজে পেত না।'

তবে উখিমঠের প্রধান মন্দিরটির স্থাপত্য বিন্যাসে রাজপ্রাসাদের ছাপ আছে। সামনে সুরম্য প্রাচীরবেষ্টিত সুপ্রশস্ত বাঁধানো আঙিনা, ছোট ছোট ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে, বড় বড় থাম, বড় বড় ঘর, অলিন্দ ,বারান্দা- হিন্দি পৌরাণিক ছবিতে যেমন যেমন দেখা যায়। তবে এটা ঠিক শ্রীকৃষ্ণের সময়কার কিনা তা নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ ঘটতে পারে। দেড়শ-দুশো বছর আগে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এধরণের বাগানবাড়ি করতেন।

লছমনঝুলার লক্ষ্মণ মন্দির থেকে শুরু করে কেদারনাথ পর্যন্ত হিমালয়ের যে কয়টি মন্দির আমরা তখনো পর্যন্ত দেখেছি-উখিমঠের মন্দিরটি সেগুলো থেকে একটু পৃথক ধরণের। মন্দির-স্থাপত্য বা মন্দির অলঙ্করণ বলতে যা বোঝায় হিমালয়ের কোন মন্দিরে তার লেশমাত্রও নেই। কতগুলো পাথর সাজিয়ে একটি সাদামাঠা মন্দির দাঁড় করানো হয় এবং তার ভিতরে বিগ্রহ হিসাবে আরেকটি পাথর বসিয়ে দেওয়া হয়। পাহাড়টি একটু নড়াচড়া করলেই, একটা ধস নামলেই মন্দির বিগ্রহ সব পাহাড়ের অন্য অজস্র প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যাবে-এর আগে কতবার এমন একাকার কান্ড হয়েছে এবং কতবার তা আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে তার হিসেবই বা কে রাখে? —আর তাই দর্শন করবার জন্য সেই মহাভারতের যুগেরও আগে থেকে এপথে যাত্রীর আর বিরাম নেই। যাত্রীরা কেউ হতাশ হয় বলেও কখনো কোন অভিযোগ শোনা যায়নি।

উখিমঠ সেদিক থেকে সম্পূর্ণ বনেদি ব্যাপার। কেবল চকমিলান মন্দিরই নয়, মন্দিরে বিগ্রহের কোন গোনাগুনতি নেই। পাহাড় থেকে কুড়িয়ে আনা এবড়োখেবড়ো পাথরের বিগ্রহ নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে আনা কারুকার্যমন্ডিত সব দেবদেবীর মূর্তি। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব— কে আছে আর কে নেই। প্রাঙ্গণে, সিঁড়িতে, অলিন্দে, ঘরে, বারান্দায়, কার্নিশে-বিগ্রহের একেবার ছড়াছড়ি। উখিমঠ তবুও ঠিক যেন জাতে উঠতে পারে নি। যাত্রীরা এখানে এসে পৌঁছয় না-কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, নিয়মমাফিক পুজো দেয়, তারপর তুঙ্গনাথের পথে এগিয়ে যায়।

উখিমঠ সম্ভবত কোন সামন্তরাজার কীর্তি। বুড়ো বয়েসে সামন্তরাজাদের মাথায় যে মাঝে মাঝে উগ্র ধর্মভাব চেপে বসত সেকথা সকলেরই জানা। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর সেটিকে পুরাণের ঊষা-অনিরুদ্ধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লোকচরিত্র সম্পর্কে কতটা গভীর ব্যুৎপত্তি থাকলে যে এটা সম্ভব তা ভেবে দেখবার মতো' কিন্তু অত কৌশল করেও কিছু হয়নি।

কিন্তু উখিমঠ থেকে গুপ্তকাশীর যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় সেটা একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। উখিমঠ আর গুপ্তকাশী মোটামুটি একই উচ্চতায়-মন্দাকিনী উপত্যকার এধারে ওধারে। পায়ে হাঁটতে হলে প্রায় দুই দিনের দূরত্ব, পাখা থাকলে বোধহয় আধ ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়।

পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়ের সবুজ আর ধূসরের মাঝখানে ছোট ছোট লোকালয়। লোকজন বা ঝরনাটা কিছুই পৃথক করে দেখা যায় না। তবু মনে হল যেন জায়গাটা নড়াচড়া করছে। ভাবতে অবাক লাগছিল যে মাত্র কদিন আগেই আমরা গুপ্তকাশী অতিক্রম করে এসেছি। সুন্দর একটা ছবি থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এসে আবার সেই ছবিটার দিকে তাকালে যেমন মনে হতে পারে অনেকটা সেইরকম। মনে আছে গুপ্তকাশী থেকেও উখিমঠ দেখেছিলাম। কিন্তু তখন এধরণের কিছু হয়নি। হবার কথাও নয়।

সেদিন দুপুরে আহার ও বিশ্রামের জন্য আমরা থেমেছিলাম গেলিয়াবগর চটিতে। খুবই নিরীহ চটি। একেবারে বনের মধ্যে।

উখিমঠ ছাড়িয়ে আসবার অল্প পরেই রাস্তাটা এই বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পথ এখন কোন গিরিশিরা (রিজ্) ধরে নয়, একেবারে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজাসুজি। রাস্তার দুধারে বিশাল বিশাল গাছ, আগাছার উপর দিয়ে রাস্তা। রাস্তার একধারে আট-দশটা ঘর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঝিম্ মেরে আছে। ছোট ছোট দরজা-হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকাই নিরাপদ-কোন জানালা নেই। অদূরের কোন ঝরনা থেকে একটা জলের ধারা নালা বানিয়ে ঘরগুলোর সামনে দিয়ে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। স্ফটিকস্বচ্ছ জল। এরই নাম গোলিয়াবগর চটি।

চটিওয়ালা দুজন। অন্যান্য চটিতে যেমন চটিওয়ালারা সপরিবারে চটির সব কাজ করে এখানে তেমন নয়। চার ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকে রোজ সকালে ওরা এখানে আসে, তারপরে বেলা পড়বার আগেই আবাব গ্রামে ফিরে যায়। এই বনে এক সময়ে বাঘ-ভালুকের খুব দৌরাত্ম্য ছিল, সেজন্যই এমন ব্যবস্থা।

ঘরগুলোকেও তাই প্রায় ফাঁসির কয়েদের মতো করে বানান হয়েছে-বাঘ-ভালুক যাতে রাত্রিবেলায় যাত্রীদের অযথা বিব্রত করতে না পারে। এখন আর বাঘ-ভালুকের তেমন দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, তবুও ভয়টা রয়ে গেছে। চারিদিকে বেশ একটা শুনশান ভাব।

আমরা সেদিন দারুণ ক্লান্ত ছিলাম। সত্যকারের ক্লান্তি। সকালের সেই নালাচটি থেকে ধরলেও, পা-দুটোর উপর দিয়ে সেদিন নেহাত কমকিছু যায়নি-শত হলেও মানুষের পা তো!

কোথাও একটু হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালেই তখন আমার

বিশ্রাম হয়। তারাদার একটু দিবানিদ্রার অভ্যাস ছিল। কিন্তু একেবার ঘড়ি ধরে বললে পনেরো মিনিটি, আধ ঘন্টা বললে আধঘন্টা। মনে আছে, গোলিয়াবগরে তারাদাকে মশারি টাঙিয়ে শুতে হয়েছিল।

কারণ মাছি। এই পরিক্রমা পথে তখনও প্রায় এখনকার মতোই দারুণ মাছির উৎপাত ছিল। উৎপাত না বলে প্রতাপ বলাই ভাল। ওদের দাপট দেখে অনেকসময় নিজেকেই কেমন বহিরাগত বলে মনে হয়-যেন বিনা পাসপোর্টে মক্ষীরাজ্যে ঢুকে পড়েছি। সেই হৃষীকেশেরও আগে থেকে এমন একটা জাগ্রত মুহূর্তের কথা মনে পড়ে না যখন আমরা মাছির সঙ্গে লড়াই করছি না। স্বভাব প্রগল্ভতা সত্ত্বেও এবিষয়ে এতক্ষণ কিছু বলিনি। কারণ মহাপ্রস্থানের পথে বইটিতে এবিষয়ে এত লেখা হয়েছে যে তারপরে আর তা নিয়ে বাংলা ভাষায় কিছু বলতে যাওয়া বাহুলতা হত। কিন্তু গোলিয়াবগরে মাছির কথা উল্লেখ না করলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার চেপে যাওয়া হবে। তারাদাকে এখানে দিনের বেলায় মশারি টাঙাতে হয়েছিল-- - সারা পরিক্রমা পথে ওই একবারই। আমরা লড়ে গেছি।

খুব সহজবোধ্য কারণেই গোলিয়াবগর থেকে সেদিন আবার রাস্তায় বেরোতে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। ভ্রমনসূচী অনুযায়ী সেদিন আমাদের তুঙ্গ নাথের আসল চড়াইয়ের তলায় একটা ছোট চটিতে রাত কাটাবার কথা-রোদ চড়া হবার আগেই যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু নিজেদের অনেক বঞ্চিত করেও সেদিন আমরা সেই নির্ধারিত চটিতে পৌছতে পারিনি। চোখকান বুজে এগিয়েও সেদিন আমাদের পথিবাসা চটিতে রাত কাটাতে হয়। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার তুচ্ছ করে আমরা হয়তো আরও এগিয়ে যেতাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের নিরস্ত হতে হয় বাঘের ভয়ে।

প্রায় নির্বংশ হবার মুখে হলেও-১৯৫৫ সনেও-হিমালয়ের এইসব অরণ্যে মাঝে মাঝে বাঘ-ভালুকের দেখা মিলত। সেই উখিমঠের পর থেকেই দেখে আসছি পথচারীদের প্রায় সকলের সঙ্গেই বন্দুক হোক বা মোটা লাঠি হোক একটা অস্ত্র আছে। এমনকি বাড়ির মেয়েরা যেখানে চাষ করছে বা লকড়ি কুড়োচ্ছে সেখানেও হাতের কাছে কিছু না কিছু একটা অস্ত্র আছে। এক-কথায়-বাঘ-ভালুক নিকটেই আছে।

গোলিয়াবগর ছিল অরণ্যের প্রান্তসীমায়, পথিবাসা একেবার জঠরের মধ্যে।

বনের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফ করে চটি বানানো হয়েছে। ঘাড় কাত করে উপরের দিকে তাকালে একখন্ড আকাশ চোখে পড়ে, বাকি সব অরণ্যে ঢাকা পড়ে গেছে। তবে চটিটা খুব মজবুত এবং সমৃদ্ধ। এই পরিক্রমা পথে এমন কতকগুলো চটি আছে যেখানে যাত্রীরা প্রায় প্রথাগতভাবেই রাত্রিবাস করে থাকে। এর পেছনে কখনো কোন ধর্মীয় কারণ থাকতেও পারে, তবে এটা অধিকাংশ সময়ই স্থির হয় পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী চটির দূরত্ব অথবা দুর্গমতা বিবেচনা করে। পথিবাসার গুরুত্ব কিন্তু ঠিক ভৌগোলিক কারণে নয়। গোলিয়াবগরে খুব একটা দেরি করে না ফেললে, যে কোন যাত্রী বেলা পড়বার আগেই স্বচ্ছন্দে এই অরণ্য অঞ্চল পেরিয়ে একেবারে তুঙ্গনাথের পদপ্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। যাত্রীরা তবুও পথিবাসায় রাত কাটায়। আমাদের বরাত ভাল, আমরাও পথিবাসায় একটা রাত কাটিয়েছিলাম।

একসময়ে এই পরিক্রমা পথের প্রায় সবটাই ঠিল শ্বাপদসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে অথবা গা ঘেঁসে। কেবল পথের দুর্গমতা আর আবহাওয়ার প্রতিকূলতাই নয়, যাত্রীকে সেইসঙ্গে বন এবং বন্যপ্রাণীদের সঙ্গেও মোকাবেলা করতে হত। উভয়েই উভয়কে সম্মান করত, কেউই সীমালংঘন করত না, তাই পাঁচ হাজার বছরেরও উর্ধ্বকাল ধরে এই পথ-পরিক্রমা কখনো বন্ধ হয়নি। সাময়িক উত্তেজনায় মাঝে মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, অসহায় বাঘ অসহায় মানুষকে খেয়েছে-কিন্তু নদীতেও তো বান হয়।

তারপরেই হঠাৎ করেই সবকিছু বদলে গেল। বন্দুক এল, মোটরগাড়ি এল, কাঠের চাহিদা বাড়ল। বাঘ-ভালুক শিকার করে কেউ জগদ্বিখ্যাত বন্যপ্রাণী বিশারদ হলেন, অনেকেই সেইসব বাঘ-ভালুকের খাল দিয়ে সদর্পে দেশের বাড়ির বসারঘর সুসজ্জিত করলেন। বাঘ-ভালুক পিছে হটে যাবার পর এলেন কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা। বন সাফের কাজ শুরু হল। সবশেষে এল মোটরবাস-যাত্রীর সংখ্যা দশক,শতক, সহস্রের গন্ডি পেরিয়ে লক্ষ, নিযুতের কোঠায় গিয়ে পৌঁছল। বন আর বন্যপ্রাণীদের কি অত ধকল সয়।

১৯৫৫ সনে আমরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই এই কালজয়ী নাটকের চৌদ্দ আনা সমাধা হয়ে গিয়েছে। এমনকি পথিবাসায়ও তখন কোন সত্যকারের বাঘ-ভালুকের ভয় নেই বললেই চলে। তবুও পথিবাসায়ই আমরা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম যে, পুরানো দিনের যাত্রীরা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে কি অবস্থায়

চটির আশ্রয়ে এসে পৌঁছতেন, এবং তারপরে তাঁদের মানসিক অবস্থা অনেকটা কি ধরণের হত।

সে এক দুর্লভ সন্ধ্যা। বেলা একটু গড়াতেই বনের মধ্যে থেকে চুপি সারে অন্ধকার বেরোতে শুরু করল। প্রথমটায় একটু ছায়া ছায়া-যেন বিশেষ কোন মতলব নেই! তারপরে সেটা আস্তে আস্তে গাঢ় হতে হতে দিনের আলোর সবটুকুই নিঃশেষে মুছে দিল। বনের বিরাট বিরাট গাছগুলো আবছা হতে হতে একসময়ে অন্ধকারে মিশে গেল। হাজার নয়েক ফুট উচ্চতায় ঠান্ডাটাও ওৎ পেতেই ছিল, ছেঁকে ধরল।

চটির সামনে গনগন করে উনানের আগুন জ্বলছে, আমরা তাই ঘিরে বসে আছি। চা চাইলেই চটিওয়ালা প্রস্তুত। চটির কুকুরগুলোও আমাদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসে জুটেছে। কুকুরগুলো দেখতে অতি ভয়ঙ্কর কিন্তু স্বভাব খুব শান্ত। বাঘ যাতে কামড়ে ধরতে না পারে সেজন্য প্রত্যেকটা কুকুরের গলায় খুব চওড়া করে শক্ত লোহার বকলস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। চটিওয়ালা সেদিন অনের বাঘ-ভালুকের গল্প বলেছিল-সব সত্য ঘটনা। অন্যান্য জায়গার চটিওয়ালারা দেবদেবীর কথা, চাষবাসের কথা বলে, পথিবাসার চটিওয়ালা বলেছিল বাঘ-ভালুকের কথা।

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উপর দিকে তাকালে ছোট এক টুকরো আকাশে কয়েকটা তারা জ্বলজ্বল করছে। চারদিকে অরণ্যের অন্ধকার। আমরা আগুন ঘিরে বসে আছি।

পথিবাসার সেই সন্ধ্যাটির কথা তেমনভাবে চিন্তা করলে আজও শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ অনুভব করি।

তুঙ্গনাথ চড়াইয়ের বিশদ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে না। ওটার কথা চিন্তা করলেও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই তুঙ্গনাথ চড়াইয়ের একটা আলোকচিত্র কিছুদিন আগে পর্যন্তও-কোন বইয়ের মধ্য থেকে বা ইন্সিওরেন্সের পলিসির খামের ভিতর থেকে-হঠাৎ হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়ত। বক্স ক্যামেরায় নিতান্ত কাঁচা হাতে তোলা ছবি-কিন্তু সেই ছবিটিতে আমাদের তুঙ্গনাথ চড়াইয়ের অভিজ্ঞতাটি যথার্থরূপে উদঘাটিত হয়েছিল।

সামনেই ছবির প্রধান অংশটা জুড়ে ননীবাবু। পায়ে শক্ত করে বাঁধা জাংগল বুট। প্যান্টের উপর দিয়ে হাঁটু অবধি খুব টাইট করে পট্টি লাগানো। খাকি পশমের প্যান্ট এবং শার্ট। শার্টে বোতামের সংখ্যা একটু বেশি, এমনকি বুক পকেট দুটোর

ঢাকনাও বোতাম দিয়ে আঁটা। মাথায় সেই নেপালী সৈনিকের বিশাল কানাতওয়ালা খাকি ফেল্ট হ্যাট, টুপির বেল্টটা এত শক্ত করে বাঁধা যে তার তলার দিকটা থুতনির খাঁজে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর হাতে সেই মাথার উপরে আরও দু-ফুট উঁচু লিকলিকে বাঁশের কঞ্চি। মুখটা ঘামে চিকচিক করছে। ছায়াটা ছোট হয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে-মানে বেলা বারোটা হবে। ননীবাবুর পা দুটো যে অবস্থায় রয়েছে তাতে মনে হয় চড়াইটার উচ্চতা ৬৫ থেকে ৭০ ডিগ্রির মধ্যে হতে পারে। ছবিটাকে একটু মন দিয়ে দেখলে ননীবাবুর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজও স্পষ্ট শোনা যায়।

ননীবাবুর পিছনে বেশ কিছুটা নিচে এই অধম-আপাতমস্তক। মাথায় গাঢ় নস্যি রঙের বিলিতি ফেল্টের টুপি, পরনে অগ্রজের ওয়ারড্রোব থেকে না-বলিয়া সংগ্রহ করা দুই-পিসের বিলিতি সার্জের স্যুট। কোমরে একটা গামছা বাঁধা রয়েছে। পায়ে কেড্‌স। আর হাতে সেই লিকলিকে বাঁশের কঞ্চি। বড়োর জামা-কাপড় ছোটর গায়ে উঠলে যেমন হয়- একেবার নাস্তানাবুদ অবস্থা। তার উপরে তখন বোধহয় আবার একটু হাওয়া ছিল, প্যান্টের পা দুটো পিছন দিকে পত্‌পত্ করছে। বেচারা, কোথায় চাকরি-বাকরি করবে, প্রেম করবে, কবিতা লিখবে, কফি হাউসে বসে দুনিয়ার তাবৎ সমস্যার সমাধান করবে-তা নয়, এসেছে হিমালয় করতে! বেশ হয়েছে।

ছবিটিতে গাছপালার কোন চিহ্নই নেই। সে-সব দশ হাজার ফুট উচ্চতায় ছেড়ে আসা হয়েছে। ছবির পিছনের দিকটায় পাহাড়ে হেলান দিয়ে কয়েকটি যাত্রীদল বসে আছে। সিকি শতাব্দী আগেকার সিক্স-টুয়েন্টি সাইজের ছবি-যাত্রীদের পৃথক করে চেনা যায় না। তবে চড়াইয়ের মেজাজটা বোঝা যায়। চড়াইটি বড় সহজ ছিল না।

কিন্তু ক্যামেরার একপেশে যান্ত্রিক চোখে চড়াইয়ের আসল জিনিসটাই ধরা পড়েনি। চড়াইয়ের রুক্ষতা ও দুর্গমতা এবং ক্লান্তি ও কৌতুক ছবিটিতে বেশ বিশদ করে বলা হয়েছে, কিন্তু এইসবের সঙ্গে যে বিরাট একটা সান্ত্বনাও ছিল ছবিতে তার কোন উল্লেখই নেই।

পথিবাসার অরণ্যাঞ্চল অতিক্রম করে হাজার নয়েক ফুট উচ্চতায় আমরা যখন তুঙ্গনাথ চড়াইয়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন থেকেই বিস্ময়ের শুরু। সকাল বেলায় হিমালয়ের অরণ্য পথ একটা দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। সূর্যের

সলজ্জ আলো, পাখির ডাক, শিশিরসিক্ত তৃণলতা, জলধারাগুলো যেন হঠাৎ করে আবার বইতে শুরু করল-চারদিকে প্রাণের সাড়া পড়ে যায়। তবে পথিবাসা অরণ্যের সেই সকালবেলাটা আমাদের চোখ তুলে দেখবার সাহস হয়নি-আমাদের চোখের সামনে তখন খাঁড়ার মত উঁচিয়ে আছে তুঙ্গনাথের চড়াই। হিমালয়ে প্রায়ই এমন হয়-ভয়ের দাপটে সৌন্দর্য পালিয়ে যায়।

তুঙ্গনাথ চড়াইয়ের বিস্ময়টাও প্রথমটায় আমাদের ঠিক নজরে পড়েনি। হিমালয়ে তো বরফ থাকবেই-তাতে আবার নতুন করে বিগলিত হবার কি আছে! চড়াইয়ের দুর্গমতাটা তার চাইতে অনেক বেশি জরুরি ব্যাপার। কিন্তু দম নেবার জন্য যখনই একটু থামছিলাম তখনই চোখ গিয়ে পড়ছিল ওই বরফের উপর। এটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু বারকয়েক দম নেবার এবং বেশ কিছুটা চড়াই ভাঙবার পর ব্যাপারটিকে আর অবহেলা করা গেল না। পশ্চিম দিগন্ত থেকে শুরু করে উত্তর দিগন্ত জুড়ে পূর্ব দিগন্তের দিকে প্রসারিত হয়েই চলেছে-খালি বরফ আর বরফ। আমরা যতই চড়াই ভাঙছি, তুষার-দিগন্তও ততই মাপে বেড়ে চলেছে-নীল আকাশের গায়ে যেন সদ্য সদ্য আকার ধারণ করছে।

তুঙ্গনাথে পৌঁছে প্রায় তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় চড়াই শেষ হল। কিন্তু তুষার-রাজ্য তারপরেও যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত পূর্বদিকে গিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে-এবং আবারও দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করে চলে গেছে। সে এক দেখবার মত দৃশ্য। সবটা দেখতে হলে পুরো একটা চক্কর খেতে হয়।

একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে গঙ্গোত্রী গোষ্ঠীর দিক্‌পালেরা-শিবলিং-বন্দরপুচ্ছ, শতোপন্থ এবং আরো সবাই। তার ডান দিকেই কেদারনাথ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি বদরিনাথ গোষ্ঠীর নৃপতিবৃন্দ। আরও ডাইনে এবং বেশ কিছুটা দক্ষিণ দিকে নীলগিরি-ফ্রাঙ্ক স্মাইথ এর নাম রেখেছিলেন গাড়োয়াল সুন্দরী। নীলগিরির কিছুটা উপরে মন্দির পর্বত, আরও কিছুটা উপরে মুকুট পর্বত। সেখান থেকে ভারত-তিব্বত সীমান্ত বরাবর একের পর এক দাঁড়িয়ে আছে সানা, দেওবন কামেট এবং অন্য সব বিশ-পঁচিশ হাজারী মনসবদারেরা। তারপরে দক্ষিণদিকে বাঁক নিয়ে হাতি পর্বত, ঘোড়ী পর্বত, দুনাগিরি এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। দুনাগিরির পরেই নন্দাদেবী-সপরিবারে।

নন্দাঘুন্টি, নন্দাঘাট, বেথরতোলি, ত্রিশূল প্রভৃতিরা নন্দাদেবীর নিভৃতঅঙ্গন (স্যাংকচুয়ারি) ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরেও পঞ্চচুলি পর্বতমালা। আরও পরে তুষার-দিগন্ত মানুষের আঁকা সীমান্তরেখা পেরিয়ে চলে গেছে নেপাল হিমালয়ে-অপি পর্বতমালা, ধবলগিরি পর্বতমালা, অন্নপূর্ণা পর্বতমালা অতিক্রম করে নিরবধি। তুঙ্গনাথ থেকে হিমালয়ের সেই এক দৃশ্য!-বিলিতি রঙিন চশমা সত্ত্বেও মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

তুঙ্গনাথের তুঙ্গদেশে গাছপালার তেমন বালাই নেই। দুটো একটা চীর পাইন গাছ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বটে, তবে রফা করতে হয়েছে। উপর দিকে বেড়ে উঠবার সুযোগ না থাকায় চারপাশে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে-জাপানী ছবিতে যেমনটি দেখা যায়-ছবির মত সুন্দর।

তুঙ্গনাথের মন্দিরটি এ অঞ্চলের অন্য দশটা মন্দিরের মত। যে কোন সময়ে পাহাড়ের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে পারে। মন্দিরের ভিতরে কোন দেবতার কিরকম বিগ্রহ ছিল মনে নেই। বিগ্রহ দর্শন করেছিলাম বলেও মনে পড়ে না। বোধহয় পূজোও দিইনি। ওসব ব্যাপারে কৌতূহল যতটুকুও বা ছিল কেদারনাথের পর সেটুকুও ঘুচে গেছে।

এতকাল পরে এখন সন্দেহ হয় যে সেদিন হয়তো সবকিছু একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল, বোধহয় একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। সেটাই স্বাভাবিক। সূর্যের আলোয় পড়লে বাদুড়-ছানার যেমন দশা হয় আমাদের কারো কারো সেদিন তেমনি হয়েছিল। কেবল পাখা ঝটপট আর মাথা ঠোকাঠুকি। দুপুরের আহার শেষ করেই তুঙ্গনাথ ছেড়ে আসতে সেদিন আমাদের এতটুকু কষ্ট হয়নি।

তুঙ্গনাথের ব্যাপারটা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার সময় লেগেছে সিকি শতাব্দীর উপর। এখন মনে হয়, সে-রাতটা তুঙ্গনাথে কাটিয়ে যদি সেই তুষারদিগন্তে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়টা দেখে আসতাম!

সুন্দরের অভিসারে

ব্রাহ্মমুহূর্তে শুভদৃষ্টি হল। সুন্দরের অভিসার সার্থক হল। আমার আঠারো বছরের স্বপ্ন সার্থক হল।

সত্যি বলতে কি এমন অতর্কিতে অদর্শনের যন্ত্রণার উপশম হবে, তা একটু আগেও আশা করি নি। কেমন করে করব? এখনও যে আমাদের এই মূল-শিবিরে প্রভাতের পরশ লাগে নি। রীতিমত রাত রয়েছে। সবে সকাল সাড়ে-চারটে। প্রচন্ড শীত। তবু প্রাকৃতিক প্রয়োজনে স্লীপিং ব্যাগের মায়া কাটিয়ে তাঁবুর বাইরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে বিস্ময়ে ও পুলকে প্রাকৃতিকপ্রয়োজন বিস্মৃত হয়েছি। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছি সিনিয়লচুর দিকে, সুন্দরের পানে। নিজের অলক্ষ্যেই কণ্ঠ থেকে ঝড়ে পড়ছে-

"এই লভিন সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর।।...
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর"

জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফল না থাকলে এমন সুন্দরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয় না।

তবে শুধু সিনিয়লচুর সৌন্দর্য নয়। পরিবেশ তার স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে সুন্দরতর করে তুলেছে। আগেই বলেছি এখনও শিবিরে সূর্যের আলো এসে পৌঁছয় নি। মাটিতে তাই কালো আঁধার কিন্তু আকাশ আলো হয়ে গিয়েছে। সেখানে নীলের ছড়াছড়ি । আর অদৃশ্য অংশুমানের সোনালী কিরণ এসে সিনিয়লচুর সারা গায়ে সোনা দিয়েছে ছড়িয়ে। মাটির জগতে সোনার জন্য এত হানাহানি আর এখানে কত সোনা!

শুধু সিনিয়লচু নয়। লিট্ ল-সিনিয়লচু, টেন্ট-পিক, পিরামিড-পিক, নেপাল-পিক এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক ও দুই নম্বর শিখর-এক কথায় সিনিয়লচুর প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই সোনার পাহাড়ে পরিণত। কিন্তু প্রতিবেশীদের কথা থাক, সোনার কথাও আর নয়। হিমবন্ত-হিমালয়ের বুকে সোনা-রূপার এমন ছড়াছড়ি আমি এর আগেও দেখেছি। কিন্তু যা কখনও দেখি নি, তা হল সিনিয়লচু। যেমন শিখর, তেমনি গিরিশিরা আর গড়ন। শিখরটি যেন মানুষের হাতে তৈরি মেট্রো ডিজাইনের চূড়া। একটা দিক ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে, আরেকটা দিক ধনুকের মতো বেঁকে নিচে নেমে এসেছে। শুধু সুন্দর নয়, সেই সঙ্গে অভিনব বটে।

গিরিশিরাটি সত্যি যেন খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার। তারপরে তুষার-সঞ্চয় আর গড়ন? মনে হচ্ছে হাজার হাজার স্থপতি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মণিমুক্তো দিয়ে শত শত বছর ধরে সৃষ্টি করেছে এই অনিন্দ্যসুন্দরকে।

এ সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। আমি তাই তার দিকে তাকিয়ে আবার গেয়ে উঠি —

'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত-
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত।।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে।।
জীবনশেষের শেষজাগরণসম ঝলসিছে মহাবেদন,
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত-
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত।।'

কবি সিনিয়লচুকে দেখেন নি। কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, আমি তারই সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি ভাগ্যবান, ফ্রাঙ্ক স্মাইথের সেই দুরধিগম্য দেবালয়ের দ্বারে রয়েছি দাঁড়িয়ে। আমি এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের সামনে বিহ্বল ও ভাষাহীন হয়ে রবীন্দ্রনাথের শরণ নিয়েছি। তিনি তো শুধু মহাকবি নন, তিনি যে আমার ভাষার মালাকার।

"বাইরে কে গান গাইছেন?" পাশের তাঁবু থেকে সুশান্তবাবু বলে ওঠেন।

"তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে আসুন।" আমি বলি, "সিনিয়লচুকে দেখুন, ছবি নিন।"

শুধু সুশান্তবাবু নয়, একে একে সবাই বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। আর এসেই নিশ্চল ও নীরব হয়ে যায়। আমার মতই অপলক নয়নে শুধু সিনিয়লচুকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

আমাদের শীত করছে না, ঠান্ডা হাওয়ায় বিচলিত হচ্ছি না, কেবল সিনিয়লচুকে দেখছি। তাকে দেখা ছাড়া এখন আর কোনো কাজ নেই। আমরা দেখছি সিনিয়লচুকে। দেখছি তার স্বর্ণসিংহাসনসম শিখর আর বাঁকা তলোয়ারের মতো মূল গিরিশিরা। দেখছি তার তুষারপ্রপাত আর হিমবাহ। দেখছি আর দেখছি। এ দেখার শেষ নেই।

আমরা কলকাতার কয়েকজন শীতকাতুরে মানুষ কতক্ষণ এই ষোলো হাজার ফুট উঁচু হিমবাহের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হল, তখন প্রভাতের পরশে জেমু হিমবাহ আলোময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতে সিনিয়লচুর তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং তার গায়ে রামধনুর রং লেগেছে। তাকে আরও সুন্দর লাগছে।

কিন্তু সুন্দর তো চিরস্থায়ী নয়। বরং যৌবনের মতো সুন্দর সর্বদা ক্ষণস্থায়ী। কথা নেই বার্তা নেই কারণ নেই, কোথা থেকে যেন পুঞ্জীভূত মেঘের দল সারি বেঁধে ছুটে আসছে। তারা সিনিয়লচু আর তার প্রতিবেশীদের সারা গায়ে সাদা ওড়না দিচ্ছে জড়িয়ে।

ধীরে ধীরে ওদের দেহের এক-একটি অংশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে প্রকৃতির এই বিচিত্রলীলা দর্শন করছি।

নেই, কেউ নেই কিছু নেই! সবার সঙ্গে আমার চোখের সামনে সিনিয়লচু অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এখন কোথাও সোনা নেই, রূপা নেই, রামধনু নেই-শুধুই সাদা। সীমাহীন সাদার সমুদ্রে সিনিয়লচু ডুব দিয়েছে।

এ অবগাহন অনন্তকালের জন্য নয়। যে কোন মুহূর্তে মেঘ কেটে যেতে পারে, তখুনি সিনিয়লচু আবার আমার সামনে আবির্ভূত হবে। তবু মনটা ভারী হয়ে ওঠে। যাকে দেখার জন্য কত কষ্ট করে এতদূর থেকে ছুটে এসেছি, সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

চমক ভাঙল। এই প্রথম অনুভব করছি এখানে প্রবল বাতাস বইছে, এখনও রোদ ওঠে নি, ভীষণ ঠান্ডা। ঘড়ি দেখি, ছ'টা বাজে।

"চা আসছে।" সহসা অসিতবাবু বলে ওঠে।

সে ঠিকই বলেছে। চেতাকে নিয়ে মেট বেরিয়ে এসেছে কিচেন থেকে। তাদের হাতে চায়ের কেটলি ও মগ।

"সাবাস মেট!" অমূল্য তাকে অভিনন্দিত করে।

"গুড মোনিং সাব্।" মেট ও চেতা উত্তর দেয়।

গরম চায়ের মগে ঠোঁট ঠেকিয়ে চারিদিকে তাকাই। গতকাল রাতের আঁধারে শিবিরের অবস্থানটা দেখতে পাই নি। আর আজ এতক্ষণ সিনিয়লচুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। এবারে অবসর পাওয়া গেছে। অতএব আমাদের মূল-শিবিরটিকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। আগেই বলেছি এ জায়গাটি জেমু গ্রাবরেখার মৃত অংশ। গতকাল সন্ধ্যায় শেষবারের মতো নদী পেরিয়ে যে উঁচু প্রায়-সমতল মালভূমির সদৃশ ভূখন্ডে এসে উঠেছিলাম, এটি তারই পশ্চিমাংশ। শিবির ক্ষেত্রটি বেশ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। জুনিপার ও নানা ছোট-ছোট গাছ রয়েছে প্রায় সর্বত্র। কিন্তু কোন বড় গাছ নেই। আছে শেওলা গজানো বড় বড় পাথর। তা থাকগে, গ্রাবরেখায় পাথর থাকবেই। কিন্তু আমাদের তাঁবু টাঙাতে কোনো অসুবিধে হয় নি। পাশাপাশি সাতটি 'টু-মেন-টেন্ট' টাঙানো হয়েছে। একটায় অমূল্য একা, বাকী ছটায় আমরা বারোজন। যথারীতি অসিতবাবু আমার 'টেন্ট-মেট'।

শিবিরক্ষেত্রটির উত্তরে সামান্য দূরে একটা বেশ উঁচু গিরিশিরা আর দক্ষিণ দিকটা নেমে গিয়েছে গ্রীনলেক থেকে আসা নদীর তীরে। নদী এখানে একটি নিতান্তই নাতি প্রশস্ত নালা। এটি জেমু চু-য়ের উপনদী। তাই নাম জেমু নালা। পারাপার কোনো সমস্যাই নয়। পাথর থেকে পাথরে পা রেখে জুতো না ভিজিয়ে পার হওয়া যায়। নদীর এপারে তাঁবু ও পলিথিন খাটিয়ে মালবাহকেরা বাসা বেঁধেছে আর ত্রিপলের ছাউনিতে কিচেন-কাম-স্টোর বানানো হয়েছে।

জেমুনালা পেরিয়ে দক্ষিণে খানিকটা এগিয়ে গেলেই জেমু হিমবাহের জীবন্ত অংশ। তারপরেই সিনিয়লচু থেকে সিনিয়লচু হিমবাহ নেমে এসে জেমু হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেই সঙ্গম ছাড়িয়ে আমাদের পথ।

কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যই জমা থাকুক। এখন বর্তমানের

কথা ভাবা যাক। এখনও এখানে রোদের দেখা নেই। আজ দেখা পাওয়া যাবে কিনা, তাও বুঝতে পারছি না। অথচ কিছুক্ষণ আগেও সিনিয়লচু আর কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে শিখরে আমরা অবাক বিস্ময়ে রোদের খেলা দেখেছি। হিমালয়ের সূর্য বড়ই অস্থির ও চপলমতি। তার খেয়াল বোঝা ভার।

অথচ উচ্চ-হিমালয়ে সূর্যের আরেক নাম জীবন। তার কৃপা ছাড়া কোনো পর্বতাভিযান সফল হতে পারে না। দেব দিবাকর আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করবেন কিনা এখনও বুঝতে পারছি না। তাহলেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না। আশায় বুক বেঁধে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং রোদের প্রতীক্ষায় না থেকে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। বহু কাজ পড়ে রয়েছে।

মেট এসে সেলাম করে, "ম্যানেজার সাব্, আজ ক'জন কুলি ছেড়ে দেবেন?"

"লীডার সাব্ কি বললেন?" পাল্টা প্রশ্ন করি।

মেট জবাব দেয়, "এখনও কোনো কথা হয় নি তাঁর সঙ্গে, তিনি দাঁড়ি কামাচ্ছেন।"

তাকিয়ে দেখি নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে একহাতে আয়না ধরে আরেক হাতে দাঁড়ি কাটছে অমূল্য। বীরেনও ওখানে রয়েছে। মেটকে নিয়ে নেতার কাছে আসি।

পরামর্শের পরে ঠিক হল মেট ও চেতাকে বাদ দিয়ে আমরা বিশজন পোর্টার স্থায়ীভাবে মূল-শিবিরে রাখব। তাদের মধ্যে চারজন দার্জিলিঙের হ্যাপ ও তিনজন টিবেটান হ্যাপ্। তার মানে আজ তেরজন পোর্টার এখানে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কাকে কাকে রাখা হবে, তা ঠিক করবে মেট।

এই অভিযান শুরু হবার পর থেকে বার বার '১৩' সংখ্যাটি কেন ফিরে ফিরে আসছে, বুঝতে পারছি না। ১৩ জন সদস্য কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে, ১৩ই মে আমরা সিকিমের মাটিতে পদার্পণ করেছি, আজ আবার ১৩ জন মালবাহক মূল-শিবিরে রেখে বাকি মালবাহকদের ফিরে যেতে বলছি।

তারা ফিরে যাবে লাচেন। অভিযান শেষে খবর পাঠাবার পরে তাদের কয়েকজন আসবে এখানে। মালপত্রসহ আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

এই যাওয়া ও আসার জন্য তাদের দেড় দিন করে তিনদিনের বাড়তি মজুরী দিতে হবে। তাতেও প্রায় দিন সাতেকের মজুরী ও খাবার বেঁচে যাবে। কারণ এখানে

এখন আমাদের এত মালবাহকের প্রয়োজন নেই।

আমি আর অসিতবাবু মেটকে নিয়ে আমাদের তাঁবুতে এলাম। যে সব কুলি-কামিনদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের নাম টুকে নিলাম। ওদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অগ্রিম দিয়ে দিতে হল। হিসেব করব লাচেন ফিরে গিয়ে, সেখানেই সব বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

অগ্রিম নিয়ে হাসিমুখেই বিদায় নেয় ওরা। হয়তো ঘরের টানে টাকার মায়া কাটিয়েছে। কিন্তু আমরা হাসিমুখে বিদায় দিতে পারি না। মনটা ভারী বয়ে ওঠে। গত চারদিন এরা সবাই সঙ্গে ছিল। আমাদের মাল বয়েছে, চা খাইয়েছে, পথ দেখিয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার আসবে এখানে, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু অধিকাংশ হয়তো আর কোনদিন আমার পথের সাথী হবে না।

তাই আমি দাঁড়িয়ে থাকি তাঁবুর বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। ওরা চলে যাচ্ছে সারি বেঁধে। কাছের থেকে দূরে, বহুদূরে। গতকাল আমরা যে পথ দিয়ে এখানে এসেছি, সেই পথ দিয়েই ওরা আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তাই নিয়ম, আসা আর যাওয়ার একই পথ।

একসময়ে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি কিচেনে এসে ঢুকি। ব্রেকফাস্ট রেডি। রুটি ওমলেট ও আলুর তরকারী।

খাবার দিতে দিতে মেট জিজ্ঞাসা করে,"সাব্ যে তেরোজন পোর্টার এখানে রাখলেন, তারা কি করবে?"

বীরেন ও অসিতের সঙ্গে পরামর্শ করে অমূল্য বলে,"দুজন চলে যাক তেলেম্। দু বোঝা বাঁশ নিয়ে আসুক।"

"বাঁশ দিয়ে কি করবেন!"

"তুষারপাতে পথরেখা নিশ্চিহ্ন হলেও যাতে পথ ভুল না হয়, সেই জন্য মার্কিং ফ্লাগের বদলে বাঁশ ব্যবহার করব।"

"নিশান বানাবো" বীরেন যোগ করে, "ভুলে ডিমার্কেশান ফ্লাগগুলো নিয়ে আসা হয় নি।"

"কিন্তু তেলেম্ গেলে তো ওরা আজ ফিরে আসতে পারবে না, কাল ফিরবে।" মেট বলে।

"তাই আসবে।" অমূল্য মঞ্জুর করে, "তবে ওদের বলে দাও যেন যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসে।"

মেট মাথা নাড়ে। তারপরে বলে, "বাকি এগারোজন পোর্টার আজ কি করবে সাব্?"

একটু ভেবে নিয়ে বলি," তিনজনকে কাঠ আনতে নিচে পাঠাও, সারাদিনে অন্তত দু-বোঝা করে জ্বালানী আনতে হবে। আর বাকি আটজন অসিতের সঙ্গে মাল নিয়ে ওপরে যাবে।"

"ঠিক হ্যায় সাব্।" মেট সেলাম করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য কুলীদের কাছে চলে যায়।

বিনীত নেতাকে জিজ্ঞেস করে,"আজ তাহলে ক'টা 'লোড' ওপরে যাবে?"

"পনেরো।"

"তার মানে সাতজন হ্যাপ ওপরে যাচ্ছে?"

"না।" অমূল্য বলে,"শেরিং-এর নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে, তাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। লাক্পা এখানে না থাকলে বীরেনের পক্ষে কিচেন ম্যানেজ করা মুশকিল।"

"তাহলে তো তেরোজন পোর্টার ওপরে যাচ্ছে। তেরোটা 'লোড' ওপরে যাবে?"

"হ্যাঁ, তেরোজন পোর্টার তেরোটা লোড্ বইবে আর কেশব ও অসিত রুকস্যাকে দু-লোড মাল নিয়ে যাবে।"

অসিত ও কেশব কোন মন্তব্য করে না, কেবল মৃদু হাসে।

সুশান্তবাবু বলেন,"তার মানে ওরাও দু-জন পোর্টার?"

"হুঁ।" অমূল্য উত্তর দেয়, "আপনি শঙ্কুদা ডাক্তার ও সাংবাদিক ছাড়া আমরা সবাই অভিযানের মালবাহক, কেবল দিনমজুরী পাবো না এই যা।"

বীরেন বলে,"আমি কিচেনে আছি। অসিত ও কেশব তোমরা তৈরি হয়ে নাও, সময় নষ্ট করো না। আধঘন্টার মধ্যে প্যাক-লাঞ্চ দিয়ে দিচ্ছি। বিনীত ও হিমাদ্রি ওদের মালপত্র সব গুছিয়ে দাও। অরুণ ও শরদিন্দু তোমাদের সাহায্য করবে।"

অমূল্য বলে,"অসিত, তোমরা এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করে সেখানে মাল রেখে আজ ফিরে আসবে। আগামীকাল আবার পনেরোটা 'লোড্' নিয়ে ওপরে

যাবে এবং এক নম্বর প্রতিষ্ঠা করবে। পাঁচজন হ্যাপ ওপরে রেখে দেবে। তাদের নিয়ে পরশু তোমরা দু-নম্বর শিবিরের পথ তৈরি করবে আর পরশু বিনীত দশজন পোর্টার নিয়ে এক নম্বরে যাবে।"

আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। কুলিদের সাহায্যে এবং অরুণ ও শরদিন্দুর সহযোগিতায় বিনীত ও হিমাদ্রী 'প্যাকিং লিস্ট' দেখে দেখে ওপরে পাঠাবার মাল বাছাই করতে লেগে গেল।

ডাক্তার অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করে, "লীডার, প্রত্যেক ক্যাম্পের জন্য একটা করে মেডিকেল কিট্ লাগবে, তাই না?"

"হ্যাঁ, তাছাড়া থাকবে 'ফার্স্ট-এড' বক্স।" অমূল্য উত্তর দেয়।

"সেটা ঠিক করাই আছে।" ডাক্তার বলে, "আমি মেডিক্যাল কিট্‌গুলো ঠিক করে ফেলেছি।"ডাক্তার তার কাজে লেগে যায়। অসিতবাবু সাহায্য করছে তাকে।

সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, ও আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না। আমি শুধু ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখছি আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। না রোদ ওঠার কোন লক্ষণ নেই। সিনিয়লচু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত সবাই তেমনি মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে।

সিনিয়লচুর প্রায় সোজাসুজি পশ্চিমে অর্থাৎ আমাদের শিবিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিছুক্ষণ আগে আমি বিশ্বের এই তৃতীয় উচ্চতম শিখরের বিশাল ও বিস্ময়কর রূপ দেখেছি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন সিনিয়লচুর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার উচ্চতা সিনিয়লচুর চেয়ে সামান্যই বেশী। দু-য়ের মাঝে উচ্চতার ব্যবধান যে প্রায় ছ'হাজার ফুট, তা মনেই হয় না। আরও কাছে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার বড্ড লোভ হচ্ছে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমরা যে পর্বতাভিযানে এসেছি। কর্তব্যের বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই আমাদের।

বীরেনের ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। কিচেন থেকে বীরেন ডাকছে। তার মানে প্যাক-লাঞ্চ তৈরি।

কুলিরাও ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে। তারা নিজেরাই রান্না করেছে, আমরা রেশন দিয়েছি। দুজন কুলি বাঁশ আনতে নিচে চলে গিয়েছে। এখন

তিনজন কাঠ আনতে যাচ্ছে। এরা তিনজনই মেয়ে, স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী। মেট অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও ছোটদের ছেড়ে দিয়েছে, দশজন স্বাস্থ্যবান যুবক ও এই তিনটি যুবতীকে এখানে রেখেছে। ওদের নাম থাসা, নাজে ও আথি।

কাঁধে দড়ি নিয়ে নাচতে নাচতে নিচে যাচ্ছে ওরা। যেন তিনটি বনহরিণী ছুটে চলেছে।

অসিতবাবু সহসা বলে ওঠে, "না সাঙবার সিলেক্শান্ ভাল বলতে হবে। কাজের মানুষগুলোকে রেখে দিয়েছে।"

"অসিতদা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা ক'রো না।" অসিত গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে।

"কি বলতে চাচ্ছিস তুই?" অসিতবাবুর কণ্ঠে কৃত্রিম ক্রোধ।

অসিত আবার বলে," যে মেয়েটাকে অসিতদা সারা পথে লজেন্স খাইয়েছে, সেটাকে রাখা হয়েছে-তাই না?"

"আমি রেখেছি?"

"কি জানি? মেটাকে কি বলেছো, তা তুমিই জানো।"

"অসিত ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।"

অসিত মোটেই ভয় পায় না। সে আবার বলে, "সুশান্তদা, আমি আজ সারাদিন এখানে থাকব না আর কাল তো ওপরেই চলে যাচ্ছি, আপনারা একটু অসিতদার দিকে নজর রাখবেন।"

"তবে রে!" অসিতবাবু অসিতের দিকে এগিয়ে যায়, অসিত ছুটে কিচেনের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। আমরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

প্যাক্-লাঞ্চ নিয়ে নিল ওরা-অসিত, কেশব, সাঙ্গে ও নওয়াঙ এবং তিনজন টিবেটান হ্যাপ্। ওদের নাম থামডং, নোরগে ও থাল্ডুপ। তিনজনই কষ্টসহিষ্ণু যুবক। গত বছরের সিনিয়লচু অভিযানে মালবাহকের কাজ করেছে। দু-নম্বর শিবির পর্যন্ত পথ ওদের জানা আছে। শেরপা পাই নি, ওরাই এখন আমাদের প্রধান ভরসা।

এবারে ওদের বিদায় নেবার পালা। জানি এ বিদায় নিতান্তই সাময়িক। ওরা আজই ফিরে আসবে। তাহলেও উৎকণ্ঠার কবল থেকে মুক্তি পাই না। যেখানে প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চয়তা আর মৃত্যুর হাতছানি, ওরা সেই জগতে চলেছে। তার ওপর আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যে-কোন মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হতে

পারে। উঠতে পারে তুষারঝড়।

তবু দিতে হবে বিদায়। দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে ওদের যেতে হবে এগিয়ে। এই এগিয়ে যাবার নামই পর্বতারোহণ। আমরা পর্বতাভিযানে এসেছি।

অসিত প্রণাম করে আমাকে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি। একে একে সবাইকে আলিঙ্গন করি। ওরা এগিয়ে চলে। সুশান্তবাবু ছবি তোলেন।

অভিযানের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল। প্রথম পর্যায়ে গাড়িতে করে লাচেন এসেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ে পায়ে হেঁটে মূল-শিবিরে পৌঁচেছি। আর এই তৃতীয় পর্যায়ে পর্বতারোহীরা সিনিয়লচুর গায়ে একনম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করতে যাচ্ছে।

আমরা ওদের এগিয়ে দিই। অসিত আর কেশবের পেছনে পেরিয়ে আসি জেমুনালা। তারপরে জেমু হিমবাহের জীবন্ত অংশ-পাথর আর বরফের ঢেউ, একটির পরে একটি ঢেউ। আস্তে আস্তে নিচু হয়ে অনেক নিচে সিনিয়লচু হিমবাহে মিশেছে। যেমন বিপজ্জনক তেমনি কষ্টকর পথ। সেই পথ পেরিয়ে ওদের পথ-সিনিয়লচু শিখরের ভয়ঙ্কর সুন্দর পথ।

অসিতবাবু ছবি নেয়। আবার করমর্দন আর আলিঙ্গন। তারপরে ওরা এগিয়ে যায়, আমরা থাকি দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। একসময় হিমবাহের ঢেউয়ের মাঝে ওরা যায় হারিয়ে। আমরা ফিরে চলি শিবিরে।

ন'টা বেজে গিয়েছে। বেলা বাড়ছে কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। দেখব কেমন করে? আকাশ যে তেমনি মেঘে ঢাকা। সিনিয়লচু সেই যে সকালে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে, আর তাকে দেখতে পাই নি।

এ অদর্শনের জন্য অবশ্য আপসোস করার কিছু নেই। সকালে তার যে অনিন্দ্যসুন্দর অপার্থিব রূপ প্রত্যক্ষ করেছি, তা আমৃত্যু আমার মনের মুকুরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাছাড়া সকালের সেই দেখা তো শেষ দেখা নয়। আমি যে বেশ কয়েকদিন সিনিয়লচুর পদতলে প্রতীক্ষা করব। তার সঙ্গে আরও বহুবার দেখা হবে আমার। তাকে দেখার জন্যই তো আমার এই অভিযানে আসা। আমি তাকে দেখব দুপুরের উজ্জ্বল আলোয়, বিকেলে আর গোধূলি বেলায়। দেখব রাতের আঁধারে আর চাঁদের আলোয়।

বাইরে বড্ড ঠান্ডা। একে রোদ নেই, তার ওপরে হিমেল হাওয়া। তাঁবুতে আসি। আমি একা। অসিতবাবু ডাক্তারের তাঁবুতে-মেডিক্যাল কিট্ প্যাক করছে।

এখন আমার কোন কাজ নেই। অযথা কষ্ট করি কেন? তার চেয়ে বরং একটু গরম হয়ে নেওয়া যাক। আমি স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ি।

ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকাই। বাইরে ফর্সা হয়ে গেছে। আজ আমি বিদায় নেব সিনিয়লচুর কাছ থেকে। জানি না তার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না?

কটা বাজে! স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে হাত বের করি। টর্চ জ্বালি।

সে কি! এ যে দেখছি সবে সাড়ে এগারোটা! কাল বোধ হয় আর চাবি দেওয়া হয় নি, ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে।

না! ঘড়ি তো ঠিকই চলছে। তাহলে বাইরে এত আলো কেন? তাঁবুর ভেতরটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মনে পড়ে সব কথা। হিমাদ্রি ওপর থেকে চাল-আটা ও আলু পাঠিয়ে দিয়েছে। ভাত-ডাল আলু সেদ্ধ ও ডিম ভাজা দিয়ে 'ডিনার'সেরেছি। প্রায় দেড় দিন পরে ভাত খেয়ে রাত আটটায় তাঁবুতে ঢুকে পড়েছি। একটু বাদে হরলিক্স এসেছে। তার পরে অসিতবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছি, ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে তখন বাইরে বেশ বরফ পড়ছিল।

এখন এত আলো কেন? তাহলে কি তুষারপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে? আকাশে চাঁদ উঠেছে? বাইরে বেরোলে দেখা হবে সিনিয়লচুর সঙ্গে?

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। উইন্ড-প্রুফটা গায়ে দিই। কোন রকমে জুতোয় পা গলিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে।

এ আমি কোথায়! এ কি আমার সেই পরিচিত পৃথিবী! না, না-এই তো স্বর্গ।

মাথার ওপরে চন্দ্রাতপের মতো নীলাকাশ। আকাশে কৃষ্ণা-চতুর্থীর চাঁদ আর ভাসমান মেঘের দল। আকাশটা নেমে এসেছে পাশের গিরিশিরার মাথায়। আর সিনিয়লচু?

না, সে সোনা নয়, রুপো নয়, তামা নয়। সিনিয়লচু মুক্তোর পাহাড়ে পরিণত। তার সারা শরীরে আলোর ঝালর। আলো তার গা বেয়ে গলে-গলে পড়ছে। সেই প্রতিফলিত আলোকশিখায় সমস্ত জেমু হিমবাহ উদ্ভাসিত, আমার চারিদিকের জগৎ মোহময়।

এই অপার্থিব অপরূপ রূপ একা উপভোগ করার নয়। তবু আমি কাউকে

ডাকতে পারি না। আমি যে নিজের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, আমার সব কথা গিয়েছে ফুরিয়ে। আমি শুধু সিনিয়লচুর দিকে রয়েছি তাকিয়ে। তাকে দেখছি আর দেখছি। এই দেখা ছাড়া এখন যে আমার আর কিছু করার নেই।

শুধু সিনিয়লচু নয়, লিটল সিনিয়লচু, টেন্ট, পিরামিড, নেপাল আর কাঞ্চনজঙ্ঘা-সবাই সুন্দর, সবাই মণিময় হিমালয়। কিন্তু সিনিয়লচু? তার সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না।

আজই এমন, পূর্ণিমায় না জানি কেমন? গত পূর্ণিমায় আমি এখানেই ছিলাম, কিন্তু সেদিন রাতে দেখা হয় নি চাঁদের সঙ্গে, সিনিয়লচু মেঘের ঘোমটা মাথায় টেনে নেয়।

পূর্ণিমার রাতে সিনিয়লচুর সঙ্গে দেখা হয় নি বলে আমার আর কোন দুঃখ রইল না। আজ এই কৃষ্ণা-চতুর্থীতে যা দেখলাম, তারও তুলনা নেই!

কিছুক্ষণ আগে এই শিবিরকে আমার স্বর্গ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল ভেবেছি। কারণ স্বর্গ কোথায়, স্বর্গ কেমন, কিছুই যে জানি না আমি। স্বর্গে ঠাঁই পাবো কিনা, তাও জানা নেই আমার।

না পেলেও আর কোনো দুঃখ রইল না। স্বর্গ যত সুন্দরই হোক, এর চেয়ে সুন্দর নয়। মর্ত্যের মাটিতে দাঁড়িয়েই আজ আমার স্বর্গ-দর্শন হয়ে গেল।

মানুষ সুন্দর, মাটি সুন্দর, সাগর সুন্দর। আকাশ সুন্দর, বাতাস সুন্দর আর পাহাড় সুন্দর। কিন্তু সবার সেরা সুন্দর কে?

না, সিনিয়লচু নয়। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মাটিকে সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়ে সুন্দর যে আর কেউ নেই, কিছু নেই।

অনিন্দ্যসুন্দর সিনিয়লচুর দিকে তাকিয়ে আমি সেই অনন্ত সুন্দরের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করছি। আমি আমার সর্বসত্তায় তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করছি।

আজ আমার সুন্দরের অভিসার পূর্ণ হল।

গোপালকৃষ্ণ রায়

নাথু-লা

অবশেষে লটারি করে যাত্রা পথ ঠিক করা হল। লটারির প্রস্তাব দিয়েই রুদ্রমণি প্রধান সোনাম ডেলেক হোটেলের ঝকঝকে কাঁচের সার্সি দিয়ে খাঙ চে জোঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা তখন কপালে উদীয়মান সূর্যের টিপ পরে অপরূপা হয়ে উঠেছে।

রুদ্রমণির আমন্ত্রণে এসেছি গ্যাংটক। কয়েক'শ বছর আগে তিব্বতি ভাষায় যাকে বলা হত 'গান্তোক' অর্থাৎ পর্বত শীর্ষ। ইংরেজরা 'গান্তোককে' গ্যাংটক উচ্চারণ করত। সুতরাং শতাব্দী প্রাচীন 'গান্তোক'উনবিংশ শতাব্দীতে গ্যাংটক হয়ে যায়। সিকিমের আদিবাসী লেপচা ভোটিয়াদের উচ্চারণের মধ্যে এখনও অবশ্য গান্তোকই শোনা যায়।

রুদ্রমণি প্রধান তখনও নির্নিমেষ দৃষ্টিতে খাঙ চো জোঙ্গা বা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে আছেন। অমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানো বড়ই কঠিন। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চোখ রেখেই রুদ্রমণি বলেন, খাঙ চে জোঙ্গার' তিব্বতীয় মানে নিশ্চই আপনার জানা। জবাবের প্রতীক্ষা না করেই রুদ্রমণি বলেন, পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট তুষার শৃঙ্গ।

কোহলি অনেকক্ষণ চুপ করে আছেন। আমাদের কথোপকথনে তাঁর কোন মন নেই! অপরূপা প্রকৃতিকে ক্যামেরা বন্দী করতে ব্যস্ত। কাশীর কোহলীর সঙ্গে বাগডোগরায় পরিচয়। স্বল্প-বাক্ মানুষটি আমাদের সঙ্গ পেতে চান। একই ট্যাক্সিতে সিকিম বা সু-খিমের রাজধানী গ্যাংটকের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হল। চলন্ত ট্যাক্সিতে বসেই গোটা পথের ছবি তুললেন কোহলি। নীরব প্রকৃতি প্রেমিক। সবুজের অনুপম সমারোহে পঞ্চাশোর্ধ কাশীবাসী কোহলির প্রায় দু'দশক বয়স কমে গেছে। তাঁর উচ্ছ্বাসে চাপল্য নেই, আছে অনাবিল মুগ্ধতা। তাঁর চোখ মুখ থেকে এই মুগ্ধতা হয়তো একদিন মুছে যাবে-মনের মুগ্ধতা তিনি আজীবন রোমন্থন করবেন। কোহলি কলরব করেন না, চেরি ব্লসম আর ম্যাগনোলিয়ার রূপের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন।

রুদ্রমণি বলেন, তাহলে লটারি করা যাক। জেনে রাখুন, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, উত্তর ও পূর্ব সিকিমে যাওয়া কঠিন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া, ওদিকে যাওয়া যায় না। দক্ষিণ ও পশ্চিমে যেতে কোনও বাধা নেই।

সিকিমের উত্তর ও দক্ষিণ ও পশ্চিম আমার দেখা আছে। উত্তর সিকিমের লাচেন ও পাচুং যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সান্নিধ্য আরও মনোরম। এপ্রিল মে-তে পুষ্পিত রডডেনড্রন উত্তর সিকিমের মানুষের অদেখা স্বর্গের নন্দন কাননে রূপান্তরিত করে।

মন মাতাল করা রডডেনড্রনের সেই রূপ কোহলি দেখেননি। পূর্ব সিকিমের মতো উত্তর সিকিমে যাতায়াতে অনেক বিধিনিষেধ আছে। সেই বিধি-নিষেধকেই যদি ডিঙোতে হয়, তবে পূর্ব সিকিম নয় কেন?

আগেই বলেছি দক্ষিণ ও পশ্চিম সিকিমে পর্যটনে বাধা নেই। দক্ষিণ সিকিম জেলার সদর শহর নামচিতে রাত কাটিয়েছি। সৌন্দর্যে মেঘালয়ের ডাউকির মতো। পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি আমাকে ডাউকির কথাই মনে করিয়ে দেয়। পশ্চিম জেলার সদর শহর গ্যালাসিং নামচি থেকে মাত্র তিন ঘন্টার পথ। পায়ে হেঁটে নয় মোটরে। পশ্চিম সিকিমে পেমাইয়াংসিতে একটি সরকারি পর্যটন নিবাস আছে। রুদ্রমণি বলেন, পেমাইয়াংসি মানে জানেন? কোহলি এবার রুদ্রমণির মুখের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেন। অনেক শব্দই তার অজানা। জানার কৌতূহল থাকলেও, তা চোখে-মুখে ফুটে ওঠে না। প্রশ্ন করেও জানতে চান না। শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন।

রুদ্রমণি বলেন, 'ভূমাপদ্ম'। পেমাইয়াংসির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সঙ্গে 'ভূমা পদ্ম' এর যথেষ্ট মিল আছে। পর্যটন নিবাসের পাশেই রয়েছে সিকিমের অন্যতম প্রাচীন পেমা ইয়াংসি গোম্ফা। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লামা লাচেন চেম্‌বো।

রুদ্রমণি একবার বলতে শুরু করলে সহজে থামতে চান না। বাধা দিলে গোঁসা করেন।

— আপনি তো এরপর খেচিপেরি লেকের কথা বলবেন। সেটাও তো দেখা আছে। কোহ্‌লি এবার নরম গলায় বলেন, লেকটার যেন কি নাম বললেন?

— খেচিপেরি। পেমাইয়াংসি থেকে তেত্রিশ কি.মি. দূরে অবস্থিত। প্রায়

চার হাজার. ফুট উচ্চতায় অবস্থান।

রুদ্রমণিকে মনে করিয়ে দিই, সিকিমবাসীদের কাছে লেকটি বড় পবিত্র। তাদের বিশ্বাস, লেকটি পাহাড়ের উপরে নয়, দেবী দোলমার কোলে অবস্থান করছে। এর জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। ঘন গাছপালায় পরিবেষ্টিত লেকটির অলৌকিকত্ব সিকিমের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের অনেকের কাছেই পরিচিত। কেউ কখনও লেকের জলে গাছের একটি পাতাও ভাসতে দেখেনি। বাতাসে যদি কখনও পাতা উড়ে এসে পড়ে, বুনো পাখি উড়ে এসে পাতাটি ঠোঁটে করে তুলে চলে যায়। খেচিপেরি লেকের অলৌকিকত্ব কাশীর কোহলির মনে অধ্যাত্ম রসের সঞ্চার করে। মনে হয়, রুদ্রমণিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি পশ্চিম সিকিমেই যেতে চাইছেন।

কোহলির অধ্যাত্ম চিন্তাকে উস্কে দিয়ে রু দ্রমণি বলেন, পশ্চিম সিকিমে দুটি গিরিপথ রয়েছে। কাঙলাচেন ও চিয়াভঞ্জন।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি-উত্তর সিকিমে রয়েছে তিনটি গিরিপথ-ডোঙকিয়া, কোঙ্‌রা লামু, আর একটা যেন কি?

রুদ্রমণি হেসে বলেন, না-কু।

পূর্বের গিরিপথগুলির নাম বলে দিন। রুদ্রমণি বলেন, আমি জানি, ওই গিরিপথগুলিই আপনাকে টানছে। গিরিপথগুলির নাম হল, জেলেনা-লা, নাথু-লা, চো-লা ও থাঙ্কা-লা। কোহলি বলেন, সিকিমে মোট নয়টি গিরিপথ আছে।

রুদ্রমণি বলেন, এই নয়টি গিরিপথের কথাই আমাদের জানা আছে। ঘন অরণ্য আর অত্যুচ্চ তুষারাবৃত পাহাড়ের মধ্যে অনাবিষ্কৃত আরও গিরিপথ থাকতেই পারে।

প্রশ্ন ওঠে কোন গিরিপথের দিকে আমরা এগোব। পুবে আর উত্তরে অনেক বিধিনিষেধ। অনেক কাঠ খড় না পোড়ালে পূর্বে আর উত্তরে যাওয়া যায় না। দক্ষিণ ও পশ্চিম পর্যটকদের কাছে পরিচিত। পরিচিত জায়গায় নতুন কোনও থ্রিল নেই। অপরিচিতকে জানার মধ্যে যে আনন্দ, তার কিন্তু তুলনা নেই।

রুদ্রমণি বলেন, তাহলে লটারি করা হোক। কোহলি হেসে ওঠেন। তাঁর কাছে সিকিমের সব দিকই সমান। সবদিকেই তিনি স্বর্গীয় শোভা দেখতে পান। সব দৃশ্যই তিনি ক্যামেরায় বন্দী করতে চান।

রুদ্রমণির কাছে বিধিনিষেধ, এমন কিছু ব্যাপার নয়। পুবের পথে তিনিও

যে যেতে চান,.তা আমার অজানা নয়। মানুষটি ধান ভানতে শিবের গীত গান সত্য, কিন্তু তার গানের মধ্যে যে সুর থাকে, তা প্রতিটি মানুষের অন্তর ছুঁয়ে যায়।

অবশেষে লটারি করেই গন্তব্য স্থান নির্ধারণ করা হল। দু'টুকরো সমান সাইজের কাগজে পূর্ব আর পশ্চিম লিখে, ভাল করে মুড়িয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন রুদ্রমণি। কোহলিকে বলা হল যে কোনও একটি তুলতে। কাশীর কোহলি ছুটে গিয়ে তুলে আনলেন একটি। খুলেই রুদ্রমণি বললেন, আপনি জিতে গেছেন। আমরা নাথু-লা যাব।

আমাদের দু'জনকে অবাক করে দিয়ে, কোহলি বললেন, খুব ভাল হল। গুরু পদ্মসম্ভবা অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য এই গিরিপথ দিয়েই নাকি সিকিম ও ভূটানে প্রবেশ করেছিলেন।

উচ্ছ্বসিত রুদ্রমণি কোহলিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এর আগে কি আপনি এই পথে এসেছিলেন? কোহলি বললেন, সিকিমে আমি এই প্রথম এলাম। আসবার আগে, স্থান, কাল ও মানুষ নিয়ে সামান্য পড়াশুনা করেই এসেছি। এটাই আমার অভ্যাস।

কোহলিকে আরও ভাল লেগে যায়। শুধু নিসর্গ সৌন্দর্যকে ক্যামেরায় বন্দী করে রাখেন না, তাকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করার জন্য ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত রাখেন।

কোহলি বলেন, পূর্ব সিকিমে যে কটা গিরিপথের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, এগুলি দিয়েই সিকিম থেকে তিব্বতে সহজে যাওয়া যায়। এই গিরিপথগুলি চুম্বি উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। সিকিম-ভূটান ও তিব্বতের সঙ্গমস্থল চুম্বি। চুম্বির নৈসর্গিক শোভা নাকি ইন্দ্রের নন্দন কাননকেও হার মানায়। সিকিম রাজারা আগে চুম্বিতেই থাকতেন। বহু রক্তাক্ত সংঘর্ষের সাক্ষী চুম্বি। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর, চুম্বি যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেসব সিকিমের অধিবাসী মর্ত্যের নন্দনকানন চুম্বিতে বসবাস করছিলেন, ১৯৬২ সালে তাঁরা সিকিমে ফিরে এসেছেন।

রুদ্রমণি সহজেই অনুমতি পত্র জোগাড় করে ফেললেন। আমার জানা আছে, কর্তৃপক্ষ এখন কড়াকড়ি অনেক শিথিল করেছেন। ১৯৬২ সালের পর প্রায় দু'দশকের বেশি সময়, সাধারণ নাগরিকেরা নাথু-লায় যেতে পারতেন না। সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে যেতে হত। এখন অনুমতিপত্র হাতে নিয়ে

যে কেউ নিজের গাড়ি অথবা ভাড়া গাড়ি নিয়ে নাথু-লায় চলে যেতে পারেন।

১৯৭৪ সালে, কড়াকড়ির সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে আমরা একদল সাংবাদিক নাথু-লা গিয়েছিলাম। রুদ্রমণি ও কোহলিকে সে কথা ইচ্ছে করেই বলিনি। ভেবে রেখেছি গ্যাংটক থেকে নাথু-লা, ৫৫ কি.মি পথ যেতে যেতে সেবারের অভিজ্ঞতার কথা বলব। তেইশ বছর আগের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখতে খারাপ লাগবে না।

অনুমতি পত্রের কড়াকড়ি হ্রাস করা হলেও, এখনও অনেক বিধিনিষেধ বহাল রয়েছে। নিরাপত্তার কারণেই সেগুলি শিথিল করা হয় নি। যেমন নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত এলাকার কোন ছবি তোলা যায় না। ছাঙ্গু লেকের পরে কেউ ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারবে না। দশ হাজার ফুট ওপরে নিরাপত্তা বাহিনীর ট্র্যানজিট ক্যাম্পে ক্যামেরা জমা রেখে নাথু-লার পথে এগোতে হবে। নাথু-লার উচ্চতা ১৪৭৫০ ফুট। দশ বছর বয়সী কোনও বালক বালিকার সেখানে যেতে অনুমতি মেলে না। উঁচুতে অনেকেই অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ বোধ করেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট একান্ত জরুরী।

নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক পর্যটককেই নাথু-লা যাবার পথে, বেলা ১১ টার মধ্যেই থেগু ট্র্যানজিট ক্যাম্প অতিক্রম করতে হবেই এবং বেলা ১ টার মধ্যেই নাথু-লা থেকে থেগুতে ফিরে আসতেই হবে।

স্বাভাবিক কারণেই কোহলির মন খারাপ হয়ে যায়। ছাঙ্গু লেক থেকেই প্রকৃতির রঙ বদল শুরু হয়। ছাঙ্গু লেক থেকেই তুষারপাত শুরু। সবুজ পাহাড় ধবল তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ছাঙ্গুর জল জমে বরফ হয়ে যায়। দীর্ঘ বরফের পাত বুকে নিয়ে সে শান্ত সমাহিত। সেই সব দৃশ্য কোহলি তাঁর ক্যামেরায় বন্দী করতে পারবেন না। কাশীর মানুষটির মুখে বিষণ্ন ছায়া নেমে আসে। অনুমতিপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে আশ্বস্ত করার মত আশ্বাস দিতে পারি না। রুদ্রমণি একটু দ্বিধায় পড়লেও, কোহলিকে আশ্বস্ত করেন। চলুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

কী করে যে ঠিক হবে, তা কোহলি বুঝতে পারেন না। রুদ্রমণির কথায়, আশ্বস্ত না হলেও, আশ্বস্ত হওয়ার ভান করেন তিনি।

এবারের শীত সর্বত্রই দীর্ঘস্থায়ী। গ্যাংটকও তার ব্যতিক্রম নয়। মধ্য এপ্রিলে অক্টোবরের কনকনে ঠান্ডা। ঘন কুয়াশা। ভোর ছ'টায় হেডলাইট জ্বালিয়ে গ্যাংটক

থেকে নাথু-লার পথ ধরি।

সিকিম ও তিব্বতের মধ্যে নাথু-লা একটি স্বীকৃত বাণিজ্য পথ। পাহাড় ঘুরে ঘুরে এই পথ ক্রমাগত উপরে উঠেছে। ৫৫০০ ফুট থেকে আমাদের উঠতে হবে ১৪,৭৫০ ফুট। ১৯৬০ সালের আগে ছিল মেঠো পথ। যন্ত্রযানের মধ্যে জিপ ছাড়া কিছুই যেত না। খচ্চর ছিল একমাত্র বাহন। সওদাগরেরা খচ্চরের পিঠে বসেই ৫৫ কি.মি. পথ অতিক্রম করে বাণিজ্য করতেন।এখন পথ পাকা হলেও বাণিজ্য বন্ধ। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এই পথকে পাকা করা হয়েছে। এই দুরূহ কান্ড সম্পন্ন করেছে সীমান্ত সড়ক সংস্থা বা বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন- যার জন্ম হয়েছিল ১৯৬০ সালে।

নাথু-লার পথে চলতে চলতে ১৯৭৪ সালের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গত ২৩ বছরে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৭৫ সাল থেকেই সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। চোগিয়াল প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মত জনপ্রিয় সরকার সিকিমের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। উত্তর ও পূর্ব সিকিমে যাতায়াতের কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গ্যাংটক পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। বছর দশেক আগেও দার্জিলিং যে সুবিধা ভোগ করত, তার বেশিরভাগটাই এখন গ্যাংটক ভোগ করছে। দার্জিলিং-এর মতো এখানে আন্দোলন নেই, বনধ্ নেই, নিরাপত্তার জন্য কোনও উদ্বেগ নেই। গত ২৩ বছরে গ্যাংটকের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। হোটেল এখন গ্যাংটকে শিল্পের পর্যায় উন্নীত।

বেলা ৯ টার মধ্যেই থেগু ট্রানজিট ক্যাম্পে পৌঁছে যাই। অনেক আগে কুয়াশা কেটে গেছে। রাস্তার দু'ধারে সবুজ পাহাড়ে রুপোলি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এখানেই অনুমতি পত্রের এককপি জমা দিতে হল। আর এক কপি জমা দিতে হবে 'সেরাথাঙ আউট পোষ্টে।

আগেই বলেছি এবার শীত সর্বত্রই দীর্ঘস্থায়ী। মধ্য এপ্রিলে থেগুতেই অক্টোবরের ঠান্ডা। এবার গাড়ির সার্শি বন্ধ করতেই হয়। প্রবল আপত্তি জানান কোহলি। তিনি ছবি তুলতে তুলতে চলেছেন। তাঁর মতে অন্তত ছাঙ্গু লেক পর্যন্ত গাড়ির জানালা খোলা থাক। গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গু লেক পর্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি ক্যামেরায় ধরা থাক।

রুদ্রমণি বলেন, ছাঙ্গু লেক পৌঁছানোর আগেই যদি ১৭ মাইলের ট্রানজিট ক্যাম্পে আপনার ক্যামেরা জমা দিতে হয়, তাহলে তো আর ছাঙ্গু লেকের ছবি তুলতে পারবেন না। ১৭ মাইলের ট্রানজিট ক্যাম্প দশহাজার ফুট উপরে অবস্থিত। ব্যাপক ভাবে না হলেও বরফের সূত্রপাত এখান থেকেই। দু'পাশের পাহাড় শীর্ষে তুষারের আলপনা। রাস্তার কোথাও কোথাও মসলিন তুষারের আস্তরণ। হিমালয় থে কে ছুটে আসছে হিমেল হাওয়া।

হঠাৎ রুদ্রমণি বলেন, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সসৈন্য তিব্বতে ঢুকেছিলেন ইংরেজ সেনানী কর্ণেল ইয়ং হাজব্যান্ড।

— ইয়ং হাজব্যান্ড। মানে যুবক স্বামী। কার স্বামী? রুদ্রমণি হেসে বলেন, বাংলায় মানে করলে অবশ্য তাই দাঁড়ায়। সেনানীটির নামই ইয়ং হাজব্যান্ড। তিনি নাথু-লা গিরিপথ দিয়ে তিব্বতে ঢুকেছিলেন, অথবা কয়েক কি.মি. নীচে জেলেপ-লা দিয়ে চুম্বি ভ্যালিতে পৌঁছেছিলেন তা আমার জানা নেই। তিব্বতীরা সিকিমের একটা গ্রাম দখল করে বসেছিল। তাদের হঠাতেই কর্ণেল ইয়ং হাজব্যান্ড এই পথ ধরে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। সেই গ্রাম থেকে তিব্বতীদের হটিয়ে দিয়ে চুম্বিতে ঘাঁটি গেড়েছিলেন তিনি। তখনও অবশ্য মেটাল্ড রাস্তা হয়নি, ১৯৫৮ সালেও কাঁচা সড়ক ধরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নাথু-লা গিয়েছিলেন। তার আগে থেকেই সীমান্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। ১৯৬২ সালে চীন ভারত সংঘর্ষের শুরু থেকেই সব গিরিপথ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালেই কিছু অবাঞ্ছিত চীনা নাগরিককে নাথু-লা গিরি পথ দিয়ে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে শুনেছিলাম, একমাত্র ডাক বিনিময় ছাড়া নাথুলা দিয়ে আর কিছু করা যেত না। সীমান্ত এলাকায় দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাছে ডাক ব্যাগ ছুঁড়ে দেওয়া হত।

তুষারাবৃত নাথু-লার শিখরে উঠে তেমনি একটা অবস্থা দেখেছিলাম। স্মরণে স্থায়ী করে রাখার মতো ঘটনা। সেনাবাহিনীর জিপে নাথু-লার শীর্ষে পৌঁছে গেলাম। আমরা এখন প্রায় পনেরো হাজার ফুট ওপরে একেবারে তুষারাবৃত হিমালয়ের বুকে। আকাশের গায়ে যেন মিশে আছে তুষার ধবল শৃঙ্গগুলি। রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে সরিয়ে নাথু-লা শিখরে পৌঁছলাম। শুধু বরফ আর বরফ। আমাদেরও নামতে হবে প্রায় এক ফুট বরফের উপর। গায়ে র‍্যাগ জড়িয়ে পায়ে ডবল মোজা পরে, আমার সহকর্মীরা কোনওরকমে ছুটে গিয়ে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কিন্তু

আমাকে নামতে দেওয়া হল না। আমার ধুতি-পাঞ্জাবি আর শাল নাথু-লার শীতে যথেষ্ট নয়। তার উপর পায়ে মোজা নেই। ফ্রস্ট বাইট হতেই পারে।

রুদ্রমণি বললেন, সত্যি আপনাকে নামতে দেওয়া হল না?-আমাদের গাইড জনৈক কর্ণেল বড়ই মহানুভব ব্যক্তি। আর্মির এক জোড়া নতুন মোজা দিলেন। অস্বীকার করব না মোজা পরার পর আমি অনেক বেশি আরাম পেলাম। একটা মাঙ্কি ক্যাপও আমায় দেওয়া হল। সেটাও গলিয়ে নিলাম।

এক চিলতে ঘাসও নাথু-লার শিখরে নেই। ব্যতিক্রম একটি তুলসি গাছ। কোনও ধার্মিক সেনানী টবের মধ্যে তুলসি গাছটি রেখেছে। তার ভক্তির প্রভাবেই হোক, অথবা প্রকৃতির করুণাতেই হোক, তুলসি গাছটি বেঁচে আছে।

পাহাড়ের মাঝখানে একটি কাঁটা তারের বেড়া। এই বেড়া কতদূর বিস্তৃত আমার জানা নেই। শিখরের কাছাকাছি দু' একটি জায়গা ছাড়া-সবটাই বরফের নীচে। সমস্ত এলাকাটাই রজতশুভ্র। শ্বেতশুভ্র এমন নৈসর্গিক পরিবেশ, শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায়, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। হিমালয়ের এই রূপ বর্ণনার অতীত।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে সর্বোচ্চ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পৌঁছলাম। কাঁটা তারের বেড়ার ওপাশে একই ধরণের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে রাইফেল হাতে প্রহরারত একজন চৈনিক সেনা। দুটি ক্যাম্পের অবস্থান ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের মধ্যে। চীনা সেনানীকে হাত দিয়ে ইশারা করলাম। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। আবার করলাম, আবারও ফিরিয়ে নিল।

হঠাৎই মাইকের শব্দে চমকে উঠি। ভারতের দিকে মুখ করে একটি লাউড স্পিকারে হিন্দী ভাষায় কী যেন বলা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর শুরু হল। আমাদের এলাকার লাউড স্পিকারটিও সরব হয়ে উঠল। চীনা ভাষায় প্রায় মিনিট পাঁচেক চলল মাইকের যুদ্ধ। মাইকের যুদ্ধ মেশিনগানে পর্যবসিত হল না। শেষবারের মতো চৈনিক সেনাকে ইশারা করলাম। হেসে হাত নেড়ে সে আমার ইশারার জবাব দিল।

বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই ছাঙ্গু লেকে পৌঁছে গেলাম। হিমালয়ের হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়ে, ছু-আর খোলা ভাসিয়ে ছাঙ্গুর জল মিশেছে তিস্তায়।

এবার ছাঙ্গুর চেহারাটাই পালটে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী শীতের জন্য ছাঙ্গু লেক

বরফাচ্ছন্ন। মনে হয়, কে যেন একটি বিশাল রুপোর পাত বিছিয়ে রেখেছে। পরিবর্তন আরও অনেক ক্ষেত্রে ঘটেছে। ২৩ বছর আগে, নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি ছাড়া, আর কোনও গাড়ি চলাচলই করত না। মানুষজনের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। ধস আর বরফ সরাবার জন্য সততই ব্যস্ত থাকত সীমান্ত সড়ক সংস্থা। পাবলিক ভেহিকলের জন্য মাঝে মাঝে রাস্তা জ্যামও হচ্ছে। ট্রাফিক কন্ট্রোলও করা হচ্ছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নাথু-লা যাবার কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়েছে।

২৩ বছর আগে যে ছাঙ্গু লেক ছিল কার্যত নির্জন, সেখানে এবার দেখলাম হট্টমেলা। পথের ধারে, পাহড়ের ঢালুতে রেস্তোরাঁ। গরম পোশাক ভাড়া দেবার দোকান। চা-ওমলেট শুকনো ফল ভালই পাওয়া যায়। অবশ্য একটি দোকানও স্থায়ী নয়। সকাল ১০ টা থেকে চারটে পর্যন্ত এখানে বিকিকিনি চলে। মাত্র ছ'ঘন্টার জন্য বেচা-কেনার অনুমতি দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। নীচে বরফাবৃত ছাঙ্গু লেক-সামনে তুষারমৌলী হিমালয়ের অসংখ্য শৃঙ্গ। এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, কার না এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে। কে এমন হৃদয়হীন আছেন, যিনি ফুলের অপূর্ব সমারোহ দেখে বিস্মিত হবেন না। ছাঙ্গ লেকের নিসর্গ শোভা তো প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদ। এ সম্পদ চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। এ দৃশ্য মনের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতে হয়।

অবশেষে নাথু-লা। প্রাকৃতিক কোনও পরিবর্তন নেই। তেইশ বছর আগে হিমালয় যেমন তুষারমন্ডিত ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে। হিমালয় আগের মতই মৌন-আগের মতোই ধ্যানমগ্ন। কাঁটা তারের বেড়ার এ পারে ও পারে নিরাপত্তা বাহিনীর চৌকিগুলো ঠিক তেমনই রয়েছে। নেই শুধু তুলসী গাছটি। সে মরে গেছে-অথবা যিনি এনেছিলেন, সেই ধার্মিক সেনানী সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, এ খবর আমি পাইনি।

আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মাইকের যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। এখন আর এ পারের রক্ষীকে দেখে ও পারের রক্ষী মুখ ফিরিয়ে নেয় না। হাসি দিয়েই হাসির জবাব মেলে। চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। প্রাচীন গিরিপথ নাথু-লা আর জেলেপ-লা দিয়ে আবার দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হবে। তুষার ধৌলী হিমালয় যে শান্তির প্রতীক।

আইন ভাঙেননি কোহলি। ট্রানজিট ক্যাম্পে তাঁর ক্যামেরাটি জমা দেননি

সত্য, নাথু-লা শিখরে ক্যামেরা নিয়ে নামেননি।

কোহলি বলেন, আরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ছাঙ্গু লেকের ছবি তুলতে আমাকে কেউ বাধা দেয়নি। এমন কি আমি নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি আর জওয়ানদের ছবি তুলেছি। অবশ্য অনুমতি নিয়ে।

এবার ফেরার পালা। বেলা ১ টার মধ্যেই থেগুতে পৌঁছতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়মের শৈথিল্য করলে চলবে না।

রুদ্রমণি বললেন, অদূর ভবিষ্যতে আরও কিছু পরিবর্তন আশা করা যায়। হয়তো শতাব্দী প্রাচীন গিরিপথ দিয়ে আবার দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হবে।

বলি, হাতে আর একটু সময় থাকলে, নাথু-লা থেকে ছ'কি.মি নীচে ভিন্ন পথে বাবা হরভজনে যেতে পারতাম। ওটিও একটি শিখ তীর্থ। বাবা হরভজনের নীচে ছাঙ্গুর মতো আরও একটি লেক আছে। নাম মানমাই-চু লেক। পূর্ব হিমালয়ের আর একটি দর্শনীয় সম্পদ।

সুনীল চৌধুরী

কোশলরামের মাতৃভক্তি

বদরীনারায়ণ পর্যন্ত তখনো মোটর বাসের পথ তৈরি হয় নি। মাটি পাথর সাজিয়ে পি-ডবলু-ডি যোশীমঠ থেকে বদরীনারায়ণ পর্যন্ত পথ দেখাশোনা করে।

যে দিনের কথা বলছি সে আজ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর আগের। তাই আমার পথের বর্ণনার সঙ্গে সব জায়গায় মিল থাকবে না। পায়ে হাঁটা পথে আজ আর কেউ যায় না বদরীনারায়ণ। তাছাড়া পায়ে হাঁটা পথ বাস পথের দৌরাত্ম্যে কোথায় হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। আমার সময়ের যাঁরা তাঁরা পুরনো দিনের পথের কথা শুনে স্মৃতির রোমন্থন করবেন। আজকের বাসযাত্রীরা সেই প্রাচীন পথের কংকাল অবশ্যই দেখতে পাবেন হনুমান চটিতে, কারণ আগের হনুমান চটি আজও প্রায় একই রকম আছে। ব্যতিক্রম কেবল বাস পথ টুকু।

পথের পাশে দ'এক মাইল অন্তর দোকান-পাট আর ধর্মশালা-চটি। যার যেমন ইচ্ছে থাকতে পারে যে কোনো চটি অথবা ধর্মশালায়। ঘর ভাড়া বলে কিছু নেই। চটি অথবা ধর্মশালার চৌকিদারদের দোকান থেকে খাবার কিনে খেলে থাকা ফ্রি।

কেবলমাত্র হনুমান চটি থেকে বদরীনারায়ণ পর্যন্ত এই ছয় সাত মাইল পথে দোকান-পাট থাকলেও রাত্রিবাসের জায়গা নেই। যেখানেই চড়াই পথের শেষ সেখানেই চায়ের দোকান আর জলসত্র আছে।

সেদিন হনুমান চটি থেকে বেরিয়েছি সকালে। কাঁধে ঝোলা। তার মধ্যে আমার জামা-কাপড়, গামছা, কম্বল আর টুকিটাকি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সাকুল্যে ওজন প্রায় আট দশ সের হবে।

অলকানন্দা নদীর ডান ধার ঘেঁষে প্রায় মাইল দুয়েক পথ সোজাসুজি। কোনো চড়াই বা উৎরাই নেই। পথটুকু দ্রুত পার হয়ে একটা চড়াইয়ের সামনে এসে থমকালাম। পাহাড়ের গায়ে জিগজ্যাগ উঠে গেছে পথটি-ইংরেজী জেডএর আকারে। মাঝে মাঝে আবার সর্টকাট, পাকদন্ডি। পথের দূরত্ব কমানোর জন্য। এ-পথ স্থানীয় পাহাড়ী মানুষ ও মালবাহকরা পায়ে হেঁটে তৈরি করেছে চলার পথের দূরত্ব

কমানোর জন্য।

বদরীনারায়ণের সর্বশেষ কঠিন চড়াই পথের শুরু এখান থেকেই। পথের ধারে কোনো গাছপালা নেই। বড় পাথরও নেই যার আড়ালে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। মাথার ওপর সূর্যের খরতাপ। পরিশ্রমে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

জিগজ্যাগ পথ ওঠা শুরু করলাম। বেশ কঠিন চড়াই। মাঝে মাঝে দূরত্ব কমানোর জন্য পাকদন্ডি ধরে উঠছি। এ পথে বেশি কষ্ট হলেও পথের দূরত্ব কমে যায়-তাই মাঝে মাঝে পাকদন্ডি প্রলোভন দেখায় পদযাত্রীকে।

বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে। মাথার ওপর সূর্যের গা-জ্বালানো দীপ্তি। দশ হাজার ফুট উচ্চতায়ও মনে হয় যেন পশ্চিমের কোনো খরতাপ অনুচ্চ মালভূমির ওপর দিয়ে চলেছি। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, পিপাসায় গলা কাঠ — ক্লান্ত লাগছে বেশ।

বড়সড় একটা পাকদন্ডি উঠে বড় রাস্তায় এসেই থমকালাম। মাঝবয়েসী কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক কান্ডিতে করে এক বৃদ্ধা মহিলাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন। সঙ্গে একজন মালবাহক , ছোট একটা বেডিং তার পিঠে। দেখার মতই দৃশ্য।

ভদ্রলোক গলদঘর্ম হয়ে কিছুটা চড়াই পথ উঠে থামছেন। খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার চলছেন। দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের বেশ কষ্ট হচ্ছে। অনভ্যাসের ফলে দেড় মণের মত ওজন বইতে হাঁপাচ্ছেন।

অনেকক্ষণ ওদের পিছনে পিছনে হেঁটে আমার চড়াই পথ চলার কষ্টের কথা ভুলে গেছি। আসলে আমি ভাবতেই পারছি না, স্যুট পরা একজন বয়স্ক মানুষ কুলির পিঠে সামান্য মালপত্র চাপিয়ে নিজে প্রায় দেড়মণ ওজনের একটা জীবন্ত মানুষকে বইছে কোন কারণে?

এক সময় কঠিন চড়াই পথ শেষ হল।

সামনে দিগন্তপ্রসারী নীল আকাশের পটভূমিকায় তুষারাবৃত পর্বতমালা ভেসে উঠল। আর সেই পর্বতমালার পাদদেশে সবুজ প্রান্তরে সোনালী আলোয় ঝলমলে বদরীনারায়ণের মন্দির দেখা গেল। যাত্রীরা জয়ধ্বনি দিল। আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করল।

চড়াই পথের শেষ সমতল জায়গাটার নাম দেবদেখানী। এখানে বড় বড়

দুটো চায়ের দোকান রয়েছে দেখলাম। যাত্রীরা ওখানে বিশ্রাম করছে, পিপাসা মেটাচ্ছে।

ভদ্রলোক একটা সমতল বড় পাথরের ওপর কাণ্ডিটা নামিয়ে বৃদ্ধা মহিলাকে নেমে আসতে সাহায্য করলেন। তারপর ওঁরা চায়ের দোকানে দুটো চেয়ার দখল করে বসলেন।

আমিও ওঁদের সামনের একটা চেয়ারে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম। দোকান ঘরের ছায়ায় বসতেই ফুরফুরে হিমেল হাওয়ায় চোখ দুটো আপনি বুজে এলো। এতটা পরিশ্রমের পর চোখ বুজে আয়েস করে বসার স্বাদই আলাদা।

— বচ্চেকো বহুত থকাবট হুয়া। উসকো চায় পিলাও বেটা। বৃদ্ধার গলা। হয়তো মালবাহকটির কথা বলেছেন। মহিলার দরদ আছে বেশ।

— চার পেয়ালা চায় দো ভাইসাব, জলদি।

চোখ বুজে বসে থাকলেও অনুভব করি কার কণ্ঠস্বর। স্যুটপরা ভদ্রলোক অর্ডার দিচ্ছেন।

ঘামে ভেজা জামা-প্যান্ট ফুরফুরে হাওয়ার স্পর্শে হিমশীতল হয়ে গেছে। শীত-শীত লাগছে। হিমালয়ের পথে চলার এই মজা। রোদে হাঁটলে ঘাম ঝরে আবার ছায়ায় বসলে কাঁপুনী লাগে। প্রচন্ড পরিশ্রমের পর সামান্য বিশ্রাম সব ক্লান্তি দূর করে দেয়।

— ভাইসাব, চায় পি লিজিয়ে।

থতমত খেয়ে চোখ মেললাম। দেখলাম স্যুটপরা ভদ্রলোক এক পেয়ালা চা আমার সামনে ধরে আছেন। লজ্জিত হয়ে চায়ের পেয়ালা নিলাম তাড়াতাড়ি। চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মনে পড়ল, কই,আমি তো চায়ের অর্ডার দিইনি? অবশ্য অনেক দোকানে অর্ডার না দিলেও সাপ্লাই ঠিক মতো আসে। কিন্তু দোকানের বয় চা টা না দিয়ে ভদ্রলোক দিলেন কেন?

আমার এই ভাবার মুহূর্তে বৃদ্ধা বললেন, বেটা খুব কষ্ট হচ্ছে? ক্ষিদেও পেয়েছে তো?

এবার সম্বিত ফিরল আমার। তাহলে, আমার উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধার চা খাওয়ানোর কথা শুনেছি আগে। তাড়াতাড়ি বললাম, না না, তেমন ক্ষিদে পায়নি।

বৃদ্ধা আমার আপত্তির তোয়াক্কা না করেই ঝোলার ভেতর থেকে একমুঠো

কাজু কিসমিস বার করে আমায় দিলেন। আপত্তির সুযোগ পেলাম না।

কাজু-কিসমিসের সঙ্গে গরম চা মন্দ লাগল না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। নাম মিঃ কোশলরাম। বাড়ি গাড়োয়াল হিমালয়ের পৌড়িতে। বৃদ্ধা মহিলা কোশলরামের মা। মাকে নিয়ে কেদার-বদরীনাথ তীর্থ করতে এসেছেন।

সঙ্গে মালবাহক থাকতেও কেন যে উনি নিজে বৃদ্ধা মাকে কান্ডিতে বইছেন একথা বার বার ঠোঁটের ডগায় এলেও জিজ্ঞেস করতে পারিনি। কোশলরামও বলেননি। বরং আমি কেন আমার মা-বাবাকে এই পরম তীর্থে আনিনি সে কথা বারাবর জিজ্ঞেস করছেন। আমার জবাবে খুশি না হয়ে একবার বলেছেন ,মা-বাবাকে তীর্থ না করিয়ে নিজে তীর্থ করতে এলে ফল মেলে না।

বেলা অনেকটা বেড়ে গেছে। পথ যদিও আর সামান্যই আছে তবু রাতের আস্তানার বন্দোবস্ত করতে হবে। আমি উঠে পড়তেই কোশলরামও উঠলেন।

কোশলরামের বৃদ্ধা মা লাঠি নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। কোশলরাম কান্ডিটা পিঠে তুলে নিয়ে মায়ের পিছনে খানিক গিয়ে বললেন, এবার বসো।

বৃদ্ধা ঘন ঘন মাথা নাড়িয়ে বললেন, না না। এ-পথটুকু আমি পায়ে হেঁটে যাব।

— তা হয় না। অনেকটা রাস্তা,তোমার কষ্ট হবে।

— কোনো কষ্ট হবে না রে কোশল। আমি ঠিক চলে যাব।

কোশলরাম জবরদস্তি করেন। বৃদ্ধাও নাছোড়বান্দা। উনি আর কান্ডিতে চেপে যাবেন না।

মা-ছেলের এই টানা পোড়েনে শেষে আমায় মধ্যস্থ হতে হল।

কোশলরাম বোঝান মায়ের বয়স হয়েছে, পায়ে হেঁটে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুশকিল হবে। বৃদ্ধা বলেন, এত পথ ছেলের পিঠে চেপে এসে বাকিটুকু যদি নিজের পায়ে না হাঁটি তাহলে পুণ্যের ফল পাব না।

মায়ের পক্ষ নিলাম আমি। বললাম, মাতাজী ঠিক বলেছেন। সামান্য পথ যখন তখন মাতাজী হাঁটলে তেমন ক্ষতি হবে না। আর খুব কষ্ট হলে বরং উঠবেন কান্ডিতে।

মায়ের হাঁটা সাব্যস্ত হতেই কোশলরামজী আমায় ওঁত মালবাহকটিকে নিয়ে

এগিয়ে গিয়ে ভাল একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে বললেন।

রাজী হয়ে ওঁর মালবাহককে নিয়ে বদরীনারায়ণের পথে পাড়ি দিলাম।

কোশলরামকে দেখে মোটেই দরিদ্র বলে মনে হয় না। দরিদ্র হলে সঙ্গে মালবাহক আনতেন না। কিন্তু কান্ডিওয়ালাকে দিয়ে না বইয়ে নিজে কেন যে বৃদ্ধা মাকে পিঠে করে বইছেন তা ভেবে পাই না।

যোশীমঠ থেকে সে সময় কান্ডিতে বওয়ার মজুরী ছিল পড়াও প্রতি প্রায় দশ টাকা। এক পড়াও মানে প্রায় দশ মাইল। যোশীমঠ থেকে বদরীনাথ মাত্র উনিশ মাইল পথ—অর্থাৎ দু'পড়াও। যাতায়াতে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ। এ টাকাটা ওঁর নেই এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু কি কারণ হতে পারে?

মালবাহকটিকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা।

লোকটিও যেন কোশলরামজীর বিচিত্র ঘটনা বলার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। আমার প্রশ্ন শুনে বলল, সাব, এ্যায়সা শরীফ অউর আচ্ছা আদমি মেরা গাঁওমে দুসরা কোই নেহি হ্যায়।

— কোশলরামজী তোমাদের গ্রামের মানুষ?

— জী সাব।

— উনি করেন কি?

— খুব বড় ব্যবসা আছে ওঁর। বহুলোক কাজ করে সেখানে।

— তাহলে তো পয়সা-কড়ি আছে।

— আছে মানে? সারা পৌড়ি জেলায় অত পয়সা আর সম্পত্তি আর কারো নেই। মালবাহকটি খানিক চুপ থেকে মাথা নিচু করে বলল, কোশলরাম মেরা চচেরা ভাই।

চচেরা ভাই শব্দটা কুণ্ঠা সহকারে বললেও ওর চোখে মুখে একটা গর্ব একটা তৃপ্তির ছাপ দেখলাম।

— সবই তো বুঝলাম, কিন্তু যে মানুষের এত পয়সা সে মানুষ সামান্য একটা কান্ডিওয়ালার খরচ বাঁচাবার জন্যে নিজের মাকে বইছেন কেন তা বুঝলাম না।

এবার লোকটি হাসল। বলল, ইস' লিয়ে তো ম্যায় কহা, এ্যায়সা শরীফ আদমি অউর নেহি হ্যায়।

— একটু খুলে বলতো ভাই। তোমার হেঁয়ালী বুঝতে পারছি না।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি যে কাহিনী বলল তাতে কোশলরামজীর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক আমায় চমৎকৃত করল।

... ছোটবেলায় কোশলরামের বাবা মারা যান। তখন কোশলের বয়স মাত্র পাঁচ-ছয়। আর কোনো ভাই-বোন ছিল না ওর। মা খুব কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করে তোলেন।

ছেলে কিছু বড় হতে গাঁয়ের আর পাঁচজন ধরল কেদার-বদরী তীর্থ করার জন্যে। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সুযোগ পেলেই কেদার-বদরী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে আসত। কোশলের মায়ের কোনো তীর্থ হয় নি। গাঁয়ের আর পাঁচজন তীর্থ করতে যাবার সময় কোশলের মাকেও বলত সঙ্গী হবার জন্যে। জবাবে মা বলতেন, যাব যাব, কোশল বড় হোক তারপর। সেবার যখন খুব ই পেড়াপিড়ি শুরু করল গ্রামের মানুষ তখন মা বলল, কোশলই আমার কেদার, কোসলই আমার বদরীনাথ। ওকে ফেলে তীর্থে গেলে আমার ফললাভ হবে না।

এ কথায় গাঁয়ের মানুষ ভাবল, আদিখ্যেতা আর কাকে বলে। তারপর থেকে আর কেউ কখনো তীর্থ ভ্রমণের কথা বলে নি ওঁকে।

কোশল লেখাপড়া শিখে ব্যবসায় নামলেন। আর দেখতে দেখতে ব্যবসা ফেঁপে ফুলে উঠল। অনেকেই বলল কেদার-বদরীনাথজীকে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে। কোশল শোনেন তাদের উপদেশ। জবাবে বলেন, যাব সময় এলেই।

বিয়ে করেছেন, ছেলেপুলেও হয়েছে দুটি। তারাও একদিন মানুষ হয়ে উঠল। স্ত্রী মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, তীর্থটা সেরে ফেলার জন্যে। বয়েস হয়ে যাচ্ছে। এখন না গেলে আর কবে যাবেন তিনি।

কোশলরামের ইচ্ছেটাও তাই। তবে মায়ের কাছ থেকে এখনো তীর্থ করার আদেশ পান নি। মা আদেশ না দিলে তীর্থ করেন কেমন করে। শেষে নিজের মনের কথা মাকে বলতেই রাজী। মাও এতদিন অপেক্ষা করেছেন ছেলের জন্যে।

কোশলরাম তীর্থের আয়োজন করলেন। মাকে নিয়ে চললেন কেদার-বদরী। সঙ্গে নিলেন একটা কান্ডি আর কান্ডিবাহক।

কেদারনাথের পথে সে সময় বাস চলত কুন্ডা চটি পর্যন্ত। তারপর প্রায় তেইশ মাইল দুর্গম পথ পায়ে হাঁটা। বাস থেকে নেমে মাকে কান্ডিতে বসিয়ে

কান্ডিওলাকে দিলেন বিছানা পত্রের বোঝা আর নিজের পিঠে কান্ডি তুলে নিলেন।

কান্ডিওলা ব্যাপার দেখে হতভম্ব। মায়ের মুখ ভার।

কান্ডিওলা অনুযোগ করে, কোশলভাই একি ব্যাপার? চাচীকে আমি নিয়ে যাব বলে এলুম, আর কিনা তুমি বইছ। শিগগীর নামিয়ে দাও। তোমার অভ্যেস নেই। চড়াই পথে কাহিল হয়ে পড়বে।

কোশলরাম হাসেন কান্ডিওলার কথা শুনে। বলেন, ছোটবেলায় এর চেয়ে বেশী ভার বয়েছি। ঠিক নিয়ে যাব।

— সে হয় না। তোমার কষ্ট হবে যে।

— হোক। আমার মা তীর্থ করবে আর তার ভার তুমি বইবে কেন? মা আমায় মানুষ করার জন্যে যা কষ্ট করেছেন তার তুলনায় আমি আর কি কষ্ট করছি?

কান্ডিওলাকে সামাল দিলেও শেষে মা বেঁকে বসেন। বলেন, তোর ঘাড়ে চেপে আমি তীর্থ করব না।

কোশলরাম অনেক বুঝিয়ে রাজী করান মাকে। ছেলের কষ্ট দেখে বুক যেমন হু হু করে ওঠে, আবার ছেলের মাতৃভক্তি দেখে যা মনে মনে গর্ব বোধ করেন।...

— কেদারনাথের ছেচল্লিশ মাইল আর বদরীনাথের উনিশ মাইল উনি নিজের পিঠে বয়ে এনেছেন ওর মাকে!

আমার প্রশ্নে বিস্ময় ঝরে পড়তেই মালবাহকটি বলল আবার, শুধু কি তাই? উনি দুবেলা নিজের হাতে রান্না করে মাকে আর আমাকে খাওয়ান রোজ।

আমার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। কোশলরামজীর প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে।

বদরীনারায়ণ মন্দিরের সামনে নতুন একটা বিশ্রামগৃহে রাতের আশ্রয় পেয়েছি। কোশলরামজী মাকে নিয়ে উঠেছেন এখানে এবং আমাকেও আটকেছেন অতিথি হিসেবে। নিজের হাতে সুন্দর রান্না করে খাইয়েছেন আমাদের সবাইকে। সাহায্য করতে চেয়েছি। উদার হেসে প্রত্যাখ্যান করেছেন সবিনয়ে। বৃদ্ধা মাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসেছেন কোশলরামজী।

শুক্লপক্ষের রাত। নির্মেঘ আকাশ। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে আশে পাশের পাহাড় আর উপত্যকা। আমিও একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছি

কোশলরামজীর পাশে।

এ কথা সে কথায় আমার অনেক খোঁজ নিলেন উনি। মাকে এযাত্রায় কেন আনিনি সে কথা জিজ্ঞেস করে আবার অনুযোগ করলেন। কিন্তু নিজের কথা এড়িয়ে গেলেন।

— আপনার মাতৃভক্তির তুলনা হয় না।

আমার কথায় হাসলেন কোশলরামজী। বললেন, কই আর তেমন ভক্তি করতে পারলাম?

— বলেন কি? কেদার-বদরীর এত পথ আপনি নিজের পিঠে মাকে বয়ে আনলেন, সেটা কম!

কোশলরামজী উন্মনা হয়ে গেলেন খানিক। তারপর বললেন, মা আমার জন্যে যা করেছেন, সে তুলনায় পুত্র হিসেবে কিছুই করতে পারিনি। জানেন, দেড়মণ মাল নিয়ে পাঁচ বছর গভীর রাতে পাহাড়ী চড়াই পথে ওঠানামা করে অভ্যাস করেছি মাকে আমার গ্রাম পৌড়ি থেকে পিঠে বয়ে কেদার-বদরী তীর্থ করাব এই আশায়। কিন্তু তা আর হল কই? বেশীর ভাগ পথ তো বাসে আর জীপে চলে এলাম। হাঁটলাম কতটুকু? আমার দুঃখ যে মাকে আমি সারাপথ নিজের পিঠে বয়ে আনতে পারলাম না। অথচ, মা আমার জন্যে সারাজীবন কত কষ্টই না করেছেন।

আমি বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হয়ে মাতৃভক্ত প্রৌঢ় মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হিমালয় ঘোরার জীবনে এমন মানুষ আর এমন মাতৃভক্তি দেখিনি কখনো।

অমিয়কুমার হাটি

গঙ্গোত্রী থেকে নন্দনবন

বিকালে সন্তোষের সঙ্গে ভাগীরথীর তীর ধরে এগিয়ে গেছিলাম এখানকার নামকরা সাধু স্বামী সারদানন্দের কুঠিয়াতে।

কুঠিয়া বলা ভুল। পাথর ও কাঠের তৈরি দোতলা বাড়ী। ঝকঝকে তকতকে, ছবির মতো, কাব্যময় পরিবেশ।

দোতালার ঘরে স্বামীজী থাকেন। ঘরে ঢুকে নমস্কার জানালাম। বসতে বললেন। একটি ছবির বই দেখালেন, ক্যামেরায় তোলা 'দি গ্যাঞ্জেস'। স্বামী সারদানন্দের নিজের ছবিও আছে, গোমুখে খালিগায়ে স্নান করছেন।

একটা সামান্য প্রশ্ন করে বিপদে পড়লাম দেখছি। প্রশ্নটি অতি সাধারণ, 'গঙ্গোত্রীর সাধু সমাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।'

প্রশ্নটাকে সহজভাবে তিনি নিতে পারলেন না। কেমন যেন অসন্তোষের সুর জবাবে। তিনি যা বললেন ইংরেজীতে, তার অর্থ হলো এই, সাধু সমাজ বলে এখানে কোনো সমাজ নেই। কয়েকজন সাধু আছেন বিভিন্ন কুঠিয়াতে, নিজের নিজের ধ্যান ধারণা নিয়ে, নিজের নিজের চ্যালা চামুণ্ডা সমভিব্যাহারে।

তাঁর কথা শুনে মনে হলো এক সাধুর সঙ্গে অন্য সাধুর তেমন বনিবনা যেন নেই। হিমালয়ের নির্জনতায় এসেও ধর্মের প্রাঙ্গণেও এই ঘৃণ্য রাজনীতি এবং কূটনীতির খেলা। কে কত প্রভাবশালী, কার কুঠিয়া কত সুন্দর, কে কত প্রচার করতে পারে, জোরে পেটাতে পারে নিজের ঢাক। এই মূহূর্তে মনে হল . এর থেকে সমতলে আমরা তাহলে তো ভলো আছি।

কাগজে কি যেন এক টাইপ করা মন্ত্র এগিয়ে দিলেন স্বামীজী। কাছে রাখতে বললেন। এটা উচ্চারণ করলে কোনো রকম বিপদ নাকি আর কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

আছে নাকি এরকম কোনো মন্ত্র? কী জানি। সন্তোষ কিন্তু পকেটে পুরে রাখলো সেটা।

গঙ্গোত্রীতে বিভিন্ন সাধুর মধ্যে বিচিত্রতর বিবাদের কথা আমরা শুনেছি।

কোনো এক সাধু তো রীতিমত হোটেলের ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও এ সম্বন্ধে কলম ধরতে হয়েছে।

সন্তোষ যখন বলল, 'আমরা আপনার আশীর্বাদ চাই, যেন সফলতা লাভ করতে পারি আমাদের অভিযানে,' তখন বিজ্ঞের মত বললেন স্বামীজী, 'পাহাড়ের কথা কেউ কি বলতে পারে কিছু? সবই উপরওয়ালার হাত। তোমরা খুব সাবধানে থাকবে, গঙ্গোত্রী হিমবাহ বড় খারাপ জায়গা-তোমাদের অভিজ্ঞতাও মনে হচ্ছে সীমিত, মালবাহকও তেমন যোগাড় করতে পারোনি।'

আসলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, স্বামী সারদানন্দকে বলে কিছু স্থানীয় মালবাহক যোগাড় করা যায় কি না।

সেদিক দিয়েও তিনি কোন সাহায্য করতে পারলেন না। এই সময় এখানকার গ্রামে গ্রামে যে যার ঘরে ফিরে আসে মেয়েরা — যাদের দূরে দূরে বিয়ে হয়েছে। উৎসব আয়োজন হয়। মেলা বসে। কেউ গ্রাম থেকে বেরোয় না। স্থানীয় লোক তাই সংগ্রহ করা যাবে না, বললেন উনি। বিভাসের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ হয়েছে এনার। বিভাসকে কিন্তু গতকাল বলেছিলেন, চেষ্টা করে দেখবেন। আজ আমরা যখন যাই, তখন দেখি সেখানে ব্রজীন্দর সিংকে। উনি আবার ব্রজীন্দরকে বলছেন যদি ও লোক আনতে পারে ! ব্রজীন্দর যে চেষ্টা করেও সফল হয়নি, সে কথা তো ওঁর জানা থাকার কথা।

উঠলো রতন সিং এবং কৃপাল সিংএর কথাও। স্বামীজী যা বললেন, তাতে মনে হলো, কৃপাল সিং তার দলবল নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেই চেয়েছিল, কিন্তু অশোক এসে পড়াতে এবং রতন সিং ও ব্রজীন্দরের উপর নির্ভর করাতে, কৃপাল নাকি অন্য দলের সঙ্গে উপরে চলে গেছে।

তাঁর এ যুক্তিটাও আমাদের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না। মোট কথা, কৃপাল এবং রতন দুজনই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এদিক দিয়ে ব্রজীন্দর সিং লোকটি সৎ। সে চেষ্টা করেছে, অকপটে স্বীকার করেছে যোগাড় করতে পারবে না দলবল। নিজে হাই অলটিচিউড পোর্টার হিসাবে আমাদের সঙ্গে চলেছে। ব্রজীন্দরকে পেয়ে আমাদের লাভই হয়েছে। অনেক কাজে লাগবে সে।

স্বামীজীর কুঠিয়াতে বসে থাকতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। উনি

যেখানটায় বসে আছেন, তার পিছনে বিরাট একটা আয়না। সেই আয়নায় প্রতিফলিত প্রবাহমান ভাগীরথী- কলকল গর্জনও ভেসে আসছিল তার। আমাদের চিন্তাধারাও তখন বইছিল প্রবল বেগে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ভাসছিল সেই স্রোতে। স্বামী সারদানন্দের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলাম সন্ধ্যায়। সেটুকুই বা কম কি?

আরতির ঘন্টা বাজছে তখন গঙ্গোত্রীর মন্দিরে। বিচিত্র তার ধ্বনি লহরী ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে দূরে, যেন যুক্ত হচ্ছে ভাগীরথীর কলতানের সঙ্গে। নাচের তালে তালে নামতে নামতে কত রঙ্গই দেখছে ভাগীরথী।

কিন্তু শুধু রঙ্গই কি দেখছে? তার গুরুগম্ভীর কলতানের মধ্য দিয়ে সে যেন কী বলতেও চায়। সারা ভারতের জীবনের বিশাল পটভূমিতেই আলপনা আঁকছে ভাগীরথী। সে যেমন প্রকৃতির অনবদ্য কবিতা, প্রাণের অমেয় উৎস, মানুষ এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে ও সে অত্যন্ত সজাগ। সমস্ত অন্ধকার দূরে সরিয়ে আলোর অভিষেকে অভিসিঞ্চিত হতে বলে সে সকল মানুষকে। সতত দেয় এগিয়ে চলার প্রেরণা। নিজে পথ করে এগিয়ে চলা- আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে।

ভাগীরথী, শুনতে পেলাম, আজ এই অন্ধকারে তার অমল হাসি হাসতে হাসতে বলছে আমাদের, এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো সাহস, ধৈর্য,মনোবল, আত্মশক্তি অটুট থাকলে, সততা এবং বিশ্বাস থাকলে, অভীষ্ট লক্ষ্য পথে অবিচল থাকলে, একতা এবং সমঝোতা থাকলে জয় তোমাদের হবেই। জয় কেউ কাউকে অর্জন করিয়ে দিতে পারে না, জয় ছিনিয়ে আনতে হয়, তোমরা সেই ছিনিয়ে আনার সাধনা কর, তপস্যা কর-তাহলেই জয় তোমাদের করায়ত্ত হবে।

চীরবন পেরিয়ে ভূজগাছের জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ। ধীরে ধীরে উপরে উঠি। বাঁ পাশে পাহাড়, ডাইনে ভাগীরথী।

পাহাড়গুলো যেন বেশির ভাগই মাটি দিয়ে তৈরি। বলে গিলা পাহাড়। অনেক জায়গাতেই এবড়ো খেবড়ো মাটির ঢিবির মত উঁচু নিচু আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে-বৃষ্টির জলে ক্ষয়ে ধুয়ে গড়িয়ে পড়ে নদীতে। ভাগীরথীর বিস্তার বড় একটা কম নয় — এখানেও একদম ঘোলা কর্দমাক্ত জল। অথচ উৎস তো কাছেই, তেমন বৃষ্টিও তো হয়নি! এর আগে কোনবারও এরকম বালি মেশানো ময়লা জল দেখিনি ভাগীরথীর।

যতই এগোই সামনে, দূরে শিখরগুলি একে একে উজ্জ্বল রোদ্দুরে ঝকমক

করে হেসে ওঠে, যেন আহ্বান জানায় শিবলিঙ্গ এবং ভাগীরথী শৃঙ্গাবলী।

ভুজবাসা পেরুবার পর পাহাড় আস্তে আস্তে নিরাবরণ হতে থাকে, সবুজের সমারোহ হঠাৎ কোন সময় যেন মিলিয়ে যায় নিজের অজান্তেই — পাথরের রাজ্যে এসে পড়ি, আর যার পটভূমিতে বরফের আলপনা আঁকা. শিখরসমূহ জ্বলজ্বল করছে, ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি ভাগীরথীর ধারে আমাদের বিরাট বড় তাঁবুটার সবুজ ছাউনি — সে যেন একা স্পর্ধাভরে পৃথিবীর সমস্ত সবুজের প্রতিনিধির মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাকে না চেনার, হারিয়ে ফেলার কোন উপায় নেই।

সবুজ নাই বা হল এখানকার প্রকৃতি! আমরা কজন এসেছি তো সবুজ মন নিয়ে! শুধু আমরাই বা কেন! যে কোন মানুষ আসে, সেইতো কচি, নবীন, গোমুখের বয়সের তুলনায় শিশু! পৃথিবীতে মানুষই সব থেকে নতুন, সব থেকে সবুজ।

আমাদের একে একে আসতে দেখে হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে এল সোমেন, অশোক, রায়দা প্রভৃতি। কাঁধ থেকে খুলে নিল পিঠুয়াগুলো, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিল আনারসের জল আর আনারস! তারপরেই গরম-ভাত, ডাল, সার্ডিন মাছ! যেন ওরা এখানে মৌরসী পাট্টা গেড়ে রাজত্ব বিছিয়ে বসেছে, আমরা ওদের মহা সম্মানিত অতিথি! অথচ এসেছে আমাদের মাত্র একদিন আগে!

প্রদীপ্ত ছুনজে, ব্রজীন্দর ও করণবাহাদুরকে নিয়ে নন্দনবনে যাচ্ছে। জহর ও চঞ্চল ছাড়া বলতে গেলে গোটা দলটাই ওদের সঙ্গে চলেছি। আমরা সকালবেলা গোমুখ দেখতে যাবো- আমাদের তাঁবু যেখানে ফেলা হয়েছে, সেখান থেকে আধমাইল দূরে, বেশ কয়েকটা পাথরের দেয়াল ডিঙিয়ে। একই দিকে যেতে হবে কিছুক্ষণ।

ওরা বিদায় নিল। রক্তবরণ ধরে বাঁ দিকে এগিয়ে চলল তিনজন দৃঢ় পদক্ষেপে। যতদূর দেখা যায়, হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। নন্দনবনের নিঃসঙ্গ পাথরের রাজ্যে শুধু চারটি প্রাণী আজ রাত কাটাবে খান দুই তাঁবুতে। ওদের আজকের যাত্রা শুভ হোক। নিরাপদ হোক। বিশাল হিমালয়ের হৃদয়ের অভ্যন্তরে হিমঅঙ্গনে প্রাণের মশাল জ্বেলে দেবে ওরা আজ। নন্দনবন আনন্দিত হবে কি?

পাথর টপকে টপকে ডানদিকে এসে ভাগীরথী ধরে উপরে এগিয়ে চললাম বাকী কজন। মিঃ মেহেরা ও ডাঃ নাথানিও দেখছি এসেছেন, চলেছেন একই দিকে।

হাতে ওদের মুভি ক্যামেরা। ওদের পুরো দলও গতকাল গোমুখ পৌঁছেছে।

গোমুখ! খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। সকালবেলা বলেই এ ঝুঁকিটা নিয়েছি সবাই। বেলা যত বাড়তে থাকবে, ততই উপরের জমাট বরফ ছিটকে পড়বে এখানে ওখানে, গোমুখকে ঘিরে।

এখন সকালবেলায় পরিবেশ প্রশান্ত। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশাল এক গুহা গহ্বর থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত আনন্দে পৃথিবীকে প্রথম দেখার বিস্ময় আবেগ নিয়ে দুর্বার দুরন্ত গতিতে মুক্তির গান গেয়ে প্রাণ ছন্দের বিগলিত ধারায় কল্লোল জাগিয়ে বেরিয়ে আসছে পীযূষ- মানব সভ্যতার জন্মের উষালগ্ন ভেসে উঠছে চোখের সামনে! কি এক ধরণের গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি মথিত করছে দিগ্বিদিক! আমাদের শিরা ও ধমনীতে যে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত, এতো তারই উৎসভূমি, বাঙ্ময় জীবন বন্যা!

যতবার দেখি, তত যেন নতুন মনে হয়। সামনে এবং বামদিকে বিরাট বিরাট ফাটল বিশাল পাথরের প্রাচীর। উপরেই ঝকঝক করছে ঝলমল আলোয় শিবলিঙ্গ এবং ভাগীরথী শৃঙ্গাবলী। বিস্তীর্ণ গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রতিনিধি হয়ে তারা পাহারা দিচ্ছে যেন ভাগীরথীর এই জন্মস্থানটিকে । যতবার এসেছি , নতুন নতুন রূপে নতুন পরিবেশে দেখেছি গোমুখ। কখনও এক মনে হয়নি। বস্তুতঃ মিনিটে মিনিটে রূপ বদলায়। গোমুখের অবস্থান এক জায়গায় থাকে না। এখন গঙ্গোত্রী হিমবাহে ১৮ হাজার ফুটের নিচে বরফ নেই। গোমুখ নিরাবরণ। আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে গোমুখ— কারণ পৃথিবীর সব হিমবাহই এখন সঙ্কুচিত হচ্ছে, সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

সুন্দর সকালে গোমুখের গম্ভীর ভয়াল সৌন্দর্য প্রাণ ভরে উপভোগ করে ফিরে এলাম তাঁবুতে ।

কিসের মুখ দেখে যে উঠেছিলাম সকালে! গোমুখ থেকে নন্দনবনের উপব উঠতে দুপুর ১২ টার মধ্যেই বার পাঁচেক আছাড় খেলাম। এবং একবার তো আই,টি,বি,পি-র দল নেতা মিঃ মেহেরার সামনেই। ভাগ্যিস ডাঃ নাথানি তখন চোখের আড়ালে ছিলেন, দেখতে পাননি অদ্ভুত পতনদৃশ্যগুলো।

কিন্তু হয়েছেটা কি? কাল রাতে এমন কিছু বৃষ্টি হয়নি। বরফ জমে নেই কোথাও। পাথর পিছলও নয়। নিচে তার জল জমে আছে, তাও না। তবু উল্টে

উল্টে পড়ছি। গোমুখ কি উপরে উঠতে দেবে না? সে কি পিছনটা টানছে?

ভাল লেগেছিল গোমুখকে। দিন রাত্রি ভাগীরথী অশ্রান্ত ধারায় গান শুনিয়েছে। জীবনের কত রঙ্গ, কত মুহূর্ত ভেসে উঠেছিল ভাগীরথীর সফেন বুদ্‌বুদে! একদিকে আঁধার বেদনা, আর একদিকে আশা আকাঙ্খা! ভাগীরথী এক স্বপ্নলোক রচনা করেছিল। মর্ত্য এবং স্বর্গের মধ্যে। ত্রিশঙ্কুর মত মনে হচ্ছিল নিজেকে। ভাবনা, চিন্তা, কোনটা দুরূহ, কোনটা ভারী, কোনটা বেশ জটিল! নিজেকে একক ভাবে পাওয়া! আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ! কি করেছি, কি করছি, কি করতে চাই! পৃথিবী সামনে দাঁড়িয়ে। পর মুখোমুখি একেবারে!

কিন্তু আজ কি দুর্বল অশক্ত হয়ে পড়েছি? কোন অসুখ করবে কি? না-ভাগীরথীর সেই কলহাস্য শুনতে পাচ্ছি না বলেই আর এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাচ্ছি না?

অথচ জহর, যে কাল পর্যন্ত অসুস্থ ছিল, কি সুন্দর দৃঢ় পদক্ষেপে এগোচ্ছে! এগোচ্ছে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল মুখার্জী।

তবে কি ওদের সঙ্গে তাল রাখতে না পারার জন্যেই এই বিপত্তি হচ্ছে?

অভয় দেয় জহর'আমার পিছে আসুন, আসুন, আস্তে আস্তে।'

তাই চলি। ওর কথা শুনে, ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। হাঁটুটা ছড়ে গেছে। জ্বলছে। বলছে সাবধানে চলতে। তড়বড় না করতে। পাঁজরের ব্যথাটা আবার মোচড় দিয়েছিল। সেটা দিনে কমেই আসছে দেখছি। তবু পারছি না যেন! কত দূর? কত দূর আর? নন্দনবনের সান্নিধ্যে এসে নন্দন তত্ত্বের আলোচনা করার কথা। সে সব মাথায় উঠেছে। শ্বেতা শিখররাজি যদিও এগিয়ে আসছে কাছে থেকে আরও কাছে, তবু চোখে সর্ষের ফুল না দেখে, পাথরের ফুল দেখছি।

এর মধ্যে ডাঃ নাথানিকে দেখে সাহস পেলাম একটু। না, ডাক্তার বলে নয়। চিকিৎসার এখনও দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না।

ডাঃ নাথানির পিঠে ঘাড়ে কোন বোঝা নেই। শুধু একটা তুষার গাঁইতি নিয়ে পথ হাঁটছেন।

তাহলে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে এখনো ওঁর থেকেও তরুণ আছি! পুরো বোঝাই তো বয়ে নিয়ে চলেছি! এই ভাবতেই সাহস পেলাম। দৃঢ় হল গতি। ধীরে ধীরে চললাম জহরের পিছনে পিছনে।

চঞ্চলের পিছনে ছোটা হরিণের পিছনে ছোটা। যাক ও এগিয়ে।

দেখছি, একটা জলধারার কাছে গিয়ে বসেছে মিঃ মেহেরা ও চঞ্চল। চঞ্চল খাবার বাক্স বের করছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এলাম। একটুখানি জিরিয়ে নিতে বসলাম পাঁচজনে।

কালকের রান্না মাংস আমাদের সঙ্গেও ছিল। চঞ্চল গোছানো লোক। ভেবে চিন্তেই ৪বেলার রান্না একেবারেই করে নিয়েছিল।

মিঃ মেহেরা ও ডাঃ নাথানিকে সেই মাংস দিলাম আমরা।

ওদের জিভ দিয়ে সত্যিই জল পড়ছে। চঞ্চলের জয় জয়কার। ও নিজে রান্না করেছে শুনে মিঃ মেহেরা তার পিঠের বোঝা নামিয়ে চঞ্চলের পিঠের বোঝার উপরেই হাত চাপড়াতে লাগলেন।

এই মিঃ মেহেরা ও চঞ্চলের মধ্যে গঙ্গোত্রীতে ডাকবাংলো অধিকার নিয়ে মনোমালিন্য তর্ক বিতর্ক কত কি হয়েছিল! চঞ্চলই আসে আগে ডাকবাংলোতে, আমাদের মালবাহককে ঘরের ভিতর মাল জমা রাখতে বলে। ঐ দিন আই,টি,বি,পি-র দলও এলো গঙ্গোত্রী। মিঃ মেহোরারও ঘর দরকার। ডাকবাংলো কাছে, গোমুখ যাবার পথের ধারে। কাজেই ওঁরও লোভ পড়ল ডাকবাংলোর উপর। অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন প্রথমে চঞ্চলকে। কিন্তু চঞ্চল নাছোড়বান্দা। সে আগে এসেছে। তারপর মন কষাকষি, কথাকাটিকাটি।

অবশ্য এসব ঘটনা যখন ঘটছে, তার আগেই আমরা বেছে নিয়েছিলাম কেদার গঙ্গার ধারের প্রশস্ত বনবিভাগের বাংলোটি। কারণ, আমাদের সদস্য সংখ্যা অনেক — ঐ জায়গাটা ছাড়া আর কোথাও সঙ্কুলান হবে না। মালপত্র এখানেই আনতে বলা হল।

মিঃ মেহেরা অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি সামান্য ভুল করেছেন। তারপরই প্রদীপ্তর কাছে এসেছিলেন, সেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছিল সেখানেই!

তারপর আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা সুন্দর সহযোগিতা। এর পরিচয় পেয়েছিলাম অচিরেই, আই, টি, বি, পি-র লোকরা দেবুকে খুব খাতির করেছিল, আগে ভাগে ওয়াকিটকি মারফত তার আগমনের খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল গোমুখে।

মিঃ মেহেরা ডাঃ নাথনিকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। লেখকের জন্যেই বেচারা

চঞ্চল ও জহর পিছুনে পড়ে রইল আর কোনো ঝুঁকি নেওয়া নয় এক পা এক পা করে হাঁটি।

তখন প্রায় তিনটে বাজে। তিনজনে গল্প করতে করতে খোশ মেজাজে চলছিলাম। আর পড়িনি উল্টে। কিন্তু তবু, শরীরের অবস্থা কাহিল। হঠাৎ তিনজনেরই মনে হল, পথ হারিয়েছি। পাথরের জঙ্গলে কোন রেখা কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। কেন? মনে মনে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

পিছনে মালবাহকরা আছে। কত পিছনে কে জানে? তাছাড়া পথ হারালে ওদের সঙ্গে তো দেখা হবেই না।

অথচ কেমন যেন মনে হচ্ছে, কাছাকাছিই এসে পড়েছি নন্দনবনের সেই জায়গাটায়, যেখানে তাঁবু পড়েছে আমাদের।

কয়েকবার চিৎকার করলাম তিনজনে মিলে। যদি কেউ শুনতে পায়! কিন্তু বৃথা চেষ্টা! প্রতিধ্বনিই শুধু ফিরে এল।

একটা জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লাম। একদিকে এগোলো জহর আর একদিকে চঞ্চল। জহর যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে নয় খুব সম্ভব, ফিরে এল ও।

চঞ্চল ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। এ পাহাড় ও পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সে অনেক উপরে এক গিরিশিরায় উঠল। ছোট টিকটিকির মত দেখাতে লাগছে। ওকে অনুসরণ করে আরও কিছুদূর এগিয়েছি।

হঠাৎ আরও উপরে দেখা গেল, একটা কাঠি পোঁতা আছে।

তাহলে তো আমাদের অগ্রবর্তীরা ঐ দিক দিয়েই গেছে!

তবু চঞ্চল ছুটল ঐখানে। আমরা নিচেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এর আগে আরো ২/৩ টি দল এসেছে নন্দন বনে। কে কোন্ পথ দিয়ে গেছে কোথায়, ঠিক কি? সত্যি সত্যিই পথ ওদিকে নয়। তাহলে?

মিঃ মেহেরাই বা গেছেন কোন দিক দিয়ে? ওঁদের আস্তানাতে গিয়ে পড়তে পারলেও তো কাজ দিত। যেমন বিরক্তি ধরছে নিজেদের উপরে, তেমনি খারাপ লাগছে এই ভেবে, পথ-রেখা দেওয়া হয়নি বলে।

কিন্তু পথরেখা না দেওয়ার তো কোন কারণ থাকতে পারে না। আবার পিছিয়ে যাই, যেখানে দেখা গিয়েছিল পাথরের পুতুল সাজানো। সেটার কাছে পৌঁছে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকেই তাকাই।

চঞ্চলের চোখে পড়ে আগে। অনুসরণ করতে বলে তাকে।

'কি পথ পাওয়া কি গেছে?' প্রশ্ন করি। কারণ বেকার হাঁটতে একপাও রাজি নই। মাথা ধরেছে সারা শরীরে ভারভার বোধ।

জহর দেখায়। যে দিকে চঞ্চল যাচ্ছে, সেদিকে একই রকম পাথর সাজানো।

কঠিন চড়াই, আবার উৎরাই, আবার চড়াই! বোঝা দশমণ মনে হচ্ছে।

হঠাৎ একটা উঁচু জায়গা থেকে সবুজ বড় তাঁবুটা চোখে পড়ে! পাথরের মরুভূমিতে ওটা যেন ওয়েসিস! ওরা হাত নাড়ছে!

প্রায় ৪টা। কফি খাবার সময়। মিঃ মেহেরা ও ডাঃ নাথানিও হাজির। কফি,চানাচুর আর বিস্কুট! তার আগে, রায়দা এগিয়ে দিল, গ্লুকোজ মেশানো জল। আঃ কী আরাম!

এবড়ো খেবড়ো পাথরের সমুদ্র। কোথাও নেই সমতল ভূমি। গত দুদিনে যারা এসেছে, তাদের প্রচেষ্টায় জায়গা সমান করে পাথর সরিয়ে গর্ত ভরিয়ে কোন রকমে খাটানো গেছে বড় তাঁবুটা। তবু গ্রাউন্ড শীট- এর একটুখানি ধারালো একটা পাথরে লেগে ছিঁড়ে গেছে। এমনই কঠিন নন্দনবন, প্রত্যেকের শোওয়ার জায়গা অসমান। বাতাসের তোষক ফোলাতেও ভয়! ফেটে যেতে পারে পাথরের কোথায় কানায় লেগে।

ভাবতে পারিনি যে এত শীঘ্র এত সহজে আবার আমরা এক জায়গায় হতে পারব। কিন্তু সেটাই সম্ভব হয়েছে। আমাদের সব সদস্য এখানে হাজির আজ। অবশ্য জ্ঞান, অশোক, রায়দা ও সোমেন এগিয়ে গিয়েছিল বাসুকী গিরিশিরা ধরে-ছুনজে ও কামীর সঙ্গে, তারপর ভীষণ ভাবে ভাঙা তোবড়ানো মোচড়ানো বাসুকী হিমবাহ দিয়ে নেমে গেছিল ৫০০ ফুটের মত। সেখান থেকে আবার খাড়া চড়াই উল্টোদিকে, পথ করে এসেছে, সেই চড়াই ডিঙিয়ে ওরা গেছিল বাসুকী তাল। ওখানে কিছু কিছু মাল রেখে এসেছে।

তারপর চলল পুনর্মিলন উৎসব। নাচ গান আবৃত্তি এবং প্রশান্তর মজার মজার হাসির গল্প, পেট ফেটে যাবার যোগাড়! এরই সঙ্গে টেপ রেকর্ডারে তুলে আনা হিন্দী বাংলা গান। গুরুগম্ভীর, তারপরেই হয়তো উচ্ছল চটুল সুর আরেকটার। অসীম ধৈর্য নিয়ে সোমেন, অশ্রু, রায়দা কত যে গান লিখে এনেছে টেপ-এ!

আর, হোক না পাথরের ধ্বংসস্তূপ! বাইরে সেই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে

চারিদিকে চাইলে মন ভরে যায়! কষ্ট স্বীকার করে যতটুকু এসেছি, সার্থক মনে হয়! আমাদের চারপাশে ঘিরে শিখরগুলি অভেদ্য দুর্গ রচনা করেছে। একদিকে রক্তবর্ণের গাঢ় রক্তিম কৃষ্ণাভ গাত্রাবরণ- বাসুকী গিরিশিরার সমান্তরালে এগিয়ে গেছে চতুরঙ্গ। শিখরের দিকে। অন্যদিকে মন্দার, শিবলিঙ্গ, কীর্তিস্তম্ভ, কেদার ডোম। তুষার সাগর থেকে মাথা তুলবার চেষ্টা করছে ওরা। খানিকটা সফল হয়েছে হয়ত শিবলিঙ্গ। সে যেন গা ঝাড়া দিয়ে বরফের আবরণ, আভরণ, আস্তরণ সরিয়ে ফেলতে চাইছে, তবু শিখরে তার শুভ্রতুষার। সামনে বাসুকী গিরিশিরার অপর পারে ভাগীরথী১-২-৩, বাঁ পাশে বাসুকীর উদ্ধত ফণা।

পড়ন্ত বিকালের আলোয় আমাদের চারপাশের দুর্গের দেয়ালগুলি অদ্ভুত আলোয় আভাসিত। অশ্রু শুনলাম অবিশ্রাম ফটো তুলে চলেছে সকাল থেকেই। প্রতিমুহূর্তেই বদলাচ্ছে আকাশের রং, প্রকৃতির পরিবেশ। মেঘ, আলো, কুয়াশা শিখরসমূহকে নিয়ে খেলা করছে।

বিশ্বদেব বিশ্বাস

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে

চৌংরিকিয়াং মূল শিবির, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৬

তিন দিন কাটল প্রায় একই রকম অভ্যাসে।

পরশু দিন নৈসর্গিক ঘটনার এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে-এই উচ্চতর পৃথিবীতে ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ভয়াবহ একটা ধারণা আগে থেকেই আছে। সেইজন্য তখনকার মনের শঙ্কিত অবস্থায় এখানকার ভূমিকম্পের পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করতে পারিনি। তবুও চোখের সামনে দেখেছি-এই কঠিন স্থির হিমানী-তরঙ্গসমূহ সহসা মুহূর্তের মধ্যে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিশালায়তন অচল হিমশৃঙ্গগুলি হঠাৎ একই সঙ্গে অথচ পর পর নেচে উঠল। নৃত্যের যেন একটা সুস্পষ্ট গতি, -দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ,অথচ নৃত্যচঞ্চল নটেরা নিজ নিজ পটভূমিতে দৃঢ়-সম্বন্ধ! সেই অনুপম দৃশ্য এখনও যেন দেখছি! বুঝিয়ে বলবার ভাষা জানি না।

শিবিরের সামনেই দেখছি-ঝুলছে একটা 'হ্যাঙিং গ্লেসিয়ার', মনে হয় এখনই যেন পড়ে যাবে। বাতাসের ভার সইবে না। আশ্চর্য! ভূমিকম্পে তার কিছুই হলো না। মেজর বাজী রেখেছেন — কয়েক বছরেও কিছু হবে না।

আমাদের আজ শেষ আরোহণ,হিমশিলা-আরোহণের শেষ পরীক্ষা। কাল অধ্যক্ষ মেজর শ্রী এন্.ডি.জয়াল নেমে ফিরে চলে গেছেন,কি জরুরি কাজ আছে। বাকি ক'টি দিন তার স্নেহানন্দময় সঙ্গ আর পাব না। আজ যেতে হবে আমাদের এ ক'দিনের নিত্য অভ্যাস-স্থল র‍্যাটিং হিমশিলা।

নদীর উপরকার নতুন তুষার গলে গিয়ে 'নেভা' (Neve) বেরিয়ে পড়েছে। বহুদূর পর্যন্ত দীর্ঘ এক কাচের 'সিট' যেন-স্বচ্ছ, মসৃণ ও পিচ্ছিল। আমরা 'স্কি' করার মত পা ঘষে ঘষে চলতে লাগলাম। পিছল এমন যে, পা দেওয়া মাত্র সরে যায়। দেখা যাচ্ছে, তলায় টলটল করে চলেছে তরল রূপালি জলের হিল্লোল, অমৃতময় সুধা যেন কাচ পাত্রে সুরক্ষিত। জল বয়ে যাওয়ার অস্ফুট কলধ্বনিও শুনতে পাওয়া যায়। তলায় স্রোতস্বিনীর চলন্ত প্রবাহ, তার উপরে স্থির কঠিন স্থূল বরফের সর। আমরা ছাব্বিশ জন একত্রে এক জায়গা দিয়ে একভাবে হেঁটে চলেছি,

ভাঙল না, নড়ল না, একটুও কাঁপল না। একজন ওস্তাদ নদীর এই নেভার উপর আইস্-অ্যাক্সের সূচলো দিকটা সজোরে আঘাত করতেই. বেগে বার হয়ে পড়ল প্রস্রবণের মত উর্ধ্বমুখী জলস্রোত , — কলকাতায় জলের নলে ছিদ্র হলে যেমন হয়। কি বিচিত্র এই নেভা! আমরা জলকে স্পর্শ না করেও জলের উপর দিয়ে বুট পায়ে হেঁটে চলেছি।

র‍্যাটিং হিমশিলার উপর দিয়েই আমাদের আজকের আরোহণ। এই হিমশৈলটির সঙ্গে আমাদেরও জমে গেছে বন্ধুত্ব. দেখলে এখন আর ভয় করে না, কৌতূহল অথবা নব বিস্ময়ানন্দেরও উদ্রেক হয় না। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় আতঙ্ক মনোহারিত্ব দুই-ই চলে গেছে! প্রথম প্রথম নির্বাক বিস্ময়ে নিষ্পলক নেত্রে এর দিকে আমরা সভয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছি; পরে এরই গায়ে সজোরে সবুট পদাঘাতে 'কিক্ অ্যান্ড আপ্' পন্থায় অথবা আইস্-অ্যাক্সের সাহায্যে ধাপ কেটে কেটে উঠতে শিখেছি। দড়ির নানাবিধ কাজ. মায় রিপেলিং পর্যন্ত বেশির ভাগ দিনই আমরা এর উপর দিয়েই শিখেছি।

র‍্যাটিং হিমশৈল অতিক্রম করে আছে একটি অধিত্যকায় শেরপা পাহাড়ীদের পবিত্র তুষার-তীর্থ 'দুধপুকুর'। আরও গরম পড়লে যে বৎসর আবহাওয়া অনুকূল থাকে, কদাচিৎ কখনও দু পাঁচজন তুষারারোহণপটু তীর্থযাত্রী আসেন বটে, কিন্তু তার পৃথক পথ আছে। আমরা যেখান দিয়ে যাব. সে পথ শুনছি অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ; সেজন্য এইটিই আমাদের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষক ও উল্লঙ্ঘনের নেতা স্বয়ং তেনজিং।

পৌঁছে গেছি দুধ পুকুর। ধবধবে সাদা বরফ. যেন এক পুকুর দুধ। দুগ্ধের শুদ্ধ শুভ্র পবিত্রতা রক্ষা করছে নীলাভ কৃষ্ণপ্রস্তরের পাত্র। হঠাৎ মেঘমুক্ত সূর্যালোক পড়তেই যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনেরই পুকুর- যেন প্রকান্ড এক অগ্নিকুন্ড, নিষ্কম্প লেলিহাম উজ্জ্বল উর্ধ্বমুখী তার শিখা!-গগল্স্ আঁটা হলেও চোখ আপনা থেকেই বুঁজে গেল। আলোকেরই এক অপরূপ খেলা,-অপূর্ব-চমৎকার!

দূরে দেখা যাচ্ছে,-গড়িয়ে যাওয়া বরফ-যেন কতকটা পথের মত, যেখান দিয়ে অন্যদিক থেকে অসমসাহসী পাহাড়ীরা তীর্থ করতে আসে। ক্রমশঃ নিম্ন পর পর হিমশৃঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে , কোথাও সোজা. কোথাও ঘুরে ঘুরে তথাকথিত এই পথটি নেমে গেছে।

এখানকার উচ্চতা সতের হাজার ফুটের উপর । একটা টিলার উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছি, নীচে দুধ পুকুর। দেখি যে শ্রী তেনজিং বুটের তলায় ক্রাম্পন লাগাননি। একথা তাঁকে বলায় ঈষৎ ম্লান হেসে তিনি উত্তর দিলেন, " অভ্যাস হয়ে গেলে তোমাদেরও লাগবে না।"

একটু থেমে, বিষণ্ণভাবে আবার বললেন, " বিশ্বাস আজ তুমি আমাকে যে কথা বলছ, আমিও আগে ঠিক এই কথাই একদিন বলেছিলাম ওস্তাদ আরোহী 'ফ্রে' সাহেবকে । আমার ঠিক এই উত্তরটাই বলেছিলেন তিনিও আমাকে। ঐ যে অদূরে 'ফ্রে' চূড়া, আগে চূড়াটার নাম ছিল কাঙচূড়া। যেদিন পাহাড়টায় চড়ব তার আগের দিন রাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দেখলাম। আমরা মানি, পাহাড়ে দুঃস্বপ্ন দুর্ঘটনারই প্রবক্তা। ফ্রে সাহেবকে বলতেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। তারপরেই সাহেব, আমি ও আংদাওয়া যাত্রা করলাম। উঠছি আমরা তিনজনে। সামনে ফ্রে সাহেব। পাহাড় এমন কিছু খাড়াই নয়- এমন কিছু বুক-ভাঙা চড়াইও নয়। তবে বরফ ক্রমশঃ কঠিন হচ্ছিল। আমি জুতোর তলায় ক্রাম্পন লাগিয়ে নিলাম। সাহেবকে বললাম লাগাতে। সাহেব মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'লাগবে না'। পাহাড়ে ওঠার বিদ্যেটা ফ্রে সাহেব রপ্ত করেছিলেন বেশ ভালই। আজ অবধি ভাবি, ওদিন সাহেবকে আমার জোর করে বলা উচিত ছিল। আরও পীড়াপীড়ি করা উচিত ছিল। বিশেষ করে ঐ স্বপ্ন দেখার পর। আমিও যেন সব ভুলে গিয়েছিলাম ।

"উঠছিলাম ভালই। শীর্ষ মাত্র আর দু'হাজার ফুটের মত বাকি। হঠাৎ সাহেব পড়ে গেলেন। কেন এবং কেমন করে তা জানি না। দেখলাম, সাহেব গড়াতে গড়াতে পড়ছেন আমারই দিকে । বোধ হয় আমাকে সুদ্ধ নিয়ে গড়িয়ে যাবেন নীচে। আমার কাছাকাছি আসতেই মন্ত্রমুগ্ধের মত লাফ দিয়ে ধরতে গেলাম। বৃথা! প্রচন্ড গতিবেগে আমার হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। ধাক্কা খেতে খেতে তাঁর দেহ গড়িয়ে পড়ল প্রায় দু'হাজার ফুট নীচে ঠিক একখানা বড় পাথরের মত। আমি নিশ্চল স্থাণুর মত হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর নেমে এসে পেলাম নিথর নিস্পন্দ পুঞ্জীভূত ফ্রে সাহেবের মৃতদেহ। আমার পাহাড়ে চাড়ার জীবনে আমি চোখের সামনে এই প্রথম কাউকে মারা যেতে দেখলাম।দেখলাম, স্বপ্ন সত্য হল। ঐ পাহাড়ের নীচে পাথর সাজিয়ে সাহেবকে শুইয়ে রেখেছি। আজও তিনি ওখানে শুয়ে আছেন আর স্মৃতি-ফলকের মত ঐ চূড়াটা তাঁরই নামে লেখা আছে-

"ফ্রে চূড়া"। বলতে বলতে তেনজিং অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। যাক, সুনিপুণ সাহসী পর্বতারোহীর আশীর্বাদে নিরাপদে তোমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হোক। তাঁরই আত্মা আজ তোমার মুখ দিয়ে আমাকে সাবধান করেছেন।"

তিনি ক্রাম্পন লাগিয়ে নিলেন।

আবার আরম্ভ হল আরোহণ। চড়াই-এর ভীষণতায় ও শ্রান্তিতে আরও পাঁচজন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ফিরে গেলেন তাঁরা এই দুধ পুকুর থেকে।

পর্বতগাত্র কখনও ক্রমোচ্চ, কখনও সোজা খাড়াই, কোথাও বরফের উপর উপল বিস্তৃত, কোথাও এক হাঁটু নূতন তুসার, কোথাও বা নগ্ন কঠিন মসৃণ গ্লেসিয়ার। রিজ্ থেকে রিজ্-পাথরের বা বরফের, কোথাও 'কিক্ অ্যান্ড আপ', কোথাও জিগ-জ্যাগ, কোথাও সোজা, -যখন যেখানে যেমন সুবিধা, সেই পদ্ধতিতে উঠছি।

শরীর ক্লান্ত, মন তাকে জোর করে টেনে বা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দেহ এবং মনে লেগেছে দ্বন্দ্ব, -দেহ চায় নামতে, মন চায় উঠতে; -স্বভাবসুলভ কৌতূহলী মন। সম্মুখে দন্ডায়মান এক বিরাট প্রাচীর, শ্বেত গম্বুজ — White Dome. এত খাড়াই যে ঘাড় পিছনে হেলিয়ে দেখতে হলো। শুনলাম এইটাই শেষ। শেষ উৎসাহ সঞ্চার হলো। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো,"Just wait, old thing, we'll get yet."দেহ মনের সঙ্গে সহযোগিতা করল।

সামনে আছি এখন মাত্র পাঁচ জন — আমরা ক্যাডেট তিন জন, আর পুলিশ অফিসার দু'জন; আর সবাই পিছিয়ে পড়েছেন। আমরাও ক্লান্ত, অবসন্ন, তবু হতোদ্যম হইনি; শেষ পর্যন্ত লড়ব, জিতবই। N.C.C. মেজর ডেভিড ও কলেজের ক্যাপ্টেন চাটার্জি বার বার উৎসাহ দিয়ে বলেছেন --- Don't throw mud on the face of N.C.C'S.আমাদের সহশিক্ষার্থী সমরিক অফিসাররা আমাদের স্নেহ করেন সত্য, কিন্তু আমরা সৌখীন বাহিনীভুক্ত বলে আমাদের ঠিক সমপর্যায়ভুক্ত হয়তো মনে করেন না। এঁদের দেখাতে হবে, সরকারী মাহিনা না নিয়েও এন্-সি-সি ক্যাডেট্রা যোগ্যতায় তাঁদের চেয়ে কম নয়; বরং তাঁরা যা পারেন না, আমরা তাও পারি। বাঙ্গালীর শ্রমশক্তি ও সহনশীলতার কথায়, বিশেষ করে আমার অসুস্থতাজনিত দুর্বলতার জন্য সেদিন স্বয়ং অধ্যক্ষ মেজর আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন; তারও সম্মানযোগ্য উপযুক্ত উত্তর দিতে হবে।

সাংঘাতিক জায়গা, এক মুহূর্ত দাঁড়াবার জায়গা নেই,- উপায় নেই। পায়ের

তলা থেকে বরফ ধসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে আনে বেশ কয়েক ফুট নীচে। উপুর হয়ে শুয়ে, আইস্ -অ্যাক্স বরফে গেঁথে ধরে, এই গড়ান পিছিয়ে আসা রোধ করতে হচ্ছে। টিকটিকির মত ই হাত ও পায়ের পার্থক্য লোপ হয়ে গেছে। দেরি হলেই আপন ভারে নেমে পড়তে হচ্ছে বলে, 'তাড়াতাড়ি' আরোহণ নিয়মবিরুদ্ধ হলেও এখানে তাই-ই হয়েছে অপরিহার্য।

উৎসাহ পরিণত হলো উত্তেজনায়। সামনে আছেন অভিজ্ঞ ওস্তাদ শ্রীআংথারকে. তাঁর পরেই আমি এবং আমার পিছনে ক্যাডেট মদন ও দিলীপ। পুলিসের বীরত্বও পিছিয়ে পড়েছে।

আগে থাকায় ওস্তাদের সমস্ত কৌশল ও পদক্ষেপ আমি দেখতে পাচ্ছি, যথেষ্ট সুবিধা হতে লাগলো এবং গতিও দ্রুততর। ওস্তাদের উপর রাগও হচ্ছে, নিজে কোন রকমে একটু নিরাপদ বুঝে দূর থেকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন -'উ ধারসে আও,'- 'ই ধারসে মৎ আও,' -'হুঁসিয়ার, মৎ গিরো'। কিন্তু আমি যে 'গিরলাম' কি না— পিছন ফিরে একবার চেয়েও দেখছেন না আর ,- আমি আছি না তলিয়ে গেছি! আবার এগিয়ে উঠছেন। ভাবছেন কি! আমি কি পাকা আরোহী হয়ে গেছি যে, আমাকে আর না দেখলেও চলে!

উঠে গেছি উপরে, আঠারো হাজার ফুট,- আরও উচ্চ এক হিমশৃঙ্গে।

সম্মুখে যা দেখছি-, এ কি! সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তি মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম। চক্ষু সার্থক, জীবন পণ করা পরিশ্রম সার্থক। অকল্পনীয় অপার্থিব সৌন্দর্য,- এত চমৎকার,-বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছি না. কলমের কালির দাগের বেড়া দিয়ে একে বাঁধা যাবে না; আমার ভাষাই বা কতটুকু!

ওই কাবরু শৃঙ্গ ২৪,০০২ ফুট-স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চূড়ায় যেন একটি মন্দির — স্তরে স্তরে যেন দুগ্ধ শুভ্র হিমশিলা দিয়ে গেঁথে তোলা, অতি নিপুণ ভাবে তৈরী। কি তার শোভা। অন্য যে দিকে চাই,— বরফ — বরফ, — আরও বরফ, — যতদূর চেয়ে দেখি, — শুধুই শুভ্র বরফেরই বিস্তৃত স্তূপীকৃত ঢেউ,— আর উপরে — অনন্ত নীল, — এ ছাড়া আর কোথাও কোন কিছুরই অস্তিত্বই নেই। নানা আকৃতির, নানা প্রকৃতির ঢেউ, — কোথাও প্রাচীর, কোথাও বা বিরাট স্তম্ভের মত চ্যালেঞ্জ করছে, আবার কোথাও বা সাদর আহ্বানে পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে নিজেই — হিমালয়তীর্থ যাত্রীদের জন্য। ১৯৩৫ সালে 'কুক' পার্টি এই পথেই

এগিয়েছিলেন

শোভার বৈচিত্র্য পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতি মিনিটে, পলকে পলকে। — এই ঘন মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতি, পরক্ষণেই এক ফুৎকারে সেই মেঘ উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল নির্মল নীল আকাশের নীচে নব নব মনোহর শোভা। সূর্যের পূর্ণতেজোদীপ্ত তুষার-মূর্তির স্বর্ণজ্যোতিতে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, পরক্ষণেই লঘু বলাকার অস্বচ্ছ আবরণ এসে সেই উগ্রতাকে নম্র করে অপরূপ রৌপ্য-মহিমামন্ডিত প্রশান্ত কমনীয় স্নিগ্ধতায় ঢেকে দিচ্ছে।

সুন্দর — সুন্দর ! — অত্যাশ্চর্য অভাবনীয় মাদকতাময় কি এক অনুভূতি! এই-ই সুখ, জীবনের সানন্দ উপভোগ, স্বোপার্জিত!

আমার এখন মনে হচ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখীদের আমি অন্যতম। আমি যেন এই জন্যই জন্মেছি, এরই জন্য এতদিন ধরে একটু একটু করে আজ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছি; আমার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন- সব এই উদ্দেশ্যেই। আমরণ দিনের পর দিন এই সৌন্দর্য, এই আনন্দরাশির মধ্যে থাকব। ইচ্ছে হচ্ছে না এখান থেকে এক পা আর যাই। পৃথিবীর অন্য যা কিছু, সব আমার কাছে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

সহসা যেন বিনা মেঘে বজ্রনাদ! - এক সঙ্গে শত শত কামান গর্জন না কাঞ্চনজঙ্ঘার রুদ্ধ রুদ্র আক্রোশ! একটানা অথচ চাপা।

অ্যাভালাঁস পড়ছে। তুষারারোহীদের সর্ববিধ্বংসী শত্রু। বিরাট পর্বতের মত এক তুষারস্তূপ পতনশীল অবস্থায় দেখাচ্ছে শুভ্র মেঘ বা ধোঁয়ার মত। অতি দ্রুত উল্কাবেগে ছুটে নামছে, শব্দ বেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত, বিচ্ছেদহীন।

আদেশ হলো-''আর নয়-নামো''। আর অগ্রসর হতে নিষেধ করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা!

আরম্ভ হলো অবরোহণ। পরক্ষণেই পাশ দিয়ে যেন একখন্ড বরফ বেগে ছুটে নীচে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে চীৎকার-'পড়ে গেছে', 'পড়ে গেছে'—

বরফ নয়, ক্যাডেট দীলিপ। বরফে লুটোপুটি খেয়ে সর্বাঙ্গ তার সাদা। হাত থেকে আইস-অ্যাক্স ছিটকে বেরিয়ে গেছে। কি অসহায় অবস্থা। আমরা স্থাণুর মত নিশ্চল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। করার কিছু নেই।

চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট আন্দাজ নীচে কাছেই আটকে গেছে বরফের একটা খাঁজে।

তাড়াতাড়ি নেমে দেখি-অর্ধচেতন অবস্থা হলেও কিছুটা নিজের চেষ্টা ও কিছুটা বরাত জোরে আঘাত বেশি লাগতে পারে নি। একটু জানু জখম হয়েই ফাঁড়া কেটে গেছে। মানসিক অবস্থা সামলাতে বেশ সময় লাগল।

হবে না! আমাদেরই বুক কেঁপে উঠেছিল,-যাঃ-হয়ে গেল বুঝি 'ফ্রে' সাহেবের অবস্থা!

দিলীপের আঘাত মোটেই সামান্য নয়। চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিনায়ক ও আমি ওর রুক-স্যাক্ নিয়ে নিতে চাইলাম। দিল না! সেই একই অভ্যাস-পিঠে রুক-স্যাক্ ও হাতে আইস্-অ্যাক্স এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে ওগুলো ছাড়লে মনে হয় যেন দেহের ভারসাম্য থাকছে না।

দিলীপ মদনের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ধীরে ধীরে নামতে থাকল। আঘাত-পাওয়া পায়ের জানু ফুলে গেছে।

তাঁবুতে ফেরার পর থেকে সারারাত্রি ধরে মদন সমানে দিলীপের পায়ের পরিচর্যা করেছে, কারণ দিলীপকে কাল বাদে পরশু আবার হেঁটে ফিরতে হবে। অতুলনীয় বন্ধুপ্রীতি, মহানুভব মানবীয় সেবা।

মদনের সেবা ও ত্যাগের আর এক ঘটনা শুনেছি। একদিন রাত্রে বিনায়ক ভট্টাচার্যের পায়ে ক্লাম্প লেগেছিল। মদন ছিল বিনায়কের তাঁবুর সঙ্গী।

সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে মদন সমানে বিনায়কের পায়ে মালিশ করে তাকে সহজ সুস্থ করে তুলেছে। পরের দিন একথা বিনায়কের কাছেই শুনেছি। বলতে বলতে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গিয়েছিল। মদনের এই পরোপকারী মনোভাব সততই দেখছি স্বতঃস্ফূর্ত, বলা যায়-সহজাত।

মূল শিবির-চৌংরিকিয়াং, ৫ই এপ্রিল ১৯৫৬

চৌংরিকিয়াং- এ আমাদের শেষ দিন, আজ পূর্ণ বিশ্রাম; আমরা নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত। কাল পূণর্যাত্রা, কথা হচ্ছিল অন্য পথ দিয়ে ফিরবার। কিন্তু বাহকেরা খবর নিয়ে এল যে, বিলম্বিত শীতের জন্য অত্যধিক তুষারপাত হয়ে সে পথে বরফ জমে আছে — কোথাও কোথাও এক কোমরেরও উপর। পাকাপাকিভাবেই ঠিক হলো, যে পথে এসেছি, সেই পথেই পূণর্যাত্রা,-একেবারে উল্টোরথ।

কাজ নেই, সুতরাং কাজের খতিয়ান মিলিয়ে আবার দেখা হলো ,সকলে

বসে,-কে কি শিখেছি, কার কোনটি বাদ গেছে। আমার একদিনও কামাই হয়নি, যে দিন অসুখ হয়েছিল ইয়ক্সামে, সে দিন ছিল ছুটি। ক্যাডেট্দের রেকর্ড হয়েছে খুবই ভাল, মিলিটারী এবং পুলিসের তুলনায়! আসল কথা- আমরা শিখেছি আগ্রহ নিয়ে, তাঁরা চাকরী বজায় রেখেছেন।

আলোচনায় আমরা সকলেই একমত যে, যা দেখেছি আর যা করেছি, তা নির্বিরোধ সত্য, তবুও - অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব।

শ্রীতেনজিং বললেন যে, এবার যথেষ্ট অন্তরায় সত্ত্বেও এভাবের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা একবারও হতে পারে নি। আমাদের মধ্যে অবশ্য তেমন বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, যদিও তার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। তার সঙ্গে একত্রে আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা জানালাম ঐ অনতিদূরে সমাহিত 'ফ্রে' সাহেবকে।

আরও শ্রদ্ধা জানালাম আমাদের ঠিক পূর্ববর্তী দু'জন অদেখা সমশিক্ষার্থী বন্ধুকে, তাঁরা শিক্ষা-সময়ে প্রতিকূল অবস্থায় প্রাণ দিয়ে পরবর্তী শিক্ষার্থীগণকে এবং কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দিয়ে গেছেন। নূতন এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, দোষত্রুটি যা আছে, অভিজ্ঞতায় তা দূর হয়ে যাবে।

ফিরবার আকুলতা এসেছে সবারই, কিন্তু ব্যাকুলতা নেই। মনোভাব স্থির শান্ত। কিন্তু এ যেন কেমন একটা নিস্তেজ নিরুদ্যম শ্রান্তি! কোথায় আমাদের সেই উৎসাহ, সেই উদ্দীপনাময় কৌতূহল! কাল যা হবে, সেই ভাঙ্গা হাটের দৃশ্যই কল্পনার ভেতর দিয়ে উঁকি মারছে।

জন-প্রাণিহীন, এমন কি কীটপতঙ্গাদিশূন্য, জীবনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এই স্থানে আমরা সত্তর জন মানুষ এই মেঘলোকের মধ্যে সৃষ্টি করেছি নূতন এক পৃথিবী, সারি সারি বস্ত্রাবাস -শোভিত যেন একটি ছোট শহর, তার কল্যাণমূলক সমাজ ব্যবস্থা। হাস্যমুখর কর্ম কোলাহলময় এই লোকালয়ের আজই শেষ দিন।

কাল হবে এর বিলোপ। স্নেহ ও সেবাপরায়ণ সজ্জিত উন্নতমস্তক অস্থায়ী আবাসগুলি আবার হবে ভাঁজে ভাঁজে নির্জীব বস্ত্রখন্ড। নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি গুছিয়ে নিয়ে হবে পোঁটলা পুঁটলি, পথের বোঝা। আমাদের প্রাণান্ত পরিশ্রমে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচিত, প্রায় পক্ষকাল ধরে প্রাণ চঞ্চল এই অঞ্চল কাল সকাল ৯টার পরেই আবার অনন্ত তুষার-প্রান্তরভুক্ত হয়ে থেকে যাবে।

আমাদের কোন চিহ্ন আর এখানে থাকবে না। সামান্য যা কিছু মলিনতার স্পর্শ কলঙ্ক লেগে থাকবে, তা আবার তুষারপাত হয়ে গলে ধুয়ে, সেই শুদ্ধ শুভ্র

চিরপবিত্র হিমালয় দেবালয়রূপেই বিরাজ করতে থাকবে, ঠিক যেমনটি থেকেছে অনাদি অনন্ত কাল থেকে।

কি আশ্চর্য মন! এই চৌংরিকিয়াং ; এই রতনচু, এই র‍্যাটং হিমশৈল, তার বরফ গুহা, দুধপুকুর, কাবরু, ওই- ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা,-এদের প্রত্যেককেই আজ মনে হচ্ছে আমাদের যেন কত আপনার! আবাল্য পরিচিত স্বদেশ স্বগৃহ স্বজনের স্মৃতির প্রবল আকর্ষণে আবার আমরা চলেছি ফিরে-পনের হাজার ফুট নীচে ভগীরথীর তীরে সেই স্নিগ্ধ-শ্যামল ক্রোড়ে,যেখানে রেখে এসেছি আমাদের চিরপ্রিয় আপনার বলতে যা-কিছু সবই। তবুও এই মেঘালোকের মধ্যে, যেখানে তারই মত সর্বতোব্যাপী মৃত্যু গ্রাস করতে চায় সর্বতোভাবে, অবাঞ্ছিত অবস্থা সকল রকমেই আমাদের প্রতিকূল,- সে সবকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি;-এই চিন্তাতেও তো শান্তি পাচ্ছি না! যেন কত কি হারানোর কেমন এক ব্যথা অন্তরে এনে দিচ্ছে অস্বস্তি!

মনে হচ্ছে — এদের এই পরম রমনীয় সৌন্দর্য, অন্তরের অসীম সৌহার্দ্য, এই তো - ক'দিন এই অসমতল বন্ধুর পথে বাঁ হাতখানি ধরে ধরে পা ফেলতে শিখিয়েছে র‍্যাটং হিমশৈল, বুটের তলায় পিঠ পেতে দিয়ে, তীক্ষ্ণ ইস্পাত-কন্টকে বিদ্ধ হয়ে আমাদের ধরে রেখেছে মৃত্যুর প্রবল অধোমুখ আকর্ষণ থেকে। শ্রান্ত চরণ ও ক্লান্ত দেহকে বসিয়ে রেখে স্নিগ্ধ বায়ুর ব্যজনে শ্রম দূর করে দিয়েছে, যেমন করেছেন শৈশবে স্নেহময়ী জননী, আর সুসমতলা বঙ্গমাতা। এই দুই আকর্ষণের প্রকৃতি বিপরীতমুখী, তবও বিমাতার হিমানীস্পর্শের এই স্নেহ মাধুর্য মাত্র এই ক'দিনেই অমৃত সিঞ্চনে মধুময় করে দিয়েছে হৃদয়কে। মনে মনে বলি- বিদায় বন্ধু,-আবার আসব, আবার দেখা হবে। বহুদূর ও ভিন্ন দশজাত ফ্রে সাহেবও ভালবেসেছিলেন এই হিমাদ্রিকে। সে ও নিপতিত, আঘাতপ্রাপ্ত, অস্থি বিচূর্ণিত ফ্রে-কে হিমানী - প্রলেপ আঘাত -ব্যথায় শান্তি দিয়েছে, তার শান্ত শীতল কোলে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। স্নেহ শান্তিময় আকাঙ্ক্ষিত চির বিশ্রাম লাভ করেছেন ফ্রে সাহেব!

১৫ই মার্চ দার্জিলিং থেকে যাত্রাকালে মনে পড়েছিল ওয়েনের কবিতা, আজ আবার মনে পড়ছে তার শেষাংশ —

"পিঠে বোঝা নিয়ে যুদ্ধপ্রত্যাগত পথ শ্রান্ত সৈনিক অজ্ঞাত, অখ্যাত, অপরিচিত পথিক রূপে পল্লীর কূপসমীপে এসে পিপাসার শান্তি লাভ করে আবার ধীর মন্থর ক্লান্ত চরণে চলেছে-সুদূর গ্রামের গৃহে ফিরে গিয়ে দেখবে- কে আছে,

প্রবোধকুমার সান্যাল

দেবতাত্মা হিমালয়

ক্রমে ক্রমে দোকানপত্র অদৃশ্য হোলো,যাত্রীদল নিয়ে সারবন্দী ঘোড়াগুলি শান্তগতিতে দূর পাহাড়ের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। একটি একটি তাঁবু উঠে গেল, পুলিস ও মিলিটারীর দল অগ্রসর হোলো। দেখতে দেখতে সেই পর্বতমালার প্রাচীরঘেরা ক্রোড়ভূমি আবার হয়ে এলো জনশূন্য। আমরা পড়েছি প্রায় শেষের দিকে, কারণ আমাদের সব দেখে যাওয়া চাই। শোনা গেল, পহলগাঁও থেকে আজও মধ্যাহ্নের দিকে কিছু যাত্রী আসবে, তারা আজ সন্ধ্যায় পৌঁছবে বায়ুযানে। সুতরাং চন্দনবাড়িতে দু-একটি খাবারের দোকান থেকে যাবে বৈকি। আজ আমাদের গন্তব্য স্থল হোলো বায়ুযান, --শেষনাগের হিমবাহ আজ আমরা অতিক্রম করবো। যখন আমরা চন্দনবাড়ি থেকে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লুম, বেলা তখন নটা। রৌদ্র আজ আর প্রখর হ'তে পারছে না, মাঝে মাঝে একটু-আধটু মেঘের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঠান্ডা লাগছে বেশ,--যারা পায়ে হেঁটে যাবে, ঠান্ডায় তাদের সুবিধা। যেদিকটায় পর্বতের ছায়া, ঠান্ডা সেদিকে বেশী। আজকের পথ বনময়। কোথাও কিছু পথ ভালো, কিছু পথ পাহাড়ের ভাঙনে বিঘ্নসঙ্কুল। নীচের দিকে দেওদারের ঘন বন, মাঝে মাঝে চিড় আর শিশুম্, ভুর্জপত্র আর আখরোটের জঙ্গল, এপাশে ওপাশে গিরিগাত্রের নির্ঝরিণীর ঝরঝরানি শব্দ। এই পর্যন্ত নাকি জন্তু-জানোয়ারের শেষ আশ্রয়, এর পর থেকে তাদের সংখ্যা বড়ই কম। গতকালকার রৌদ্রে আর রাত্রের তুহিন ঠান্ডায় যে কারণেই হোক আমাদের পথে প্রচুর হিমকণাপাত ঘটেছে। সমস্ত পথটা সেজন্য পিছল ও সপসপে। আমরা ধীরে ধীরে উঠছি উপরে। যারা পায়েহাঁটা, তাদের গতি মন্থর হয়েছে। তারা লাঠি ঠুকে চলছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, তাদের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে পেরিয়ে যেতে আমাদের কিছু কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে- সন্দেহ নেই। অর্থাৎ মনের মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন অক্ষমতা ও পরাজয়বোধ অনুভব করছি। উপায় নেই, এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

প্রায় মাইল দেড়েক এসে আমরা সেই সুপ্রসিদ্ধ চড়াই-পথ পেলুম। এর নাম 'পিসুর' চড়াই-এটি চন্দনবাড়ি অঞ্চলে অতি কুখ্যাত। অনেকে বলে, এটি হোলো

প্রথম এবং সর্বপ্রধান অগ্নিপরীক্ষা। নীচের দিকে নিবিড় অরণ্য, আস্তে আস্তে উঠতে থাকলে অরণ্যলোক হালকা হয়ে আসে। পথের প্রথম দিকে এত পাথরের জটলা এবং সে-পাথর এত আলগা যে, যদি দৈবাৎ একটি কি দুটি স্থানচ্যুত হয়, তবে সর্বনাশ! নীচের দিকে অসংখ্য যাত্রী হয়ত প্রাণ হারাবে। নাগা-সাধু, সন্ন্যাসী ও মহন্ত মহারাজরা চলেছে মন্ত্র জপতে জপতে। প্রতিটি পদক্ষেপ ক্লান্তিকর। লাঠির ভর দিয়ে দু-পা ওঠো, আবার দাঁড়াও, নিশ্বাস নাও, আবার ওঠো। পথ বিপজ্জনকভাবে পিছল। নীচের থেকে মাথা উঁচুতে তুললেও পর্বতের চূড়া দেখা যায় না। ঘোড়া উঠছে,— সামনের দুটো পা উঁচুতে, পিছনের পা দুটো নীচে। মানুষের মতো ঘোড়াও সন্তর্পণে পা তুলছে, পাছে পিছলে যায়, পাছে হোঁচট খায়। এ তাদের অভ্যাস, এ তারা জানে। কিছুদিন আগে গিয়েছিলুম ভূটানের দিকে বক্সা দুর্গে। মাঝখানে আন্দাজ আধ মাইল এই প্রকার পথ ছিল। কিন্তু তার বিস্তৃত আঁকবাঁক ছিল ব'লে এতটা বুঝতে পারা যায়নি। এখানকার পাক-দন্ডিতে ঘোড়ার দেহের সামনের অংশটা যখন বাঁক নিয়ে উঠছে, পিছনের শরীরটা তখন আগেকার বাঁকপথে থেকে যাচ্ছে,— অর্থাৎ পরিসর এত সামান্য। দিল্লীর কুতবমিনার উঁচু আড়াইশো ফুট, কিংবা কলকাতার মনুমেন্ট উঁচু দেড়শো ফুট। কিন্তু ওদের ভিতরকার সিঁড়ি যদি ঘুরে ঘুরে চার মাইল পথ উঁচুতে উঠতো-তাহলে? কুতবমিনারের ভিতরের সিঁড়িতে সোজা হয়ে এক একবার দাঁড়ানো যায়। এখানে সিঁড়ি নেই, পাহাড়ের খাঁজ নেই, জিরোবার স্থান নেই, দাঁড়াবার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বিপদ তাদের, যারা নীচের দিক থেকে এখনও উপরে উঠছে। ঘোড়ার পায়ের ঠোকরে যদি একটি পাথর গড়ায়, তবে সেটি ঠেলবে আরেকটি পাথরকে-দুটিতে গিয়ে তৃতীয়টিতে দেবে ধাক্কা,- তারপর? তারপর নীচের তলাকার যাত্রীদের সেই শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যু আর ভাবতে পারিনে। পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ডান্ডিতে চড়ে বাঙালী মহিলা। আতঙ্কে তাঁর চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়েছে। বিজ-বিজ ক'রে বলছেন, জয় অমরনাথ! জয় বিপদতারণ মধুসূদন! চোখে আঁচল চাপা দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা!

উপুড় হয়ে আমরা ঘোড়ার গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আছি। খদের দিকে তাকাচ্ছিনে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'তে পারে। উপর দিকে তাকাতে পারছিনে, মাথা ঘুরে যায়। শুনেছি যারা আত্মহত্যা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তারাও অপঘাত মৃত্যুকে ভয় করে! নীচের দিকে কোথায় চন্দনবাড়ি শূন্য অধিত্যকা হারিয়ে গেছে,

অরণ্যের শীর্ষস্থান আর খুঁজে পাচ্ছিনে, পৃথিবী আমাদের অনেক নীচে, অনেক পিছে প'ড়ে রইলো! তেরো চৌদ্দ বছর আগে পন্ডিত নেহরু এসেছিলেন এখানে, শেষনাগের তুষার-নদী দেখবার ইচ্ছা ছিল তাঁর,--কিন্তু এই পিসুর চড়াই তাঁর পথে বাধা ঘটিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খাঁন আবদুল গফ্‌ফর খান এবং শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। পন্ডিতজীকে তাঁরা এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন এক একটা বাঁক আসতে লাগলো যে, আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলুম। সবচেয়ে বিপদ ছিল, এই অদ্ভুত পাহাড়ের এক একটি স্থলের মৃন্ময় পিচ্ছিলতা, এক একটি স্থলে ধারালো পাথরের ফাঁকে মাত্র এক ফুট কিংবা ছয় ইঞ্চি পরিমাণ পা রাখার জায়গা। একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহূর্তের অন্যমনস্কতা, সামান্য একটি হিসাবের ভুল,-- তারপর মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে যাত্রীর মালপত্র প'ড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে; ক্লান্ত ঘোড়া তার পিঠের সওয়ার এবং মালপত্র ফেলে দেবার চেষ্টা করছে,-- সেখানে তার আত্মরক্ষণীবৃত্তির আদিম চেতনা। মাঝে মাঝে তাদের অবাধ্যতা, মাঝে মাঝে তাদের অবস্থান-ধর্মঘট। গণি ধরেছে শক্ত হাতে আমার ঘোড়ায় লাগাম। সতর্ক তার চক্ষু, সতর্ক প্রহরা। অভয় দিচ্ছে আমাকে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে। গণি নিজে হাঁপাচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে মুখের থেকে এক-একটা আওয়াজ বার করছে। কখনো ঘোড়াদের দিকে শিস দিচ্ছে,কখনো বা নিঃঝুম পাহাড়ের মধ্যে চেঁচাচ্ছে- 'হোউস,-সাব্বাস! হোউস,-সাব্বাস!' ওটা তাদের বুলি, ও বুলিটা ঘোড়ারা বোঝে। যে দুটি ঘোড়া আগে-পিছে চলে, তারা নিজেদের মধ্যে মন জানাজানি করে, একজনকে ফেলে আরেকজন এগোয় না, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পথের মাঝখানে জিদ ধ'রে দাঁড়ায়, চেঁচায়, অবাধ্য হয়। ওদের এই প্রকৃতি রক্ষকরা জানে এবং সেইমতো ব্যবস্থা করে। এই পথের সম্বন্ধে বায়ুযানের তাঁবুর মধ্যে ব'সে আমার নোট-বইতে যেটুকু লিখে রেখেছিলুম, এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি ঃ

''সর্বাপেক্ষা উঁচু চড়াইপথ পার হচ্ছি। সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী সমস্তটা ভয়াবহ। আমার জীবনে এমন সঙ্কটসঙ্কুল চড়াই খুব কমই অতিক্রম করেছি। পথ অতিশয় পিছল, দুঃসাধ্য এবং দুরতিক্রম্য। অবকাশ নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপত্র ফেলে দিচ্ছে ঘোড়ারা। মহিলারা প'ড়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটি ভুল মানেই মৃত্যু। আশেপাশে বিভীষিকাময়

গহ্বর, তুষার-গলা প্রপাত, শক্ত বরফে আচ্ছন্ন নদী, তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্বত এবং সমস্ত পথের দুই পাশে মধ্য শরৎকালের বিবিধ রঙীন বর্ণের অজস্র ফুলের সমারোহ শোভা। প্রত্যেক পদে পদে সাধু-সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা, অশ্বরক্ষক ও কুলীর দল,— প্রত্যেকে এক একবার হাঁ ক'রে নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করছে। এই প্রকার মর্মস্পর্শী দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট আরো উপরে উঠে এলুম—।''

নীচেরতলা থেকে উঠে ছাদের খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালুম। এটা উপত্যকা। চন্দনবাড়ি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ, তবে লম্বা অনেকখানি। সামনে সুদীর্ঘ সমতল দেখে আমাদের মুখে-চোখে অসীম স্বস্তিবোধ। যারা এখনও পিছনে আসছে, তাদের কথা ভাবতে ভয় করে। কামনা করি, তারা নিরাপদে আসুক। আমরা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুটের উপরে উঠেছি কাগজপত্রের হিসাবে। পর্বতমালার তৃতীয় স্তরে আমরা এসেছি। চতুর্থ স্তর হোলো 'গ্লেসিয়ার'-অর্থাৎ বরফ-জমা নদী নীচে উপরে এবং চারিধারে। সেই নদীরা ঝুলে থাকবে আমাদের চোখের সামনে। আশেপাশে দেখি, কারো চোখ থেকে বেরিয়ে এসেছে আনন্দের কান্না, কেউ ধুঁকছে, কেউ বা বাক্‌রুদ্ধ। অনেকেই বিশ্বাস করেনি নিরাপদে উঠবে। শোনা গেল, জন আষ্টেক বাঙালী পুরুষ এবং চার-পাঁচজন মাদ্রাজী মেয়ে-পুরুষ ভয় পেয়ে ফিরে গেছে। 'কুন্ডু স্পেশালের' পরিচালক শ্রীমান শঙ্কর কুন্ডু এই নিয়ে পরে আমার কাছে বড় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাঙালীর উৎসাহ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি তারা পিছিয়ে যায়। কিন্তু জাতি-চরিত্র বিচারের সময় তখন নয়। কণ্ঠ, তালু, টাগরা সব শুষ্ক-আগে একটু চা খেয়ে বাঁচি। ছোট্ট একটি চা-কচুরীর দোকান আমাদের আগে-ভাগে এসে গেছে। এই উপত্যকাটির নাম হোলো যশপাল। কেউ বলে, যোজপাল। হিমাংশুবাবুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটেছে। ঘোড়া থেকে নামলেন কয়েকজন বাঙালী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। দুঃসাধ্য তীর্থযাত্রায় এরই মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয় ও বন্ধু হয়ে উঠেছি। আশেপাশে গাছপালা ক'মে এসেছে,-তবু দেবদারু আর রুদ্রাক্ষের কয়েকটি গাছ চোখে পড়ছে। ঘাস-লতা আছে এখানকার উঁচু-নীচু প্রান্তরে। বৃষ্টির কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর কষ্টস্বীকারের বাইরে পার্বত্য প্রকৃতি তার সমস্ত শোভা নিয়ে বিরাজমান। ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটেছে অজস্র। যতদূর দৃষ্টি চলে, ফুলের বিছানা পাতা। একই বৃন্তে পাঁচ-সাত রংয়ের ছোট

ছোট আশ্চর্য ফুল। প্রত্যেক পাপড়ির রং পৃথক, একটি বোঁটার সঙ্গে অন্য বোঁটার বর্ণের মিল নেই। কোনো ফুলের নাম জানিনে, কোনো ফুল চিনিনে,— তাই এত আনন্দ হচ্ছে। আগে বলেছি, সমগ্র কাশ্মীর হোলো মৃন্ময়। তার পাহাড়, তার প্রান্তর, তার অরণ্যলোক, তার নদীপথ, তার উপত্যকা-অধিত্যকা,-সমস্ত মৃত্তিকাময়। এই মাটির ক্ষয় হয়ে চলেছে যুগে যুগে। আশেপাশে পর্বতমালায় অসংখ্য অগণ্য ক্লীফ্-কলমের ডগার মতো একটার পাশে আরেকটা দাঁড়িয়ে। সেই চূড়াগুলি মৃন্ময়--তা'তে ক্ষয় ধরেছে বহুকাল থেকে। কেউ যদি বলে, হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যে কাশ্মীরের পর্বতমালার এ উচ্চতা থাকবে না-আমি অসঙ্কোচে বিশ্বাস করবো। কাশ্মীরের এত ফলন কেবল তার মৃন্ময়তার জন্য। যশপাল থেকে বেরিয়ে যত দূরে যাচ্ছি, এই ক্ষয়িষ্ণু পর্বতের একই চেহারা। অন্য কোন পার্বত্য দেশে-বিশেষ ক'রে এই উচ্চতায় এ প্রকার ফলন হয়না। সমগ্র গাড়োয়ালে নেই, কুমায়ুনে নেই, হিমাচল প্রদেশে নেই, নেপালে কিংবা সীমান্তে নেই। সেখানে সর্বত্র গ্র্যানাইট্ পাথরের ভিড়,—দশ হাজার ফুট পর্যন্ত সেখানে ফলন। সেসব অঞ্চলে গেলে কাশ্মীরের চেহারাকে বিশ্বাস করা যায় না। কাশ্মীরকে লোকে ভূস্বর্গ ব'লে এসেছে বহুকাল থেকে, কিন্তু কাশ্মীরের মতো ভূস্বর্গ সমগ্র হিমালয়ে শত-সহস্র আছে। আদি-অন্ত হিমালয়ে যেথানে-সেখানে ভূস্বর্গ। ব্রহ্মপুত্রে, সুরমায়, তিস্তায়, বাগমতীতে, কৌশল্যায়, শারদায়, গোমতী ও রাপ্তিতে, ব্রহ্মপুরা ও সমগ্র কুনায়ুনে, বিপাশা আর চন্দ্রভাগায়,—যেখানে অরণ্য-সমাকীর্ণ দুর্গম পর্বতমালার আশেপাশে গিরিনদীরা চলে গেছে, সেখানেই ভূস্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের কথা পৃথক। এখানে সমস্ত প্রকার খাদ্য, ও সব্জি ও ফলপাকড় অজস্র। এখানকার গ্রামে ঢুকলেই মনে হবে বাঙালা দেশ। সেই থোড়, মোচা, কাঁচকলা, সেই শশা, ঢেঁড়শ, ঝিঙে; সেই বেগুন, পটল,আর লাউ। আদা, লঙ্কা, তেঁতুল,সজ্‌নে আর নটে। নদীতে অজস্র মাছ,উঠোনের মাচানে লাউ আর কুমড়োর লতা। সেই অঙ্গন আর মাটির ঘর, সেই ধানঝাড়া আর চালকোটা। সেই মৌরীফুল, আর কাঁচা ডালিমের গন্ধ। সেই দারিদ্র্যের রুগ্নতা আর নগ্নতা, সেই রোগ আর জরা। ওর পাশে তাকাও,—আঙুর আর আপেলের বন, বাগুগোসা, খোবানি, বাদাম,-আরো কত রকমের ফল,কত মেওয়া। অজস্র খাঁটি ঘি, অজস্র সুন্দর সুগন্ধি চাউল। মাছ, মাংস, মাখন, ডিম, — চারিদিকে প্রাচুর্য। কিন্তু সমগ্র দেশে নেই পয়সা, রোগে ভুগে আর দারিদ্র্যে মরে

কাশ্মীর। আর যারা বাইরের থেকে মোটা টাকা নিয়ে বেড়াতে যায়, তারা ফিরে এসে বলে— ভূস্বর্গ!

আরো চার মাইল এগিয়ে যাচ্ছি। আকাশে একটু-আধটু কালো মেঘের ইশারা দেখছি। ডানদিকে বিরাট পর্বতের সারি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। চেহারা প্রায় ওই একই, ক্ষয়িষ্ণু মৃন্ময়। মাঝখানে আবার গেছে কিছুক্ষণ প্রাণান্তকর চড়াই- প্রায় সাত আটশো ফুট। আমাদের আগে এগিয়ে গেছে বহু লোক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া,- দক্ষিণে অনেক নীচে দিয়ে গেছে সেই নীলগঙ্গা। সেটি মিলেছে শেষনাগ নদীতে, যার নাম দুধগঙ্গা। চড়াই আর উৎরাই চলেছে— তবে চড়াই বেশী বরাবর। এদিকের পথ কিছু ভালো, কিছু সহ্য করা যায়, কিছু বা চওড়া। কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে ভয় করে। মাঝে এক-আধবার যাযাবর গুজরদের এক-আধটি বস্তি চোখে পড়েছিল। তারপরে আর কিছু নেই। যতদূর দেখছি, মহাশূন্য। পাখি, জন্তু, মানুষ, গাছপালা—কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না। আকশে এক-আধ টুকরো মেঘের চলাফেরা দেখে সকলেই উদ্বেগ বোধ করছে। আমাদের ক্যারাভান চলেছে সঙ্কটসঙ্কুল পর্বতমালার সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধ'রে বিরাট সরীসৃপের মতো।

শেষনাগ এলো। হঠাৎ যেন খুলে গেল দিগন্তের পূর্বদ্বার। পশুরাজ সিংহ যেন ব'সে রয়েছে উত্তর-পূর্বদিগন্ত জুড়ে। সমগ্র দেহে ধবল তুষারশোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিস্তৃত এবং এত ব্যাপক তার পটভূমি যে, সেই হ্রদের আয়তন সহসা ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল। একটি তুষার নদী এসে নেমেছে হ্রদে এবং একটি নদী বেরিয়ে গেছে সেই হ্রদ থেকে। যেমন কৈলাসের চূড়ার অদূরে মানস সরোবর এবং রাবণ হ্রদ। শেষনাগ হ্রদের ওপারে সোজা উঠেছে কোহিনূর পর্বতমালা ও হিমবাহ, এপারে কিন্তু বালুবেলা। বহু যাত্রী পাহাড়ের তলায় নেমে গেল স্নান করতে প্রায় এক মাইল উৎরাই পথে। আমাদের পথের থেকে আন্দাজ পাঁচশো ফুট নীচে সেই হ্রদ। সুতরাং সেই জল স্পর্শ ক'রে আসা কঠিন নয়। অনেক পাঞ্জাবী মেয়ে নেমে গেল, অনেক উৎসাহী যুবকও। আশ্চর্য শোভা ব'লেই তার দুর্বার আকর্ষণ। ওপারের নানা পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে তুষার নদী। এই হ্রদের জলে আছে নাকি নানা ধাতব পদার্থ মিশ্রিত,— যারা স্নান করে, তাদের আর এ জীবনে নাকি চর্মরোগ হয় না। তুষারগলা জল, ডুব

দিলে অসাড় হয়ে আসে সর্বশরীর। কিন্তু অনেককে বলতে শুনেছি, স্নানের পরে সকলে আশ্চর্যরকম সুস্থ বোধ করে। তারা আর ঠান্ডায় কাতর হয় না। যদি কল্পনা করি, জ্যোৎস্না রাত্রে এই স্বচ্ছ নীল জলে অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আসে কিন্নরী আর অপ্সরীর দল,— তাহলে সেটা সত্য মনে হবে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কোন নির্দিষ্ট নিরীখ সত্য সত্যই এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন একটা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, যেখানে আমরা ভিন্ন আর কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই। হয়ত যারা এখানে আছে, তারা অশরীরী, আমাদের চর্মচক্ষু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। আমরা তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই,-- কিন্তু ধারণে পাইনে। হয়ত আমাদের দেখছে তারা সকৌতুকে। কিন্তু আমরা যাদের দেখতে পাচ্ছিনে, তারা যে নেই,--- একথা কে বললে? থার্ড ডাইমেন্‌শ্যনে কেমন করে দেখতে পাচ্ছি? কেমন করে দেখছি টেলিভিশ্যনে? হয়ত একদিন আমরা নতুন ধরনের লেন্স আবিষ্কার করবো, — তার সাহায্যে দেখতে পাবো, যা দেখবার জন্যে মানুষের এত আকুলি-বিকুলি, দার্শনিক দের এত খোঁজাখুঁজি। তপস্বীরা অনেকদিন ধ'রে চোখ বুজে রইলো, অনেক সাধু ঘর ছেড়ে যোগের আসনে ব'সে জীবনপাত করলো, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সবাইকে লুকিয়ে অনেকেই গা-ঢাকা দিয়ে রইলো,--- যদি ঈশ্বরকে দেখা যায়। চোখে দেখতে না পেয়ে বললে, বেশ ত' মন দিয়েই দেখবো! খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ— ঐ একই চেষ্টা সকলের। তবে কি বিজ্ঞান দেখিয়ে দেবে ঈশ্বরকে। এমন লেন্স আবিষ্কার করবে একদিন-যা চোখে দেবামাত্রই দেখতে পাবো-যা এতদিন চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাইনি। যন্ত্রের সাহায্যে যদি আসল মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধ'রে রাখা যায়,—যেটা অশরীরী, তবে অশরীরীকে যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাবে না কেন?

উপর থেকে ক্রমশ দেখা যাচ্ছে বায়ুযানের শূন্য হিমকান্ত প্রান্তর। মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে, কিন্তু শীত ধরেছে খুব। তুহিন বাতাস উঠেছে। হাত অবশ হয়েছে ঠান্ডায়। আমরা বায়ুযানে এসে পৌঁছলুম।

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

শৈলতীর্থ মণিমহেশ

মণিমহেশ হিমালয়ের অন্যতম কঠিন তীর্থ— প্রকৃতির অকারুণ্যে ততটা নয় যতটা মানুষের অবিবেচনায়। হিমাচল প্রদেশে চম্বা জেলায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০০ মি (১৩০০০ ফুটেরও বেশী) উঁচুতে মণিমহেশ হ্রদ; তার উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৫৫৮০ মিটার (১৯০০০ ফুট) উঁচু কৈলাস পাহাড়। বরফাবৃত শ্বেতশুভ্র কৈলাসশিখরকে কল্পনা করা হয় দেবাদিদে ব মহাদেব রূপে। প্রাচীনকাল থেকে তিব্বতে অবস্থিত মানস সরোবর ওকৈলাসকে ভারতবাসী শিব-পার্বতীর বিহারভূমি বলে পূজা করে আসছেন। মণিমহেশ - কৈলাসও তেমনি বেশ কিছু ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে আসছে ; এখানেও হরগৌরীর পূজা প্রতি বছর কয়েক হাজার ভারত বাসীকে হিমাচল- হিমালয়ে টেনে আনে। হয়ত হিমাচলের এই তীর্থ মানস - সরোবর কৈলাসের মত এত বেশী লোকপ্রিয়তা লাভ করেনি বলেই ২৭২৭ মিঃ থেকে ৪০০০ মিঃ পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিঃ মিঃ ব্যাপী চড়াই অতিক্রমের কষ্ট লাঘব করার জন্যে কি রাজ্য সরকার, কি কেন্দ্র সরকার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করেন না, ফলে এই দুর্গম পাহাড়ী পথে যাত্রীগণ কুলি, ঘোড়া কিংবা বাসস্থানের কোন নিশ্চয়তা পান না।

প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর দিন এবং পক্ষকাল পরবর্ত্তী রাধাষ্টমী দিন কয়েক হাজার নরনারী মণিমহেশ তীর্থে শিবের পূজা দিতে যান। ওখানে কোন মন্দির নেই; কৈলাস পর্বতের নীচে মণিমহেশ হ্রদের পুবপাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় পূজারী একটি চতুর্মুখ শিবের ছোট মর্মর মূর্তি (নেপাল কাঠমাণ্ডুতে পশুপতিনাথের মত) নিয়ে বসে ভক্তের পূজা উপাসনার ব্যবস্থা করেন। গত ১৯৮৬ সালে জন্মাষ্টমী পড়েছিল বুধবার ২৭ আগষ্টে এবং রাধাষ্টমী পড়েছিল বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বরে। হিমাচল রাজ্য সরকারের প্রচার পুস্তিকায় (১৯৮৩ সালের পর ছাপা হয়নি) যদিও লেখা আছে এই পক্ষকাল ধরেই যাত্রীদের সুবিধার জন্য কুলি, ঘোড়া, তাঁবু, ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার করে থাকেন, জন্মাষ্টমীর চারদিন পর এবং রাধাষ্টমীর দশ দিন আগে ১ সেপ্টেম্বর তীর্থ দর্শন করতে আমি সরকারী, বেসরকারী কোন

ব্যবস্থাই দেখতে পাইনি, শুধু মণিমহেশ ও সাত কিঃ মিঃ নীচে ধানছোতে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাঁবু ছাড়া।

আমার এই প্রায় সত্তর বছর বয়সে হাডসার (২৭২৭ মিঃ) থেকে হাঁটা শুরু করে ৬ কিঃ মিঃ দূরে ধানছো (৩৩৩৩ মিঃ) এবং সেখান থেকে মণিমহেশ (৪০০০ মিঃ) পর্যন্ত সাত কিঃ মিঃ পাথর ছড়ানো এবড়ো- খেবড়ো চড়াই পথ অতিক্রম করা কী কষ্টকর হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভাগ্যবলে একটি কুলি যোগাড় যদিও হয়েছিল তবু উঠতে দুদিন এবং নামতে একদিন— এই তিনদিনের রাস্তায় একটিও জনপ্রাণী সঙ্গী না থাকায় (কয়েকটি বুলবুল পাখী ছাড়া) আমার দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা বর্ণনা করার ভাষা নেই। কুলি যোগাড় হলে দৈনিক ৩৫ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়।

হাডসার - ধানছো ছয় কিঃ মিঃ পথ যেতে লেগেছে পাঁচ ঘন্টা এবং ধানছো- মণিমহেশ সাত কিঃ মিঃ পথ অধিকতর দুর্গম বলে লেগেছে ছয় ঘন্টা। হাডসার থেকে এক কিঃ মিঃ রাস্তা প্রায় সমতল, আবার ধানছোর কিছু আগেও চড়াই সহনীয়; কিন্তু ধানছো থেকে উঠে মণিমহেশের পথে ছয় কিঃ মিঃ দূরবর্তী গৌরীকুন্ড পর্যন্ত রাস্তাটি যেমনই সঙ্কীর্ণ ও এবড়ো - খেবড়ো পাথর বিছানো তেমনই দুঃসহ সেই চড়াই।

৩১আগস্ট ধানছোতে পি ডব্লিউ ডি-র তাঁবুতে এস ডি ও শ্রী সুরেশ কুমারের আনুকূল্যে রাত কাটিয়ে ১ সেপ্টেম্বর সকাল সাতটায় মণিমহেশের পথে বেরিয়ে সাড়ে তিন ঘন্টায় চার কিঃমিঃ পথ পেরুতে প্রাণ যেন বেরিয়ে গেল। কুলি কালুরাম কুড়ি বছরের জোয়ান ছোকরা হাডসার গ্রামের অধিবাসী; সে তো আমার কিলো আষ্টেক মালশুদ্ধু ব্যাগটি নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পাথরে পাথরে পা ফেলে অনেক দূরে চলে গেছে। সেই চার কিঃমিঃ পর একটি চা-রুটি-ভাতের ত্রিপল ঢাকা ঝুপড়িতে যখন তার দেখা পেলাম তখন আমার যেন আর এক পা-ও চলার ক্ষমতা নেই। ওইটুকু পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝেই ওপরে পাহাড়ের চূড়ার দিকে এঁকে বেঁকে চলা রাস্তার পানে চেয়ে কান্না এসে যেতো; মানব শিশুর দুঃখে-বিপদে চিরন্তন কাতরধ্বনি "মা" "মা" ডেকে আকুতি জানাতাম অদৃশ্য পরম দয়াময় ভগবানের কাছে তাঁর করুণার জন্য। হাডসারের পরই পাইন দেওদারেরা সব বিদায় নিল;রাস্তার দুপাশে পাহাড়ের গায়ে ফার্ণ জাতীয় ঝোপ। ধানছো ছাড়িয়ে কিছু দূর পরই দেখলাম

পথের ওপরে নীচে পাহাড়ের গা ভর্তি গাঢ় নীল অপরাজিতার মত ফুল,কোথাও বা হলুদ রংয়ের লিলি কিংবা ছোট ছোট চন্দ্রমল্লিকা। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তখন সংগ্রাম করেছি এবং চার কি পাঁচ পা চলার পরই লাঠিতে ভর দিয়ে কিংবা বড় কোন পাথরে গা এলিয়ে দিয়ে ২/৩ মিনিট জোরে জোরে শ্বাস ফেলে বিশ্রাম করে আবার চলেছি। ঝুঁকে কোন ফুলে হাত দেব সেটুকু শক্তিও পাইনি।

কালুরামকে পেয়ে আর তাকে কাছছাড়া করিনি গৌরীকুণ্ডে পৌঁছাবার আগে। মাঝে মাঝেই তার হাত ধরেছি। এক হাতে লাঠি আর এক হাত ধরে আছে কালুরাম। এই ভাবে আমার পুরুষকারের উপর একান্ত নির্ভরতার দম্ভ চূর্ণ করে পরম করুণাময় ভগবান আমাকে কালুরামের মাধ্যমে হাত ধরে এই কঠিন পথ অতিক্রম করিয়েছেন। মাঝে একটি ২০ মিটারের মত স্থির হিমবাহ (গ্ল্যাসিয়ার) পেরুতে হয়েছে; এবং সেখানে কালুরাম পুত্রপ্রতিম স্নেহে সাবধানতার সঙ্গে আমাকে ওই পিচ্ছিল পথ পার করে দিয়েছে। ওই সময় আবার আমার ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল কারণ ভুল করে সঙ্গে পানীয় জল নিয়ে যাইনি। কালুরাম আমার লাঠিটি দিয়ে হিমবাহ খুঁড়ে ওপরের ধূলো পড়া বরফ সরিয়ে নীচ থেকে পরিষ্কার বরফ নিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করল,"বেশী খাবেন না"। এক মুঠো ঝুরো বরফ চুষে চুষে খেয়ে পিপাসা দূর হল, যেন নতুন জীবন পেলাম। চার কিঃ মিঃ দূরে গৌরীকুণ্ডে পরিষ্কার জল পেয়ে আবার জল খেলাম। গৌরীকুণ্ডের কাছে একটি ঝুপড়িতে চা পান ও বিশ্রাম করে বেলা একটার কিছু পর পৌঁছে গেলাম মণিমহেশ। চার বছর ধরে লালিত জীবনের একটি ব্যাকুল প্রার্থনা, আকুল কামনা পূরণ হল। একমাত্র পরম দয়াময় ভগবানের অসীম করুণায়, গুরুজনের আশীর্বাদে, আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের শুভেচ্ছা-ই আমার ঊনসত্তর বছর বয়সে অপটু শরীর নিয়েও হিমাচল হিমালয়ের এই কঠিন তীর্থ দর্শন করা সম্ভব হল।

মণিমহেশ তথা কৈলাস দর্শন, পূজা ও উপাসনা করে করে কী তৃপ্ত হয়েছি? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, অন্তত আমার পক্ষে নয়। অপার্থিব, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের জবাব "হ্যাঁ", পার্থিব দৃষ্টিতে "না"। সমগ্র হিমাচল প্রদেশটিই শিবভূমি বলে পরিগণিত সরকারী তথ্যে ও তত্ত্বে যেমন, সরকারী পথনির্দেশক শিলালিপিতেও তেমনি। হাঁটাপথ শুরু হবার পরপরই লেখা রয়েছে "চলো বুলানে ওয়ালা আয়ে হ্যাঁয়। ভোলে শঙ্কর নে বুলায়া হ্যাঁয়"(চলো ডাক

দেবার লোক এসে গেছেন/ভোলা শঙ্কর ডাক দিয়েছেন)। মাঝে মাঝেই লেখা আছে "ভক্তিই শক্তি" এবং অনুরূপ উৎসাহের বাণী। সুতরাং দুরারোহ পার্বত্য পথে আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গে যাত্রী যখন নিজের সমস্ত শক্তি, সকল প্রয়াস প্রয়োগ করে কৈলাশের সানুদেশে মণিমহেশ তীর্থে উপনীত হন, তাঁর মনে সাফল্যের পরিতৃপ্তি, সার্থকতার আনন্দ তখন উপলব্ধ হবে-এ আর আশ্চর্য কি? তাই আমার মত অনেক যাত্রীই হয়ত অনুচ্চস্বরে বলে ওঠেন "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম"। আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির মাঝে সেখানে কোন ফাঁক নেই, নেই কোন প্রশ্ন, কোন সংশয়!

মণিমহেশ হ্রদের চারদিকে পরিক্রমার পথে পা দিয়ে মনে যে অপূর্ব অনুভূতি, বেদনা-বিস্ময়-আনন্দের মূচ্ছর্না অনুরণিত হল তার তুলনা পরে পেলাম এক বন্ধুর চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, "চোখ না বুজেও দেখতে পাই সবুজে, সাদায় মোড়া পার্বত্য পথ দিয়ে আপনি চলেছেন, হিমালয়ের প্রসন্ন দৃষ্টির সস্নেহ আশ্রয়ে। কে বলে একা, একা হাঁটছেন? সাথে সাথে হিমালয়ও চলেছে। হিমেল বাতাসে, পুরনো দিন, বর্তমান আগামী দিন সব একাকার হয়ে বলছে, "অন্তায়, অন্তায়বন্দ্‌বাদীনম্/অনন্তায় মূকম" "for the finite is the eloquent man / for the infinite is the mute." (সীমার সাথেই প্রগলভতা/অসীমের সামনে মৌন)।" পরিক্রমা শেষে চতুর্মুখ মর্মর মূর্তির সামনে যখন পূজারীর হাতে কাজু-কিসমিস তুলে দিলাম নৈবেদ্য হিসেবে এবং পূজারী আমার হাতে হ্রদের জলভর্তি পাত্র দিয়ে মূর্তির মাথায় জল ঢালতে বললেন এবং উচ্চারণ করতে লাগলেন "নমঃ শিবায় নমঃ", পথশ্রমের ক্লান্তিতে আর প্রাপ্তির উপলব্ধিতে যেন আচ্ছন্নের মত তনু মন অবসন্ন হয়ে গেল! কালুরামের ডাকে ঘোর ভাঙলো।

উঠে জুতো-মোজা-দস্তানা পরে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গেই মর্তের মানব,তার পাপপুণ্য, সংশয়, বিস্ময় ব্যাকুলতায় আলোড়িত দেহমন নিয়ে চতুষ্পার্শকে যেন নতুন করে দেখল। তখন পার্থিব দৃষ্টিতে দেখলাম; মণিমহেশ হ্রদের ওপর তো পাতলা বরফের শুভ্র বরফাবৃত কৈলাশ শিখরও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না-চারিদিকের পাহাড় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য। পূর্বসূরীগণ লিখে গেছেন কৈলাশ পাহাড়ের নীচের দিকে কয়েকটি ছোট পর্বত সূচিত করে শাপগ্রস্ত গাদ্দী মেষপালক ও তার মেষযূথ; তাছাড়া কৈলাশ শিখরের কাছে নাকি শেষনাগের জীবাশ্মও দেখতে

পাওয়া যায়। আমারও হয়ত কোন শাপ লেগেছিল; নইলে সবই মেঘের আড়ালে চলে গেল কেন? মণিমহেশ হ্রদটি যেন একটি বড় দিঘি-৭০ মিটার লম্বা, ৩০ মিটার চওড়া। মনে প্রশ্ন উঠল-এই অবশিষ্ট, সাধারণ দৃশ্যটুকু দেখবার জন্যই কি এত কষ্ট, এত চেষ্টা, এত দিনের এত উদ্যম? স্বীকার করতে দ্বিধা হলেও যেন এ প্রত্যয় এড়ানো গেল না-আমি তৃপ্ত নই।

দিল্লীতে ফিরে হিমাচল সরকারের ডেপুটি পাবলিসিটি অফিসার শ্রী ডি পি যোশীর কাছে হিমাচল ভবনে আমার এই ব্যর্থতার ব্যাখ্যা শুনলাম; ভারমৌরে "চুরাশীর" প্রাঙ্গণে প্রধান গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে না গেলে মণিমহেশ তীর্থযাত্রা ব্যর্থ হয়, নয়ত কোনো দুর্ঘটনা হয়। এখন মনে পড়ছে, আমারও দুর্ঘটনা হয়েছিল; ফেরার পথে ভুল রাস্তা ধরার দরুন পাথরে পা হড়কে পড়ে গিয়ে আহত হই। যোশী আরও বললেন তাঁর স্ত্রীও আমারই মত অজ্ঞাতসারে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে যাননি বলে যাত্রাশেষে এত আহত হয়েছিলেন যে ২০ দিনের চিকিৎসার পর সেরে ওঠেন। একজন ড্রাইভার, যোশী জানালেন, গুরুর আদেশ অমান্য করেছিলেন বলে তীব্র ঠান্ডায় পঙ্গু হয়ে গেছেন, তাঁর মেরুদন্ড বেঁকে গেছে। আগে জানলে আশীর্বাদ আমিও নিতাম।

স্বীকার করি, তৃপ্তি-অতৃপ্তির এই তর্কের কোন সর্বজনীন সমাধান নেই, এটি নেহাতই ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার। এটিকে মুলতুবি রেখে মণিমহেশ তীর্থযাত্রার বিবরণে এগুনো (নাকি পিছানো) যাক। দিল্লী থেকে রাত্রের ট্রেনে করে ২৮ শে আগস্ট সকালে পাঠানকোট পৌঁছে ফার্লংটাক দূরে বাস আড্ডায় গিয়ে চম্বার বাসে চড়ে ১২২ কিঃ মিঃ দূরবর্তী চম্বায় পৌছালাম পাঁচ ঘন্টা পর, বিকাল তিনটা নাগাদ। বাস-সীমান্তের কাছে হিমাচল পর্যটন বিভাগের দুটি হোটেল-উচ্চবিত্তের জন্য ইরাবতী, অল্পবিত্তের জন্য চম্পক; ওখানে কোন ট্যুরিস্ট লজ নেই। চম্বা স্বাধীনতার আগে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল; এখন হিমাচল রাজ্যের অন্যতম জেলা। রাজধানী চম্বা সুন্দর শহর ১০০০ মিটার উঁচু। শহরের মধ্যমণি চৌগান নামে বিশাল ময়দান, যার এক পাশে ইরাবতী নদী (স্থানীয় ভাষায় রাভি) প্রবাহিত, অন্যদিকে শহরের প্রধান প্রধান সরকারী কার্যালয় তথা রাজবাড়ী। চৌগানে এক পাশে গোটা ছয়েক প্রাচীন মন্দির রয়েছে যাদের কারুকার্যময় স্থাপত্য পথিকের বিস্ময় জাগায়। তিনটি মন্দির মহাদেবের নামে সমর্পিত, বাকি তিনটি বিষ্ণুর নামে। মণিমহেশ-

কৈলাশের যাত্রীগণ অনেকেই এই সময় চৌগানে অস্থায়ী আস্তানা তৈরী করে নেন। এই সময় শীতের আগমনের প্রাক্কালে পাহাড়ী যাযাবর জাতি গদ্দী নারী পুরুষ তাদের ভেড়া ছাগলের পাল নিয়েও চৌগানে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। চম্বা শহরের মাইল দেড়েক দূর ভুরি সিং মিউজিয়মে রক্ষিত আছে চম্বার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহ এবং কাংড়া ও বাশোলী চিত্রের অপূর্ব সম্ভার।

পরদিন ২৯ আগস্ট বাসে করে ৫০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী খাড়ামুখ পৌঁছুলাম তিন ঘন্টা পর বেলা একটায়। যে রাস্তাটুকু দুঘন্টায় যাওয়া যেত কেন এত সময় লেগেছে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্গী এক ভদ্রলোক জানালেন এখানকার লোকের তো বেশীর ভাগেরই কাজকর্ম নেই তাই এঁদের কাছে সময়ের মূল্য নেই। খাড়ামুখের পথে বাস ২/৩ জায়গায় ৫/৬ মিনিট করে থামলো ভেড়া-ছাগলের পালকে রাস্তা দেবার জন্য। খাড়ামুখে ঝুলন্ত পুলের ওপর দিয়ে রাভি নদী পার হয়ে ছোট রাস্তার উপযোগী মিনিবাসে চড়লাম। মিনিবাসটি খাড়ামুখে একটি পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় ১৫১৫ মিটার উঁচু পাহাড়ের ওই স্থানটিতে সব সময়ই ঝোড়ো হাওয়া বইছে; নীচের দিকে দেখা যাবে ৩০০ মিটার গভীর খাদ দিয়ে গর্জন করে চলেছে মণিমহেশের পূত বারি নিয়ে বুডঢাল নদী অদূরে ইরাবতীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। প্রায় এক ঘন্টা পর পৌঁছালাম ১৩ কিঃ মিঃ দূরবর্তী মহকুমা শহর ভারমৌর। ভারমৌর চম্বা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। জনশ্রুতি, মহারাজ সলিল বর্মার আমলে চুরাশীজন যোগী ভারমৌর এসেছিলেন এবং রাজার ভক্তি ও আতিথ্যে পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে দশটি পুত্র ও একটি কন্যালাভের আশীর্বাদ করে গেছিলেন। এই কন্যাটির নাম ছিল চম্পা বা চম্বা। এই অনুষঙ্গ বিধৃত রয়েছে পর্যটন বিভাগের "চম্পক" হোটেলের নামের মধ্যে; যেমন অন্য হোটেলটির নাম রাখা হয়েছে রাভির প্রাচীন নামে "ইরাবতী"। ভারমৌরে সেই চুরাশীজন যোগীর স্মৃতি রক্ষার জন্য চুরাশীটি মন্দির তৈরী হয়েছিল, যার কিছু কিছু এখনও বজায় রয়েছে কালের তথা প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ সয়েও।

শহরের মধ্যস্থলে চুরাশী নামে এক ময়দানে প্রধান প্রধান কটি মণিমহেশ-হরিহর-শিবজী, নরসিংহদেব, লখনা-ব্রাহ্মণী-মহিষাসুরমর্দিনী ও গজপতি দেবের নামে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীতে তৈরী— এ বিবরণ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কিছু ছোট ছোট কাঠের মন্দির

াকলেও প্রধান মন্দির কটি পাথরের এবং মণিমহেশ ও ধর্মরাজ শিবলিঙ্গ ছাড়া মন্যান্য প্রধান মূর্তি অষ্টধাতুর তৈরী। ধর্মরাজের কাঠের মন্দিরে বাস করেন কাশী নুমান ঘাটের নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রেম নারায়ণ গিরি। সত্তর বৎসর বয়স্ক প্রেম নারায়ণ জানালেন তাঁর গুরু জয়কৃষ্ণ গিরি ভারমৌরে যেসব মন্দির এখন দেখতে পাওয়া যায় তার সব কটি উদ্ধার করেছিলেন স্থানীয় জনগণের সাহায্যে প্রায় ৪৫ বছর আগে। শুধু মন্দির সংস্কারই নয় স্থানীয় লোকের আপদ-বিপদেও জয়কৃষ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়তেন; তাই তাঁকে নাগাবাবা বলে স্থানীয় নরনারী পূজা করতেন, ভালবাসতেন। প্রায় ১১৫ বছর বয়সে তিনি ১৯৬৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দেহরক্ষা করেন। চুরাশী প্রাঙ্গণে তাঁর মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

প্রেম নারায়ণ ২১২৩ মিঃ উঁচু ভারমৌরে সারাবছরই থাকেন যদিও দেওয়ালী থেকে শুরু করে মকরসংক্রান্তি (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) পর্যন্ত দুমাস ওখানে বরফ পড়ে। তিনি নাকি দেড়মিটার পর্যন্ত বরফ জমতে দেখেছেন। পি ডব্লিউ ডির এস.ডি.ও সুরেশ কুমারও তুষারপাতের কথা বললেন; কিন্তু তাঁর মতে ওখানে এক মিটারও বরফ জমা হয় না। চুরাশীর চত্বরে ওই সময় মণিমহেশ তীর্থের জন্য মেলা বসেছিল এবং প্রায় ৫০ টি অস্থায়ী দোকান তাদের মনোহারী শহুরে পসরা (জামা-কাপড় জুতা-খেলনা- চুড়ি-স্নো-পাউডার-আলতা) এবং বাহারী মিষ্টির দোকান নিয়ে পাহাড়ী ক্রেতাদের রঙিন সাজে ঝলমল করছিল। রাত্রে মাঝেমাঝেই নাচ-গানও হচ্ছিল। হয়ত আশ্চর্যের নয় তবু উল্লেখ্য, অন্তত একটি ভিডিও পার্লার ওই প্রত্যন্ত পাহাড়ী জায়গায়ও দেখতে পেলাম। হিমাচলে বিশেষত পাহাড়ী এলাকায়, দেশী ও বিদেশী মদের বহুল প্রচার। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চুরাশী প্রাঙ্গণে মদ্যপান প্রচলিত দেখলাম। এই ভারমৌরেই ২৯ তারিখে শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল নিঃশ্বাসের কষ্টে। ২১২৩ মিটারেরও বেশী উঁচু ভারমৌর; রাত্রে ঠাণ্ডার প্রকোপ খুব বেশী না হলেও ১২ বছর ধরে কিঞ্চিত অসুস্থ হার্টের পক্ষে ওই উচ্চতায় শ্বাসগ্রহণ করতে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক মনে করে সঙ্গে ব্র্যান্ডি নিয়ে গিয়েছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু খাদ্যের সঙ্গে দুধের ভিতর ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। পরেও প্রতি রাত্রে শোবার সময় দুধ ও ব্র্যান্ডি খেয়েছি মণিমহেশ থেকে ফিরে ২ সেপ্টেম্বর ভারমৌর না আসা পর্যন্ত। তাই আর শ্বাসকষ্টে রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে বসে থাকতে হয়নি। ভারমৌরে পি ডব্লিউ ডি-র রেস্ট হাউসে যে কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলের

মত আরামদায়ক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আগে থেকে রিজার্ভ করিনি বলে পি ডব্লিউ ডি-র স্থানীয় কর্তা সুরেশ কুমারও আমাকে কোন ঘর ওখানে দিতে পারেননি। আমাকে থাকতে হয়েছিল চুরাশীর প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েতের অতিথিশালার নোংরা পরিবেশে। তবে যাওয়া আসার পথে দু'রাতের আশ্রয় পেয়েছিলাম-এজন্য আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ।

সুরেশ কুমার ও তাঁর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার কাংড়ার অধিবাসী বিজয় ঠাকুরের চেষ্টা সত্ত্বেও ৩০ আগস্ট ভারমৌর থেকে ১৩ কিঃ মিঃ দূর হাড়সার যাবার জন্য কোন যানবাহন পাইনি। রাজ্য পরিবহনের একটি জিপ চলবার কথা; কিন্তু শুনলাম ২/৩ দিন ধরে ওটি খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুণ ওখানে নেই। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এই সরকারী অবহেলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি। সেদিন বাধ্য হয়ে ভারমৌরে আটকে গেলাম। আমার অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে বিজয় ঠাকুর পি ডব্লিউ ডি রেস্ট হাউসে ওর ঘরে রাতের আশ্রয়ই শুধু নয় নিজের সঙ্গেই সারাদিন আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন ৩১ আগস্ট একটি মালবাহী ভ্যানে চড়ে হাড়সার পৌঁছে গেলাম। ড্রাইভার সরকারী জিপের ভাড়াই নিল; আমি কিন্তু অনেক বেশী দিতে প্রস্তুত ছিলাম। হাড়সার এই পাহাড়ী পথের শেষ গ্রাম; এখানে মণিমহেশের পান্ডা-পুরোহিতেরা বাস করেন। এখন হিমাচল আপেল পাকবার সময়। তাই ভারমৌর ও হাড়সার উভয় স্থানেই লাল টুকটুক ফলে আপেলগাছগুলি ঝুঁকে রয়েছে। হাড়সারে পৌঁছেই পি ডব্লিউ ডি সুপারভাইজার শ্রবণ কুমারের খোঁজ করে তাঁর হাতে সুরেশ কুমারের চিঠিখানা দিলাম। ভারমৌরে সুরেশ কুমার আমাকে এই চিঠি দিয়েছিলেন যাতে পথে আস্তানা যোগাড় করতে না পারলে পি ডব্লিউ ডি-র তাঁবুতে রাতের আশ্রয় পেতে পারি। শ্রবণ কুমার দেবদ্বিজে ভক্তিমান যুবক। তিনি কালুরামকে আমার সঙ্গে দিলেন এবং ব্যবস্থা করলেন যাতে ধানছোতে তো বটেই, প্রয়োজন হলে মণিমহেশে তাঁবু পেয়ে যাই।

সকাল দশটায় হাড়সার পৌঁছে পথে আস্তানা ও কুলির ব্যবস্থা হয়ে যেতেই সাড়ে দশটা নাগাদ ধানছোর পথে পদযাত্রা শুরু করলাম। কালুরাম সঙ্গে চলল আমার ব্যাগটা নিয়ে। কিছুদূর গিয়ে রাস্তা এত সরু ও এলোপাথাড়ি পাথর ছড়ানোর দরুণ এবড়ো খেবড়ো হতে থাকল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলাম। ওই করে প্রায় পাঁচঘন্টা পর বেলা আড়াইটায় ২৭২৭ মিঃ ধানছো পৌঁছালাম। পি

ডব্লিউ ডি-র তাঁবুতে কালুরাম লেপ-তোষক-কম্বল দিয়ে সুখশয্যা তৈরী করে দিতেই কোনমতে জুতো মোজা খুলে শুয়ে পড়লাম। সেদিন একাদশী ছিল বলে ভাত রুটি খাবার বালাই ছিল না; কালুরাম সাবু ভিজিয়ে দিল; সঙ্গে গুড়ো দুধের টিন ছিল তা দিয়ে দুধ বানিয়ে দুবার সেই খাদ্য দিয়ে ক্ষুধা মিটিয়ে নিলাম। তাছাড়া সঙ্গে ছিল কাজু, আখরোট, কিসমিস ও মিছরি-যা পাহাড়ে চড়তে মাঝে মাঝে চিবিয়ে খেলে ঘন ঘন মুখ শুকিয়ে যায় না, শরীরে পুষ্টিও হয়।

রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। গায়ে গরম কাপড়চোপড় এবং বিছানায় লেপ কম্বলের প্রাচুর্য থাকায় ঠান্ডা তেমন লাগেনি; এক ঘুমেই রাত পোহাল। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ১ সেপ্টেম্বর, সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম মণিমহেশের উদ্দেশে। যাঁরা হিমালয়ে তীর্থভ্রমণ করেছেন তাঁরা যদি কেদারনাথের পথে রামওয়ারার বরফঢাকা চড়াই, যমুনোত্রী যেতে বান্দরঘাটি থেকে ১ কিঃ মিঃ পাথর ছড়ানো সরু পথ এবং গোমুখ যাত্রায় হিমবাহের পর হিমবাহ পেরিয়ে বিপদসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ রাস্তার কথা মনে করেন তবে ওই সব দুর্গম ভয়াল পথের সমবায়ে তৈরী অভিজ্ঞতা লাভ করবেন ধানছো থেকে মণিমহেশ পর্যন্ত সাত কিঃ মিঃ রাস্তা চলতে গিয়ে! যা হোক, কোনমতে বেলা একটা নাগাদ মণিমহেশ হ্রদের তীরে উপনীত হলাম এবং হ্রদ প্রদক্ষিণ করে কাজু-কিসমিস দিয়ে মহাদেবের মর্মর মূর্তির কাছে পূজো দিলাম। ঘন্টা খানেক পর গৌরীকুন্ডের কাছে ঝুপড়ি হোটেলে খিচুড়ি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে ধানছো ফিরে এলাম বিকেল চারটে নাগাদ। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকাল ৯ টায় হাড়সার। কালুরাম বিদায় নিল। একটি বেসরকারী জিপ আমাদের নারী-পুরুষে মিলে ১২ জনকে নিয়ে জনপ্রতি দশটাকা ভাড়ার বিনিময়ে ১০ টায় পৌঁছে দিল ভারমৌর। ভারমৌর পঞ্চায়েত ভবনে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, সোমবার শিবের জন্মদিন। ওই শুভদিনে এত কঠিন তীর্থ পর্যটন করে শিবকে পূজা করতে পেরেছি। কী করে এই শরীরে, এই বয়সে এটা সম্ভব হল!

কমলকুমার গুহ

দ্রাস ও কারগিল

দ্রাসে একটি রেস্ট হাউস আছে। এখানে, মাতায়ানে বা বোধ খাবরুতে থাকতে হলে অনুমতি দেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি ডবলু ডি, রোড্‌স এ্যান্ড বিল্ডিংস, কারগিল ১৯৪১০৩। এ ছাড়া দ্রাসে হোটেলও আছে। এটি হোল বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান, যেখানে মানুষ সারা বছরই বাস করে। ১৯৮৬ সালে পারা নেমে গিয়েছিল মাইনাস ৪০° সেলসিয়াসে। এটাই নাকি স্বাভাবিক। তবে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাপমাত্রা নেমেছিল মাইনাস ৫২° সেলসিয়াস, আর রেকর্ড নাকি মাইনাস ৬০° সেলসিয়াস! বিশ্বের শীতলতম গ্রামটির কথা এবারে আপনারা জিজ্ঞাসা করতেই পারেন। সেটি হোল সাইবেরিয়ার ভেরখোয়ান্‌স্ক। তবে দ্বিতীয় স্থানের নতুন দাবীদার হোল সাইবেরিয়ার ইয়াকুল্‌টা। এখানকার রেকর্ডও হোল মাইনাস ৬০° ফ্যা (জানুয়ারী ১৯৮৭)। এমনিতেই দ্বিতীয় স্থানটি এখন আর দ্রাসের পাওয়া উচিত নয়। কারণ মাতায়ান আরও ঠান্ডা এবং সেখানে শীতকালেও কিছু লোক থাকে।

এই প্রচন্ড ঠান্ডার জন্যই বোধ হয় এখানকার ভেড়ার লোমের ঠান্ডা প্রতিবোধ করার ক্ষমতা খুব বেশী। এখানকার পশমিনা তো জগৎ বিখ্যাত। নেপোলিয়ান জোসেফাইনকে একটি পশমিনা শাল উপহার দেবার পর থেকে এটা সারা বিশ্বে আভিজাত্যের প্রতীক। অবশ্য যারা এই পশমিনা ভেড়া চরায়, তারা শক্ত উলের ঢলঢলে ফেরান বা জোব্বা পরেই ঘুরে বেড়ায়।

পশমিনা ছাড়া দ্রাস থেকে খুবানীও প্রচুর পরিমাণে বাইরে যায়। নিজেদের প্রয়োজনীয় শাকসব্জীও এরা উৎপাদন করে।

এরা বেশীর ভাগই শিয়া আর নিজেদের বলেন বাল্‌টি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এরা নিজেদের ভুটিয়া বলতেন। এদের কথ্য ভাষা অনেকটা তিব্বতী ঘেঁষা। আসলে এরা হলেন দর্দ জাতির বংশধর, যারা উত্তর পশ্চিম থেকে এই অঞ্চলে আসেন। পরে ধর্মান্তরিত হবার ফলে তারা নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি অনেকটাই বিস্মৃত হন। এদের মধ্যে যারা এখনো প্রাচীন রীতিনীতি মেনে চলছেন, তাঁরা নিজেদের

ড্রোগপা বলেন। ড্রোগপাদের কোন কোন উৎসবে এখনো বাল্‌টিরা অংশগ্রহণ করেন। তাদের ক্ষেত্রে ধর্ম কোন বাধা হয়ে দেখা দেয়নি।

দ্রাস অঞ্চলের প্রধান ভাষা বালটি বা শিনা হলেও আরো তিনটি ভাষার এখানে চল আছে-দর্দি, কাশ্মীরী ও উর্দু। দ্রাসের দুই কিমি উত্তর-পশ্চিমে গোশন। বেশ বড় গ্রাম, জনসংখ্যা ৬৫০। দ্রাসের লোকজন প্রায় সব শিয়া হলেও, গোশনে কিছু বৌদ্ধ (?) আছেন-এরা হলেন দ্রোগপা। আর আছেন পাঁচ ঘর। যারা মুসলমানও নয়, বৌদ্ধও নয়। নিজেদের ধর্মের নাম এরা জানেন না। অন্যদের তুলনায় এরা ফর্সা আর চেহারায় কোন মঙ্গোলীয় ছাপ নেই-বরং অনেকটা ককেশীয় ছাপ আছে। এরা নিজেদের মধ্যে এমন একটি ভাষায় কথা বলেন, যার সঙ্গে স্থানীয় চারটি ভাষার কোনটিরই মিল নেই।

এদের আচারে বিচারে আশ্চর্যজনকভাবে ইহুদী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সদর দরজায় এরা এক রকমের ধাতুনির্মিত রক্ষাকবচ লাগায়, যার সঙ্গে ইহুদী মেজুজথের (Mezuzoth) মিল আছে। তবে Star of David নেই। অবশ্য মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের শবর জাতির মধ্যেও অনেকটা এই ধরণের রক্ষা কবচের চল আছে। এদের পারলৌকিক ক্রিয়া ইহুদীদের মতো এবং গোর দেবার সময় মৃতের মাথা থা[illegible] পশ্চিমে, জেরুজালেমের দিকে। নবজাত শিশুর খতনা মুসলমানদের হয় দশম দিনে, আর এদের হয় অষ্টম দিনে। এরা কোশর অর্থাৎ ইহুদীদের অনুমোদিত খাবারই খায়। এদের নাম হয় ইসমাইল, আব্রাহাম, ইসাক ইত্যাদি।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার কথা। মুসা তখনো আবির্ভূত হননি। সিরিয় মরু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, একদল পশুপালক চলে আসেন মিশরে। তখন জোসেফ তাদের শস্য শ্যামল গোশন প্রান্তরে বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেন। বহুদিন বাদে তাঁরা আবার দেশান্তরী হলেন, যাকে বলা হয় diaspora বা dispersion। ততদিনে সিল্ক রুট চালু হয়ে গেছে এবং ইহুদীরা পশুপালন ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। তাদেরই কেউ এসেছিলেন এখানে, পত্তন করেছিলেন নব গোশন-এর? এখান দিয়েই গিয়েছিল সিল্ক রুট ; চালু ছিল চীনের তিব্বত দখল, অর্থাৎ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। প্রাকৃতিক রুক্ষতা ও চরম শীতের মধ্যেও তাদের রুজি রোজগারের অভাব ছিল না নিশ্চয়ই।

এখনো পর্যন্ত কোন ভ্রমণ সাহিত্যিক বা তিব্বতী বিশেষজ্ঞের এখানে পায়ের

ধূলা পড়েনি। যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য এক গেলাস চা ও পরের পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ, তাঁরা তাঁদের কাজ করুন। তবে সত্যিকারের গবেষক ও অনুসন্ধিৎসুদের এগিয়ে আসতে হবে। ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে হিমালয়ের অন্দরে অন্দরে। এখনো দেরী করলে হয়তো অনেক দেরী হয়ে যাবে।

ইহুদীরা এর পরেও কাশ্মীরে এসেছেন। শ্রীনগরের ৫০ কিমি উত্তর পশ্চিমে এবং উলার হ্রদের উত্তর পাড়ে বন্দিপুর। সেখানে নেবু পর্বতের শিখরে আছে 'মুসা পয়গম্বরের সমাধি'। স্থানীয় অধিবাসীরা সরকারী ভাবে মুসলমান হলেও নিজেদের মুসার অনুগামী বলে পরিচয় দেন। তাদেরই একজন এই সমাধির দেখাশোনা করেন। ১৯৮২ সালে এই কাজ করতেন ওয়ালী ঋষি। তখনই তাঁর বয়স ছিল আশী, আজও বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। তিনি বলেছিলেন যে ফারাওদের অত্যাচারের ফলে, মুসা নাকি সদলবলে মিশর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন কাশ্মীরে, এবং এটা তাঁরই সমাধি। ওয়ালীরা পুরুষানুক্রমে ন'শ বছর ধরে এই সমাধির দেখাশোনা করছেন।

শ্রীনগরের ৩০ কিমি উত্তরে গুটলিপোরা গ্রাম। স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের বলেন বেনী ইসরাইল অর্থাৎ ইসরাইলের সন্তান। মুসার সমাধিকে পুজো দেবার জন্যে এরা নিয়মিত ভাবে বন্দিপুরে যান। ওদের নেতা ছিলেন মীর আল নক্সবন্দী। তখন তাঁর বয়স নাকি ছিল ১২০ বছর! তিনি বলেছিলেন, তারা হলেন জেকবের বংশধর। পরে তাঁরা বৌদ্ধ হন এবং বর্তমানে মুসলমান।

উচ্চতাই লাদাকের একমাত্র সমস্যা নয়, এখানে বৃষ্টিপাতও অত্যন্ত কম, বছরে মাত্র ১৪০ মিলিমিটার। অর্থাৎ থর মরুভূমির অনেক অঞ্চলের থেকেও কম। ইদানিং অবশ্য বৃক্ষরোপণের ফলে লে অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে (৯৭০ মিলিমিটার) এবং অনেক মাটির বাড়ি ধ্বসে যাচ্ছে।

চাষবাস এমনকি পশুপালনের জন্যে এখানে সময় পাওয়া যায় খুবই কম— মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দিনের তাপমাত্রার হেরফেরও প্রচন্ড। এটা আবার চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। এ সব কারণেই লাদাককে ভৌগোলিকরা বলেন 'কোল্ড ডেজার্ট'।

তবে লাদাক উঠে এসেছে টেথিস সাগর থেকে, তাই মাটি বেশ উর্বর। সেচের বন্দোবস্ত করতে পারলে এই মাটিতে সোনা ফলানো যায়। এখানে জলের

প্রধান উৎস হোল হিমবাহ। এগুলো গলতে সময় লাগে, অথচ প্রয়োজন সকালে। তাই লাদাকিরা নানা জায়গায় নালা থেকে খাল কেটে, নিজেদের সেচের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছেন। দ্রোগপা এলাকায় আবার খাল গেছে মাটির নীচ দিয়ে। অপচয় আরো কমাবার জন্যে খালের নীচে পলিথিন দেওয়া শুরু হয়েছে। এতে জলের অপচয় হয় খুবই কম। মাঝে মাঝে জিং বা পুকুর করা আছে। সন্ধ্যের সময় জল জমে আর সেগুলো ক্ষেতে দেয়া হয় পরদিন সকালে। তাই প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখা যায় খাল ও জিংয়ের ছড়াছড়ি। তবে বরফের ঢল নেমে অনেক সময় চাষের ক্ষতি করে। তাই কারগিল ও অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ বাঁধ তৈরি শুরু হয়ে গেছে।

চাষের জন্যে ওরা ব্যবহার করেন এক ধরনের সংকর জাতের বলদ। নাম হোল জো বা ঝা। এরা হচ্ছে গরু ও পুরুষ ইয়াকের মিশ্রণ। সরকারী উদ্যোগে নুব্‌রায় একটি ইয়াক ও চ্যাংস্নাতে একটি গরুর ফার্ম আছে। কিন্তু কোথাও জো নিয়ে কাজ হচ্ছে বলে শুনিনি। কোন কোন জায়গায় ঘোড়া দিয়েও চাষের কাজ চালানো হয়। এ ব্যাপারেও উন্নত প্রজন্মের জন্যে কোন সরকারী গবেষণা নেই।

লাদাকের অর্থনীতি এখনো কৃষি নির্ভর, যদিও, সে নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমছে। মোট জনসংখ্যার ৪৪% কর্মরত, তার মধ্যে (৩% জন মজুর ধরে)৭৮% হোল কৃষিকর্মী — ৬৬% পুরুষ ও ৩৪% মহিলা। কৃষিকর্মীদের মধ্যে মহিলাদের অনুপাত কাশ্মীর উপত্যকা থেকে অনেক বেশী। এসব হচ্ছে ১৯৭১ সালের হিসেব। ১৯৬১ সালে কৃষিকর্মী ছিল ৮৫·৩ %।

তবে কোল্ড ডেজার্ট বলে কথা। কৃষি জমি খুবই কম। মানুষ ব্যবহার করে মাত্র ২·২% জমি। লে জেলায় বন নেই বললেই চলে আর কারগিল জেলায় বনভূমি হোল ·৫ %। গ্রামীন জমি হোল ·৬% । তার মধ্যে ৩০% জমিতে চাষ হয়, ১৯% জমি চাষযোগ্য অথচ চাষ হয় না (এর মধ্যে ৭% তৃণভূমি) আর ৫১% চাষের অযোগ্য।

চাষ হয় ছোট ছোট প্লটে-নদী ঝরনা বা খালের আশেপাশে। এ সব জমির উচ্চতা মোটামুটি ভাবে (১০০০০´ /৩০৫০ মি) থেকে (১৪০০০´ / ৪২৭০ মি) পর্যন্ত।

এতদিন ধরে আঁশহীন যব অর্থাৎ গ্রিম ছিল লাদাকের প্রধান শস্য। গ্রিমের সুবিধা হোল যে (১৫০৯০´/৪৬০০মি) পর্যন্ত ফলে আর নীচের দিকে হয় দু ফসলী।

এ থেকে তৈরি হয় ছাং, যার মধ্যে ৩ থেকে ৫% এ্যালকোহল। বোতলে বহুদিন পর্যন্ত ছাং অবিকৃত রাখার এক পদ্ধতি বেরিয়েছে। লে তে নাকি এর জন্যে একটি কারখানা তৈরি হবে। ছাংয়ের সঙ্গে (Phopus) মিশ্রিত করে Carbonation এবং Parteurisation দুইই করা হবে।

এখন লাদাকের দ্বিতীয় শস্য হোল গম। মাটিতে একটু বালি মেশানো থাকলে গমের ফলন ভাল হয়। এ ছাড়া আলু তো আছেই। এখন নানা জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজ বোনা হচ্ছে। তাছাড়া অনেক নতুন ফসল ও তরকারী তার জায়গা করে নিচ্ছে, যেমন-বাক হুইট, ডাল, লুসার্ণ (পশু খাদ্য), ইয়ারখন্ডী ঘাস, শালগম, মূলা, গাজর, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, টমাটো, কাঁকুড়, ভূট্টা, করম সাগ, alonthos, lettuce ইত্যাদি। আর কিছু ফলফলাদিরও চাষ হচ্ছে-যেমন আপেল,আঙ্গুর, খুবানী, আখরোট ইত্যাদি।

তবে এতো করেও লাদাক সম্পূর্ণ স্বনির্ভর নয়। কিছু শস্য ও পশু খাদ্য এখনো নীচ থেকে আনতে হয়। পুরোপুরি স্বনির্ভর হতে মনে হয় এখনও বেশ সময় লাগবে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রায় অজানা তথ্যও জানানো উচিত। লোক চক্ষুর আড়ালে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ফিল্ড রিসার্চ ল্যাবোরেটরীর অবদান অসামান্য। সেটা ১৯৬০ সাল। নেহেরু এসে দেখেন যে এই বিরাট সৈন্যবাহিনীর রসদ পর্যন্ত বিমানে করে আনতে হচ্ছে। সে এক বিরাট খরচার ব্যাপার। তখন তিনি আলমোড়ার ডক্টর বশী সেনকে অনুরোধ করেন, এ সম্বন্ধে কিছু করতে। ডঃ সেন তার প্রিয় ছাত্র এম সি জোশীকে পাঠিয়ে দেন। জোশী লে-তে থাকেন ছ বছর এবং দু হাজার বর্গ একর নিয়ে সেখানে একটি বিরাট কৃষি ফার্ম গড়ে তোলেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচার রিসার্চ সাহায্য করেন তাঁকে। জোশী আলমোরায় ফিরে গেলে কর্ণেল প্যাটেল এই ল্যাবোরেটরীর কর্ণধার হন। এরা যে শুধু গবেষণা করে যাচ্ছেন তাই নয়, তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞান তাঁরা চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেও পেরেছেন। ভারতের পটভূমিতে এটাই হোল সবচেয়ে বিস্ময়কর কান্ড। এখন এসব ব্যাপার দেখাশোনা করেন ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। বিশ্বের অন্য কোন দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তর এই ধরনের কাজ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

এরা চাষের সময় বাড়াতে পেরেছেন দেড় মাস, আর অনেক এক ফসলী ক্ষেতকে দু ফসলীতে উন্নীত করেছেন। পনেরো জাতের তরকারী এরা লাদাকে ফলিয়েছেন। কয়েকটি নমুনা হোল ঃ ১৪ কেজি বাঁধাকপি, ১৭ কেজি মূলা, ৫ কেজি শালগম ও দেড় কেজি আলু। পুগা উপত্যকা, সোকার ও চুমাতাংয়ে পর্যন্ত তরকারী ও ফুল ফলেছে, যদিও সব কিছুই আকারে একটু ছোট হয়ে গেছে। ইওরোপীয় প্রথায় কাঁচের ঘর, এমনকি পলি হাউস হয়েছে, এবং কাছাকাছি থেকে গরম জল এনে ঠিকমতো কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে এখন তৈরি হচ্ছে পালং, ধনেপাতা, পেঁয়াজ, টমাটো, শসা, এমনকি করলা ও লাউ পর্যন্ত। এখন তো পশুখাদ্য নিয়েও গবেষণা চলছে।

বর্তমানে ৯৪% কৃষিজমিতে সেচের সুবিধা আছে। বাকি ৬% সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর। সেচ খাল বলতে লাদাকে আছে-খার্বাথাং (২০০০ একর), আবিচান মোথাং (১৫০০ একর), ইগো-ফে (৩৬০০ একর), স্তাকনা ও গর্গরথাং (মোট ৪০০০ একর)। লাদাকের বহু নদীনালাকেই এখনো সেচের কাজে লাগানো হয়নি। সেচ ব্যবস্থাকে আরো ব্যাপক করতে পারলে, লাদাক খুব তাড়াতাড়ি খাদ্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

চাষ ও বাস দুইয়ের পক্ষেই ভূমিস্খলন একটি প্রচন্ড অভিশাপ। দ্রাস ও সুরু উপত্যকায় এর বাড়াবাড়ি, তাছাড়াও আছে ফোতুলার নীচে ও সিন্ধু উপত্যকায়। একে ঠেকাবার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে বৃক্ষ রোপণ। বৌদ্ধ শ্রমণরা চিরকালই এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। আজও তাই যে কোন বৌদ্ধ মঠের চারিদিকে গাছ দেখা যায়। ইদানীং পপলার ও স্থানীয় এক ধরনের গাছ (মজনু) লাগিয়ে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। সামাজিক বন সৃজনও একটু আধটু শুরু হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মঠ ও স্কুলের ছাত্রদের সাহায্য নেয়া উচিত।

এ ছাড়া ধূম্রহীন চূলা প্রতি গ্রামে বিলি করতে হবে। সৌরশক্তিকে আরো ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে নতুন তৈরি জঙ্গল বাঁচবে। লাদাকে এতদিন শুকনো মাটির ইট, পাথর ও স্থানীয় কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এখন আধুনিক ধরণের বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়েছে, যা লাদাকের পরিবেশের পক্ষে উপযোগী নয়। ঢালু জমিতে আধুনিক বাড়ি তাড়াতাড়ি ধসে যাচ্ছে। পুরানো ধরণের বাড়ি তৈরি করার জন্যে এখন উৎসাহ দেওয়া উচিত।

সামান্য দুয়েকটি কাজ করলেও অনেক সুফল পাওয়া যাবে। লাদাকীদের খাবারে ভিটামিন সি-এর অভাব আছে। অথচ খুবানীতে এই জিনিষটি আছে প্রচুর পরিমাণে। তাই খুবানীর চাষ বাড়ানো প্রয়োজন। এর কিছু অংশ থেকে তেল হতে পারে। তাহলে ছোবরা হবে পশুখাদ্য। এর খোলস থেকে জ্বালানী হতে পারে। লাদাকে সারেরও অভাব আছে। মলকে এই কাজে লাগানো যেতে পারে। আবহাওয়া খুব শুষ্ক হওয়াতে খুব বেশী একটা অসুবিধা হবে না।

লাদাকের দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা হোল পশুপালন। তবে কর্মীদের মধ্যে মাত্র ৪% এই পেশায় টিকে আছেন। যদিও ভেড়ার সংখ্যাই ছয় লাখ। ভেড়া ও গরুর একটি সরকারী ফার্ম আছে কারগিলে। Freisen ও সহিওয়াল গরুর মিশ্রণ ঘটিয়ে দিনে ২৪ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া জার্সি গরুর সঙ্গে স্থানীয় গরুর মিশ্রণ ঘটিয়ে গবেষণা করা হয়েছে লের কাছে ন্যামুসপার-য়ে। এতেও দুধের উৎপাদন অনেকটা বেড়ে গেছে।

ইয়াকের লোম দিয়ে চাদর ও কম্বল, পশমিনা দিয়ে টুইড, শাল ও চামড়া দিয়ে জুতো ইত্যাদি তৈরি হয় লাদাকে। চ্যাংথ্যাং অঞ্চলে খুব ভাল জাতের পশমিনা হয়। সরকার ইরান থেকে কারাকুল জাতের ভেড়া এনে একটি ফার্ম খুলেছেন। মাঠুতে মেরিনো ভেড়ারও একটি ফার্ম আছে। তবে মেরিনোর সঙ্গে পশমিনা ও সিন্থেটিক সুতোর মিশ্রণে ভাল কাজ হতে পারে। এ নিয়ে কোন গবেষণা হচ্ছে বলে শুনিনি।

ফিল্ড রিসার্চ ল্যাবোরেটরী একটি উন্নত ধরনের মুরগি উদ্ভাবন করেছেন। এ ছাড়া মাটির নীচে মুরগির ঘর করার পরামর্শও দিচ্ছেন গ্রামবাসীদের। এখন লাদাকে ডিমের খুব একটা অসুবিধা নেই।

আগে লাদাকে দুই কুঁজওয়ালা উট ছিল। এরা অনেক কাজ করতো। এখন ভারতীয় লাদাকে এরা প্রায় লুপ্ত। পাকিস্তানী ও চিনা অংশে এরা এখনো টিকে আছে কিনা জানি না।

এরপর আসে ঘোড়ার কথা, জান্সকারে যা খুবই জনপ্রিয়। ঘোড়ার কথা বলতে গেলে পোলোর কথা বলতেই হয়। তিব্বতী ভাষায় পুলু মানে বল।পোলোর জন্ম হয়েছিল ভারতের দুই প্রান্তে-মণিপুরে ও বাল্‌টিস্তানে। বাল্‌টিস্তানে এটা ছিল জাতীয় খেলা। রাজা ও মন্ত্রীদেরও এই খেলা শিখতে হোত। বালটিরাই এই খেলার

প্রচলন করে লাদাকে। গোড়ার দিকে এই খেলা শুরু হয় কারগিল জেলার দ্রাস ও লেগ্‌তানে এবং লে জেলার নুব্‌রা তুরতুতে (শিওক উপত্যকা)। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কিছু বালটি এসে বসতি স্থাপন করে চুশোট গ্রামে-লের ১৫ কিমি ওপরে, সিন্ধুর তীরে। অনেকে বলেন লাদাকের বিখ্যাত রাজা সেংগে নামগিয়াল পোলো খেলা খুব পছন্দ করতেন। তার মা ছিলেন বালটি। তিনিই বালটিদের বসিয়েছিলেন চুশোট গ্রামে। লে অঞ্চলের পোলো খেলায় এই গ্রামের বালটিরা আজও অগ্রণী এবং চৌকোস। পোলো খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই এই গ্রামের।

রাজাদের আমলে পোলো খেলা হোত লে সহরের নীচে। ডোগরা শাসনকালে (১৮৪২-এর পর) খেলা হোত আরেকটু ওপরে-এখন যেখানে নব নির্মিত প্রধান বাজার ও চওড়া রাস্তা। এখন খেলা হয় আরো ওপরে, ডেপুটি কমিশনারের অফিসের সামনে। এখন অনেক টুর্নামেন্ট চলে এখানে। সমাজের সর্বস্তরের লোক এই খেলায় অংশ নেয়-চাষী, দোকানদার, সাধারণ সরকারী কর্মচারী, এমন কি দারোয়ান, সহিস পর্যন্ত।

খেলা না বুঝলেও দেখতে ভাল লাগে। সমানে বাজে সুর্ণা ও দমন। আওয়াজ অনেকটা আমাদের সানাই ও তবলার মতো। গোল হলে বাজে উঁচু পর্দায়। আকাশ চিরে নামগিয়াল শিখর। তার নীচে পরপর দুর্গ, গোমপা, পুরানো প্রাসাদ ও নামগিয়ালের প্রাসাদ। অন্যদিকে ঢাল নেমে গেছে সিন্ধুতে। তার ওপারে জান্সকার পর্বতমালা, যার মধ্যে মধ্য মণি হোল স্তোক কাংরী-যার শিখরের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও আশ মেটেনি। সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

১৮৪৭ সালে আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম পোলো খেলা দেখেছিলেন মুলবেকে। মাঠ ছিল ১২০০´ x ২৪০´ (৩৬৬ x ৭৩ মি) আর প্রতি দলে ছিল কুড়ি জন! এখন লে অঞ্চলের খেলায় প্রতি দলে থাকে ছ'জন। যাই হোক, এর পর গিলগিটের পলিটিক্যাল এজেন্ট চার্লস স্মিথের ভাল লেগে যায় এই খেলা। তিনি এই খেলার কিছু অদল বদল করে ও কিছু নিয়ম তৈরি করে এটি চালু করেন ইংরেজদের মধ্যে। ধীরে ধীরে খেলাটি তখন একটি আন্তর্জাতিক রূপ নেয়।

লাদাকী পোলোয় নিয়ম কানুনের বেশী একটা বালাই নেই। ফাউল বলতে একটি — কোন ঘোড়ার গতিপথের সামনে আসা চলবে না। মাঠের আকার বলে কিছু নেই, যা পাওয়া যায় তাই। খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কিছু বেঁধে দেওয়া নেই।

বল ধরে ছুঁড়ে মারলেও গোল হয়। হুনজা অঞ্চলে অবশ্য বল নিয়ে দুই গোল পোষ্টের মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে হয়। সময় বাঁধা চক্কর নেই, কারণ লাদাকে ঘোড়া বদলাবার রেওয়াজ নেই। লাদাকী ঘোড়া এক ঘন্টা পর্যন্ত অনায়াসে দৌড়তে পারে। আগে যে কোন পক্ষে নটি গোল হলে হাফ টাইম হোত। ইদানিং দেখছি লে অঞ্চলে পঁচিশ মিনিট বাদে হাফ টাইম ও তারপর দশ মিনিটের বিরতি। এদের খেলার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হোল ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর থেকে উড়ন্ত শট নেওয়া। বিশ্বের কোথাও আমি এমনটি দেখিনি।

দ্রাসের শেষ প্রান্তে, পথের বাঁকে রয়েছে দুটি প্রস্তর স্তম্ভ। তাতে খোদাই করা আছে অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়র মূর্তি। এ ছাড়াও আছে একটি অশ্বারূঢ় মূর্তি ও একটি পদ্ম-কিছু লেখাও রয়েছে পাথরে। তার একটি পাঠোদ্ধার করেছিলেন কানিংহ্যাম। সারদা লিপিতে নাকি লেখা আছে 'মৈত্রয়ন'। মূর্তির গায়ে কিছু কাশ্মীরী ধাঁচের গয়না আছে। সেজন্যেই বোধহয় তিনি বলেছেন এটি একটি নারী মূর্তি। আসলে এটি মৈত্রয়র মূর্তিই হবে। মনে হয় এগুলো সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। সারদা লিপি ও কাশ্মীরী গয়না সম্বন্ধে বলা যায় যে দ্রাসের লোকজন দর্দ হলেও মাতায়ানের গ্রামবাসীরা অনেকটা কাশ্মীরীদের মতো।

বাস স্ট্যান্ড থেকে মাত্র কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই মূর্তিগুলো দেখা যায়, পারমিটেরও বালাই নেই। চোখ খোলা রাখতে পারলে বাসে বসেই এক ঝলক দেখে নেয়া যায়।

সরকারী অর্থের বদান্যতার ফলে লাদাক বিশারদ বা তিব্বত বিশারদ নামে একটি নতুন শিক্ষিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কেউ এই মূর্তি বা শিলালেখ নিয়ে গবেষণা করেছেন কিনা জানা নেই। তবে এই মূর্তির পটভূমিকা জানতে হলে এই অঞ্চলের ইতিহাস খানিকটা জেনে নেয়া দরকার।

তিব্বত থেকে স্বাধীন হবার পর লাদাক কতগুলি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত হয়-তার একটি ছিল হেমবাব্‌স বা বরফের রাজ্য অর্থাৎ বর্তমানের দ্রাস। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে কাশ্মীরের রাজা হন সিকান্দর-মূর্তি ও মন্দির ভাঙ্গার জন্যেই তিনি বিখ্যাত। তার সময়ে পশ্চিম লাদাকের বাল্‌টি অঞ্চলে বৌদ্ধদের ধর্মান্তকরণ শুরু হয়; সব মঠ মন্দির একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ততদিনে দ্রাস-কারগিল অঞ্চল লাদাকের হাতছাড়া হয়ে গিয়ে নতুন নাম নেয় পুরিগ। এই রাজ্যও ভাগ হয়। বোধ

খারবু থেকে জোজিলা পর্যন্ত নতুন রাজ্যটির রাজধানী হয় কার্তসে-সুরু উপত্যকায় শঙ্কুর পুবে। চিঘতান রাজ্য গড়ে ওঠে সিন্ধুর ওপারে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে এই দুই রাজ্যের রাজারাই মুসলমান হন এবং ত্রিসুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। যথারীতি মঠমন্দির ভাঙ্গার কাজও শুরু হয়। তিব্বতের রাজা জামিয়াং নামগিয়াল (১৫৬০-৯০) পুরিগ পুনর্দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। নববর্ষ উৎসবের আগে যুদ্ধ যাত্রা অশুভ। কিন্তু সে পর্যন্ত দেরী করলে হাতে সময় থাকবে কম। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই শীত নেমে আসতে পারে। তাই তিনি মার্চের গোড়ায়, অর্থাৎ দুমাস আগেই এই উৎসব সেরে ফেলেন। সেই থেকে লাদাক ও তিব্বতের নববর্ষের মধ্যে এই দুই মাসের পার্থক্য চলে আসছে।

শেষ পর্যন্ত পুরিগ পুনর্দখল করেন জামিয়াংয়ের নাতি ফেলদান নামগিয়াল (১৬২০-৪০)। কার্তসের ত্রিসুলতানকে বন্দী করে লে-তে নিয়ে যাওয়া হয়। কার্তসে ও চিঘতানের গৌরবের দিন হয় চিরতরে অস্তমিত। তারপর জোরাওয়ার সিং লাদাক দখল করলে দ্রাস আবার তার পুরানো গৌরব ফিরে পায়। এখানে তৈরি হয় একটি দুর্গ আর লাদাকের পাঁচটি থানার একটির সদর দপ্তর।

বাদামী পাথরে ছাওয়া উপত্যকা এখানে প্রায় তিন কিলোমিটার চওড়া ও পাঁচ কিলোমিটার লম্বা। উত্তরে রুক্ষ পাহাড়ের সারি। এখানে ওখানে চার পাঁচটি গ্রাম বা পাড়া মিলে দ্রাস-লোকসংখ্যা তিনশর উপর। এখানে আছে স্কুল, পোষ্ট অফিস, হাসপাতাল ও অবজারভেটরী। একটি টুরিষ্ট বাংলোও আছে, পারমিট মেলে কারগিলের টুরিষ্ট অফিসারের কাছ থেকে। এছাড়া রাহি টি স্টলের উল্টো দিকে অর্থাৎ বাসস্ট্যান্ডের ওপরেই রয়েছে পি ডাব্‌লু ডির রেস্ট হাউস। এর কথা আগেই বলেছি। তার নীচে আছে বিস্তীর্ণ ময়দান, কিছু উইলো, পপলার ও সফেদার গাছ, বাজরা, যব ও গমের ক্ষেত (বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫৬০ মিলিমিটার), শিখ দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও সবার শেষে দ্রাস নদীর তীরে মৎস্য পালনকেন্দ্র।

কয়েকটা দিন ছুটি কাটিয়ে যাবার পক্ষে দ্রাস হচ্ছে একটি অপূর্ব জায়গা। থাকতে হলে পি ডাবলু ডির পুরানো রেস্ট হাউসে থাকাই ভাল। এখানকার ভিজিটার্স বুকটি হোল একটি স্বর্ণখনি। এটি হাতে করেই সারা দিন কাটিয়ে দেয়া যায়। একটি পাক গোলায় বাংলোটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২৬ মে ১৯৯৯। তবে আশা করি অমূল্য ভিজিটার্স বুকটি অক্ষত আছে। এর থেকে দুটি মন্তব্য তুলে ধরার লোভ সামলাতে

পারছি না।

১৯২২ সালের ১৮ ই অক্টোবর Capt. Munning White লিখেছেন ঃ 'যে ভারতীয় এই বাংলোর নকশা তৈরি করেছেন, তিনি জনগণের টাকা নষ্ট করার জন্যেই এটা করেছেন। তাকেই এই বাংলোটি কিনতে বাধ্য করা উচিত।' এর জবাব এলো চার বছর বাদে। ১৯২৬ সালের ৩০শে অক্টোবর জওহরলাল নেহেরু লিখলেন ঃ 'ক্যাপ্টেন হোয়াইটের মন্তব্য সম্বন্ধে বলি, যে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এই বাংলোটি তৈরি করেছিলেন, তাঁরই উচিত ছিল এই বাংলোয় অন্ততঃ এক মাস কাটিয়ে যাওয়া।' তিনি সই করেছেন —'টুরিস্ট-জে নেহেরু, এলাহাবাদ।'

ভারতের ভাবী প্রথম প্রধান মন্ত্রী জোজিলা পেরিয়ে হেঁটে ফিরে যান নভেম্বর মাসে-ভাবা যায়? এর একটা উল্টো দিকও আছে। ভারতের প্রথম কজন রাষ্ট্রপতি আর লাদাকের মাটিতে পা দেননি। প্রথম যিনি এসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন নীলম সঞ্জীব রেড্ডী।

বিগত দুই দশকে দ্রাসে এসেছে আমূল পরিবর্তন। এখানে বিদ্যুৎ আসে ১৯৭৪ সালের শেষে আর প্রথম ব্যাঙ্ক খোলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ ইন্ডিয়া—১৯৭৮ সালের ১ লা জুলাই। এখন যুদ্ধের সুবাদে দ্রাস একটি বিরাট পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে বাধ্য।

আশীর দশকের গোড়ায় দেখেছি যে জোজিলা পার হয়ে আসা মানুষকে এরা মনে করতেন স্বর্গের দূত! আর এখন আলাপ করতে গেলে প্রথম প্রশ্ন আসে ঃ 'কেন এসেছেন?' তবে সেই শান্ত সমাহিত ভাবের রেশটুকু এখনো আছে। এখনো দেখা যায়, হুঁকো হাতে বাড়ীর কর্তা বারান্দায় বসে আছেন, অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লে রাজপথের দিকে। ছবি তুলতে গেলে এখনও কেউ পয়সা চাননা। বরং হেসে বলে ঃ 'কপি পাঠাবেন। ঠিকানা হোল, মীর মোহম্মদ, দ্রাস।'

লাদাককে ভাল করে দেখতে হলে পরিশ্রম করে ইনার লাইন পারমিট যোগাড় করতে হবে । দ্রাসের আশেপাশের যে সব গ্রামের কথা বলেছি, সে সব জায়গায় যেতে হলেও পারমিট লাগবে। কারণ লে রাজপথের এক মাইল (১.৬ কিমি) উত্তর থেকেই ইনার লাইন শুরু। কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কোন দোষ দেওয়া যায় না। হানাদাররা দ্রাস হয়েই জোজিলার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। আজও দ্রাসে রাত্রিবাস করলে, মাঝে মাঝেই গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এখান থেকে

কারগিল পর্যন্ত অনেক জায়গায় যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা মাত্র ৫ থেকে ১০ কিমি দূরে ।

দ্রাসের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭-য়ের অক্টোবরে পাক সেনা ও আফগান হানাদাররা মিলে মিশে স্কার্দু অবরোধ করে। মেজর শের জং থাপার নেতৃত্বে, কাশ্মীর রাজ্যের সেনারা তাদের ঠেকিয়ে রাখে ১৯৪৮-য়ের ১৪-ই অগাস্ট পর্যন্ত ।তারপর এই পথ দিয়েই পাক সেনা এসে জোজিলা, দ্রাস ও কারগিল দখল করে। দীর্ঘ পাঁচ মাস লড়াই করে, জেনারেল থিমাইয়ার অধীনে ভারতীয় সেনা এলাকাটি পুনর্দখল করে। ১৯৪৯-য়ের জানুয়ারীতে যুদ্ধ বিরতি হয়। তখন শীতকাল। তাই ভারতীয় সেনা কারগিলের ওপরে পয়েন্ট ৪০১৬ (১৩৪০৬´) থেকে নেমে আসে। বিনা বাধায় পাক সেনা সেখানে গিয়ে শক্ত ঘাঁটি বানিয়ে বসে এবং মহানন্দে কারগিল ও লে রাজপথকে তাদের কামানের নিশানা বানিয়ে নেয়।

সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে, বহু রক্ত ঝরিয়ে ভারতীয় সেনা দখল করে নেয় পয়েন্ট ৪০১৬ ও সেই সঙ্গে পয়েন্ট ৫৭০৮ (১৮৭২৭´),১৯৮০ সালে। সমস্ত এলাকা হয় নিরাপদ। কিন্তু আমাদের তদানীন্তন সরকারের সেটা সহ্য হয়না। পয়েন্ট ৫৭০৮ দান করা হয় শত্রুদের, সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসাবে।

তারপরেই শত্রু নতুন ফন্দী আঁটে। নব্বুইয়ের দশকের গোড়া থেকে যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা জুড়ে গিরিশিরার ওপর শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। ওদের বাংকার রিজ ও টার্ন বাম্প রিজের নব নির্মিত ঘাঁটি থেকে লে রাজপথ মাত্র চার কিমি। সারাটা ১৯৯৮ জুড়ে ওরা প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করলো কারগিল অঞ্চলে। সাধারণ কামানের বদলে ওরা ব্যবহার করলো বিমান বিধ্বংসী কামান। এগুলোর নিশানা নির্ভুল এবং গোলা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে আছড়ে পড়তে সময় লাগে অনেক কম। অর্থাৎ চলতি গাড়িও পার পায় না।

আমাদের দিক থেকে রাস্তায় বোর্ড লাগানো হল 'আগে গোলাগুলির ভয় আছে'। সভ্য সমাজে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নজর করে দেখতে হয়। নইলে মনে হতে পারে যে লেখা আছে 'আগে পাথর পড়ার ভয় আছে'। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে এখনো এটা গিনেস বুকে ওঠেনি। দিনে একটি করে গাড়ি চলতে দেওয়া হয়। রাতে চলে কনভয়। গাড়িগুলোর মধ্যে ব্যবধান থাকে ১৬৪০´ (৫০০ মি)। তাই শত্রু সেনা গোলা চালাবার নতুন সময় সীমা বেঁধে দিলো, রাত ১১.৩০ থেকে

ভোর ৩.৩০ পর্যন্ত।

এতো কাণ্ডের পরও শীতকালে যথারীতি আমাদের সেনা নেমে এলো উঁচু ঘাঁটিগুলো থেকে। রেখে এলো কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার দাবার। আর পাক সেনা বিনা বাধায় উঠে এলো সেখানে। বিনামূল্যে পেয়ে গেল ভারতীয় সেনার রেখে আসা জিনিষগুলি। তারপর সীমারেখা পেরিয়ে অনেকটা চলে এলো। তৈরি হোল নতুন অনেক পোক্ত ঘাঁটি। আমাদের সেনা নাকি টের পেল ১৯৯৯ সালের মে মাসের ৬ তারিখে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হোল ১৫ তারিখ থেকে।

আমাদের মনে রাখতে হবে এই যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার মধ্যে কোন নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড নেই। এ ব্যাপারে চিরাচরিত বদান্যতারও কোন অবকাশ নেই। দ্বিতীয়তঃ সিয়াচেনের মতো এখানেও শীতে নেমে আসা চলবে না। তৃতীয়তঃ তিনটি সংস্থাকে এক করতে হবে, আই বি ও মিলিটারী ইনটেলিজেন্স। এ ছাড়া আছে রাজ্য ইন্‌টেলিজেন্স আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর। ওদের গাফিলতিতেই বহু জওয়ানের প্রাণ গেছে। অন্ততঃ প্রথম তিনটি এক হয়ে গেলে এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারবে না। তাছাড়া লে রাজপথের বিকল্প পথ তরান্বিত করতে হবে। কারণ মানালী-লে রাজপথও শীতে বন্ধ হয়ে যায়। দুটি বিকল্প পথ অবশ্য তৈরি শুরু হয়েছে-দ্রাস থেকে শঙ্কু ও কাকসার থেকে খার্বু। যত তাড়াতাড়ি চালু হয় ততই মঙ্গল।

দ্রাস থেকে নতুন জেলা সদর কারগিল (৮৭৮০/২৬৭৬ মি) ২৮কিমি, শ্রীনগর থেকে ২০৩ কিমি। পাকিস্তানের বদান্যতায় কারগিল এখন সারা বিশ্বে সুপরিচিত। দেশ বিদেশের বহু লোকই এখন এখানে আসতে উৎসুক। মুজাফ্‌ফার আলি তাঁর 'জুনি' ছবিটি শেষ করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তিনি শুরু করে দিয়েছেন 'কারগিল' নামে একটি নতুন ছবি। লাইনে রয়েছেন আরো অনেকে। ফলে হবু দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এখানে দেখার মধ্যে আছে তুর্কী শৈলীর শিয়া মসজিদ; শুধু কারগিলের নয়, কাছাকাছির মধ্যে শঙ্কু ও ট্রেস্‌পোনেরও। এদিকে পাকিস্তানে ৭৪৬টির ওপর শিয়া মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। বহু শিয়া চলে এসেছেন এপারে, বালটি বাজার ও অন্যান্য জায়গায়। কিউরিও সন্ধানীদের স্বর্গ হোল তিব্বতী বাজার। তাছাড়া এখানকার শীত নিরোধক পুরানো বাড়িগুলোও দেখার. পাথরের ওপর মাটির

আস্তরণ ও মাটির নীচে ঘর। অবস্থাপন্ন লোকের পর্দাও কম্বলের।

বহু উইলো,খুবানী ও তুঁত গাছ লাগানো হয়েছে। ফলে সবুজের ছোঁয়া লেগেছে। চাষবাস বেড়েছে, পশুচারণ হচ্ছে অনেক বেশী। রেডিও, টিভি, বিদ্যুৎ, এমনকি হেলিকপ্টার পর্যন্ত চালু হয়েছে। ক্রমবর্ধমান সহরের কিছু অংশ চলে এসেছে লাইন অভ কন্ট্রোলের চার কিমির মধ্যে। জনসংখ্যা তিন হাজার থেকে এক লাফে প্রায় বিশ হাজার ছুঁয়েছে।

তবে পর্যটন দপ্তর এখনো প্ল্যানিংয়ের পর্যায়ে আছেন। ডাক বাংলো ও ইন্সপেক্শান বাংলো ছাড়া হোটেল আছে মাত্র গুটি কতক। আগে থেকে বন্দোবস্ত না করে গেলে, দুর্ভোগ অনিবার্য।

অশ্রুময় গুহঠাকুরতা

নন্দাকিনীর উৎসপথে

রওনা হলাম আমরা তিনজন— সুধাংশুদা, দিলীপ আর আমি— অগ্রবর্তী মূল শিবিরের উদ্দেশে। মূল শিবির থেকে খাড়া শ'খানেক ফুট নেমে নন্দাকিনী। নন্দাকিনীর তীর ধরে বরাবর চললেই শিবিরে পৌঁছে যাব। আমাদের সঙ্গে তিনজন মালবাহক চলেছে কিছু মালপত্র নিয়ে।

ঘন্টা দুই হাঁটার পর আমরা হোমকুন্ডের স্পারটার নীচে এসে পৌঁছাই। মালবাহকদের মধ্যে দু'জন এই প্রথম আসছে এ পথে। ওরা ধরে বসল, ওদের হোমকুন্ড দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আবার সেই ঠেলে ওঠা যার কোন প্রয়োজন ছিল না। নদী ধরেই এ ক'দিন যাওয়া আসা করা হচ্ছে — এ পথটাই সহজ। কিন্তু উপায় নেই। ওদের পুণ্যাকাঙ্ক্ষা না মিটিয়ে যাওয়াটা অমানবিক হবে। এতে করে আমাদের ঘন্টাখানেক সময় বেশী লাগবে।

হোমকুন্ড থেকে আমাদের অগ্রবর্তী শিবিরের তাঁবুগুলি এবং লোকজনের চলাফেরা নজর করা যাচ্ছে। তীর্থ দর্শনের পর আবার নেমে আসি নন্দাকিনীর তীরে। এখান থেকেই উপরে উঠতে হবে সেই বড় কাল পাথরটা লক্ষ্য করে যার পাশে আমাদের তাঁবু পড়ছে। শ'দুই ফুট বেশ ভাল চড়াই, আলগা পাথর ছড়ানো। শেষ চড়াই সব সময়েই কষ্টকর মনে হয়। মাথা নীচু করে উঠতে উঠতে হঠাৎই তাকিয়ে দেখতে পাই সামনে একটা লাঠির মাথায় মার্কিং ফ্ল্যাগ। পাথরের আড়ালেই আমাদের তাঁবু।

দিপুদা, অশোক,জহর আর ডাক্তার আমাদের অপেক্ষায় ছিল। তাঁবুগুলির একটু উপরেই একটা মস্ত চ্যাটালো পাথর টেবিলের মত। তার উপরেই সকলে রোদে গা মেলে বসে রয়েছে। থালায় চানাচুর ভর্তি —মগ ভর্তি চা। একটু বিশ্রাম করি। তারপর জানতে চাই আমাদের অগ্রগতির খবর।

লিডার বলে, 'দেবু, সোমেন আর শেরপা দু'জন ক্যাম্প ওয়ান অকুপাই করতে গেছে সঙ্গে ক'জন কুলী নিয়ে।'

— 'ক্যাম্প ওয়ান হয়ে গেছে? বাঃ খুব ভাল প্রগ্রেস তো?' সুধাংশুদা খুশী

হয়ে ওঠেন।

—'হ্যাঁ, গতকাল জহর , সোমেন, ডাক্তার, আজীবা আর আংনিমা গিয়েছিল রেকি করতে— আমি তখনও এসে পৌঁছই নি। ওরা ক্যাম্প ওয়ানের জায়গা ঠিক করে এসেছে। আজ জহর আর ডাক্তারের বিশ্রাম। কাল সকালে ওরা উপরে চলে যাবে। আর একটা খবর শুনলে নিশ্চই খুব খুশী হবে— তা হ'ল জহররা গতকাল রেকি করতে গিয়ে বড়ি হোমকুন্ড খুঁজে পেয়েছে।'

— ' বড়ি হোমকুন্ড পাওয়া গেছে?' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠি আমরা।

— 'হ্যাঁ পাওয়া গেছে, আর তাতে আমাদের বড় লাভ হয়েছে।'

— 'সে তো বটেই — এত বড় একটা তীর্থ আমরা নতুন করে আবিষ্কার করলাম!'

— 'না, সে কথা আমি বলছি না। বড়ি হোমকুন্ড থেকে প্রায় দু'হাজার ফুটের একটা কঠিন ক্লাইম্ব আছে ১নং ক্যাম্পে যেতে হলে। একমাত্র পুষ্কর সিং ছাড়া কেউই এ. বি. সি. থেকে উপরে মাল বয়ে নিয়ে যেতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু এই বড়ি হোমকুন্ড আবিষ্কার হবার পরে ওদের মধ্যে উৎসাহের বান ডেকেছে। কে কার আগে মাল নিয়ে যাবে তারই জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ।'

— 'যাকগে, বড়ি হোমকুন্ড কিভাবে পৌঁছল ওরা ডিটেলস্ বল তাড়াতাড়ি।'

— 'সেটা জহরের মুখেই শোন —ওরাই খুঁজে পেয়েছে —ওরাই ভাল বলতে পারবে।'

জহর শুরু করে —

'গতকাল সকালে আমি, সোমেন, ডাক্তার, আঙনিমা আর আজীবা রেকি করতে বের হলাম। প্রথমে আমাদের নন্দাকিনীর উত্তর থেকে আসা স্ট্রিম ধরে উৎস মুখের কাছে পৌঁছতে হবে-কারণ রন্টিস্যাডেল ওই দিকেই দেখতে পেয়েছি আমরা। কিন্তু সমস্যা ছিল কোন পথে যাব । নন্দাকিনীর কোর্স ধরে না এখান থেকে শ'দেড়েক ফুট ওপরে যে শিরদাঁড়ার মত মোরেন রিজ্‌টা আছে সেটা ধরে। দেবুদা আমাদের বলেছিল যে সতোপন্থ লেকে যাবার সময়ে নাকি তোমরা ওই রকম একটা মোরেন ধরেই সহজে লেকে পৌঁছেছিলে। প্রথমে আমরা নদীর কোর্স ধরেই খানিকটা এগিয়ে যাই। কিন্তু দেখি পথ খুব খারাপ। আজীবাকে বলি মোরেন

রিজ ধরতে। কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হয় না। বলে ওরকম আলগা বালি-পাথরের ছুরির ফলার মত রিজ ধরে যাওয়া বিপজ্জনক। বালি পাথর সুদ্ধ হুড়মুড় করে নীচে গড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আজীবার অভিজ্ঞতার কাছে নতি স্বীকার করে নদী ধরেই চলতে থাকি। কিন্তু পথ ক্রমেই দুর্গম হতে থাকে। প্রচন্ড কষ্ট হতে থাকে আমাদের । হঠাৎ দেখি অনেক উপরে সেই মোরেন রিজের মাথায় দেবুদা আর একজন কুলী বেশ তাড়াতাড়ি সহজভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।'

— 'হ্যাঁ', লিডার বাধা দিয়ে যোগ করে,' দেবু বলেছে যে কিছুক্ষণ একা তাঁবুতে কাটিয়ে ওর আর ভাল লাগে না— বেরিয়ে আসে। কেদার সিং কে নিয়ে মোরেন রিজের দিকে উঠতে শুরু করে । পথটা কেমন তা দেখার জন্য। রিজটার কাছে এসে দূরে রিজের অনেক নীচে জহরদের দেখতে পায়। সূর্যের আলো তখনও ত্রিশূলের প্রাচীর পেরিয়ে হোমকুন্ড গলির মধ্যে এসে পৌঁছয় নি। স্লিটে (Sleet) ঢাকা মোরেন পথ— অত্যন্ত কষ্ট করে এগোতে হচ্ছে জহরদের। পা হড়কে যাচ্ছে প্রায়ই —খুব আস্তে আস্তে যেতে হচ্ছে ওদের—প্রতি স্টেপেই লড়াই করতে হচ্ছে। দেবু তখন ওই শিরদাঁড়া মোরেনটার মাথায় উঠে আসে। প্রথমে খুব সাবধানে চলে কিন্তু দেখে যে পথটা নীচের পথের চেয়ে অনেক ভাল—চড়াই নেই। বিশেষ পরিশ্রমই হচ্ছে না। কেদারকে নিয়ে তখন দেবু বেশ জোর কদমেই এগোতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের রেকি দলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। অনেকটা এগিয়ে আসার পর একটা জায়গায় এসে বসে বিশ্রাম নেয়। তারপরে তুই ই বল জহর।'

— ''উপরে দেবুদাদের গড় গড় করে এগিয়ে যেতে দেখে আজীবার উপরে আমাদের দারুণ রাগ হয়। শুধু শুধু এই জঘন্য পথ দিয়ে নিয়ে এল-শুনলো না আমাদের কথা। অথচ দেবুদারা কত সহজে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন আর উপরের পথ ধরার কোন উপায় নেই। এই স্লিটে ঢাকা লুজ স্ক্রী স্লোপ বেয়ে ওঠা অসম্ভব। বাধ্য হয়েই চলি রাগে গজ গজ করতে করতে। আজীবাকে দেখাই দেবুদাদের। ওর মুখে তখন আর কোন কথা নেই। এভাবে অনেকক্ষণ চলার পর গ্লেসিয়াল বেড়টা দেখি ক্রমেই উঁচু হয়ে ওপরের মোরেন রিজে গিয়ে মিশেছে। সেই পথে শেষে আমরাও রিজের উপর উঠে আসি। দেখি দেবুদা বসে আছে। আমরাও বসে পড়ি দেবুদার পাশে। একটু দম নিয়ে দেবুদাকে জিজ্ঞেস করি ,'কী ব্যাপার দেবুদা? তুমি একা কেন? তোমার সঙ্গে একজন কুলি দেখেছিলাম!' দেবুদা বলে,

— 'আরে ও তো কেদার । ও বলছে এখানেই কোথাও বড়ি হোমকুন্ড আছে। তাই এধার ওধার একটু খুঁজে দেখতে গেছে।'

"একটু বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু করি। কেদারও এসে যোগ দেয়। পায় নি ওর বড়ি হোমকুন্ড। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম বড়ি হোমকুন্ডের কথা। কেদারের কথাতেই আবার সব মনে পড়ে গেল। একটু উত্তেজনাও বোধ করি। কিন্তু আমাদের মাথায় তখন চিন্তা ১নং ক্যাম্প লাগাবার জায়গা খুঁজে বার করা। ওই বাজে পথে আসতে গিয়ে প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। এ পথটা অনেকটা ভাল। এই শিরদাঁড়া মোরেন রিজটা সোজা গিয়ে নন্দাঘুন্টির গিরিশিরার সঙ্গে মিশেছে। এই সংযোগের কিছুটা ডানদিকে, ত্রিশূল আর নন্দঘুন্টির মাঝখান দিয়ে একটা ঢাল নেমে এসেছে। আমাদের ওই ঢালটা দিয়েই উঠতে হবে— মাঝে মাঝে রন্টি স্যাডেলকে দেখা যাচ্ছে এই রিজের উপর থেকে । ক্রমেই আমরা নন্দাঘুন্টির গিরিশিরার কাছে চলে আসি। সংযোগস্থলে পৌঁছে একটা অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। সংযোগস্থলের কিছুটা নীচে যেখানে ত্রিশূল আর নন্দঘুন্টির মাঝের ঢালটা এসে নেমেছে, সেখানে প্রায় গোলাকার অপূর্ব একটি কুন্ড। তার চারিধারে মোরেন রিজের যেন বেড়া দেওয়া। কয়েক মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটাতেই বুঝতে পারি আমরা বড়ি হোমকুন্ডে পৌঁছে গেছি। সবার আগে কেদার সিং চেঁচিয়ে ওঠে, 'নন্দা মায়ী কি জয়, বাঙ্গালী বাবু লোগোঁকি জয়।' আনন্দে ও নাচতে থাকে। সে এক দৃশ্য। —নেমে আসি আমরা হোমকুন্ডের পাড়ে। এখন কুন্ডে জল নেই। একটা বড় পাথর, বেদির মত। আমরা সবাই এই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। কেদার মাটি তুলে মাথায় মাখে।"

— 'তারপর ?'

— "তারপর আর কি, আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে প্রায় দু'হাজার ফুটের ওই ঢালটা বেয়ে উপরে উঠে ১ নম্বরের জায়গা খুঁজবার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আজীবা আবার বাধা দেয়। বলে হোমকুন্ডের পাড়ে তাঁবু লাগাতে। কিন্তু এ. বি. সির এত কাছে তাঁবু লাগাতে আমরা রাজী হই না। ওর সঙ্গে বাক্‌বিতন্ডা শুরু হয়ে যায়। রাগ করে ওকে আমি নেপালী ভাষায় বলি,'তবে তুমি এখানেই বসে থাক —আমি উপরে উঠে গিয়ে ক্যাম্প লাগাবো।' আজীবা হয়তো ভেবেছিল যে ওদের ছাড়া আমরা এগিয়ে যেতে ভরসা পাব না। কিন্তু আমি আর ডাক্তার যখন দু'তিনশো

ফুট উঠে গেছি তখন আর উপায়ন্তর না দেখে আজীবা আর নিমা আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওই দারুন চড়াই শেষ হয় একটা বরফে ঢাকা ধাপের উপরে। সেখানেই মার্কিং ফ্ল্যাগ লাগিয়ে নেমে আসি। ওখান থেকে স্যাডেল একেবারে সামনে কিন্তু বেশ কিছু লম্বা লম্বা ক্রিভাস্ আছে।"

লিডার পরের দিনের প্রোগ্রাম বলল। কাল ডাক্তার আর জহর এক নম্বরে চলে যাবে —ওদের সঙ্গে আমি, সুধাংশুদা আর অশোকও যাব কিছু জিনিষপত্র পৌঁছে দিতে। তবে আমাদের তিনজনকে কালই আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। কারণ ওখানে তাঁবু কম, জায়গা হবে না। 'তোমরা সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। আর যদি এক নম্বরে যাবার পরেও স্ট্যামিনা থাকে এবং রুট ওপেন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে স্যাডেলটা থেকেও ঘুরে আসতে পারো। কিন্তু যা-ই কর সন্ধের আগে ফেরা চাই।' আমরা তো দারুণ খুশী। এরকম হঠাৎ পাওয়া সুযোগ বড় একটা আসে না। এক নম্বর বিনা বাধায় হয়ে যাওয়াতে এবং হোমকুন্ড খুঁজে পাওয়াতে লিডার বেশ খোশ মেজাজে আছে —তাই হয়তো এরকম একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

বিকেল হয়ে এসেছে। জায়গাটা খুব ঠান্ডা। হোমকুন্ড গলির মুখে অবস্থিত বলে বেশ হাওয়া বয়। সূর্যের আলো শিবির থেকে সরে গেলেই দারুণ ঠান্ডা পড়ে। সকালেও যতক্ষণ রোদ না আসে ততক্ষণ হাত-পা জমে থাকে।

ভোর সাড়ে পাঁচটা না বাজতেই বেডটী দিয়ে গেল কেদার সিং। এখানে তাঁবুর মধ্যেই স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করা হয়। ভোর বললাম বটে কিন্তু ঘন অন্ধকার চারিধারে। মোমবাতি জ্বালিয়ে স্লিপিং ব্যাগসুদ্ধ উঠে বসে চা খাই। কিন্তু বেরোতে ইচ্ছে করে না— কী ভীষণ ঠান্ডা। গড়িমসি করে জামাকাপড় জুতো পরে যখন তাঁবুর বাইরে আসি তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। ভোরের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিধারে। ঝাপসা দেখাচ্ছে। ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা এলিয়ে রয়েছে এখানে ওখানে।

খিচুড়ি চাপান হয়েছে প্রেসার কুকারে। খেয়ে রওনা হব। সাতটার সময় রওনা হবার কথা ছিল। কিন্তু খিচুড়ি আর হয় না। সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল প্রেসার কাজ করছে না। স্টীম্ বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেব চেষ্টা করেও কিছুই করা গেল না। এদিকে আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়তে শুরু করবে। জহর খু

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বার বার বলতে থাকে —'রাস্তা খুব খারাপ, এর উপরে বরফ পড়তে থাকলে খুব বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। আমরা না হয় কোন রকমে গিয়ে পৌছব, কিন্তু তোমাদের আবার এ পথ দিয়েই ফিরে আসতে হবে। তোমরা বরং আজ যেওনা।' আবহাওয়ার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জহরের বার বার এই কথা বলাতে আমাদের সকলেরই উৎসাহে যেন কিছুটা ভাটা পড়ে গেল। সুধাংশুদা এবং আর একটু পরে অশোকও বেশ ইতস্ততঃ করতে লাগল। লিডার গম্ভীর। কোন কথা বলছে না। আমরা যে যাব না আজ, সেটা নিজে থেকেই কেমন যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। লিডারকে অত গম্ভীর দেখে ভাবলাম ও-ও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করছে। দুম করে বলেই ফেললাম —' আমি বরং ঘুরেই আসি দিপুদা, এই সুযোগ মিস্ করলে হয়তো আর যাওয়াই হবে না।'আমাকে অবাক করে দিয়ে দিপুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল,

— 'বেশ তো যাও না। ঘুরে এসো। অসুবিধা কি আছে? অশোকের দিকে তাকিয়ে বলল,

-- 'অশোক তুইও যাবি --দু'লিটার কেরোসিন নিয়ে।' তখন সুধাংশুদা বললেন,

-- 'সকলেই যদি যায় তা হলে আমিই বা পড়ে থাকি কেন?'

সুতরাং আগের প্রোগ্রামই বহাল রইল জহরের আশঙ্কা উপেক্ষা করেই। শেষ পর্যন্ত ন'টা নাগাদ আধাসিদ্ধ খিচুড়ি খেয়ে রওনা হলাম।

শিবির থেকে শ' খানেক ফিট ওঠার পর সেই শিরদাঁড়া মোরেন চোখে পড়ল। কুমিরের পিঠের মত দেখতে। উপরটা বিশেষ চওড়া নয়। কোথাও তিন সাড়ে তিন ফুট কোথাও দেড় দুই ফুট। প্রথমে ওর উপর দিয়ে খুব সাবধানে চলছিলাম-যদি বালি পাথর সুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে যাই! কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পরেই ভয় ভেঙ্গে যায়। বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলতে থাকি। এ পথে চড়াই বিশেষ নেই,ধীরে ধীরে উঠেছে। সমস্ত জায়গাটা একটা ধ্বংসস্তূপের মত— চারিধারে ভাঙ্গা পাথর আর বালির স্তূপ। এক দিকে নন্দাঘুন্টির ভাঙ্গা ফাটা শৈলপ্রাচীর, অন্য দিকে ত্রিশূলের শুষ্ক, নীরস পাথর আর পাথর। চলতে চলতে শুধু মাঝে মাঝে ঝকঝকে উজ্জ্বল হিমপ্রপাত চোখে পড়ছে —নন্দাঘুন্টি থেকে, ত্রিশূল থেকে নেমে এসেছে। রুক্ষ পাথরের রাজত্বে এটুকুই বৈচিত্র্য।

ঘন্টাখনেক চলার পর সামনে দেখি শিরদাঁড়া পথটি শেষ হয়ে গেছে নন্দাঘুন্টির প্রস্তরময় গিরিশিরার গায়ে। ডানদিকে একটু নীচেই গোলাকৃতি একটা হ্রদ — তার চারিধার ঘিরে রয়েছে নাতি উচ্চ গ্রাবরেখা। হ্রদটি আপাততঃ শুকনো। তবে যে জলধারা এই হ্রদটিকেজলে পূর্ণ করত তার পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে হ্রদটির পলির উপরে। হয়তো বর্ষার সময়ে জলে পূর্ণ থাকে। ডাক্তার বলার আগেই আমরা বুঝে গেছি যে আমরা বড়ি হোমকুণ্ডে এসে পৌঁছেছি। নেমে এসে বসি একটা বড় পাথরের উপরে। দূরে ত্রিশূল গিরিশিরার উপরে কয়েকটা বরফাচ্ছাদিত কুঁজ কুয়াশার আবরণ ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে। পূর্ব দিকে ত্রিশূল শৃঙ্গ থেকে একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর শুভ্র হিমপ্রপাত নেমে এসেছে হোমকুণ্ডের উত্তর দিকে। কুণ্ডের পূর্ব কিনারা থেকে দু'হাজার ফুটের খাড়া ঢাল উঠে গেছে উপরের দিকে ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টি শিখর দুটিকে যুক্ত করে।

জহর বলে,' এই ঢাল বেয়ে উঠে গেলে শেষে একটা স্নো শেলফ পাওয়া যাবে— সেখানেই আমরা ১নং ক্যাম্প বানিয়েছি।'

জায়গাটার একটা অসাধারণ প্রশান্তি আছে। তীর্থ মাহাত্ম্য কিনা জানি না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল যে এই উজ্জ্বল হিমপ্রপাত, দূরে ওই স্বপ্নীল শিখরগুলি. যুগযুগান্তরের পুরাতন মহাতীর্থ এই হোমকুণ্ড, সবই যেন কেমন অবাস্তব। অন্তরে অনুভব করছি যেন একটা শক্তিশালী জীবন প্রবাহ বয়ে চলেছে এই পাথর,বরফ, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে। একটা অপার্থিব আনন্দ, একটা শঙ্কা এবং শ্রদ্ধায় সহসা হৃদয় যেন আপ্লুত হয়ে গেল। প্রকৃতির এই বিশালতার সামনে, এই নীরব অসীম শক্তির সামনে মানুষের সমস্ত ক্ষমতার গর্ব, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

'চলুন অনেক সময় লাগবে ক্যাম্পে পৌঁছতে— দারুণ খাড়া ঢাল— ধীরে ধীরে উঠতে হবে, ডাক্তার তাগাদা দেয়। উঠতেই হয়। এটা পর্বতাভিযান। পর্বতাভিযানে উত্তেজনা আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে, সফলতার সঙ্গে আছে আত্মতৃপ্তি, কিন্তু নেই রয়ে বসে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ একটু একটু করে উপভোগ করা। নেই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া। অভিযানের সময় সীমা বাঁধা। প্রচুর খরচ। তাই সময় সীমার মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তাছাড়া অধিক

উচ্চতায় আবহাওয়া একটানা বেশীদিন ভাল থাকে না— তাই অনুকূল আবহাওয়ার লগ্নকে পার হতে দেওয়া চলে না।

চড়াই ওঠা শুরু হল। প্রচন্ড চড়াই। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই এই ঝুড়ো ঢালের গায়ে আটকে রয়েছে। খুব কষ্ট হচ্ছে উঠতে কিন্তু বিশ্রাম নেবার কোন উপায় নেই। একটানা অনেকক্ষণ আরোহণের পর একখানা বিশাল টেবিলের মত পাথর পাওয়া গেল। তার উপরে বসে পড়ি সবাই। ফুস ফুস যেন ফেটে যাচ্ছিল।

এখান থেকে হোমকুন্ড দেখা যাচ্ছে খুব ছোট। উড়োজাহাজ থেকে নীচের জমি যেরকম লাগে ঠিক সেরকম লাগছিল নীচের উপত্যকাটি। আবার উঠতে হয়। জহর সামনে চলেছে, ওর পিছনে আমি তারপর সুধাংশুদা, ডাক্তার, অশোক। জহর ঘন ঘন বিশ্রাম নেয় না কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই ক্ষণেকের বিশ্রাম নিয়ে নেয় তাই ধীরে ধীরে সমান পদক্ষেপে চলে একটানা। ওর পেছনে চলেছি ওর পায়ের দিকে নজর রেখে, তাই যতখানি কষ্ট হবার কথা ততটা কষ্ট হচ্ছে না।

জহরের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়ে, যদি সত্যিই তুষারপাত শুরু হত তা হলেএ পথে উঠে আসা একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা হত। এত খাড়া ঢালে নতুন তুষার জমে তুষার ধ্বস পড়তে শুরু করত। তাছাড়া এখন একটুও হাওয়া নেই। যদি জোরে হাওয়া বইত বা ঝড় উঠতো তাহলে এই বড় বড় আলগা পাথরগুলি অনায়াসেই গড়াতে থাকতো। বেশ একটা সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হত। পাহাড়ে আবহাওয়ার পরিবর্তনে পথের অবস্থা যে কি পরিমাণে পাল্টে যায়— যারা পাহাড়ে যান তারা সকলেই জানেন। আমরা ভাগ্যবান। সকালবেলায় খারাপ আবহাওয়ার সূচনা হলেও শেষ পর্যন্ত বিশেষ খারাপ হয় নি। লাটু মহারাজের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক মূল শিবির স্থাপন করার পর থেকেই আমরা মোটামুটি ভাল আবহাওয়াই পেয়েছি। তাই আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি।

দ্বিতীয়বার বিশ্রাম পেলাম, যেখান থেকে তুষার সীমা শুরু হয়েছে। এখান থেকে 'স্নো শেলফ্টা' দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে ডানদিকে ত্রিশূল শিখর একেবারে কাছে, পরিষ্কার। শেলফের বাঁ দিকে নন্দাঘুন্টির প্রস্তর প্রাচীরের উপরে একজনকে ছোট কালো পুতুলের মত দেখা যাচ্ছে। অনেকটা উঠে গেছে। একনম্বর শিবির থেকে বোধ হয় রেকি করছে। এতক্ষণে আমাদের মুখে কথা ফোটে। প্রায় এসে

পড়েছি। আর দু'শো-আড়াইশো ফুট বরফ ভেঙে উঠতে পারলেই শিবিরে পৌঁছে যাব—অবশ্য তাঁবু দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। মনে মনে বেশ আত্ম প্রসাদ লাভ করি একথা ভেবে যে এই দুরারোহ পথ মাত্র দু'বার বিশ্রাম নিয়ে চলে আসতে পেরেছি। শরীর যথেষ্ট ক্লান্ত — কখন শিবিরে পৌঁছে এক মগ গরম চা পাব এই চিন্তাই এখন প্রধান। তাই ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে এই শেষ পথটু কু যত তাড়তাড়ি সম্ভব পাড়ি দেবার জন্য উঠে পড়ি। বেশ কিছুটা ওঠার পর শিবির নজরে এল। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে। আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। আমরাও হাত নেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উপরে উঠতে থাকি। একসময়ে সম্পূর্ণ বেদম হয়ে সমতল শেলফের উপরে পা রাখি আর সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। দম নিয়ে দেখি সোমেন। হাত ধরে একটা রোপ কয়েলের উপর বসিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখি নিমা এক মগ গরম চা বাড়িয়ে ধরেছে। ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে অনেকক্ষণ আগে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বরফ চাপিয়ে দিয়েছে সস্‌প্যানে করে স্টোভের ওপরে ।

একটু ধাতস্থ হতেই আমাদের প্রোগ্রামের কথা জানাই সোমেনকে। সোমেন বলে, — 'গতকালই আমরা স্যাডেল রুটটা ওপেন করেছি। চা খেয়ে নাও, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। দেরী করলে আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়বে— তখন তোমাদের ফিরতে খুব মুশকিল হবে'।

সামনের দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের সেই স্বপ্নের স্যাডেল, ঘোড়ার জিনের মত, নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূলকে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে— একেবারে হাতের কাছে। ডানদিকে ত্রিশূলের গিরিশিরা বড় বড় লম্বা ফাটলে ভরা। বাঁ দিকে নন্দাঘুন্টির গিরিশিরা পাথর আর তুষারে মেশামেশি। আর এ দুইয়ের মাঝে ছোট্ট সমতল চিরতুষারাবৃত আমাদের এই সাময়িক আশ্রয়স্থল। এই শেলফ্ থেকে নেমে গেছে একটি তুষার ঢাল— মিশেছে পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচে স্নো বেসিনে— গামলার মত চেহারা। এই বেসিনের অপর প্রান্ত থেকে স্যাডেলের দিকে উঠে গেছে খাড়া তুষারাচ্ছাদিত আর একটা ঢাল। আর এই ঢালের শেষে রন্টি স্যাডেল। সুধাংশুদা আর আমি চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ি। সোমেন আমাদের গাইড। ডাক্তার এল না। কিছু দূর এগোতে দেখি পুষ্কর সিং আর একজন পোর্টারও পিছনে পিছনে আসছে। আর আসছে অশোক। নন্দাঘুন্টির গিরিশিরা ধরে 'ট্র্যাভার্স' করতে করতে এগোই—

বেসিনে নামি না। স্যাডেলের ঢালের কাছাকাছি এসে যেখানে নীচের বেসিন এবং ঢালটা মিশেছে সেই জায়গাটাতে এসে পৌঁছাই। স্যাডেলের ঢালের দিকে পা বাড়াতেই বিপত্তি। ভূস্ করে কোমর পর্যন্ত ঢুকে যায়। ওই সংযোগস্থলে একটা বড় ফাটল আছে (bergschrund)—কিন্তু ওপরটা নরম তুষারে ঢাকা তাই বুঝতে পারিনি। সোমেন ধমকায়, 'তাড়াহুড়ো করছো কেন? এ জায়গাটা লম্বা পা ফেলে ঢালের উপরে চলে যাবে। রোপ লাগানো নেই-যদি ফাটলটা বেশী গভীর হত?' হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠে বলি —'সে কথা এতক্ষণে বলছো আগে বললে কি হত।'

—'আগে বলার সুযোগ কোথায় দিলে তুমি? আবার উঠতে শুরু করি। মাঝে মাঝে নরম বরফে হাঁটু অবধি ঢুকে যাচ্ছে। পা তুলে টেনে আবার পা ফেলছি। জুতো মোজা ভিজে শেষ। কিন্তু সে সব আর কিছুই গায়ে লাগছে না। মনে দারুণ উত্তেজনা— আমরাই প্রথম ভারতীয় দল এ পথে এলাম। রন্টি স্যাডেলে পা দিলাম।

স্যাডেলের উপর পৌঁছে মনে হল চোখের সামনে কে যেন একটা জানালা খুলে দিল। চারিদিকের সুউচ্চ শৈল প্রাচীর দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এখন এই স্যাডেলের বাতায়ন পথে দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়ে ছুটে গেল বহু দূরে, রন্টি নালা পেরিয়ে ঋষিগঙ্গার খাদের উপর দিয়ে আরও উত্তরে, যেখানে দিগন্তের শেষে দুনাগিরি তার শুভ্র শিখরের চূড়া টুকুন পর্বতশ্রেণীর আড়াল থেকে তুলে ধরেছে। বাঁ দিক ঘেঁষে দেখা যাচ্ছে রন্টি পর্বতের একাংশ, ডানদিকে ত্রিশূলের পিছনে বেতারতোলি শিখর। স্যাডেলটা প্রায় দেয়ালের মত নেমে গেছে শ'চারেক ফুট। তারপর ধীরে ধীরে খাড়াই কমে গিয়ে হাজার দুই ফিট নীচে সমতল শুভ্র প্রান্তরে মিশেছে। ওই প্রান্তরের শেষে রণ্টিনালার আভাস। এই নালা ধরে উত্তরে গেলে ঋষিগঙ্গা। সেখান থেকে রিনি হয়ে তপোবন— যোশী মঠে চলে যাওয়া যায়।

লংস্টাফ এসেছিলেন মে মাসে। তখন প্রচুর বরফ থাকে এ অঞ্চলে। তিনি স্যাডেলের অপর পারে নামতে পারেন নি। একটা রাতও কাটাতে পারেননি এখানে, বরফের অবস্থা এতই খারাপ ছিল। এখান থেকে নেমে যেতে যেতেই একটা বিশাল হিমানী-সম্প্রপাত হয়েছিল ঠিক যেখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন। স্যাডেলটা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

'...but the saddle was heavily corniced and at our feet snow

slopes, which were dangerous, fell away steeply for about 2000 to the head of Rinti glacier. In my opinion it would be quit possible to make the descent on the north in good snow conditions, but the passage would demand much time and great care to effect safety. If the slope was ice, neither ascent or descent would be practicable."

আমরা এসেছি সেপ্টেম্বর মাসে । তাই অত বেশী বরফ পাইনি। মে মাসে এলে বৈদিনী থেকেই বরফ ভাঙতে হত। এবং জিউঁরাগলি কল পার হওয়া যেত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লংস্টাফ এসেছিলেন সুতোল, চননিয়াঘাট হয়ে। তিনি শৈলসমুদ্র থেকেই বরফ পেয়েছেন। এখন যদিও স্যাডেলে বেশ কার্নিশ (cornice) রয়েছে কিন্তু ফিক্সড্ রোপ করে অপর পারে নেমে যাওয়াটা বিশেষ কষ্টকর নয়। আমাদের দু'চারজন একটা দড়ি লাগিয়ে শ'খানেক ফুট ওঠা নামা করে দেখেছে যে আমরা সেই ভাবে তৈরি হয়ে এলে, এদিক দিয়ে নেমে তপোবন হয়ে চলে যেতে পারতাম হয়তো।

বেলা বাড়তে আকাশের অবস্থাও ক্রমে খারাপ হয়ে আসে। তাড়াহুড়ো করে যতগুলি পারলাম ছবি তুলে নিলাম। 'ফিক্সড্ রোপটা' ওখানেই রেখে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তাছাড়া একটা 'রোপ কয়েলের' মধ্যে একটা কাগজে আমাদের নাম ধাম, তারিখ লিখে ওখানে রেখে দেওয়া হল।

এখান থেকে নামতে মন চাইছিল না। কিন্তু সোমেনের তাগাদায় ফিরতেই হল। ওর ভয় যেভাবে আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে তাতে তাড়তাড়ি না করলে নামার পথে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই টিনের মুরগির সঙ্গে গরম ভাত। এই চিরতুষার রাজ্যে এমন খাবার গ্র্যান্ড-গ্রেট-ইষ্টার্ণের প্রথম শ্রেণীর লাঞ্চ থেকেও অনেক বেশী উপাদেয়।

রমনীয় রানীক্ষেত

মধ্য হিমালয়ের কুমায়ুন পর্বতমালা দূর দূরান্তের মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এক আশ্চর্য প্রশান্তি মধ্য হিমালয়ের পর্বতে কন্দরে, গ্রামে জনপদে, পথে বিপথে। এর আরণ্যক সুষমা তৎসহ রূপময় তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ অ-কবিকে পর্যন্ত আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও কেমন মুগ্ধ সমাহিত করে তোলে।

উপরের কথাগুলির তাৎপর্য বোঝা যাবে কুমায়ুনের শৈলাবাস 'রানীক্ষেতে' এলে। ১৮২৯ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, পাইন-ধূপছায়ার মায়ায় ঘেরা এই শৈলশিখর শহর। সামনের বাধাহীন দিগন্তরেখায় চোখ মেললে দেখা যাবে মধ্য হিমালয়ের আশ্চর্য আকর্ষণ তুষারাচ্ছাদিত নন্দাঘুন্টি, হাতি পর্বত, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট পর্বতশৃঙ্গ এবং পিন্ডারী হিমপ্রবাহ অঞ্চলের অন্যান্য সুদূর পর্বতরাজি। সূর্যের প্রতিমুহূর্তের প্রতিফলনে পর্বতশৃঙ্গের রঙ বদলায়: প্রভাত আলোয় যার যৌবন দেখে প্রতিটি পর্যটক উল্লাসিত হয়েছেন, সন্ধ্যার শেষ কিরণে তারই সমাহিত প্রশান্তরূপ দেখে তিনি আরো মুগ্ধ এবং বিস্মিত। সভ্য জগতের মানুষ জানে শুধু মাত্র রঙ করতে; কিন্তু প্রকৃতি জানে অকৃপণ রঙ ছড়াতে এবং বিশেষত পাহাড়ের ক্ষেত্রে তো কোনও কথাই নেই।

কুমায়ুনে শৈলাবাস অজস্র। এর মধ্যে নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানী প্রভৃতি সাধারণের মধ্যে বহু আলোচিত। উৎসাহী প্রকৃতিপ্রেমীর মতে, নৈনিতাল নাকি কাশ্মীরের পকেটবুক সংস্করণ। বলাবাহুল্য, বায়ুসেবী ভ্রমণবিলাসী সাধারণভাবে নির্ভর করে থাকেন টুরিস্ট গাইড; কিন্তু সিমলা, দার্জিলিং-- এর মতো নৈনিতাল কিংবা আলমোড়ার যতখানি হাঁকডাক, সে তুলনায় রানীক্ষেত এতদিন কিঞ্চিত স্বল্প প্রচারেই সন্তুষ্ট থেকেছে। সবুজ নির্জন পিয়াসী পর্যটক মাত্রই নাকি বলেন, রানীক্ষেতের নৈসর্গিক শোভার আবেদন অতুলনীয়। কবির ভাষায়, রানীক্ষেত যেন সীমাহীন পাইন বীথিকার মধ্যে ছোট্ট একটি পাখির বাসা। সমগ্র রানীক্ষেতের রূপসী শরীর ঘিরে এক আশ্চর্য প্রশান্তি! চতুর্দিকে পুষ্প সম্ভার — প্রকৃতি নিজের হাতে

যেন পথে প্রান্তরে, অরণ্যে বারো মাস অজস্র ফুলের মেলা বসিয়ে রেখেছে। এই ছোট্ট শৈলাবাসে যেখানে হাজার পঞ্চাশেরও কম জনবসতি, তার প্রতি পদক্ষেপে স্বল্প ব্যবধানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সাজিয়ে রাখা নানা মরসুমী ফুলের টব নিঃসন্দেহে সুকুমার রুচির পরিচায়ক। আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রানীক্ষেত অবশ্যই শৈলাবাসের সম্রাজ্ঞী।

জিম করবেট এক সময়ে জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত অতিবাহিত করেছেন কুমায়ুনের নানা অঞ্চলে। তাঁর বিভিন্ন রচনায় সে সময়ের এই অঞ্চলের নিসর্গ এবং অধিবাসীদের উজ্জ্বল উল্লেখ পাওয়া যায়। জনৈক বিদেশী পর্বতপ্রেমী রানীক্ষেতের শান্ত সবুজ পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিগন্তপ্রসারী হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বতমালার অনির্বচনীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন ...'there is something intimidating and almost terrifying in such a vast horizon and that on which we gazed from Ranikhet.' ভারতদর্শনে এসে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম ডগলাস একদা বলেছিলেন,'Ranikhet is easily the finest hill station in the world.' রানীক্ষেত জওহরলাল নেহরুরও খুব পছন্দ ছিল এর শান্ত পরিবেশের জন্য। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তো সময় পেলেই কাজের অবসরে রানীক্ষেতে এসে বিশ্রাম নিতেন। বলা যেতে পারে, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কল্যাণেই হিমালয়প্রেমী বাঙালী রানীক্ষেতের পরিচিতি লাভ করেছেন। স্থানীয় মানুষজন বলেন, রানীক্ষেতে বাঙালী ভ্রমণকারীদের সংখ্যা ইদানিং প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। বলাবাহুল্য, রানীক্ষেত রমণীয়; রানীক্ষেত কমনীয়। রানীক্ষেত প্রকৃতির কোলের একটি পরিচ্ছন্ন শান্তির শহর। প্রতিটি রাস্তাই বলতে গেলে যানবাহন চলাচলের উপযোগী; এখানকার যে কোনও বাংলোতে, তা ওপরেই হোক বা নিচেই — অবলীলাক্রমে আপনি মোটরে করে পৌঁছে যেতে পারবেন। পাহাড়ের গায়ে ওক আর পাইন গাছের প্রহরায় আশ্চর্য সবুজ গালিচার মতো রানীক্ষেতের গল্ফ গ্রাউন্ড দেখলে চোখ ফেরানো দায়! মনে হবে এই সবুজ গালিচার সংসারে শুয়ে বসে দিনটি যদি কাটিয়ে দেওয়া যায়! এ ছাড়া এখানকার আরাধ্য ব্যাঘ্র বাহিনী দেবী কালিকার মন্দির কিংবা অনেক ঘন্টা ঝোলানো ঝুলনা দেবীর মন্দির নির্জন পাহাড়ী পরিবেশে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

রানীক্ষেতকে আরো সুন্দর করে তোলার পিছনে ছিল ইংরাজ। কুমায়ুন

পার্বত্য অঞ্চলের আরণ্যক সম্পদের জন্য ১৮১৪সাল বা তার কাছাকাছি সময় থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ী নজর এইদিকে আকৃষ্ট হয়। কুমায়ুনের নেপালী শাসক তখন বাম শাহ্। বৃটিশ ভারতের তদানীন্তন বড়লাট স্বনামধন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের সাম্রাজ্য আগ্রাসী দু'চোখ তখন কুমায়ুনের দিকে। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর প্রতিনিধি গার্ডেনার সাহেব মারফৎ বাম শাহের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যর্থ হয়ে শেষ অস্ত্র হিসাবে ১৮১৫ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সরকারী নথিপত্রে অবশ্য রানীক্ষেতের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৬৯ সালে। স্বর্ণ কোটলি এবং তানা গ্রামের জমি ও জঙ্গল দখল করে প্রচুর অর্থব্যয়ে সে সময়ে এখানে ক্যান্টনমেন্ট্ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে রানীক্ষেত সৈন্যদেরও অন্যতম প্রিয় শৈলাবাস। এবং বলাবাহুল্য, রানীক্ষেত স্বাধীন-উত্তর-ভারতের কুমায়ুন রেজিমেন্টের সদরকেন্দ্র।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয় ব্রিটিশ আমলের সামরিক পূর্ত বিভাগে কর্মসূত্রে এক সময় বেশ কিছুকাল রানীক্ষেতে ছিলেন। সে সময়ে তিনি অপরিমেয় যোগ বিভূতির অধিকারী এক সিদ্ধ গুরুর অসীম কৃপা লাভ করেন এবং কঠোর ক্রিয়া যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এক মহান যোগীরাজ হিসাবে বিশ্বে পরিচিত হন।

রানীক্ষেতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রমণীয় স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন ভাইসরয় লর্ড মেয়ো। রানীক্ষেতের শান্ত নম্র পরিবেশ তাঁকে এত বেশি মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন ভারত সরকারের গ্রীষ্মাবাস সিমলার পরিবর্তে রানীক্ষেতে স্থানান্তরিত করতে। তাঁর অভিলাষ অনুযায়ী রামনগর থেকে রানীক্ষেত পর্যন্ত একটি রেলপথ চালু করা সম্পর্কে জরিপ বিভাগের পরামর্শ পর্যন্ত আহ্বান করা হয়। কিন্তু লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতুবি থেকে যায়।

শরতে-হেমন্তে-বসন্তে রানীক্ষেতের রমণীয়তা চিরতরুণ, দূরের পর্বতশৃঙ্গে রঙের পালাবদলে দর্শক-অতিথির হৃদয়হরণে রানীক্ষেতের জুড়ি মেলা ভার! শরতের মুক্ত নীল আকাশ জুড়ে হালকা মেঘের ভেলা ভেসে যাওয়া, তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ জুড়ে তাদের আশ্চর্য বিচরণ, হেমন্তে কাছের ও দূরের পাহাড়ের অঙ্গ জুড়ে শস্যক্ষেত্রের সোপানে সোনালী ফসলের হিল্লোল; বসন্তে রঙিন ডানায় ভর দিয়ে কোকিল, টিয়া, বুলবুল এবং আরো অনেক নাম না জানা পাখির কূজন,

পাইন বীথিকায় তাদের হৃদয়ের জাগরণ প্রকৃতি প্রেমিককে মধ্য হিমালয়ের রানীক্ষেতের পরিবেশে যতখানি অন্য স্বর্গে পৌঁছে দেবে, ততখানি বোধহয় অন্য কোথাও নয়!

রানীক্ষেত প্রকৃত অর্থেই পাহাড়ের রানী। কিন্তু রানীক্ষেত কি করে রানীক্ষেত? জনশ্রুতি যে, রানী কলাবতী নাকি এই শৈল জনপদে প্রথম চাষবাসের প্রচলন করেন। আবার অনেকে বলেন, শূদ্রদেবের মহিষী পদ্মিনীর প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র ছিল হিমালয়ের কোলের এই শৈল জনপদ।

কথিত আছে, চাঁদ বংশীয় রাজারা একদা কুমায়ুন অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তাঁদের কুলদেবী হলেন নন্দাদেবী অর্থাৎ শক্তি। কুমায়ুনের উৎসবাবলীর মধ্যে রামলীলা, দেওয়ালি হোলি, রাখীবন্ধন, জন্মাষ্টমী অন্যতম। এ-ছাড়া জাতীয় উৎসব রয়েছে হরিয়ালা এবং নন্দাদেবী। 'নন্দাদেবী' উৎসবের মুহূর্তে রানীক্ষেত নাকি আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে স্থানীয় পরিশ্রমী পার্বত্য মানুষের হৃদয়স্পন্দনে।

দীপককুমার সরকার

নন্দনকাননে

আকাশ তখনও অন্ধাকার। কুয়াশার মায়াজালে ঘাংরিয়া দিব্যি নিশ্চিন্তে লুকিয়ে আছে। ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু তন্দ্রা কাটেনি। সকালের সুখনিদ্রায় দু'চোখ যেন টেনে ধরে। চোখ মেলতেই বুঝতে পারি আমরা ক'জন ছাড়া বহু তীর্থ যাত্রী বেরিয়ে পড়েছেন। বাধ্য হয়ে কম্বল ছেড়ে তাড়তাড়ি উঠি।

কত বিচিত্র গানে গানে মুখর হয়েছে প্রভাতী আকাশ। মুখর হয়েছে বাতাস উচ্ছ্বসিত কলরোলে। দিগন্তে কুয়াশার কুহেলিকা। যেন প্রকৃতির অঙ্গে ইন্দ্রজাল বিছানো। অসীম আকাশে মেঘদল চলেছে। মহা উল্লাসে।

মুক্তির আনন্দে আজ মন উন্মুখ। চোখে মদির আবেশ। বুকের বীণায় বাজে সুরের আলাপ। বিবাগী ভ্রমর যেন আপন আনন্দেই গুনগুনিয়ে উঠেছে। অজানা অচেনা পথ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। চরণ যুগল চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সকাল ৭টা। গুরুদ্বারের চা-হালুয়া খেয়ে হেমকুণ্ডের পথে (সাড়ে তিন মাইল) বেরিয়ে পড়ি।

গুরুদ্বারের কাছেই লক্ষ্মণ গঙ্গা বা হেমগঙ্গা ও ভুন্দর নদীর সঙ্গম। নদী পার হয়ে ওপারের রাস্তা ধরি। দুদিকে দুটো পথ গেছে বেঁকে। বাঁ দিকে নন্দনকানন। ডানদিকে হেমকুণ্ড-লোকপাল।

চড়াই। আলগা পাথরের পথ ক্রমে একেবেঁকে উঠেছে। ডান দিকে হেমগঙ্গা। দুদিকে বার্চ ও ভুর্জ বৃক্ষের বন। শ্যামলীমা প্রকৃতির মনোলোভা শোভা। শিশির সিক্ত কচি ঘাসের স্নিগ্ধ প্রভা। ফুলের সৌরভ। ডালে ডালে শাখে শাখে পাখীর মিষ্ট মধুর সুর। চলার প্রেরণা আনে। উৎসাহে উঠতে থাকি।

দূরে ডানদিকে দেখা যায় এক অপূর্ব সুন্দর জলপ্রপাত। সফেন মুক্ত গলা জল। হেমকুণ্ড নিঃসৃত নির্ঝরিণী। যেন স্বর্গ থেকে বিপুল ধারা নামে মর্তের বুকে। উদাস মনে পথ চলি। আর চেয়ে চেয়ে দেখি।

শরতের আকাশে দল ছাড়া মেঘের বলাকা আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। কখনও আলো কখনও অন্ধকার। যেন চলেছে মন দেয়া-নেয়া। ধীরে ধীরে উঠি। হাঁফিয়ে

যাই। ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগে। ক্লান্তি দূর হয়। নবীন উৎসাহে এগিয়ে চলি।

পথে পথে আলোছায়ার লুকোচুরি। পায়ে নতুনের আস্বাদন। প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্যে মন ভুলিয়ে রাখে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় তুহিন শিখর মালা। নয়ন ভরে। প্রসন্ন চিত্তে পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকি। বাঁ দিকে একটু ওপরে দেখা যায় একটি গুহা। শুনেছি যখন ঘাংরিয়ায় কোন ধর্মশালা বা গুরুদ্বার ছিল না তখন এটাই লোকেরা ধর্মশালার ন্যায় ব্যবহার করতো। নাম তার নারাথোর।

পথে আজ বহু শিখ তীর্থযাত্রী। স্ত্রী পুরুষ সকলেই আছেন। এক বৃদ্ধ চলেছেন। জীর্ণ দেহ। তবুও বুক ভরা আশা। প্রচন্ড চড়াই। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে। একটু দাঁড়াই। সোমনাথ বিস্কুট দেয়। হঠাৎ বড় বড় পাথর পড়ে। তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের মাথা থেকে বাঁদরের দল পাথর ছোঁড়ে। ভীত মনে হাঁটতে থাকি। হাত ধরে বৃদ্ধ পথিককে টেনে তুলি। দ্রুত গতিতে যাওয়া সম্ভব নয়। বিস্কুটের প্যাকটি পকেটে পুরতেই পাথর ছোঁড়া বন্ধ হয়।

আকাশে চলে আঁধারের খেলা। কুয়াশার লুটোপুটি। সব কিছুই অবলুপ্ত হয়। এ যেন রহস্যময় হিমালয়ের রোমাঞ্চকর আবেদন। বৃষ্টি নামে। পলিথিনসীট জড়িয়ে চলতে থাকি।

আশ্চর্য হিমালয়ের আবহাওয়া! ক্ষণিকেই মেঘদল যায় উড়ে। কুয়াশার ওড়না তুলে হাসতে থাকে সূর্যদেব। আহা কি অপরূপ শোভা। মুগ্ধ নেত্রে ক্ষণিক তাকিয়ে দেখি। যেন মুক্তির আহ্বান জানায়। মর্তের লোক এগিয়ে চলে স্বর্গ পানে।

ক্রমে গাছপালা শেষ হয়। দুদিকে দেখা যায় ফুলের মেলা। পথের আশে পাশে ছোট ছোট গাছ। অজস্র ব্রহ্মকমল। যেমন রূপের ছটা তেমনি গন্ধের আকুলতা। সৌরভে সুরভিত পরিবেশ।

দূর থেকে দেখা যায় গুরুদ্বারের পতাকা। মন আশায় ভরে। পথ এসে থামে সিঁড়ির গোড়ায়। ধাপে ধাপে ১০৬১টা সিঁড়ি উঠে গেছে হেমকুন্ডের মাথায়। ক্ষণিক বসি। অরুণ পাকদন্ডির রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। বরেন ধুঁকাতে ধুঁকাতে আসে। বেলা তখন ১০টা। সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসি হেমকুন্ডের (১৪২৫০) প্রান্তরে। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ধর্মশালায় উঠি। সামনে একটা ছোট সাইন বোর্ড। তাতে লেখা— এখানে জুতো খুলে হেমকুন্ড দর্শন করতেহবে। আমাদের দেখে এক শিখ ভদ্রমহিলা ঘরে বসতে বলেন। একটু বসে আমরা খালিপায়ে হেমকুন্ডের তীরে আসি। আচম্বিত

শোভায় আঁখি যেন স্তম্ভিত হয়, আহা কি অপরূপ রূপ।

তুষারতীর্থ হেমকুন্ড। প্রকৃতির আপন হাতে গড়া। রমণীয় পরিবেশ। তিন দিকে বিশাল গিরিশ্রেণী। মাথায় তার শুভ্র তুষারের প্রলেপ। নিস্তব্ধ মৌন মহান হিমগিরির আন্দরে শান্ত স্বচ্ছ সবুজ সরোবর। যেন স্বর্গতোরণ।

সম্মুখে ধ্যানগম্ভীর সপ্তশৃঙ্গ পর্বতমালা। শিখর দেশ থেকে নামে হিমবাহ হেমকুন্ডের জলে। কুন্ডের চারিপাশে অজস্র প্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমল। উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে যেন দেবতার পাদমূলে নিজেদের অর্ঘ্য দেবার জন্য। সুগন্ধে আমোদিত পরিবেশ। মনে অপার শান্তি আনে।

গোলাকার হ্রদ। চওড়ায় আধ মাইলের মত। পরিধিতেও প্রায় এক মাইল। বাঁদিকে লোকপালের মন্দির। পুরানো কালীকমলি ধর্মশালা। কুন্ডের লাগাই ছোট গুরুদ্বার। হ্রদের দিকে মুখ করা একখানি ঘর। ভিতরে গুরু গোবিন্দ সিং এর ছবি। বাইরে পতাকার স্তম্ভ। গুরুদ্বারের একপাশে শিখ ধর্মশালা। পাথরের তৈরি। লম্বা সারি সারি ঘর। রান্নাঘর। ঘরের ভিতরে কার্পেট ও কম্বল বিছানো। আর একটা ঘর বোঝাই চেরাই করা কাঠ ও তক্তা। নতুন বিশাল গুরুদ্বার তৈরি হবে বলে বড় বড় ভারী লোহার বীম ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এনে রেখেছে।

কুন্ডের একটু বাঁ দিকে দেখা যায় এক ক্ষীণ জলধারা। লক্ষ্মণ গঙ্গার জন্ম হয়। রিমিঝিমি সুরে বয়ে যায় ঘাংরিয়ার দিকে। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্য। পাহাড়ীরা বলে লক্ষ্মণ গঙ্গা। শিখেরা বলেন হেমগঙ্গা। নন্দন কানন থেকে আগত ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিলিত হয় ঘাংরিয়াতে।

চোখ তুলে দেখি গিরিরাজ সপ্তশৃঙ্গকে। হঠাৎ একফালি সূর্যরশ্মি এসে পড়ে গিরিরাজের মস্তকে। এ যেন আবেগ ভরা স্নেহ চুম্বন। মেঘের ওড়না সরিয়ে নীল আকাশের নীচে হাসতে থাকেন গিরিরাজ। মাথায় তার রেশমী আলোর পরশ লাগে। দেবতার মন্দিরের রুদ্ধ দুয়ার যায় খুলে। অসংখ্য রৌপ্য প্রদীপমালায় উদ্ভাসিত হন সপ্তশৃঙ্গ। নিরাভরণ। জ্যোর্তিময়। নীলিমার বুকে ভেসে যায় ছোট ছোট মেঘের তরী। বাতাসে সরে যায় কুয়াশার ঝালর। কে যেন দেবতার মন্দিরে চামর দোলায়। অসীম আনন্দে মন ভরে। অপলক নয়নে চেয়ে থাকি।

আকাশের নীল রঙ। শ্বেত শুভ্র গিরিরাজের উজ্জ্বল রূপ। পাথরের নানা বর্ণ-বিন্যাস। প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা। সবকিছু সরোবরের স্ফটিক স্বচ্ছ জলে

প্রতিবিম্বিত হয়।

আহা কি মনোহর রূপ। কি অনুপম শোভা! এ যেন বিশ্বপ্রকৃতির নীল দেওয়ালে টাঙানো অনন্ত মহান রঙিন ছবি। প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি। পার্থিব ধন যশ মান সবকিছুই যেন তুচ্ছ বলে মনে হয়। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী জেগে ওঠে কোন এক অজানা অনুভূতির স্পর্শে।

ধীরে ধীরে জলধারার ওপর কাঠ পেরিয়ে লোকপালের মন্দিরে আসি। ছোট পাথরের মন্দির। মাথায় শ্লেট পাথরের ছাউনি। ভিতরে ছোট্ট কালো পাথরের মূর্তি। পূজারী বলেন লক্ষ্মণ মূর্তি। প্রবাদ লক্ষ্মণ নাকি এখানে দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন। পাশে আরও দুটি মূর্তি আছে। লোকপাল ও সিদ্ধিদাতা গণেশ। পূজারী মন্ত্র পাঠ করেন। দু'হাত ভরে ফুল তুলে এনে অঞ্জলি দিই। লোকপালজির পূজা হয়।

ঠান্ডায় দাঁড়াতে না পেরে কালীকমলি ধর্মশালার ঘরটিতে ঢুকি। সেখানে লোকেরা আগুন জ্বালিয়েছে। কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় ভর্তি। চোখ জ্বালা করে। ক্ষণিক আগুনের ধারে বসি। ওরা হালুয়া প্রসাদ দেয়। ভক্তি ভরে গ্রহণ করি। আগুনের তাপে শরীর গরম হয়। ঘরে মন টেঁকে না, বাইরে বেরিয়ে আসি। পূজারী দেখান কাকভূশণ্ডী শিখর। বরফের মধ্যে সেখানেও হেমকুণ্ডের মত হ্রদ আছে। সেখান থেকেই বেরিয়েছে কাকভূষণ্ডী গঙ্গা। ভুন্দর গ্রামের একটু নীচে মিলিত হয়েছে ভুন্দর নদীর সাথে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে নীলকণ্ঠও দেখা যায়।

সপ্তশৃঙ্গের এপাশে হেমকুণ্ড। ওপাশে নন্দন কানন। রতবন, ঘোড়ীপর্বত প্রভৃতি যে সকল পর্বতশ্রেণী নন্দন কাননের উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে- তারাও এই পর্বতের অংশ বিশেষ।

কাকভূষণ্ডীর কথা হতেই মনে পড়ে পুরাণের সেই অমর কাকের কথা। বরেন তাই জিজ্ঞাসা করে ওখানে গেলে কি সেই অমর কাকের দর্শন মিলবে?

পূজারী হাসতে থাকেন। বলেন পথ খুব দুর্গম। ক্বচিৎ কখনও সাধু-সন্ন্যাসীরা যান সেখানে। ভুন্দর গ্রাম থেকে দুর্গম পথ পেরিয়ে যেতে হয়। তবে বিষ্ণু প্রয়াগের পথে ঝারকুলা চটি থেকে দুর্গমতা কিছুটা কম হয়।

ঠান্ডায় খালি পায়ে আর দাঁড়ানো সম্ভব হয় না। শরীর যেন অসাড় হয়ে আসে। তাড়তাড়ি শিখ ধর্মশালায় ফিরে আসি। এক পাঞ্জাবী মেজর সঙ্গে মহিলা ও আরও অন্যান্য সেনাবাহিনীর লোক নিয়ে এখানে এসেছেন। মহিলা আমাদের ঠান্ডায়

কাঁপতে দেখে ঘরে গিয়ে বসতে বলেন। নিজে স্টোভ ধরিয়ে চা ও পকোড়া ভেজে আমাদের দেন। লজ্জা পাই। বলেন লেও বেটা। ডর মাৎ। হাত পেতে নিই। কিছুক্ষণ পরে আবার হালুয়া দিয়ে যান। আশ্চর্য এঁদের আতিথেয়তা। কম্বল চাপা দিয়ে গরম চা খেতেই শরীর বেশ সতেজ হয়।

এখানকার ধর্মশালায় কোন লোক থাকে না। যাত্রীরা নিজেরাই রান্নাঘরে ঢুকে চা ইত্যাদি অপরকে করে খাওয়ান। ঘর খুলে আশ্রয় নেন।

বেলা বাড়তে থাকে। প্রকৃতির মায়া খেলা শুরু হয়। ঝিরঝিরে তুষার পড়ে। আকাশ ম্লান হয়ে আসে। ফিরে যাবার আগে শেষ বারের মত হেমকুন্ডকে দেখি। অভিনব রূপ। কালো পাথরের উপর শুভ্র তুষারের প্রলেপ পড়ে। যেন শ্বেত চন্দনের ছিটা। ধ্যানমগ্ন ধূমায়িত গিরিরাজ। মহান নিস্তব্ধতা। স্বর্গীয় অনুপম শোভা। তারি মাঝে হাসতে থাকে স্বচ্ছ সবুজ জলধারাটি। যেন জননীর স্মিত হাসি।

তুষারে গায়ের কালো জামা নিমেষে সাদা হয়। বার বার ঝেড়ে ফেলি। মুহূর্তেই আবার ভরে যায়। এ যেন তুষার তীর্থে তুহিনের পরিধান। তবুও দাঁড়িয়ে থাকি। দু'চোখ ভরে দেখি। মনের অভিলাষ যেন আর মেটে না।

সত্যি বিচিত্র এই সরোবর! বিচিত্র এর আবিষ্কার কাহিনী। একদা শিখগুরু গোবিন্দ সিং সাধনা করেছিলেন লোকপাল হেমকুন্ডে। তাঁর রচিত "বিচিত্র নাটক" ধর্মগ্রন্থখানিতে তিনি তাঁর পূর্বজন্মের সাধনাস্থল হেমকুন্ডের বর্ণনা দেন।

"অব মৈ আপনী কথা বখানীঁ,
তপ সাধত জিহি বিধি মোহি আনীঁ।
হেমকুন্ড পর্বত হৈ জহাঁ,
সপ্তশৃঙ্গ সোহত হৈ বহাঁ।
সপ্তশৃঙ্গ তিহি নাম কহাবা,
পান্ডুরাজ জহাঁ জোগ কমাবা।
তহঁ হম্ অধিক তপস্যা সাধী,
মহাকাল কালকা অরাধী।
এহি বিধি করত তপস্যা ভয়ো,
দ্বৈ তে একরূপ হৈব গয়ো।।"

অর্থাৎ যেখানে রয়েছে সপ্তশৃঙ্গ পর্বতমালা। যার পাদমূলে পান্ডুরাজার

তপস্যাভূমি। সেই পবিত্র স্থানে তিনিও মহাকালের আরাধনা করে ঈশ্বরের দর্শন পান।

দিনের পর দিন বহু অনুসন্ধান করেও শিখরা কেউই গুরুজীর সেই সাধনাস্থল খুঁজে বের করতে পারেন নি। অবশেষে ১৯৩৬ সালে সন্ত সোহন সিং ও হাবিলদার মোদন সিং, দু'জন শিখ তীর্থযাত্রী হিমালয়ের বহু দুর্গম তীর্থ ঘুরে দুরূহ চড়াই অতিক্রম করে উপস্থিত হন হিন্দুদের অতি প্রাচীন তীর্থ লোকপাল হ্রদের তীরে। হ্রদটি দেখে তাঁরা স্তম্ভিত হন। মিলে যায় তাঁদের সাধনাস্থলের বর্ণনার সঙ্গে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন — এই তো সেই গুরুজীর সাধনাস্থল-হেমকুন্ড! এই তো সেই সপ্তশৃঙ্গ! এই পাহাড়ের পাদমূলে তো পান্ডুকেশ্বর! সেখানেই তো পান্ডুরাজা শিব স্থাপনা করেছিলেন। প্রসন্ন চিত্তে তাঁরা পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে শিখ সমাজে প্রচার করেন তাঁদের সেই নব আবিষ্কৃত হেমকুন্ডেব কথা। শিখদের বিরাট ধর্ম সভায় এঁদের যুক্তি ও প্রমাণ সমর্থিত হয়।

তারপর থেকেই শুরু হয় পুণ্যকামী শিখদের তীর্থযাত্রা। নব আবিষ্কৃত প্রাচীন পবিত্র হেমকুন্ডে। অবিশ্রামে চলতে থাকে দুর্গম চড়াই ভেঙে। সেদিন যাত্রা পথে কোন আশ্রয় ছিল না। তবুও তারা যেত আশায় বুক বেঁধে। দুর্গম পথে পা বাড়াতো গুরুজীর নাম নিয়ে-পুণ্যফল লাভের আশায়।

ক্রমে যাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। শিখদের প্রচেষ্টায় পথ সুগম হয়। যাত্রাপথের মুখে গড়ে ওঠে গোবিন্দঘাট। গুরুদ্বার তৈরি হয়। নতুন তীর্থপথে নির্মিত হয় ধর্মশালা। তাঁদের প্রচেষ্টায় পাহাড়ের সংকীর্ণ পথ প্রশস্ত হয়। গড়ে ওঠে ঘাংরিয়াতে গুরুদ্বার ও ধর্মশালা। প্রতিষ্ঠিত হয় গুরুদ্বার ও ধর্মশালা হেমকুন্ডের তীরে।

শীতে সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। নির্মল শীতল বাতাসে অস্বস্তি বোধ হয়। অরুণ তাগিদ দেয়। বরেন যেতে রাজী নয়। অপেক্ষা করতে বলে। সোমনাথ ও সুকুমার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। ঠান্ডার দেশে চলাই যে পরম আনন্দ, প্রকৃত আরাম দায়ক —সে কথাটা সে ভুলে যায়।

হঠাৎ দেখা যায় সেই বৃদ্ধ তীর্থযাত্রীকে। জরাজীর্ণ দেহ খানি নিয়ে কোন রকমে এসে পৌঁছেছেন হিমতীর্থে হেমকুন্ডের তীরে। মুখে অনাবিল হাসি। কপালে হাত ঠেকিয়ে দুহাত তুলে ধ্বনি দেন — জয় হেমকুন্ড কী জয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তালে তাল দিই। কান পেতে শুনি পাহাড়ের প্রতিধ্বনি। মনের গহনে যেন আনন্দের

প্রতিধ্বনি তোলে।

বরেনের মনেও তার দোলা লাগে। নতুন আশার আলো দেখে। উৎসাহ পায়। যেতে রাজী হয়।

হিমালয় অসীম অনাদি অনন্ত। এর রহস্যময় আকর্ষণ প্রতি নিয়তই মানুষকে আকুল করে তোলে। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার আগ্রহ মানুষের চিরদিন। রহস্যালোকের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, মানুষ তাই ঘুরে বেড়ায় জনশূন্য এই সব দুর্গম অঞ্চলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে। শাশ্বত সুন্দর হিমালয়কে দেখার নেশায়।

পথ চলতে পথিকের কষ্ট হয়। ক্ষুধার্ত। ক্লান্ত। কিন্তু বাঁক ঘুরতেই দেখে বিচিত্র রূপের পসরা। অবসাদ যায় মুছে। প্রকৃতির অনন্ত রূপের পানে চেয়ে চেয়ে বিভোর হয়। শক্তিতে বলীয়ান। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আবার উৎসাহে এগিয়ে যায় আপন অভীষ্ট পথে। প্রতিটি মুহূর্তই যেন নতুন দিগন্তের দ্বার খোলে। স্বর্গীয় সুষমার জাদু বিস্তার করে। অনির্বচনীয় রূপের ভান্ডার দর্শনে প্রাণে আনন্দের উদ্বেল জোয়ার বয়। হৃদয় কানায় কানায় ভরে।

অনাদি অনন্ত কাল ধরে মানুষ চলেছে এই বিরামহীন অভিযানে। এ চলার শেষ নেই। হিমালয়ের আহ্বান যেন অজানার আহ্বান। শত বাধাও যেন তুচ্ছ বলে মনে হয়। কোন প্রলোভনই তাকে ধরে রাখতে পারে না।

বেলা তখন ১১-১৫। আকাশ ঘন মেঘে ছায়। কুয়াশার ঘনীভূত অন্ধকার। কনকনে হিমেল হাওয়া। যেন ঘুমন্ত প্রকৃতি। পিছিল উৎরাই পথ। অতি সন্তর্পণে নামতে চেষ্টা করি। কিন্তু নিজের ভার নিজে রাখাই কঠিন। হুড়হুড় করে নামিয়ে দেয়।

আঁকাবাঁকা পথ যেন ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে দূর থেকে অনেক দূরে। নতুন আশায় বুক ভরে। ফুলের সৌরভে মন মাতায়। নন্দন কানন দেখার উৎসাহে দ্রুত গতিতে চলতে থাকি।

বেলা বেড়ে যায়। মনের উদ্বেল জোয়ারও বাড়তে থাকে। যাব সেই পুষ্প রাজ্যে। সেই প্রকৃতির হাতে সাজানো মালঞ্চে। যেখানে ঘুরে বেড়ায় নানা রঙের পাখী। নানা সুরে ডাকে। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে রঙ বেরঙের ফুলেরা হাসে। বাতাসে মাথা দোলায়। রঙিন জগৎ। রঙিন নেশায় মন যেন দুলতে থাকে। তন্ময় চিত্তে পথ

চলি।

হঠাৎ বরেনের ডাক কানে আসে। সকলে দাঁড়াই। সে কাছে আসে। বলে একটু আস্তে চল। সুকুমার এতক্ষণ নীরবই ছিল। বরেনের কথা শুনে একটু বসতে বলে। বসি। কচি শ্যামল ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর। যেন সবুজ গালিচা পাতা। আশেপাশে ইতস্ততঃ ফুলের শোভা। এ যেন প্রকৃতিরাণী ক্লান্ত পথিকের জন্য শ্যামল কোমল শয্যা পেতে রেখেছেন। জননী বসুন্ধরার কোলে মাথা রেখে ক্ষণিক শুয়ে থাকি। ঝিরঝিরে বাতাস, ফুলের সুগন্ধ, শোভনা প্রকৃতির কমনীয়তায় দু'চোখে যেন ঘুমের আমেজ লাগে। চোখ বুজতে না বুজতেই অরুণ ডাকে। আবার চলতে থাকি। দূরে দেখা যায় ঘাংরিয়ার গুরুদ্বার। বেলা তখন ১১-৪৫। আমরা ঘাংরিয়ায় এসে পৌঁছাই।

সুজয়া গুহ

রন্টি অভিযান

১৯৬৫ সাল। সিকিমের রাথং হিমবাহের নিচে তাঁবুর সারি। হলুদ, কমলা, সবুজ, নীল-কত রং এর তাঁবু। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেয়েরা এসেছে পর্বতারোহণ শিক্ষা নিতে। দার্জিলিং এর H.M.I.এই শিক্ষা পরিচালনা করে। এমনি একটা তাঁবুতে কয়েকজন বাঙালী মেয়ে-সুদীপ্তা সেনগুপ্ত, নীরা সরকার, ইন্দিরা বিশ্বাস ও আমি। বাইরে অবিশ্রান্ত ভাবে সাদা তুষার ঝোরে পড়ছে কালো আকাশের গা থেকে। তার সঙ্গে নেমে এসেছে নিস্তরঙ্গ নিকষ কালো সন্ধ্যা। আমাদের তাঁবুতে মোমের স্নিগ্ধ আলো। আমি পড়ে চলেছি 'অন্নপূর্ণা'— মরিস হার্‌জগের লেখা পর্বত অভিযানের বিখ্যাত রোমাঞ্চকর বই। ওরা তিনজনে একাগ্র হয়ে শুনছিল। ইন্দিরা হঠাৎ জ্বলজ্বলে চোখে বলে উঠল— বাংলা দেশ থেকে শুধু মেয়েদের একটা অভিযান বার করবই। বই বন্ধ করে ওদের আলোকিত চোখ আর কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম — 'তাই কি কখনও হয়? এতো শুধু স্বপ্ন।'

অন্ধকারের বুক চিরে ডুপ্লিকেট ডুন ঝম্‌ঝম শব্দ্ তুলে ছুটে চলেছে। নিদ্রাহীন চোখে আমি স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছি। আজ আমাদের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে শুরু করেছে। ১৯৬৭ সালের ৯ই অক্টোবর। আমরা নয়জন— দীপালী সিংহ (দলনেত্রী), সুদীপ্তা সেনগুপ্তা (গাইড), ইন্দিরা বিশ্বাস (সাংবাদিক), স্বপ্না নন্দী, শিলা ঘোষ, লক্ষ্মী পাল, স্বপ্না মিত্র, ডাঃ দীপক সিংহ ও আমি (ম্যানেজার) চলেছি হিমালয়ের এক দুর্গম গিরি শৃঙ্গের উদ্দেশ্যে। তার নাম রন্টি (১৯,৮৯৩)।

পরদিন রাত্রে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আমাদের সঙ্গে দার্জিলিং এর শেরপা ও ৭জন High altitude porter যোগ দিল। ১১ই অক্টোবর হরিদ্বার স্টেশনে নেমে শুরু হল আমাদের কর্মব্যস্ততা। সুদীপ্তা আর আমি আবার সব মালপত্র ও শেরপাদের নিয়ে হৃষিকেশ চললাম। ওখান থেকে জোশীমঠগামী বাস ছাড়ে। বাস রিজার্ভ ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। বাকী দল হরিদ্বার থেকে র‍্যাশনের আটা, চাল, ও চিনি কিনে বিকেলে হৃষিকেশ এল। এখানে কেরোসিন তেল ও অন্যান্য কিছু বাজার সারলাম।

১২ই অক্টোবর বাসে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, ও নন্দপ্রয়াগ পেরিয়ে দু'দিন পর এসে থামলাম বিষ্ণুপ্রয়াগে অর্থাৎ জোশীমঠে। জোশীমঠ উত্তর প্রদেশের শেষ মহকুমা শহর। নিয়মিত বাসের মেয়াদ এখানেই শেষ। গাড়োয়াল নামে পার্বত্য এলাকায় চামোলি জেলার জোশীমঠ মহকুমায় রন্টির অধিষ্ঠান।

১৪ তারিখ ভোরে স্বপ্না নন্দী, স্বপ্না মিত্র, শিলা ও আমি ধৌলি গঙ্গার তীর ধরে রিণি গ্রামে এলাম। উদ্দেশ্য কুলি সংগ্রহ। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রাম লতা, পাং, সুবাইন ও রিণি থেকে মোট ৪৩ জন কুলী জোগাড় হলো। প্রয়োজন ছিল ৭৫ জনের। আবার মালের বোঝা খুলে সাজাতে হলো। দৈনিক মাথাপিছু ৮ টাকা ও এক কেজি র‍্যাশন দিতে হবে। ৩০ কেজির বেশী মোট নেবে না। ওদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে করতে দু'দিন গেল। দীপালীরা ১৫ তারিখে এল।

আমরা ১৬ই অক্টোবর থেকে হাঁটা শুরু করলাম। রিণি থেকে ঋষিগঙ্গার প্রবাহ ধরে দক্ষিণ পুবে চলেছি। পিঠে বিরাট বোঝা। পয়ে ভারী জুতো। হাঁটব কি? পথ বলেতো কিছু নেই। খাড়া চড়াই আর উৎরাই। তাও ঘন জঙ্গলে অন্ধকার। বিছুটি পাতার কামড়ে আমরা ক্ষতবিক্ষত। এদিকে প্রচুর কাঠ বাদাম, দেওদার, জুনিপার আর একরকম টক ফলের গাছ। তাছাড়া আছে মৌরী, রশুন আর কত নাম না জানা গাছের মেলা, কত ঝোপঝাড়।

১৮ তারিখ থেকে পথ আরও ভয়ঙ্কর হলো। নদীর বুকে খাড়া দেয়াল- কখনো মাটির কখনো পাথরের। ক্রমাগত ভেঙে মাটি পাথর ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে নদীর বুকে। এই পথ আমাদের Traverse করতে হবে। কোন রকমে ধাপ কেটে এগোচ্ছি। একশ ফিট কলস্বিনী নিচেই রন্টি মদমত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। আজকে আমরা ঋষিগঙ্গার প্রধান শাখা নদী রন্টি গাধেরা ধরে সোজা দক্ষিণে যাচ্ছি। তিন ঘন্টা চলার পর সেদিনের মত ক্ষান্ত হলাম।

১৯ তারিখে— খাড়া চড়াই ভেঙে উঠছি। উঠছি ত' উঠছি। এ পথ যেন স্বর্গের সিঁড়ি। কিছু পরেই বুঝি আকাশের সঙ্গে মিশব। না, হঠাৎ থেমে যেতে হলো সামনে সুন্দর সবুজ প্রাঙ্গণ। তার চার পাশে সাদা কালো সবুজ পাহাড়ের বেষ্টনী। এই প্রান্তরে আমাদের মূল শিবির স্থাপিত হলো। জায়গাটার নাম রাজয়ের, উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট। অভিযানের এক অধ্যায় শেষ হলো।

পরের দিন আমরা পরবর্ত্তী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আরোহণের বিশেষ সরঞ্জাম পিটন, ক্যারাবিনার, দড়ি, তাছাড়া জামা, কাপড়, ফেদারকোট, প্যান্ট, দস্তানা, জুতো, জুতোর কাঁটা আরও খুঁটিনাটি কত কিছু গুছিয়ে নিতে হল। পরবর্ত্তী তিনটে শিবিরের জন্য রসদ কিছু কিছু ভাগ করে রাখলাম। কাজ যেন আর শেষ হয়না।

২১ তারিখ ভোরে সুদীপ্তা, শিলা, লক্ষ্মী ও আমি চললাম ১নং শিবির স্থাপন করতে। কি খাড়া চড়াই ভাঙতে হচ্ছে! একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি আরেকটা পাহাড় অবরোধ করে আছে। এত উঁচুতে এক নাগাড়ে চড়াই ভাঙতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। গাছগাছড়া নেই। তাই হিমেল হাওয়ার চাবুকে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। পাঁচটি পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে একটি সংকীর্ণ প্রান্তর পেলাম। এখানে ১ নং শিবির পাতলাম। উচ্চতা ১৫০০০ ফুট।

২৩ তারিখে আবার আমরা চারজনেই চললাম ২নং শিবির স্থাপন করতে। প্রথমেই একশ ফিট্ একটি দেয়াল পার হতে হলো। খাড়া বরফের দেয়াল বেয়ে উঠতে আমরা বেশ অসুবিধা বোধ করছি। নরম বরফ। তাই দড়ি আটকাবার কোন উপায় নেই। ধাপ কেটে আর তুষার গাইতি গেঁথে কোনক্রমে উঠে এলাম। দক্ষিণে তুষার মৌলী আমাদের গন্তব্য-স্থল। সেখানেই রন্টি। আমরা বারটা নাগাদ এক পাথুরে এলাকায় তাঁবু ফেললাম। ২ নং শিবির (১৬৫০০´)।

পর দিন ভোরে খাওয়া সেরে আমরা চারজন ৩নং শিবিরের স্থান নির্বাচনের জন্য ওপরে উঠতে শুরু করলাম। সেদিন প্রায় সাড়ে তিনশো ফুট উঁচু বরফের দেওয়াল বেয়ে উঠতে হলো। বরফের মধ্যে ডুবে থাকা পাথরে হোঁচট খেয়ে মাঝে মাঝে দারুণ রকম আছাড় খাচ্ছি। তাহলেও বেশ তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। আসলে আমরা বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছি।

ওপরে উঠে বরফের ঢেউখেলানো প্রান্তর বেয়ে অনেকটা হেঁটে রন্টির পাদমূলে পৌঁছলাম। শিখর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ৩নং শিবিরের জায়গা ঠিক করে ২নং শিবিরে ফিরে এলাম।

নন্দী, মিত্র, ইন্দিরা ও দীপালী ইতোমধ্যে এখানে এসে পড়েছে। খুব হৈ চৈ। শিখরে কে যাবে কে যাবে না— তাই নিয়ে এক চোট গবেষণা। সবাই সক্ষম, সবাই সাহসী, অতএব সবাই যেতে উৎসুক, লীডার ছাড়া, কারণ ওঁর উঁচুতে উঠলে Breathing trouble এর সম্ভাবনা আছে।

সমস্যা চাপা পড়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রচন্ডতায়। আকাশ ভেঙে বিরামহীন তুষারপাত শুরু হলো। তার সঙ্গে তাল দিয়ে তুষার ঝড়। আমরা তাঁবুর ভেতর আর ওপর থেকে বরফ পরিষ্কার করতে করতে ক্লান্ত, সিক্ত। হাওয়ার গর্জনে রাতে ঘুম নেই। সবসময়ে আতঙ্ক, এই বুঝি দড়িদড়া ছিঁড়ে শূন্যে অভিযান চালায়। ষ্টোভে আগুন হয়না। তাই আধ সিদ্ধ চাল, আলু আর কাঁচাজলের চা, দুধ খেতে হচ্ছে। অথচ কত রকমের খাবার সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু এই ঠান্ডায় কে বেরিয়ে এসব ব্যবস্থা করে?

২৭ তারিখ রোদ উঠল। সেদিন ৩নং (১৮২০০) শিবির স্থাপিত হলো ২৮ তারিখ ভোরে শিখর জয়ের চেষ্টা হবে।

সুদীপ্তা, লক্ষ্মী ও মিত্র ৭-৪৫ মিঃ এ শিবির থেকে বেরিয়ে হাঁটু ডোবা বরফ ভেঙ্গে ওপরে উঠতে শুরু করল। ওরা একটা ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে উঠে এল রন্টির উত্তর-পূর্ব-গিরি শিরায়। গিরি শিরাটি অত্যন্ত খাড়াই। এখানে বরফে ঢাক অসংখ্য চোরাফাটল ওদের ক্রমাগত বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। শেরপারা না থাকলে ওদের পক্ষে ফাটল এড়িয়ে এগোন অসম্ভব হত। শক্ত বরফের এলাকা সুরু হলো পা পিছলে যাচ্ছে। ওরা জুতোর কাঁটা (crampon) লাগিয়ে নিল। তাতেও গ্রিপ পাচ্ছেনা। ঠক্ ঠক্ করে বরফের আস্তর কেটে ধাপ তৈরি হলো। এই ভাবে হাত ও পায়ের যৌথ পরিশ্রমে ওরা অল্প অল্প করে এগোচ্ছে। বিপদ বুঝে পিঠে ঝোলা দড়ি খুলে নিজেদের যুক্ত করে নিল।

এর পর গিরি শিরাটির খাড়াই কমল। কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এল। দু পাশে বিরাট ফাটল মুখ ব্যদন করে আছে। সামান্য পা ফস্‌কালেই গড়িয়ে একেবারে ফাটলের গ্রাসে চলে যেতে হবে। ওরা কোনদিকে না চেয়ে শুধু পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে উঠছে। হঠাৎ বুম বুম শব্দ। ধ্বস নামছে। শেরপা সর্দার তলিয়ে গেল অনেক নিচে গিয়ে কোন ক্রমে নিজেকে রুখল। আবার ধ্বস। আবার।

তবু মেয়েরা মনোবল হারায়নি। বরং ওরা প্রকৃতির এই অদেখা রূপ, এ রণচন্ডী মূর্ত্তি উপভোগ করেছিল। কিন্তু শেরপা সর্দার বিচলিত। সে এই অবস্থা পরিণত জানে, অসংখ্য দুর্ঘটনার সাক্ষী সে। তাই সে সদস্যাদের ফিরে যেতে বলল কিন্তু ওরা রাজী নয়। শিখরের এত কাছে থেকে ফেরা চলে না। রাস্তা খারাপ শেরপারা ওপরে যেতে অনিচ্ছুক? তবে একজনকে নিয়ে যাক। ঝামেলা অনে

কম হবে,দায়িত্ব কমবে। দড়ির পেছন থেকে সুদীপ্তা নিজেকে মুক্ত করল, লক্ষ্মীকে ডেকে নিল। স্বপ্নাকে নির্দেশ দিল শিখরে যেতে। স্বপ্নার পথ চলার দিকে তাকিয়ে ওদের বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস উঠল। শিখরজয়ী রূপে ওদের নাম উঠবেনা। শিখর মাত্র দু'শ ফিট দূরে। যাক্ একজন সফল হলেও দলের সফলতা।

স্বপ্না মিত্র, পাসং ও দাতেনজিং এর সঙ্গে দড়িতে যুক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ঘন তুষারপাতে চারিদিকে অন্ধকার। এবড়ো খেবড়ো পাথরে হোঁচট খেতে খেতে উঠছে। তিনটে ফিক্স্ড রোপ করতে হলো। ২-৪৫ মিঃ শিখরে উঠে দাঁড়াল ওরা তিনজন। অসীম আনন্দে স্বপ্না জাতীয় পতাকা, ক্লাব ও মনিমেলার পতাকা গাঁথল। ধূপ জ্বালল। ১০ মিঃ পরে নেবে এল।

খবর পেয়ে ২নং শিবিরে আনন্দের প্লাবন। আজ আমাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক। পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো— বাংলার মেয়েদের শিখর জয়ের কাহিনী।

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

খাটলিং বাসুকীতাল

খাটলিং হিমবাহ দেখতে যাবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। পায়ে হেঁটে খুব একটা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট না করেই গাড়োয়াল কুমায়ুনের দুটো হিমবাহ পিন্ডারী আর গঙ্গোত্রী দেখতে আজকাল প্রতি বছরই প্রায় হাজারখানেক হিমলায়- প্রেমী গিয়ে থাকেন। আমিও গিয়েছি। সম্প্রতি বছর পাঁচ সাত ধরে খাটলিং হিমবাহ দেখতে মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবরা কেউ কেউ যাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পর্যটন দপ্তরও কিছুদিন আগে এই হিমবাহ দেখার জন্য একদল পর্যটককে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা গিয়েছেন এ পথে, তাঁদের কাছে শুনি এই পথে এখনো দর্শকের ভিড় হয় নি। খুব আনন্দে শান্তিতে ঘুরে আসা যায় এক অপরূপ রূপজগতে। মনে ইচ্ছা বাড়ে। পরে আবার শুনি পরিচিত কয়েকজন খাটলিং হিমবাহ দেখতে গিয়ে ফেরার পথে বাসুকীতাল হয়ে কেদারনাথ দেখে ফিরেছেন। শুনে আরো উৎসাহ বাড়ে। ১৯৮৩ সালে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হয় আমরা খাটলিং হিমবাহ যাবো টেহরী হয়ে। আর ফিরবো বাসুকীতাল কেদারনাথ হয়ে। যাবার দিন ঠিক হয় নভেম্বরের আট তারিখ। বর্ষার উপদ্রব কাটিয়ে ভালো শুকনো দিনে পথ হাঁটা যাবে। ঠান্ডা হয়তো একটু হবে কিন্তু ভেজা জামা জুতো নিয়ে হাঁটার থেকে সেটা ভালো। একটু দেরীতেই পথে নামবো।

কিন্তু বিধি বাম। যাত্রার দিন পাঁচেক আগে জানা গেল আমি কর্মক্ষেত্র থেকে ছাড়া পাচ্ছি না। উপায় নেই। ভবিতব্যকে মেনে নিতেই হবে। আট তারিখ রাত্রের ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম ছয়জন সঙ্গীকে। আমার যাওয়া হলো না। পাহাড়ে যাবার দিন স্থির করে যেতে না পারলে বড়ই কষ্ট। ট্রেনে আমার ব্যর্থটা খালিই গেল বটে কিন্তু মনটা চললো ওদেরই সাথে।

সব ঠিকঠাকই চলছিল-আটই নভেম্বর বেরিয়ে দশ তারিখ সকালে হরিদ্বার হয়ে হৃষীকেশ। এবং সেদিনই দুপুরের বাস ধরে বিকেলের আগেই টেহরী পৌঁছেছে ওরা ছয়জন। নভেম্বরের অল্প ঠান্ডায় টেহরীকে খুব একটা খারাপ লাগেনি। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই একটা থাকার জায়গা জোগাড় হয়েছে। বাজার থেকে দিন

দশেকের প্রয়োজনীয় চাল, আটা কিনে মুড়ে নেওয়া হয়েছে পলিথিনের ব্যাগে। পরদিন সকালেই বাস। পথে কিছু পাওয়া যাবে না। দিন আট-দশ পথে থাকতে হবে। কাজেই তাঁবু, স্টোভ, কেরোসিন খাবার-দাবার-লটবহর নেহাত কম নয়। প্রায় মাঝ রাত অবধি ওরা ব্যস্ত বাঁধাবাঁধির কাজে। তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতে না ঘুমোতেই রাত কখন ভোর হয়ে গেল-চা খেয়ে আলস্য কাটিয়ে ছুটোছুটি। বাসে মাল তোলা। জায়গা রাখা। ব্যস্ততা। তবু তার মধ্যে আনন্দ আছে। আর আছে নতুন পথের আকর্ষণ।

দুপুর নাগাদ বাস ঘামশালি হয়ে ঘুট্টু পৌঁছেছিল। আগেকার যুগে লোকে যখন পায়ে হেঁটে চারধাম পরিক্রমা করতো তখন গঙ্গোত্রী থেকে ফেরার পথে ভাটোয়ারীর কাছে মাল্লা থেকে পাওয়ালির চড়াই ভেঙ্গে দিনতিনেকে পৌঁছুতো এই ঘুট্টুতে। ঘুট্টু থেকে পথ ত্রিযুগীনারায়ণের। এবং তারপর সাধারণ পথে কেদারনাথ। আজকের গতির যুগে আর কেদারের যাত্রীরা আসেন না এ পথে। ঘুট্টু এখন একটা আর পাঁচটা সাধারণ পাহাড়ী গ্রামের মতই একটা গ্রাম। হতশ্রী দরিদ্র অপরিচ্ছন্ন। দিনে একটা বাস যায় আসে টেহরী থেকে। ন'মাসে ছ'মাসে আসে খাটলিং দর্শনেচ্ছু দু'একদল যাত্রী। স্থানীয়দের খুব একটা মাথাব্যথা নেই তাদের নিয়ে।

ছয় বন্ধু এসে উঠল ঘুট্টুর ডাকবাংলোতে। বাসে আসার সময়েই ঘামশালিতে নেমে দলনেতা সোমেন মজুমদার এই বাংলোয় থাকার অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছিল। কাজেই থাকার কোন অসুবিধা নেই। মালপত্র তুলে রবি আর তাপস লাগলো রান্নাবান্নার কাজে। সোমেন, অশ্রু চৌকিদারের সঙ্গে আলোচনায় বসলো, জনাছয়েক পথ চেনে এমন ভারবাহক জোগাড়ের চেষ্টায়। দেবাশিস আর সুভাষের দায়িত্ব মালপত্র নতুন করে বাঁধাছাঁদা করার।

সন্ধ্যের মধ্যেই ভারবাহকের ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেল। ওরা খুশী। ওরা পথপ্রদর্শক হিসাবে যাকে চাইছিল সেই উমীদ সিংকে পাওয়া গিয়েছে। আর পাওয়া গিয়েছে জয়পাল সিংকে। ভাল স্বাস্থ্য। এ পথে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছে বিভিন্ন দলের সাথে। এরা দুজন আবার নিজেদের পছন্দমত অন্য চারজনকে নিয়ে এসেছে। এ পথে যেতে এরা সবাই রাজী। ক্ষেতখামারে এখন কাজ নেই। শীত এসে যাচ্ছে। অলস গতিতে চলেছে গাড়োয়ালের জীবন। অথচ নগদ অর্থের প্রচুর

প্রয়োজন আজকাল। খেয়ালী বাবুদের কল্যাণে যদি গায়ে খেটে কিছু উপার্জন করা যায় মন্দ কি? তবে দাবি একটাই। সাহেব-ওপরে তাকিয়ে দেখ, ছোট ছোট পাহাড়ের ওপরেও বরফ জমেছে। শীত এসে গিয়েছে হিমালয়ে; বরফ-সর্দি-ঠান্ডা। তোমাদের মতো আমাদের জুতো নেই-কাপড় নেই, তার তো একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয়।

ব্যবস্থা করাই ছিল। বেরোলো তাদের জন্য আনা বাটার জুতো, সোয়েটার কয়েকটা স্লিপিং ব্যাগ। তার ওপর কালো চশমা। এবার সবাই খুশী। কোই ফিকির নেহি। সবেরে আট বাজে চলনা।

তিরাশী সালের বারো তারিখে ঘুট্টু ছাড়লো বারোজনের দল। হেমন্তের নীল আকাশ। এত পরিষ্কার নীল সচরাচর দেখা যায় না। মধ্য নভেম্বরের চড়া রোদকেও এই উচ্চতায় খুব মিষ্টি মনে হয়। পথে লোকজন বিশেষ নেই। সরু পায়ে চলা পথ। ওপরে গোটাকয় ছোট ছোট গ্রাম আছে, তাদের প্রয়োজনেই এই পথের সৃষ্টি। সাধারণ চড়াই। ঘন জঙ্গল। হঠাৎই ঘন জঙ্গলের বাঁকে ভেসে ওঠে নীল আকাশের বুকে নাম না জানা পর্বতশিখর। ওরা খুশী। ওরা আনন্দিত। লোকজন কোলাহলমুক্ত এক অপরূপ আনন্দ জগত।

দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে গেল পথে। রিহ্‌, গাঙ্গী আর খারশালিতে রাত কাটিয়ে চতুর্থ দিন বিকেলে ওরা এসে তাঁবু খাটালো চৌকীর মাঠে। সুন্দর পরিষ্কার বিকেল। নীল আকাশের বুকে সামনে বিশাল থয়লাসাগর শিখর দাঁড়িয়ে আছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে। তারপরে দেখা যাচ্ছে রুদ্রগয়ড়া শৃঙ্গ। খাটলিং হিমবাহ এখানে একটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গিয়েছে। এ পথে এগোলে ওই রুদ্রগয়ড়ার পাশ দিয়ে গিয়ে নামা যায় গঙ্গোত্রীর পথে। ওখানে একটা গিরিপথ আছে। বছর পঞ্চাশেক আগে এখানে জরীপের কাজে এসেছিলেন অডেন সাহেব। তাঁর নামেই এই গিরিপথের নাম 'অডেনস কল'। তিনি এ পথেই এসেছিলেন গঙ্গোত্রী উপত্যকা থেকে খাটলিং উপত্যকায়। সারা বিকেল ধরে চারধার দেখা। নানা আলোচনা। আনন্দ। ওরা এবার খাটলিং-এর পথে না গিয়ে দুধগঙ্গা হিমবাহের পথ ধরবে। একটু পুবদিকে এই পথ ধরে দুটো ছোট হিমবাহ হ্রদ মসুর আর পানাতাল পার হয়ে পৌঁছবে বাসুকীতাল। এবং তার পরদিন কেদারনাথ। নভেম্বরের শেষে হয়তো কেদার মন্দির এখন বন্ধ। পরিত্যক্ত। তা হোক গে। ওদের তাতে অসুবিধা হবার

কথা নয়। সকলেই হিমালয় ভ্রমণে অভিজ্ঞ। জনাচারেকের আছে পর্বতারোহণে প্রশিক্ষণ। মাঝ নভেম্বরের হিমালয়ে আবহাওয়া খুব পরিষ্কার। শেষ রাতে একটু বরফ পড়ে। চলার পথে দশ-বারো হাজার ফুট উচ্চতায় যেন একটা সাদা চাদর বিছানো-তা হোক, এ সময়ে পথ চলে আনন্দ। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। গাছপালা বর্ষার পরে এখনো সবুজ সতেজ। রাস্তাঘাটে নেই জোঁক কিংবা ধসের উপদ্রব। সবাই খুশী। খুব খুশী।

চৌকীর থেকে পথের বাধা আসতে আস্তে প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। নরম বরফ কখনো কখনো হাঁটু অবধি ঢুকে যায়। পিঠে বোঝা নিয়ে এই বরফের চড়াই ভাঙ্গা সত্যি কষ্টকর। পায়ে হান্টার জুতো। অল্প বরফে হয়তো এই জুতোয় কাজ চলে। কিন্তু পা যেখানে বরফে ঢুকে যায় সেখানে মনে অস্থিরতা বাড়ে। উপায় না দেখে সাথে আনা প্লাসটিক শীট কেটে পা মুড়ে নেবার ব্যবস্থা হয়। অন্তত জুতোর ভেতরে যেন বরফ না ঢোকে। পাটাকে বাঁচানো চাই।

চলতে যতই অসুবিধা হোক, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া খুব পরিষ্কার। কাজেই ফেরার কথা কারো মনেই উঁকি দেয়নি। শুধু চলার গতি হয়েছে ধীর। ভারবাহকের দল হয়েছে ক্লান্ত। চৌকি থেকে ভবা গিয়েছিল একদিনে পানাতালে পৌঁছানো যাবে— কিন্তু না, সেই পথ অতিক্রম করতে লেগেছে তিনদিন। সবাই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। সাথে আনা খাবার শেষ। ভারবাহকের দল আর পারছে না পরিশ্রম করতে। বরফ বরফ আর বরফ। হাঁটুভর বরফ ঠেলতে ঠেলতে সবাই প্রায় সহ্যশক্তির শেষ সীমায় উপস্থিত।

যাই হোক, সেদিন ওদের বাসুকীতাল পৌঁছানোর কথা দিনের শেষে। এবং জানে রাতটা কাটালেই উতরাই পথে কেদারনাথ। কেদারে কিছু না পাওয়া যাক আজকাল গৌরীকুন্ড অবধি বাস পাওয়া যায়। সরাসরি ওখানে নেমে যাওয়া যাবে আর তাহলেই উষ্ণ আহার। বিশ্রাম। কয়েক ঘন্টাতো মোটে কষ্ট। সহ্যই করা যাক।

কিন্তু চলার পথে চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হঠাৎ সোমেনের খেয়াল হয় রবি খুবই পিছিয়ে পড়েছে। যেন হাঁটতেই পারছে না। কোনরকমে অনেক কষ্টে পা তুলছে, ফেলছে। কি হলো ওর? অশ্রুকে নিয়ে সোমেন দাঁড়িয়ে পড়লো। তাপস, দেবাশিস, সুভাষ এগোলো ভারবাহকদের ধরতে। তারা এগিয়ে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে কয়েকজনের থাকা দরকার।

আধঘন্টা লাগলো রবির **সোমেনদের** কাছে পৌঁছুতে। এক টুকরো পাথরের ওপর ধপাস করে বসে পড়লো সে— **আমি** আর পারছি না— আমার পা দুটো যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। দারুণ **যন্ত্রণা। আমি** আর চলতে পারছি না।

উদ্বিগ্ন সোমেন বরফের মধ্যে থেকে ওর পাটা টেনে বের করলো। একি তোমার পায়ের প্লাসটিক শীট বাঁধোনি! রবি আমতা আমতা করে বললো, সকালে চেষ্টা করেও বাঁধতে পারিনি। তোমরা সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত ছিলে বলে আর বিরক্ত করিনি। অশ্রু রবির জুতো খুলতে যাচ্ছিল— সোমেন বাধা দিল— যা করার ক্যাম্পে গিয়ে হবে এখন জুতো খুললে রবিদা হয়তো আর জুতো পায়ে গলাতেই পারবে না। যা হবার হয়েছে-ওঠো হাঁটতে তোমাকে হবেই। পা ঠুকে ঠুকে চলো। চেষ্টা করো জুতোর মধ্যে আঙুলগুলোকে খেলাতে। ওঠো-চলো। সোমেন এখন দলনেতা। অনেক চিন্তা দায়িত্ব তার।

আবার চলা শুরু। রবির কষ্ট হচ্ছে। চলতে পারছে না। উত্‌রাই পথে টলতে টলতে নামা। সামনে সোমেন পথ দেখায় পেছনে অশ্রু তার টাল সামলাচ্ছে। বেশ বোঝা যায় রবির নিজের পায়ের ওপর কোন দখল নেই। সোমেন বলে রাত হয়ে আসছে— রবিদা একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করো। কিন্তু কাকে বলা। অসহায় রবি ভট্টাচার্য হাতড়ে হাতড়ে নামার চেষ্টা করে কোনরকমে আর তারই মাঝে হঠাৎ আঁধার নেমে আসে চারদিক কালো করে। কালো আকাশের পটভূমিকায় দু' একটা তুষার-শিখর হয়তো দেখা যাচ্ছে— কিন্তু দেখার মন তখন আর কারো নেই।

খানিক পরে হাঁটা অসম্ভব হয়ে উঠলো। অন্ধকারে কে পথ দেখাবে। কোথায় যাবে। সোমেন বুক ভরে দম নিয়ে এগিয়ে ডাকতে লাগলো-তাপস তাপস! মিনিট পনেরো পরে ঘন আঁধারের বুকে টর্চের আলো দেখা গেল। বরফের মধ্যে টর্চ নিয়ে এসেছে তাপসরা সঙ্গীদের খোঁজে এবং তাঁদের সাহায্যে রাত আটটা নাগাদ তারা সবাই পৌঁছুলো বাসুকীতালের পাশে। কিন্তু হ্রদ কোথায়। সব জমে বরফ। যেন একটা সাদা চাদর দিয়ে কেউ মুড়ে দিয়েছে পুরো এলাকাটা। বরফ ছাড়া একফালি জায়গাও চোখে পড়ে না।

অন্ধকারের মধ্যেই হাতে হাতে তাঁবুগুলো খাটিয়ে ফেললো ছেলেরা। কিচেনে ষ্টোভ জ্বালিয়ে বরফ গলিয়ে কফি তৈরি হলো। এদিকে ম্যাট্রেশ ফুলিয়ে রবিকে শুইয়ে তার পা থেকে জুতো খোলার চেষ্টা করেও বিফল হলো সকলে। পা অসম্ভব

ফুলে গিয়েছে। উপায় নেই। শেষে জুতো কেটে খুলতে হলো। পায়ের অবস্থা দেখে চমকে উঠল সোমেন। সর্বনাশ যা হবার তা হয়েছে। পা কোথায়। কাঠকয়লার মতো কালো হয়ে গিয়েছে আঙুল সহ দুপায়ের পাতা, গোড়ালী। তুষার ক্ষত। হা ভগবান!

সে রাতটা কাটলো কোনরকমে। সাথে যা ওষুধপত্র ছিল সেগুলো ব্যবহার করা হলো ঠিকই। কিন্তু সবাই জানে ক্ষত এত গভীর যে এগুলো তাতে কোন উপকারেই লাগবে না। পরদিন সকাল থেকেই চেষ্টা চললো জনাচারেক দিয়ে রবিকে যদি নামানো যায় কেদারে। কিন্তু রবির ভারী শরীর ভারবাহকরা নিয়ে বাসুকীতাল থেকে প্রাথমিক চড়াই ভেঙ্গে গিরিশিরার ওপর উঠতে ব্যর্থ হলো বারবার। ওদেরও দোষ নেই। গত দু'-দিন কেটেছে অনাহারে। এত বরফে চলাফেরা করতে তারা অভ্যস্ত নয়। সারাদিনে দুশো ফিট চড়াই ভাঙ্গা গেল না। হাল ছেড়ে দিয়ে আবার তাঁবু খাটানো হলো। নভেম্বরের একুশ তারিখ। তাঁবুর ভেতর শুয়ে রবি কষ্ট পাচ্ছে। দ্রুত শীত নেমে আসছে হিমালয়ে। খাবার কেরোসিন সব শেষ। অতঃ কিম!

তাপস দেবাশিস সুভাষের বয়স কম। অভিজ্ঞতা প্রায় নেই-ই। কাজেই সোমেন আর অশ্রুই খোলাখুলি আলোচনা করলো। বর্তমানে ভারবাহকদের দিয়ে রবিকে নামানোর উপায় নেই। একমাত্র উপায় কেদার কিংবা গৌরীকুন্ডে গিয়ে নেপালী কান্ডিওয়ালা যদি পাওয়া যায় নিয়ে এসে একে নামানো। এদিকে খাবার-দাবার নেই। সবাই এখানে অনাহারে অপেক্ষা করে লাভ নেই। রবির সঙ্গে একজন থাকবে-বাকিরা নেমে যাবে। সম্ভব হলে উমীদ আর জয়পাল কিছু কেরোসিন আর খাবার নিয়ে উঠে আসবে। রবির কাছে থাকবে অশ্রু। সোমেন দলনেতা। অনেক অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বও অনেক। নিচের ওই ছুটোছুটি সে অনেক ভালোভাবে করতে পারবে।

বাইশ তারিখ সকালে ওরা সবাই নেমে গেল। অশ্রু আর রবি সেই বিরাট শ্বেতসাম্রাজ্যে। একফোঁটা কেরোসিন নেই। নেই কোন খাবার। অল্প কিছু বাদাম, কর্ণ-ফ্লেকস। এক টিন জমানো দুধ। এই তাদের সম্বল। কিন্তু জল! তার কি হবে!

অনেক খুঁজে তিনটে আধপোড়া মোমবাতি পাওয়া গেল। কিন্তু মোমবাতি জ্বেলে তো বরফ গলিয়ে জল করা সম্ভব নয়। কি করা যায়। অশ্রু অনেক রকম

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলো প্রেসার কুকারে নরম বরফ ভরে বন্ধ করে যদি রোদে রেখে দেওয়া যায় ঘন্টা দেড়েক, সেই বরফ গলে জল হয়ে যায়। তারপর সেই তিনটে মোমবাতি জ্বালিয়ে মগে করে সেই জল একটু গরম করে কফিগুলো খেলেই চলে। মন্দ নয়।

সারাদিন এই করেই কাটলো। এবং পরদিনও। তেইশ তারিখ বিকেল চারটে নাগাদ ফিরে এলো উমীদ আর জয়পাল। সাথে টিন ভরে কেরোসিন। কিছু চাল-ডাল-চিনি-সিগারেট। সঙ্গে সোমেনের চিঠি। সোমেন জানিয়েছে, ওরা সেদিন বেলা চারটে নাগাদ কেদারনাথে পৌঁছেছে। পুরো কেদার পরিত্যক্ত। জনহীন। শুধু মন্দিরের একজন পাহারাদার কোন কারণে ছিল। তার কাছেই ওরা রাত কাটিয়ে প্রায় মধ্যরাত্রে যাত্রা করে সকাল আটটায় পৌঁছেছে গৌরীকুন্ডে। কিন্তু কপাল খারাপ। গৌরীকুন্ডও জনহীন। কোন নেপালী ভারবাহক পাওয়া যায়নি। ভারত সেবাশ্রমও কোন সাহায্য করতে পারে নি। উপায়ান্তর না দেখে ও সরাসরি নেমে যাচ্ছে দেরাদুন। বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে চব্বিশ না হলেও পঁচিশ নভেম্বর ও যেমন করেই হোক রবিদাকে নামানোর ব্যবস্থা করবেই। চিন্তা করবে না। সঙ্গী ভারবাহকেরা দেশে ফিরে যেতে চাইছে। তাদের ও ছেড়ে দিয়েছে। শুধু উমীদ আর জয়পালকে রাজী করিয়ে কিছু মালপত্র দিয়ে পাঠালো। ওরা দুদিন থাকবে অশ্রুদের সঙ্গে।

চিঠি পেয়ে মন খারাপ হলে কাউকে দোষ দেবার নেই। গত আটচল্লিশ ঘন্টা ভাবা গিয়েছিল কান্ডি নিয়ে কয়েকজন ধোতিয়াল ভারবাহক আসবে। রবিকে নিয়ে ওরা সরাসরি নামতে পারবে লোকালয়ে। কিন্তু এই চিঠি উদ্ধারের সেই প্রাথমিক আশা নিবিয়ে দিল। রবি কিন্তু খুব একটা হতাশ হলো না। হাত বাড়িয়ে বললো-একটা সিগারেট তো দাও অশ্রুদা। তিনদিন সিগারেট খাইনি। দারুণ কষ্ট হচ্ছে।

পরদিন অশ্রু উমীদ আর জয়পালকে নিয়ে হেলিকপ্টার নামার একটা জায়গা তৈরি করলো। তারপর তার কাছাকাছি রবিকে বয়ে আনা হলো। নতুন করে খাটানো হলো তাঁবু। এবং শবরীর প্রতিক্ষা। যদি সোমেন পারে মুক্তির দূত কোন হেলিকপ্টারকে পাঠাতে। বেলা তিনটে নাগাদ একবার যেন একটা আওয়াজও পাওয়া গেল। কিন্তু না একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে উড়ে গেল একটা বিমান। হেলিকপ্টার নয়। আবার হতাশা গ্রাস করলো ওদের।

পঁচিশ নভেম্বরও সকাল থেকে এরা তাকিয়ে আকাশের দিকে। কিন্তু না কোন আওয়াজ চিহ্ন কিছুই নেই। বেলা এগারোটা নাগাদ অশ্রু বেরোলো উমীদ আর জয়পালকে নিয়ে। বাঁচার অন্য কোন রাস্তা যদি খুঁজে পাওয়া যায়। জমাটবাঁধা বাসুকীতালের দক্ষিণের বরফ ঢাকা গিরিশিরার ওপর ওরা ধীরে ধীরে উঠে এলো বেলা বারোটা নাগাদ। এধারে প্রায় হাঁটুভর নরম বরফ, উঠতে কষ্ট। কিন্তু চড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠে অবাক হবার পালা। আরে উল্টোদিকে তো ছিঁটেফোঁটা বরফের চিহ্নও নেই। খয়েরী রংয়ের পাথরের ঢাল। বোল্ডার। সবুজ ঘাস। নীচে-অনেক নীচে যেন মানুষের চলাফেরা। গ্রামের চিহ্ন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা। আরে তোমরা জানো— ওটা কোন্ গ্রাম।

উমীদ জয়পাল অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে— তারপর বলে ওটা বোধহয় ত্রিযুগীনারায়ণ। মন্দিরটাও দেখা যাচ্ছে। রাস্তাও তো খুব একটা কষ্টকর মনে হচ্ছে না। অশ্রু মনে মনে উল্লসিত হয়। বরফ নেই। আলোচনায় ওরা দুজন রাজী হয়। হ্যাঁ, এপথে রবিকে নিয়ে নামা যাবে। আমরা কাল সেই চেষ্টাই করবো। এভাবে আর থাকা যায় না।

অশ্রু খুশী মনে ফিরে আসে তাঁবুতে। ওরা দুজন ওখানেই একটা বড় পাথরে বসে গাঁজা ধরায়। তা খাক। ওদেরও তো একটা উদ্বেগ চলছে। একটু হালকা হওয়া দরকার।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা সব হিসেব পালটে গেল। সোমেনের হেলিকপ্টার পঁচিশ তারিখেও এলো না। উল্টে ওরা দুজন জানালো রবিসাহেব খুব ভারি। তাকে নিয়ে কারো পক্ষেই এতটা পথ নামা সম্ভব নয়। এদিকে শীত এসে যাচ্ছে। খাবার দাবার ফুরিয়েছে। অনুমতি দাও। ওরা কাল সকালে নেমে যাবে। ঘরে বৌ-বাচ্চা আছে। তাদের প্রতি কর্তব্য আছে। ওরা অনির্দিষ্টকাল কিভাবে এই বরফের রাজত্বে বসে থাকে। ওরা আর পারছে না।

যুক্তি তর্ক কিছুরই কোন প্রয়োজন নেই। সত্যি তো নিজেদের জন্য ওদের জীবন বিপন্ন করতে বলার অধিকার কারো নেই। অশ্রুরা স্তব্ধ হয়ে তাদের কথা শুনলো। তাহলে তাই হবে।

রাত্রে অশ্রু বসে একটা চিঠি লিখলো গৌরীকুন্ডের ভারত সেবাশ্রমের স্বামীজীর কাছে অনুরোধ জানিয়ে, সেই চিঠি আমাদের সংগঠনের কোলকাতার

ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। আর নিজের রুকস্যাকেপ্লাসটিক কাগজে মুড়িয়ে রাখলো দুঁজনের পরিচয়, কে কেন কি অবস্থায় এখানে এসেছে সব জানিয়ে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

আর পাঁচটা দিনের মতোই ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লো ছাব্বিশে নভেম্বর জমাট-বাঁধা বাসুকীতালের ওপর। শান্ত সমাহিত চারদিক। কোনো আওয়াজ নেই। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় বরফ ফাটার শব্দ। একঘেয়েমীর মধ্যে সেটাই বৈচিত্র্য। অশ্রু তাঁবুর সামনে মাথা উঁচিয়ে থাকা পাথরটায় বসে সিগারেট খায়। তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে নীল আকাশে ভেসে যাওয়া সাদা মেঘ দেখে রবি। কোন চিন্তা কোন উদ্বেগ আজ আর তাদের নেই। ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে দুজনেই।

বেলা এগারোটা নাগাদ অপরাধীর মত মুখ করে উমীদ আর জয়পাল এসে দাঁড়ালো। কষ্ট ওদেরও লাগছে কিন্তু উপায় নেই। সাহেবরা অপরাধ নেবেন না। আর পারছি না। অনুমতি করুন নেমে যাই উষ্ণ জীবনের মাঝে। এই হিম শীতলতা আর সহ্য হয় না।

রবি একবার বললো অশ্রুদা তুমিও নেমে যাও ওদের সাথে। বুক ফেটে কান্না আসছিল। অশ্রু কোন জবাব দিল না। ভারত সেবাশ্রমের চিঠিটা দিল ওদের হাতে। ওরা হাত মেলালো। তারপর উমীদ আর জয়পাল মাথা নীচু করে বরফ ভাঙ্গতে লাগলো। বোঝা যাচ্ছিল ওদের চোখেও জল।

এদিকে সোমেনরা গৌরীকুন্ড থেকে সরাসরি দেরাদুনে এসে যোগাযোগ করেছে সেখানকার সেনাবাহিনীর দপ্তরে। কিন্তু কপাল খারাপ, ২৪ তারিখ কোন হেলিকপ্টার পাওয়া যাবে না। সেনাবাহিনীর প্রধান এই অঞ্চলে আসছেন-সবাই ব্যস্ত। তবে পঁচিশ তারিখ তারা অনুসন্ধান চালানোর আশ্বাস দিল। পঁচিশ তারিখ সকাল থেকে সেই দপ্তরে সোমেন হাজির। বেলা এগারোটার সময় খবর পেলো বেরিলি থেকে হেলিকপ্টার যাত্রা করেছে, যোশীমঠ হয়ে যাবে উদ্ধার কাজে। খাওয়া-দাওয়া ভুলে সে সেখানে অপেক্ষা করছে— কোন খবর নেই। কি হলো! রাত নটা নাগাদ খবর এলো উদ্ধার কাজ বাতিল করা হয়েছে। জীবনের কোন লক্ষণ সেই সাদার রাজত্বে পাওয়া যায়নি। ওখানে কেউ নেই।

সোমেনের প্রায় পাগল হবার উপক্রম। সে কি করে হয়। ওরা যাবে কোথায়। ও সরাসরি গিয়ে হাজির হলো সেই কর্ণেলের কাছে। আর একবার চেষ্টা করা

হোক। আমি স্থিরনিশ্চিত তারা আছে। তবে তোমার চালকরা ঠিক জায়গা বুঝতে পারেনি। অনুমতি দাও আমি সেই যানে থেকে তাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবো। ফেরত নিয়ে আসবো আমার দুই সঙ্গীকে। আমি তাদের কথা দিয়েছি।

সরকারি বাঁধাবাঁধি অনেক। তবু সেই ভদ্রলোক সোমেনের দৃঢ়তায় বোধহয় খুশী হলেন। বললেন ঠিক আছে তুমি কাল সকাল ছটার মধ্যে বেরিলিতে গিয়ে রিপোর্ট করো। আমি এর মধ্যে দিল্লী থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাবে নতুন অনুসন্ধান পার্টিতে।

সোমেন বেরিয়ে এলো মিলিটারি ছাউনি থেকে। ঘড়িতে রাত দশটা। ভোর ছটার মধ্যে বেরিলি পৌঁছুবে কি করে। এক ট্যাক্সী ড্রাইভার বললো যেতে পারে কিন্তু ভাড়া দিতে হবে নশো টাকা। অত টাকা কোথায় পাবে। শেষে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ড্রাইভার সব শুনে বললেন চলো তোমাকে নাজিয়াবাদে নিয়ে গিয়ে দুন এক্সপ্রেস ধরিয়ে দেব। তাহলে পাঁচটার মধ্যে বেরিলি পৌঁছুবে। তাই হলো। তাপস আর সোমেন ট্যাক্সী নিয়ে নাজিয়াবাদ হয়ে বেরিলি পৌঁছুলো ভোর সাড়ে চারটেয়। তারপর স্টেশনে সেনাবাহিনীর দপ্তরে যোগাযোগ। ওদেরই গাড়ীতে ত্রিশ কিলোমিটার দূরের ছাউনিতে যাওয়া। আটটা নাগাদ দিল্লীর অনুমতি পাওয়া গেল। অল্পবয়সী পাইলট কফি খাওয়ালো সোমেনকে। তারপর উঠে বসলো হেলিকপ্টারে। ওরা প্রথমে যাবে যোশীমঠ। সেখান থেকে তেল ভরে নিয়ে বাসুকীতাল। তবে যাত্রা শুরুর আগে সে বললো— মজুমদার তুমি আমাদের একটা আইন জানো তো? সোমেন বললো— কোন্ আইন বলছো। মাথায় টুপি আঁটতে আঁটতে সে বললো— এই হেলিকপ্টারে আমরা কিন্তু মৃতদেহ তুলি না। সোমেন একটু থতমত খেলেও বললো তোমার আইন আমি ভাঙ্গতে বলবো না কিন্তু দেহে প্রাণ আছে কিনা সেটা দেখার একটা সুযোগ কিন্তু আমার চাই।

রবি বসেছিল আধশোয়া ভঙ্গিতে তাঁবুর ভেতর, অশ্রু বাইরে পাথরে। দূরে উমীদ, জয়পাল বরফের গিরিশিরার ওপর ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। ঠিক সেই সময় একটা গুর গুর আওয়াজ। ওরা থমকে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত ফিরে আসতে লাগলো। অশ্রু উঠে দাঁড়ালো। নীল আকাশের বুকে মাছির মত ছোট কালো চিহ্ন। আসতে আসতে বড় হচ্ছে। নীচে নামছে। বোঝা যাচ্ছে হেলিকপ্টার। রবি দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো ম্যাট্রেশে— বাবা।

এর পরের গল্প খুব দ্রুত। হেলিকপ্টারে সোজা বেরিলি। মিলিটারী-বেস হাসপাতাল। কোলকাতায় আমরা টেলিগ্রাম পেলাম। ওরা এলো ঊনত্রিশ তারিখে। এই শরদিন্দু রক্ষিতই ব্যবস্থা রেখেছিলো। আমরা রবিকে একবার বাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে সরাসরি গেলাম নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে। তিনজন চিকিৎসক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন রবির জন্য। সাহায্য করেছেন সকলে। একটানা সাত মাস চিকিৎসার পর তিনবার অস্ত্রোপচারে দুপায়ের দশটি আঙুল খুইয়ে ছাড়া পেয়েছেন রবিদা। প্রায় স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করছেন। অফিস যাচ্ছেন এবং বেড়াতে যাওয়ারও কমতি নেই। ইচ্ছে আছে একবার কেদারে আসার।

শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

থোরাং পেরিয়ে মুক্তিনাথ

সঠিক পথের দু'দিকে পাথর সাজিয়ে রাখা আছে। বড় পাথরের পর ছোট আরও ছোট করে চূড়ার মতন করা। দেখলেই বোঝা যায়- মানুষের হাতের কাজ এগুলো। খুব সম্ভব কোন ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে আছে প্রথাটার সংগে! সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার ডানহাতি একটা চড়াই ভাঙছি— মিনিট দশেকও হয়নি-দেখলাম পাথরের ওপর কে চক দিয়ে লিখে রেখেছে-'ওয়েলকাম টু থোরাং'। মনটা ছলাৎ করে উঠল। সংগে সংগেই ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই রসিকতা- এত তাড়াতাড়ি, এখনও সকাল দশটা বাজেনি- থোরাং পৌঁছে যাবার কথা তো নয়। আমরা থাকতে থাকতেই দু'একজন শ্বেতাংগ পৌঁছে গেল সেখানে- ওদের সংগেও কোন পথপ্রদর্শক নেই। একই প্রশ্ন ওদের মনেও। আমার যা মনে হয় বললাম। না, এত তাড়াতাড়ি থোরাং পৌঁছে গেছি বলে, আমিতো অন্তত ভাবতে পারছি না। এটাও অবশ্য একটা ছোট গিরিপথের মতোই দেখতে-'৭৭-এর অভিযাত্রীদের মুখে শুনেছি-ওরা একটা গিরিপথকে থোরাং বলে ভুল করেছিল, এটা সেটাই হবে হয়তো। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একসারি বরফচূড়া ঝক্‌ঝক্ করছে- মানস্‌লু হিমাল। একটু বিশ্রাম নিয়ে হাঁটা শুরু।

থোরাং যে পার হইনি এটা বোঝা গেল সহজেই-কারণ থোরাং- এর পরে মুক্তিনাথ অব্দি একটানা উৎরাই। কিন্তু আমরা এখনও তেমন কোন উৎরাই দেখছি না। ছোট গিরিপথের মতো জায়গাটাকে পেছনে রেখে একটু বাঁদিকে ঘুরতে হোল আমাদের-সামনে একটা বরফচূড়া যেন কয়েকশ' ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে- পথেও কিছু কিছু বরফ পড়ে আছে- পায়ে চলা পথ বেয়ে একটু নীচে নেমে একটা ঝরনা পার হতে হোল এবার।

ঝরণার ধারে চাকলা চাকলা বরফ পড়ে আছে-তবে জলও আছে। চিড়েটা খেয়ে নিলে কেমন হয়? জলে ধুয়ে চিনি দেওয়া হোল চিড়েতে-কিন্তু এমন বিতিকিচ্ছিরী রকমের ঠান্ডা— যে কেউই বিশেষ খেতে পারল না। নদীটা পার হয়ে আবার একটু চড়াই- খুব খাড়া অবশ্য নয়- এবং এইরকম ভাবেই- কখনও একটু চড়াই-

কখনও একটু উৎরাই করে পথ চলা।

মিঠু রোজ সবচেয়ে আগে এগিয়ে যায়— আজ ও পেছিয়ে পড়ছে বারে বারে। আমরা বসে বিশ্রাম নিচ্ছি— কিন্তু এতটা বিশ্রামের হয়তো দরকার হোত না। একবার তো একটু ঝিমুনিও এসে গেল। ইতিমধ্যে আমরা একটা বরফচূড়ার একেবারে পাশ দিয়ে হাঁটছি- বরফচূড়াটা রয়েছে আমাদের ঠিক বাঁদিকে। আবার একটু বিশ্রাম। নীচে এর আগের বাঁকটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে-কিন্তু মিঠু এখনও এসে পৌঁছয়নি ওখানে। বসেই আছি- মিঠু এল- ওর চলা ফেরায় খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে - রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? না, ওই তো উঠছে আবার- রুকস্যাকটা পিঠে নিয়ে আবার চলতে শুরু করেছে। ফলে আমরাও উঠে পড়লাম আবার।

একটু হাঁটার পরে দু'জন শ্বেতাংগ পেছন থেকে এসে ধরে ফেলল আমাদের- তোমাদের বন্ধু বোধহয় অসুস্থ বোধ করছে- হাঁপাচ্ছে- জানিয়ে গেল তারা। আবার বসে পড়লাম— মিঠু আসুক তারপরেই এগুবো। এখন প্রায় একটা বাজে-কুলিরা এগিয়ে গেছে-যাওয়াও সম্ভব নয়- যে করেই হোক সামনেই যেতে হবে আমাদের। আর তো খুব দূরেও নেই আমরা থোরাং থেকে- যে কোন মুহূর্তেই হয়তো পেয়ে যাব আমাদের লক্ষ্যস্থলটাকে- কিন্তু ঠিক কত দূরে আছে সেটা, ঠিক কতক্ষণ লাগবে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে কেউ জানি না আমরা- বলে দেবার মতোও কেউ নেই। আজ নারাদের দলটা চোখের আড়াল হবার পর পেছন থেকে আমাদের টপকে চলে গেছে সব মিলিয়ে জনা পাঁচেক মানুষ। ওপাশ থেকে কেউ আসেনি থোরাং পেরিয়ে— অন্তত আমাদের চোখে পড়ে নি কেউ।

প্রায় দু'টো নাগাদ একটা চড়াই- এর মাঝামাঝি একটা পাথরের ওপর পাঁচ হাজার মিটার লেখা দেখলাম। পাঁচ হাজার মিটার মানে ষোল হাজার চারশো ফুট, আরও প্রায় চোদ্দশ ফুট চড়াই বাকী। হাঁটছি-হেঁটে চলেছি— ঝলমলে রোদটা আর নেই- কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশের পাহাড়— আশ্চর্য সৌন্দর্য যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার আড়ালে। কিন্তু এসব আর তেমন করে নাড়া দিচ্ছে না যেন। এখন একটাই চিন্তা- থোরাং পার হতে হবে- একটাই লক্ষ্য থোরাং গিরিপথ।

যারা পর্বতাভিযানে যায়— তাদের শুনেছি এরকম হয়। আশেপাশের ওপর তেমন নজর থাকে না। যে পর্বতচূড়ায় পৌঁছাবার জন্যে রওনা হয়- পৌঁছয় হয়তো

দু'একজন- কিন্তু পুরো দলটাই উন্মুখ হয়ে থাকে সেই মুহূর্তটার জন্যে, যে মুহূর্তে পর্বতচূড়ায় প্রোথিত হবে দলের পতাকা— সাফল্যের মালা গলায় দুলবে দলের। আমরা নিতান্ত পদযাত্রী, চারপাশ দেখতে দেখতে পথ চলা, দেখা আর চলাটাই আসল— লক্ষ্য একটা থাকে বটে, কিন্তু সেটাই মুখ্য নয়।

এর আগে পনের হাজার অব্দি ওঠার অভিজ্ঞতা আছে আমাদের, ঘাংরিয়া থেকে হেমকুন্ড একদিনে পাঁচ হাজার ফুট ওঠা আর নামা, ওপরে কতক্ষণই বা ছিলাম। তাছাড়া সংগে পথপ্রদর্শকও ছিল সেবারে। এত ওপরে আসার কথা কিছুদিন আগেও ভাবি নি, এবারে রওনা হয়েও ভেবেছি- পারব তো? মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হবে না তো?

আর কিছুক্ষণ পরেই সতেরো হাজার সাতশো চৌষট্টি ফুট উঁচু একটা গিরিপথ পার হব আমরা, ঠিক কখন জানি না, জানি না এর পরে চার-পাঁচ ঘন্টা উৎরাই পথে পুরো পাঁচ হাজার ফুট নেমে কখন মুক্তিনাথে গিয়ে পৌঁছব-? (আসলে বাইশে অক্টোবরের বিকেলে ঠিক কি ভেবেছিলাম সেটাও আজ আর মনে পড়ছে না!) যতদূর মনে পড়ছে— আমরা হাঁটছিলাম- চারপাশে পাহাড়গুলো আর তেমন উঁচু লাগছে না- পাশের বরফচূড়াটা অবশ্য প্রায় ঢেকে গেছে- কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে- তা যেন অনেকটাই আমাদের চোখের সামনে- মাথাটা সোজা রেখেই দেখা যাচ্ছে— চোখ তুলে দেখার তেমন দরকার হচ্ছে না।

পথটা ইতিমধ্যে প্রায় সমতল হয়ে এসেছে— চারপাশে বোল্ডার-ছোট বড় মাঝারি আকারের পাথর ছড়ানো ছেটানো— তারই মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ-অন্তবিহীন পথ। হঠাৎ নজরে পড়ল বড় আকারের কয়েকটা পাখী। আকারে প্রায় শকুনের মতো, কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর- অনেকটা পায়রার মতো। আমি একটু এগিয়ে এসেছি- পাখীগুলো আমায় দেখে উড়ে গেল আকাশে— মনে হোল কোন জরুরী আলোচনায় বাধা পড়ল ওদের। আর একটু এগিয়ে— হঠাৎ দু'টো লম্বাটে গিরিশিরার মাঝে একটা প্রশস্ত রাজপথের মত থোরাং গিরিপথ নজরে পড়ল আমার।

কাউকে বলে দিতে হোল না- এর আগে যা দু'একটা গিরিপথ পার হয়েছি- তার সংগে এটার মিলও নেই তেমন- তবু মন বলল পৌঁছে গেছি— আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি আমরা। একটু পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম- একটা পাথরের স্তূপ-

মানুষের তৈরী ওপরে তিব্বতী সাদা ধর্মপতাকা উড়ছে- তার ঠিক পরে রাস্তাটা অনেক নীচে নেমে গেছে। আর সন্দেহের কোন অবকাশই নেই— গিরিপথের ওপাশে ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কৃষ্ণা-টুম্পা আর মিঠু— হাত আকাশে তুলে ওদের অভ্যর্থনা জানালাম— আমরা থোরাং গিরিপথের ওপরে পৌঁছে গেছি।

কিন্তু বেশিক্ষণ আনন্দ করার সময় কই? বিকেল হয়ে আসছে— চারপাশে মেঘে ঢেকে গেছে— আলো আর তেমন নেই। আর ঘন্টা তিনেক আগে এখানে পৌঁছতে পারলে আমাদের পেছনে অর্থাৎ দক্ষিণে অন্নপূর্ণা আর গঙ্গাপূর্ণার শিখররাজি, দক্ষিণপূর্বে মানস্‌লু আর পশ্চিমে অর্থাৎ আমাদের যাত্রাপথের ডানদিক ঘেঁষে ধওলাগিরি হয়তো দেখা যেতো, দেখা যেতো চার পাশেই অনেক নামী, অনামী শিখর। রোদের তেজ আর আশে পাশে বরফ থাকলে কালো চশমাটাও খুব দরকারী মনে হোত। তা, সেসব আর হোল না। থোরাং— এর ওপরে দাঁড়িয়ে বরফচূড়া দেখার সুযোগ আর হোল না। সেই পাথরের স্তূপটাই একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইল আমাদের থোরাং পার হবার।

এবার নামার পালা। চারটে নাগাদ শুরু করেছিলাম— এবং প্রায় কোন দিকে না তাকিয়ে দেড় ঘন্টাটাক দৌড়ে নামলাম- উৎরাই পথ বেয়ে। পথ কোথাও বেশ খাড়া- কোথাও কম-কদাচিত সমতলও। ধীরে ধীরে কুয়াশায় ঢেকে যেতে লাগল চারপাশ- আবার হঠাৎ একসময় কিছুক্ষণের জন্য কুয়াশা কেটে একটু রোদও উঠল। বাঁদিকে একটু দূরে একটা পাথরের পাঁচিল-মাথাটা মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা— ডানদিকে একটা খাদ— আমরা নেমে চলেছি তো চলেইছি-চারপাশ ভাল করে দেখারও সময় নেই। আলো থাকতে যতটা নেমে পড়া যায় ততই মঙ্গল। আবার ঢেকে গেল চারদিক-আলোটা বেশ কমে গেল— পথরেখা ঝাপসা হয়ে আসছে। আমরা একসংগেই ছিলাম সবাই, একটু দাঁড়ালাম। তেষ্টা পাচ্ছে-ওয়াটার বটলে জল আছে কি? হ্যাঁ, একটাতে জল আছে খানিকটা- ছিপি খুলে জল খেতে গেল টুম্পা। কই জল পড়ছে না তো? পড়বে কি করে? জল যে জমে বরফ হয়ে গেছে। সে জল না হয় না খেলেও চলবে-কিন্তু হাঁটা বন্ধ করলে চলবে না।

অন্ধকার হয়ে গেছে। আলো চাই এবার। দু'টো টর্চ আছে আমাদের কাছে-কিন্তু কোনটাই জ্বলছে না। ছ'টা ব্যাটারী সংগে নিয়ে বেরিয়েছিলাম- পথে চামসেতে দু'টো কিনেছি কিন্তু গতকাল ফেদিতে আসার সময় অনেকটা পথ টর্চ জ্বালিয়ে

আসতে হয়েছে-তাঁবুর মধ্যেও জ্বালাতে হয়েছে অনেকক্ষণ- ফলে দু'টো টর্চই অকেজো হয়ে পড়েছে। এখন উপায়? রুকস্যাকে প্যাড আছে। প্যাডের কাগজ ছিঁড়ে মুড়ে নিয়ে জ্বালাবার চেষ্টা করলাম-কিন্তু চারপাশের জমাট বাঁধা কুয়াশায় কাগজ ভিজে যাচ্ছে-ধরছে না ভাল করে। মিঠু একটু অসুস্থ আজ-বমি করল-আলো নেই-ঠিক এই সময় বরফপাত শুরু হোল। এগুতে তো হবেই, অন্ধকারে আন্দাজে এগুচ্ছি-ভরসা এই, রাস্তাটা তেমন বিপজ্জনক নয়-হয় শুধুই নামা নয়তো সমতল। কিন্তু পথরেখাটাতো দরকার- রাস্তা হারিয়ে ফেললে কোন আঘাটায় গিয়ে পৌঁছবো কে জানে?

হঠাৎ দূরে ছোট্ট একটু আলো দেখা গেল। কৃষ্ণা চেঁচিয়ে উঠল 'হেল্প' 'হেল্প'- আলোটা মনে হোল এগিয়ে এল একটু। কিন্তু খুব বেশি নয়। পথে আলো নেই-আমি একবার হড়কে খানিকটা নীচে চলে গেলাম- আবার আন্দাজেই উঠে এলাম পথে। মিনিট কয়েক আলোর দিকে হাঁটার পরে- আবছা অন্ধকারে দুজন ভদ্রলোক নজরে এলেন। একজনের কপালে একটা টর্চ লাগানো আছে- এরা জার্মান,কাল থোরাং পার হবেন বলে এখানে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন। খানিকটা সাহায্য পেলাম এঁদের কাছে-কিছুক্ষণ পথ দেখালেন আলো ধরে-। শুনলাম আমাদের কুলিদের সংগে দেখা হয়েছে এঁদের। খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বললেন-সামনে হাঁটলে একটা চা-এর দোকান পেয়ে যাব।

ধন্যবাদ দিয়ে এগুলাম। কিন্তু এগুবো কি করে-অচেনা রাস্তায় একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাঁটা যায়? এই সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। টুম্পার গায়ে একটা লাল উইন্ডচিটার ছিল-আবছা আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল তা থেকে। অতি প্রাকৃতিকতায় তেমন বিশ্বাস নেই আমার-নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে এর পেছনে-কিন্তু সেই আলোটুকু আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভূত ভরসার সৃষ্টি করেছিল এটাও ঠিক। টুম্পাকে সামনে রেখে আবছা অন্ধকারে পথ চলছি। কৃষ্ণা মিঠু পেছিয়ে পড়ছে-দু'একবার হোঁচট, আছাড় ইত্যাদিও জুটছে পদযাত্রার ফাউ হিসেবে। কৃষ্ণা আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না- জঙ বাহাদুরের নাম ধরে চেঁচাতে শুরু করে দিল- এবং কি আশ্চর্য- একটু দূরে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে উঠে আসতে দেখলাম একজনকে। কাছে এলে দেখলাম সে জঙ বাহাদুরই বটে।

এবার পথ দেখাচ্ছে জঙ বাহাদুর। নিভে যাওয়া কাঠটাকে ফুঁ দিয়ে অগ্নিশিখা তৈরী

করছে জঙ- সেই আগুনের শিখাতে পথ কয়েক পা নামছি আমরা, আবার নিভে যাচ্ছে কাঠখানা, আবার ফুঁ-আবার অগ্নিশিখা- এবং সেই শিখায় আবার কয়েক পা পথ চলা। ঠিক কতক্ষণ এভাবে চলেছিলাম বলতে পারব না- ঘড়ি দেখিনি, দেখলেও মনে নেই- তবে সেই জার্মানদের ছেড়ে আসার পরে আধঘন্টার বেশি কিছুতেই নয়- হয়তো আধঘন্টাও নয়।

ইতিমধ্যে খুব ছোট একটা পাথরের আড়ালের সামনে দাঁড়িয়েছি আমরা। মালপত্রগুলো বাইরে রেখে রক আর জঙ দুই বাহাদুরে মিলে ওই পাথরের আড়ালটার নীচে একটা আগুনের কুন্ড জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকছিল, আমাদের ডাকে জঙ বাহাদুর উঠে গেছে।

তখন বরফ পড়ার গতিটা আরও বেড়েছে। আমাদের বিছানা, পিট্টুর ওপরে বেশ বরফ জমে গেছে। বরফ জমতে শুরু করেছে আমাদের রুকস্যাকের ওপরেও, তবে হাঁটছিলাম বলে তার পরিমাণ অল্প। কিন্তু কাঠে ফুঁ দিয়ে তো বেশিক্ষণ চলবে না, অন্য উপায় বার করতে হবে।

আচ্ছা, মশাল জ্বাললে কেমন হয়? দু'একটা লাঠি আছে আমাদের সংগে। পাহাড়ে হাঁটতে গেলে লাঠি নিতেই হবে এমন কোন কথা নেই-তবে মাঝে মাঝে হাতে লাঠি থাকলে ভালই লাগে। পথে লাঠি হারিয়েও ফেলেছি কয়েকবার, আবার একটা জুটেও গেছে। সেইরকম একটা লাঠির মাথায় ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো হোল। ছেঁড়া ন্যাকড়া তো সংগে থাকবেই, রান্নার কাজে লাগছে না? কেরোসিনও আছে সংগে-ন্যাকড়ায় কেরোসিন ঢেলে মশাল তৈরী, দেশলাই জ্বেলে দিতেই আলোয় আলো। আঃ! কতক্ষণ আলো দেখিনি মনে হচ্ছে।

ব্যাস, এবার তরতর করে নেমে চলা-জঙ বাহাদুর আর রক বাহাদুর আগে আগে, তারপরে আমি- হাতে মশাল-তারপর লাইন দিয়ে বাকী তিন অভিযাত্রী। কারও মুখে বিশেষ কথা নেই- টুম্পা যে টুম্পা-প্রায় যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কথা বলতে পারে- সেও চুপ করে গেছে। কৃষ্ণা রাগারাগি করছে না, মিঠু কারও পেছনে লাগছে না-সে এক অবস্থা!

কিন্তু মশাল যে ক্রমশ নিভে আসছে-কতক্ষণই বা হেঁটেছি-মিনিট পনেরো-কুড়ি হবে। এবার? ছেঁড়া ন্যাকড়া তো আর নেই হাতের কাছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া নেই তো কি হয়েছে? গামছাটাই ছিঁড়তে হবে-তেমন পুরোনো নয় গামছাটা কিন্তু তখন আর

সেটা ভাবলে চলে-? গামছাটা লম্বালম্বি ছিঁড়ে দু'টুকরো করা হোল্, একটা টুকরো রেখে দিলাম- আবার যদি দরকার হয়। অন্য টুকরোটা এবার কেরোসিনের জ্যারিকেনে ঢুকিয়ে ছিলাম-তেলটা ভাল করে লাগাতে হবে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। স্রেফ হাতের আন্দাজে কাজ করা। তেলে ভেজা গামছার টুকরো জড়ানো হোল লাঠির মাথায়। শক্ত করে বাঁধতেও হোল-খুলে না যায়-হাত কেরোসিনে মাখামাখি। মশাল জ্বালিয়ে আরও খানিকটা পথ এগুনো গেল-ঘড়ি দেখলাম প্রায় আটটা বাজে। বরফে পথরেখা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে-কখনও সামনের থেকে কখনও পেছন থেকে আলোটা ভাল করে দেখানোর আবেদন আসছে- এবং শেষ অব্দি এই মশালটাও নিভল।

একটা বেশ বড়-সড় পাথর পড়ে আছে রাস্তার ধারে। একটা মানুষ কোনক্রমে গুঁড়ি মেরে যেতে পারে তার খাঁজে। রক বাহাদুর ঢুকে গেল খাঁজটায়। মৌজ করে একটা সিগারেট ধরাল। এবং কষে একটা টান মেরে বলল- আমি আর যাচ্ছি না। বলে কি লোকটা? যাচ্ছো না মানে? এখানে থাকবে কোথায়-মরে যাবে যে? ছ-ছ'টা লোক রাত কাটাব কি করে? কেন এই পাথরের খাঁজে? কিন্তু ওখানে তো আর একজনেরও জায়গা হবে না। সে না হলে আর কি করা? রক বাহাদুর এক পাও যেতে রাজী নয়। আচ্ছা পাগল তো! বোঝালাম, একটু বকাবকিও করলাম- রক বাহাদুর কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে-বরফও পড়ে চলেছে সমান তালে। কি ভাগ্যি জঙ এখনও হুঁশে আছে-ও যেতে রাজী। ফলে আবার মশাল তৈরী-রক বাহাদুর-আর তার পিঠের মালপত্র-তার ভেতরে শ্লিপিং ব্যাগ দুটোও রয়েছে-ফেলে রেখে-আমাদের অগ্রগমন। বিছানাটা অবশ্য জঙবাহাদুরের কাছেই আছে-কম্বলগুলো আছে তাতে, এইটুকুই যা ভরসা। কিন্তু একসময় শেষ মশালটাও নিভে গেল-মশাল জ্বালাবার মতো ন্যাকড়া-গামছা আর কিছুই তো নেই হাতের কাছে। তাহলে এবার জামাকাপড়েই কেরোসিন ঢালতে হয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জঙ বাহাদুর ঘোষণা করল-সে রাস্তা চিনতে পারছে না। খুব একটা চমকে উঠেছিলাম কি? অধিক শোকে এবার আমাদের পাথর হবার মতো অবস্থা।

নিভু নিভু মশালের আলোয় যেটুকু দেখতে পাচ্ছি-একটা প্রায়-সমতল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা-আশেপাশে অজস্র বোল্ডার-কোন কোনটা বেশ বড়; তার

আড়ালে একত্র লোকে কোনরকম করে বরফের ছোঁয়া বাঁচিয়ে-বসেও থাকতে পারে হয়তো-কিন্তু এভাবে পাঁচ পাঁচটা প্রাণীর একটা গোটা রাত কাটাবার কথা চিন্তা ও করতে পারছি না। নিভন্ত মশালে আরও খানিকটা কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলাম-যে করেই হোক রাস্তা খুঁজে বার করো জঙ। জ্বলন্ত মশালটা হাতে করে একবার চারপাশটা ঘুরে এল জঙ বাহাদুর-ফিরে এসে বলল-রাস্তা পেয়েছি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

রাস্তা তো পাওয়া গেল-আলো কোথায়? হঠাৎ মনে পড়লো- পিট্রুতে একটা কুপি আছে আমাদের। কুপি মানে একটা ছোট শিশির মাথায় একটা টিনের চাকতি কোনক্রমে লাগানো আর একটা ন্যাকড়া পাকিয়ে টিনের চাকতি ছেঁদা করে শিশিটার মধ্যে ভরে দেওয়া।

এই অভিনব কুপিটারও একটা ইতিহাস আছে। মোমের খরচ কমাবার জন্যে একটা লোহার তৈরী কুপি এনেছিলাম আমরা-গত বছর পিথোরাগড়ে কেনা। পিসাং অব্দি সংগে ছিল সেটা- কেরোসিন ভরে ব্যবহার করতাম-আবার কেরোসিন হ্যারিকেনে ঢেলে পিট্রুতে ভরে নিতাম। পিসাং-এ যে বাড়ীতে উঠেছিলাম সে বাড়িতেও একটা কুপি ছিল-জঙ বাহাদুর আমাদেরটাও সে বাড়ীরই হবে ভেবে পিসাং-এই ফেলে এসেছে সেটা। বিকেলে মানাং-এ পৌঁছে কুপির খোঁজ করে যখন জানা গেল, সেটা পিসাং-এই ফেলে আসা হয়েছে-তখন রাস্তা থেকে একটা শিশি আর টিনের চাকতি কুড়িয়ে এই দ্বিতীয় কুপিটা তৈরী করা হয়। তেল ভরে জ্বালানো হোল সেটা। দিব্যি জ্বলল।

এবারে আমার হাতে মশালের বদলে কাঁচের কুপি-সামনে জঙ বাহাদুর পেছনে অন্যেরা। সব কষ্টেরই শেষ আছে-খানিক পরে জঙ বলল এসে গেছি- কি দেখে বলল কে জানে? এবং একটু পরে দেখলাম আমরা একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। রাত তখন পৌনে দশটা।

জার্মান ভদ্রলোক আমাদের বলেছিলেন মিনিট পনেরো হাঁটলে পাওয়া যাবে চা-এর দোকানটা। আমরা সেটা পেলাম বোধহয় সাড়ে তিনঘন্টা পরে। এই সময়টা সবটাই হেঁটেছি এমন নয়। মশাল তৈরী করতে, রকের সংগে ঝগড়া করতে-অন্ধকারে বরফ গলে ভিজে যাওয়া রাস্তাও পা টিপে টিপে হাঁটতে-সময় নষ্ট হয়েছে অনেক। হয়তো রাস্তা মাঝে ভুলও করে থাকবো। তবে দিনের আলোতেও এই পথটা আসতে

ঘন্টা দেড়েক লাগারই কথা। শুনেছি থোরাং থেকে মুক্তিনাথ চার ঘন্টার পথ। ওদের চার ঘন্টা আমাদের সাধারণত পাঁচ ঘন্টা হয়েই যায়, তবু যদি চার ঘন্টাও ধরি তা হলেও এই পথটুকু দেড় ঘন্টার কম হতেই পারে না-কারণ পরের দিন মিনিট পঞ্চাশের মধ্যেই আমরা মুক্তিনাথ পৌঁছে গেছলাম। কিন্তু সে তো কালকের কথা। আজকের কথাটাই শেষ হোক আগে!

ঘরটা কাঠের। আমরা দরজায় ধাক্কা দিতে, ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল কেউ। আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। আবছা অন্ধকারে যেটুকু চোখে পড়ল-ঘর ভর্তি লোক। দু'টো চৌকি-টেবিল-মেঝে-এমনকি টেবিলের তলাতেও লোক শুয়ে। দরজার ঠিক উল্টোদিকে-এক নিউজিল্যান্ডবাসী দম্পতি মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে ছিলেন ঘেঁষাঘেষি করে। আমাদের আওয়াজ পেয়ে ভদ্রমহিলা উঠে বসেছেন,পাঁচজন তো দূরের কথা-একজনেরও শোয়ার জায়গা হবে না এখানে-আর এ ব্যাপারে সেই পঞ্চাশোর্ধ মহিলাটির কোনই দায়িত্ব নেই- তবু আমাদের অবস্থা দেখে ভদ্র মহিলার মুখে যে অসহায় ভাব ফুটে উঠল সেটার বোধহয় কোন জাত নেই। কোথায় নিউজিল্যান্ড। কোথায় নেপালের এক দুর্গম অঞ্চল, আর কোথায় পশ্চিম বাংলা-সেই মুহূর্তে মহিলাটিকে একেবারে আমাদের মা-মাসির মতোই মনে হচ্ছিল। ঘর ভর্তি লোক-অনেকে অস্বস্তি বোধ করছেন আমাদের কথা ভেবে-কিন্তু এতগুলো লোককে জায়গা দেবে কি করে? বড় ঘরটার পাশে - একটা ছোট্ট ঘরে দোকানের মালকিন শুয়েছিলেন- আরও দু'একজনের সাথে-সেখানে অন্তত মেয়েরা বসে কাটাতো পারতো - কিন্তু ভদ্রমহিলা রাজী নন তাতে।

একটু জল চাইলাম। শুনলাম জল নেই।

তখন একজন বলল-আপনারা তাঁবুটায় থাকতে পারেন। তাঁবু? তাঁবু কোথায়? ঘরটা থেকে বেরুলেই দেখতে পাবেন। আর ওখানে একটা ওয়াটার বটলে জলও পাবেন একটু।

সত্যিই তাই। - ঘরের সামনে একটা ছোট উঠোন। তারই গা ঘেঁষে একটা উঁচু জমি-জমিতে একটা তাঁবু খাটানো। আমরা মালপত্র সহ-অর্ধেক তো ওপরে রক বাহাদুরের কাছেই পড়ে আছে- ঢুকে পড়লাম সেই তাঁবুটার মধ্যে। তাঁবুটার ভেতরে মেঝেটা একটু জল জল ছিল- খুব একটা পরিষ্কারও নয়। তা, তখন আমাদের কাঁরা-আকাঁড়া বাছ বিচার করার মতো অবস্থা নয়। যাই হোক এক্কেবারে আকাশের

তলায় তো শুতে হচ্ছে না।

কুপিটা তাঁবুর বাইরে একটা পাথরের উপর রাখলাম-তাঁবুর দেওয়াল ভেদ করে যেটুক আলো ঢুকছে- তাতেই কাজ সারতে হবে। প্লাস্টিকটা বিছিয়ে হোল্ডলটা খুলে ফেলা হল- হোল্ডলের পাশেই ফ্ল্যাপটা খুলে দিয়ে সেখানে টুম্পা আর কৃষ্ণার জায়গা করা গেল- আর ওদের মাথার কাছে, প্লাস্টিক কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি আর মিঠু। শোয়ার আগে সকালের রুটি দুটো দিয়েছি জঙ বাহাদুরকে- দোকানের দরজার গোড়ায় একটু জায়গা করে নিতে পারবে ও-এক ঢোক করে জল খেয়েছি-আর জুতো-মোজাটা খুলেছি কোন রকমে। ব্যাস আজ আর কোন কাজ নয়। টিন খুলে বিস্কুট বার করার মত শক্তিও আজ আর অবশিষ্ট নেই মিঠুর। রুকস্যাক হাঁটকালে হয়তো খেজুর কি আমসত্ত্বও মিলতে পারতো একটু-সেটাও আর খেয়াল হল না কারুর। গ্লুকোজের বাক্স খুলে শক্তি আহরণের মত শক্তিও নেই। এখন শুয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়াপদের কথা ভাবাই যাচ্ছে না।

বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভিজে ভিজে ঠেকল। বালিসের কাছে জল ছিল একটু- বোঝা গেল সেটা ক্রমবর্ধমান। হাওয়া বালিসের ওয়ারটা ভিজে গেছে একেবারে। জল টপ্ টপ্ করে পড়ছে তাঁবুর নানা জায়গায়। আপাতত মাথাটা বাঁচানো দরকার-টুম্পাকেএকটু সরে শুতে বললাম-মাথাটা যাতে তুলে দিতে পারি হোল্ডলের বিছানাটায়-আর তাতে কৃষ্ণার ঘুমটা গেল ভেঙে। জল পড়ছে ওর গায়েও। আমাদের দুজনেরই কম্বল বেশ ভিজে গেছে-আমারতো প্যান্টটাও বেশ ভেজা। কিন্তু ভেজার জন্যে আলাদা কোন ঠান্ডা লাগছে না-এই যা সুবিধে। টুম্পা-মিঠু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আহা ঘুমোক, সেই সাড়ে চারটেয় উঠে আর তো বিশ্রাম পায় নি তেমন। কৃষ্ণা ইতিমধ্যে উঠে বসেছে-চেষ্টা করছে টুম্পার গায়ে যাতে জল না পড়ে-হাত দিয়ে জলের ফোঁটা ধরে-ফেলে দিচ্ছে অন্যদিকে। আমিও আধশোয়া-কখনও জেগে কখনও আধঘুমে। মাঝে মাঝে জলের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কম্বলের শুকনো অংশ খুঁজে বেড়াচ্ছি গায়ে দেব বলে। জল পড়েই যাচ্ছে-টুপ্-টাপ্—টুপ্-টাপ্। আর এইভাবেই কেটে গেল একটা রাত। আসলে সব রাত্তিরই তো শেষ হয়!

২৩ অক্টোবর-শেষ রাত্রের দিকে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম-তাঁবুটা প্রায় বরফে ঢাকা। পরে জেনেছি-তাঁবুর বরফ ঠিক মত

ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে জলও কম পড়তো ভেতরে, আর তেমন তেমন বরফপাত হলে বরফের ওজনে তাঁবু ছিঁড়ে যেতে পারতো। তা এতসব না জেনেই-ভেতর থেকে একটু ধাক্কা মেরে বরফগুলো নীচে ফেললাম-আলো এল তাঁবুর মধ্যে,মিঠুকে ডেকে দিয়ে চেন খুললাম তাঁবুর। বাইরে প্রায় ইঞ্চি দশেক বরফ জমে আছে-। জুতো মোজা পরে বাইরে এলাম। কুপিটা নিভে গেছে-টিনের ঢাকনাটার ওপর নৈবেদ্যের চূড়োর মতো বরফ জমে আছে। আমাদের কেরোসিনের জ্যারিকেনটা একটা ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল তাঁবুর বাইরে-ঝুড়িটা বরফে ঢেকে গিয়ে কিম্ভূত দেখাচ্ছে। আবার ঢুকলাম তাঁবুর ভেতরে,পিট্টু আর রুকস্যাক দুটো বার করলাম টেনে-মালগুলো দোকানে নিয়ে গিয়ে রাখা যাক-মিঠু আর কৃষ্ণাকে বললাম-বিছানাটা বেঁধে ফেলতে।

দোকানের লোকজন তখন সব উঠে পড়েছে। আমাদের কালকের অভিজ্ঞতা শুনে সবাই খুব অবাক। নিউজিল্যান্ডের মাসিমা তো দারুণ অ্যাডভেঞ্চার বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। টুম্পাও ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে দোকানে-ওকে দেখে তো ভদ্রমহিলা হৈ হৈ করে উঠলেন একেবারে। ওঁরা ছাড়া দোকানে শুয়েছিল একজন নেপালী যুবক-সে মুক্তিনাথের দিক থেকে থোরাং পার হবে বলে এসেছে। নিউজিল্যান্ড দম্পতিও তাই। নেপালী ছেলেটির সংগে কোন কুলি নেই-সে একেবারেই একলা। তবে অন্যদের সাথে দু'জন কুলি আছে। আর কাল রাত্রের সেই জার্মান ভদ্রলোকদের দু'জন কুলি রাত্রে দোকানে ছিল, ওদের একজনেরই ওয়াটার বটলের জল খেয়েছি আমরা।

বরফ তখনও পড়ে যাচ্ছে একটানা-তবে মনে হচ্ছে-রাত্রের চেয়ে গতিবেগটা কম। আজ থোরাং পার হওয়া খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার-ওখানে নিশ্চয়ই দু'তিন ফুট বরফ পড়ে গেছে এতক্ষণে। ওঃ, যদি আমরা কাল থোরাং পার হতে না পারতাম-যদি আর একটা দিন দেরী হয়ে যেতো কোথাও -তাহলে নিশ্চয়ই ফেদি থেকেই ফিরে যেতে হোত আমাদের।

মিঠু আর কৃষ্ণা ততক্ষণে দোকানে এসে পড়েছে। বিছানা প্রায় সবটাই কম বেশি ভেজা। তবু বেশি ভেজাগুলো দিয়ে একটা বোঁচকা করেছে ওরা। এখন কিছু খাওয়া দরকার। কৃষ্ণা আর মিঠু আসার আগেই আমি আর টুম্পা একটা করে চা খেয়ে নিয়েছ-এরপর বিস্কুট-দোকানের আর আমাদের টিনের। এবং ফাঁকে ফাঁকে চা।

সেদিন সকালে গোটা চারেক চা-ই খেয়ে ফেলেছি এক-একজনে। ইতিমধ্যে জঙ বাহাদুরের কাছে রক বাহাদুরের কথা শুনে একজন নেপালী এসে বলল, তোমাদের বুড়ো তো নির্ঘাৎ মারা পড়েছে-যা বরফ পড়েছে কাল। তা, আমরা ওপরে যাচ্ছি- আজ তো থোরাং পার হওয়া যাবে না,- আমাদের লোকজন ওপরে আছে-ওদের নিয়ে আসতে যাচ্ছি। তুমি একজন লোক দাও-আমাদের সংগে-দেখি কি হোল বুড়োর! লোক তো জঙ বাহাদুর। ওকে আমার উইন্ডচিটার আর গ্লাভস্‌দু'টা খুলে দিলাম-যাক দেখে আসুক-কেমন আছে রক বাহাদুর। এ রকম একটা ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, তবু রক বাহাদুরের তেমন খারাপ কিছু হয়েছে এটা মোটেই ভাবতে পারছিলাম না।

নেপালী ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হোল। একাই বেরিয়েছিলেন ঘুরতে-থাকেন কাঠমান্ডুতে।

খানিক পরে রক বাহাদুরকে নিয়ে ফিরে এল জঙ বাহাদুর। জার্মানিরাও ফিরে এল। আজ আর থোরাং পার হবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমরা তখন চা খাচ্ছি। জার্মানি ভদ্রমহিলা এসেই ফেদার জ্যাকেটটা খুলে টুম্পার গায়ে পরিয়ে ছিলেন- ইতিমধ্যে ওদের লোকজনের মুখে কাল রাত্রের ঘটনা শুনে থাকবেন হয়তো। রক বাহাদুরও সুস্থই আছে। রকের সুস্থ প্রত্যাবর্তন আমরা সেলিব্রেট করলাম ডিম সেদ্ধ আর চা খেয়ে।

এবার মুক্তিনাথ যাবার কথা ভাবতে হয়। নিউজিল্যান্ডবাসী দম্পতি রওনা দিলেন ওঁদের লোকজনকে সাথে করে। খানিক বাদে জার্মানিরাও চলে যাবে-আমরাও ঠিক করলাম এক সাথে যাব। বরফ তখনও পড়ছে-চারদিক সাদায় সাদা-এই সময় একসাথে গেলে বরফের ওপর পায়ের দাগ ধরে চলে যাওয়া যাবে-দেরী হলে রাস্তা চেনা শক্ত হতে পারে। আর পথে কোন সাহায্যের দরকার হওয়াও অসম্ভব নয়। একটু বেশি লোক সংগে থাকা ভাল। রক বাহাদুর একটু গুঁই গাঁই করে রাজী হয়ে গেল।

ন'টা চল্লিশ নাগাদ বেরিয়েছি দোকান ঘর ছেড়ে। সামনে সমতল একটা প্রান্তর। বরফে পা দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা সকাল থেকেই হচ্ছে। পেঁজা বরফে পা দিলে পা খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে মাটিতে,যেন বরফ সরে গিয়ে রাস্তা হয়ে যাচ্ছে একটা। যেখানে একটু বেশি বরফ সেখানটায় শক্ত বরফের একটা সর পড়ে যাচ্ছে মাটির

ওপর, তাতে হাঁটতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বরফের মাঝে পা-এর দাগ ধরে নিশ্চিন্তে হাঁটছি-ঠান্ডাও তেমন লাগছে না-যদিও রোদ তেমন চড়া নয় এখনও। খানিক পরে একটা সরু নালা। একটু নেমে উঠতে হোল খানিকটা। ওঠার পথটা বরফগলে বেশ কাদা কাদা হয়ে রয়েছে-বরফের প্রলেপ দেওয়া গাছ ধরে ধরে ওপরে উঠলাম। ছোট কাঁটা গাছ- জুনিপারই হবে হয়তো- হাত ছড়ে এক্‌সা ।

মিনিট পঞ্চাশ হাঁটার পরেই নীচে মুক্তিনাথ দেখা গেল-ইতিমধ্যে পায়ের তলায় বরফ কমে এসেছে-রোদের তেজও একটু বেড়েছে। নীচে হলদেটে পাতাওলা কিছু গাছ-মাঝে মাঝে কয়েকটা বাড়ী, শুনলাম ওটাই মুক্তিনাথ। এরকম আরও কিছু গ্রাম নজরে পড়ল আমাদের ভিউ পয়েন্ট থেকে। মুক্তিনাথ গ্রামের আগেই পথে পড়ল। উৎরাই পথের বাঁদিকে বেশ বড় একটা ঘেরা জায়গার পাশ দিয়ে নামতে হোল আমাদের-মুক্তিনাথ মন্দির ওই ঘেরা জায়গাটার ভেতর দিকে।

দীপালী দে

মদমহেশ্বর

পঞ্চকেদার অর্থাৎ পঞ্চশিব, কেদারেশ্বর, মদমহেশ্বর, তুঙ্গেশ্বর, রুদ্রেশ্বর এবং কল্পেশ্বর হিমালয়ের পাঁচটি পর্বত শিখরের পাদদেশে অধিষ্ঠিত। বহুযুগ ধরে সাধুসন্ত, ভক্ত, তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকরা অতি দুর্গম পথে পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পেরিয়ে পদব্রজে দর্শন করেছেন পঞ্চকেদার। তখন না ছিল পথঘাট, না ছিল লোকালয়, পরন্তু ছিল বন্যজন্তুর বিভীষিকা। গুহায় রাত্রিবাস করে ভক্তরা চলতো ভগবানের টানে সবকিছুকে তুচ্ছ করে। আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে দুর্গম পথ হয়েছে সুগম, পদযাত্রার স্থান নিয়েছে বাসযাত্রা। আর সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে অল্পবিস্তর লোকালয়। এইসব সুযোগের ব্যবহার করতে বেরিয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ, তীর্থযাত্রী আর হিমালয় প্রেমী। বাস ও পদযাত্রার মাধ্যমে চলেছে হিমালয় দর্শনে। হিমালয়ের অখন্ড দেহকে খন্ডন করে তৈরি হয়েছে পথ, নদীর উপর গড়ে উঠেছে সেতু, নিঃসন্দেহে হিমালয়ের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিন্তু পূর্ণ হয়েছে সাধারণ মানুষের তীর্থদর্শনের কামনা। নতুবা হিমালয়ের অসীম সৌন্দর্য চিরকাল সৌন্দর্য পিপাসুদের অগোচরে থেকে যেতো।

উত্তরাখন্ডের গাড়োয়াল বাসপথে কেদারের আগে শোনপ্রয়াগ এবং বদরীর আগে হেলাং এর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে হাঁটাপথে প্রায় ২০০ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে এবং ২০০০ মি. থেকে ৪০০০ মি. উচ্চতায় পঞ্চকেদারের অবস্থান। পঞ্চকেদার পরিক্রমার উপযুক্ত সময় এপ্রিল থেকে জুন এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর। কিন্তু হিমালয়ের আবহাওয়া সর্বদাই অনিশ্চিত। অনুকূল আবহাওয়া যে কোন মুহূর্ত্তে প্রতিকূল হয়ে যায়। সেই অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারলেই হিমালয় ভ্রমণ সার্থক।

পুরাণে বর্ণিত আছে, পঞ্চপান্ডব জ্ঞাতিহত্যার পাপমুক্তির জন্যে ব্যাসদেবের নির্দেশে হিমালয়যাত্রা করেন এবং তথায় দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন লাভের আশায় তপস্যা করেন। মহাদেবও তাঁদের দর্শন না দেবার ইচ্ছায় মহিষের রূপধারণ করে পালিয়ে বেড়ান। এমন সময় কেদারখন্ডে ভীম মহিষরূপী পলাতক মহাদেবের পশ্চাদংশ ধরে ফেলেন এবং অবশিষ্টাংশ মেদিনী মধ্যে প্রবেশ করে। মহিষরূপী

মহাদেবের পশ্চাদভাগ কেদারনাথে বিরাজমান। অপর চারটি ভাগ যেমন মধ্যভাগ মদমহেশ্বরে, বাহুভাগ তুঙ্গনাথে, মুখাবয়ব রুদ্রনাথে এবং জটারূপ কল্পনাথে বহিঃপ্রকাশিত। পান্ডবগণ এই পাঁচটি স্থান দর্শন করে প্রত্যেকটি জায়গায় মন্দির স্থাপন করেন। দর্শনান্তে পান্ডবদের পাপ-মুক্তি ঘটে এবং স্বর্গারোহণ হয়। এই পাঁচটি ক্ষেত্র এ যাবৎকাল পঞ্চকেদার নামে প্রচলিত হয়ে আসছে।

কেদারনাথ প্রাণভরে দর্শন করে সেখান থেকে ২০ কিমি পথ নেমে আসি শোনপ্রয়াগ (উচ্চতা ১৭৭৪ মি.) শোনগঙ্গা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমে।

মদমহেশ্বর (উচ্চতা ৩৮২৫ মি.)-- শোনপ্রয়াগ থেকে গুপ্তকাশীর বাসে ২০ কিমি এর ব্যবধানে জুরানীতে (উচ্চতা ১৬৬৭ মি.) নামতে হয়। এখান থেকেই আমাদের দ্বিতীয় কেদারের পদযাত্রা শুরু হয়। গভীর রোডোডেনড্রন- এর জঙ্গল ভেদ করে পথ নেমে গেছে মন্দাকিনীর তটে। পুল পার হয়ে সে পথ আবার উপরে উঠে কালীগঙ্গার দিকে ঘুরে যায়, দূর থেকে দেখা যায় কালীগঙ্গা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। জুরানী থেকে কালীমঠের (উচ্চতা ১৩১২ মি.) দূরত্ব ৭ কিমি, এখানে দেবী অম্বিকা মহাকালীরূপে রক্তবীজ অসুরকে বধ করেছিলেন। অসুরবধের স্থানটি মূলমন্দিরে আচ্ছাদিত। তার পাশে মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, ভৈরব ও অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দির। কালীমঠের উপরে কালীশিলা। এখানে শুম্ভনিশুম্ভ কর্তৃক বিতাড়িত দেবগণ দেবী অম্বিকার আরাধনা করেছিলেন। কালীগঙ্গার পুল পেরিয়ে পাইনবনের ভিতর দিয়ে পথ। বনবিভাগ দ্বারা চিহ্নিত বিশালকায় গাছগুলি থেকে রেসিন সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। পাইনের তার্পিন জাতীয় তৈলজ পদার্থের ঝাঁঝালো গন্ধে নেশা লেগে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ি। কালীমঠ থেকে ৭ কিমি পথ লেঁখ (উচ্চতা ১৮০০ মি.) মাঝে বেড়ুলা গ্রাম। এ অঞ্চল বড়ই রুক্ষ। পথের পাশে চোখে পড়ে গোলাপী রঙের বড় লিলি জাতীয় ফুল (Amaryllis)— ফুল সর্বস্ব এই গাছ গুলি এ পথের আর কোথাও দেখা যায়নি। লেঁখ থেকে মদমহেশ্বর গঙ্গার ধার ধরে আরো ৭ কিমি পথ গিয়েছে রাঁশি (উচ্চতা ২১৫৩ মি.)— মদমহেশ্বরের শক্তি রাকেশ্বরীদেবীর মন্দির। শীতকালে মদমহেশ্বরের চলমান মূর্তি উখীমঠ যাওয়া আসার পথে এখানে দু'রাত্রি থাকে। মন্দিরের আশেপাশে কিছু চাষের জমি দেখা যায়। এখানকার পূজারী জনানন্দজীর আতিথেয়তা মনে রাখার মত। আমাদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে কিছু লোক সমাগম হয় দাওয়াই এর খোঁজে। আধুনিকতার

স্বাদ পেয়েছে এরা— স্থানীয় জড়িবুটিতে আর চলছে না। এখান থেকে রওনা দিই ৬ কিমি পথ পেরিয়ে গোন্ডারের দিকে। জনশূন্য পথ চলতে চলতে সাপের দেখা মেলে। একটু এগিয়ে দেখি প্রায় ২০ মি উপর থেকে নেমে আসছে এক জলপ্রপাত, দূর থেকে জলকণার স্পর্শ অনুভব করা যায়, কাছে গেলে স্নানের আকাঙ্খা মেটে। এই জলশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পানচাক্কী বসিয়েছে গ্রামবাসীরা, এই অঞ্চলের আবহাওয়া কিছুটা আর্দ্র। রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে ফুটে রয়েছে তারার মত সাদা ফুল, তুলতে গিয়ে দেখি ফুল তো নয় এক শ্রেণীর ছত্রাক (Earth star-Geastrum)। গোন্ডারের আগে প্রচন্ড একটা উৎরাই পথে নেমে আসি মদমহেশ্বরের গঙ্গার ধারে। দর্শন করি হনুমানজীর ছোট্ট মন্দির। সেদিনের ২৪ কিমি হাঁটা পথের পরিসমাপ্তি ঘটে গোন্ডার গ্রামে (উচ্চতা ১৮৪৬ মি.)।

পরদিন মদমহেশ্বর দর্শনের উদ্দেশ্যে অতি প্রত্যুষে রওনা হয়ে ১ কি.মি. পথ পুল পেরিয়ে বানতোলী (উচ্চতা ১৬৬৭ মি.) পৌঁছাই। মদমহেশ্বর পাহাড়ের পাদদেশ- সরস্বতী ও মদমহেশ্বর গঙ্গার সঙ্গম। এখানে আছে তুলাসিংজীর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির-সঙ্গমেশ্বর মহাদেব আর ভবিষ্যতের জন্য গড়ে ওঠেছে একটি যাত্রীনিবাস। বানতোলী থেকে ৯ কিমি দীর্ঘ ও ২১৫০ মি. চড়াই পথ উঠে গেছে মদমহেশ্বর পাহাড়ের উপরে। পথে জল নেই, অতএব এখান থেকে পানীয় জল নিয়ে রওনা হবার নির্দেশ দেওয়া আছে। প্রথম ৩ কি.মি. পথ ফার গাছের (Abies) ছায়ায় ঘেরা, সহজেই উঠে আসি নানু (উচ্চতা ২১৩৪ মি.)। সামনে এক বিজ্ঞপ্তি ''চড়াই দেখে নিরাশ হোয়োনা, উপরে অনুপম সৌন্দর্য''। এগিয়ে চলি বড়গাছের সীমারেখা ছাড়িয়ে এসে পড়েছি সবুজ গাছের গালিচায় মোড়া পাহাড়ে। যতদূর দৃষ্টি যায় হলুদ ফুলের সমারোহ (Euphorbia) তারই মাঝে উঁকি দেয় নীল, লাল, সাদা, আরও কত রঙবেরঙের ফুল। Cynoglossum, Polygonum, Artemeia, Plantago, Rumex, Fagoyprum, ইত্যাদি এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে হিমালয়ের বনৌষধির অমূল্য সম্পদ। পথ যত উপরে ওঠে চড়াইএর মাত্রা বাড়তে থাকে, চলার গতি কমে।, অক্সিজেনের অভাব অনুভূত হয়। ২/৩ কি.মি. পরে পথ আবার প্রবেশ করে গভীর অরণ্যানীর মধ্যে ভেজা স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া, গাছের উপর থেকে ঝুলে রয়েছে কত রকমের লাইকেন (শৈবাল ও ছত্রাকের মিশ্র উদ্ভিদ) পাহাড়ের গায়ে মস, মারকেনসিয়া এবং নানা জাতীয় ফার্ণ (Hymenophylum,

Asplenium)। *কুলীরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে রাস্পবেরী ফল তুলে খায়,* আমাদেরও দেয়-টক মিষ্টি ছোট ফল নিঃসন্দেহে খেয়ে ফেলি। এখানকার গাছপালা সম্পর্কে ওরা খুবই সচেতন কোনগুলি বিষাক্ত ভালই জানে, সব সময় আমাদের সাবধান করে আমরা যেন গাছে হাত না দিই। পথ এবার পাহাড়ের উপরে উঠে এসেছে সামনে সমতল ভুখন্ড-মদমহেশ্বর উপত্যকায় প্রবেশ পথের দুপাশে হলুদ ফুলের (Caltha) চাদর বিছিয়ে আমাদের আভিনন্দন জানায়। সামনে দেখা যায় মদমহেশ্বর মন্দির, তার পিছনের পাহাড় ফুলে ভরে আছে, মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি সাইপ্রাস গাছ (Cupressus)। প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে সত্যি অনুপম সৌন্দর্য। পূজারী মন্দির খুলে দেন, পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে প্রণতি জানাই মধ্যমহেশকে। মন্দিরের ভিতরে মদমহেশ্বরের স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ, বাইরে পার্বতী ও হরপার্বতীর মূর্তি এবং পাশে মদমহেশ্বরের পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত সেই গাভীর ক্ষুরের চারটি ছাপ— দেবমাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। মদমহেশ্বরের উপরে ২ কিমি পথ বৃদ্ধ মদমহেশ্বর (উচ্চতা ৪১৫৮ মি.) শোনা যায় সেখান থেকে মান্দানি ও চৌখাম্বার দৃশ্য অপূর্ব। কিন্তু আবহাওয়া মেঘলা থাকায় তা দেখা সম্ভব হয়নি। মদমহেশ্বরে রাত্রিবাস করে পরদিন এই পথে ২৩ কি.মি. অতিক্রম করে নেমে আসি লেঁখ।

প্রাণেশ চক্রবর্তী

হিমালয়ের গোপনপুরে

ছটি ঋতুর মধ্যে হিমালয়ে তিনটি ঋতুরই প্রাধান্য চোখে পড়ে। শীত, বসন্ত ও বর্ষা।

এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে সেরা ঋতু হলো— বসন্তকাল। বসন্তকাল হিমালয়ে ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত সময়। বাতাসে তখন কন্‌কনে ঠান্ডার তীব্রতা থাকে না। থাকে না আকাশে মেঘের ঘনঘটা। লাল রডোডেনড্রনের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় অমলধবল পর্বতমালা, নীলআকাশের বুক থেকে সর্বদা উদাত্ত আহ্বান জানায়। বড় মায়াময় তার এই আহ্বান। ধমনীর রক্তপ্রবাহকে চঞ্চল করে তোলে।

এই বসন্তকালেই হিমালয় তার অপরূপ রূপের পসরা সাজিয়ে রাখে চতুর্দিকে। উপত্যকার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিগুলি সবুজে সবুজ হয়ে ওঠে। বুগিয়ালগুলি কচি কচি নরম সবুজ ঘাসে ছেয়ে যায়। নদীনালা, ঝর্ণাধারার মিষ্টিমধুর সুরমূর্ছনায় আকাশবাতাস সর্বদা মুখরিত থাকে। যেদিকেই চোখ পড়বে শুধু রঙীন ফুলের মেলা। সেখানে রঙীন প্রজাপতির ভিড়। স্নিগ্ধ বাতাসে ফুল থেকে ফুলে তারা উড়ে বেড়াচ্ছে। বনস্থলীতে নিঃশঙ্ক বিহার করে হরিণের দল। সর্বত্র এক প্রশান্ত আবেষ্টন বিরাজ করে। চারিদিকে চলতে থাকে সুরের অনন্ত খেলা। প্রকৃতির এই উজার করা রূপরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে তখন উপলব্ধি করা যায় মৃত্যুর মধ্যেই শাশ্বত জীবনের অনন্ত ধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে।

দূর দিগন্তে সূর্যস্নাত পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ এক বিচিত্র শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। ঘাড় ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে একঝাঁক মুনিয়াল পাখি। ময়ূরের মত নীল সবুজে মেশানো পালকের রঙ। স্তব্ধ বিস্ময়ে ওরা দেখে, দেখি আমিও। তারপরেই চোখের পলকে ডানা ঝাপ্টিয়ে দুরন্ত বেগে উপত্যকার পানে উধাও হয়ে যায়। চকিতের দেখা কিন্তু মনোহারিণী। চুপচাপ অপেক্ষা করি যদি আবার আসে।

কিন্তু — না। দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আবার তুহিনশীর্ষ পর্বতমালার দিকে। এবারে

আবার আর এক অভিনব দৃশ্য। একজোড়া গ্রিফন ভালচার। বিরাট বিশাল আকৃতি; বরফঢাকা পাহাড়ের প্রায় গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন চক্কর দিচ্ছে। অসাধারণ দৃপ্ত ভঙ্গি তাদের।

গ্রিফন শকুন জাতীয় পাখি, ঘোর বাদামী রঙের পালকে ঢাকা। ঘাড়খানা ঈগলের মতো দেখতে। কিন্তু মাথায় কোনোরকম পালক নেই। কেমন যেন চাঁছা ছোলা।

এদের প্রসারিত ডানার দৈর্ঘ্য দশ ফুট। হিমালয়ের এটিই সর্ববৃহৎ পাখি। ন্যাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশে ওরা সাধারণত বাসা বেঁধে থাকে। গায়ে যেমন তাদের অশেষ ক্ষমতা তেমনি দৃষ্টিশক্তিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। উড়তে উড়তে চোখের পলকে মাটিতে নেমে জীবজন্তুর হাড়মাংস তুলে নিয়ে পরক্ষণেই আকাশে উঠে যেতে পারে। ভুলেও কখনও নিচু সমতল জায়গায় বসে না।

গ্রিফন একটির বেশি কখনো ডিম পাড়ে না। ডিমের রঙ সাদা এবং কালো ছিট ছিট দুরকমেরই দেখা যায়।

অনুরূপ আর একটা পাখি হল— ল্যামারগেয়ার। হিমালয়ের উচ্চতম অংশে প্রায়ই ওদের উড়তে দেখা যায়। মাথাটা গোলগাল, পায়রার মতো। তবে গ্রিফনের মতো ন্যাড়া নয়। থুতনির নীচে একটু কালো দাড়ি আছে। গলা ও বুকের রঙ উজ্জ্বল সোনালী। ডানা দুটো ভুষো কালির মতো দেখতে। এরাও আকাশের খুব উঁচুতে ওঠে। ডানায় তাদের জেটগতি। ঘন্টায় প্রায় আশি মাইল বেগে ছুটতে পারে। এভারেস্টের কাছাকাছি পঁচিশ থেকে সাতাশ হাজার ফুট উঁচুতে ল্যামারগেয়ারদের প্রায়ই উড়তে দেখা যায়।

গাছপালা, ফুল আর হরেকরকম জীবজন্তুই নয়, হিমালয় অনন্যসুন্দর পাখিদের আদর্শ বিচরণক্ষেত্র। অনুকূল পরিবেশের অভাবে বহু দূর দূর দেশ থেকেও অনেক সময় বিচিত্র সুন্দর পাখিরা এসে আশ্রয় নেয় হিমালয়ে। নির্জন নিরাপদ স্থানের লোভেই যে তারা বিস্তার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে হাজির হয় তা কিন্তু নয়। বহু মানসিক অবস্থাও এর পশ্চাতে কাজ করে। সর্বোপরি এখানে রয়েছে খাদ্যস্বয়ম্ভরতার নিশ্চিন্ত আশ্বাস।

ভালচার-জাতীয় পক্ষীকুল সচরাচর যে সমস্ত খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে তার অধিকাংশই হচ্ছে মৃত জন্তুজানোয়ারের দেহাবশেষ। অনেক সময় তাদের

ভাগ্যে আবার বিভিন্ন জীবজন্তুর শিকারের উচ্ছিষ্টও জুটে যায়। কেননা কোন প্রাণীই শিকার ধরে পুরোপুরি খায় না। কিছু-না-কিছু তারা ফেলে রেখে যায়। তা ছাড়া অনেক সময় গ্রিফন, ল্যামারগেয়ার, ঈগল নিজেরাও পাখি, খরগোশ, ইঁদুর হত্যা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকে। ধস্, তুষারপাত, তুষারঝঞ্ঝা হিমানী-সম্প্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগেও নিত্য বহু প্রাণী মারা যাচ্ছে। সেগুলিও তাদের খাদ্যভাণ্ডারকে নিয়মিতভাবে সমৃদ্ধ করে থাকে।

অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাখিদের খাদ্য হচ্ছে পোকামাকড়, বিভিন্ন রকমের কীটপতঙ্গ, লতাপাতা, ফুলফল, মস, ছত্রাক ইত্যাদি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এ — সবেরও কখনও ঘাটতি হয় না। সেজন্য বসন্তকাল এলেই ঝর্ণা, নদীনালা সংলগ্ন তৃণভূমিগুলিতে পাখিদের মেলা বসে যায়।

এক রকমের পাখি আছে যারা সারাদিন ধরে বোল্ডার থেকে বোল্ডারে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়ায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঠোঁট বাড়িয়ে ঠিক ঠিক জায়গা থেকে পোকামাকড় তুলে নিচ্ছে। আবার কিছু কিছু পাখি আছে যাঁরা ইঁদুরের মত চলতে চলতে জমির বুক থেকে পোকামাকড় তুলে নেয়। রবীন অ্যাকসেনটার এমনি একটি পাখি। পাখিগুলি ছয়/সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা হবে। মাথা ও গলা আগাগোড়া ধূসর। বুকের রঙ মেটে লাল।

টুই-উ টুই-উ সুরে ডাকতে ডাকতে এক ঝাঁক পাখি ঘাসের জমিতে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটা বড় বোল্ডারের পাশে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখছিলাম তাদের অদ্ভুত চলার ছন্দ। একটা বড় ঝর্ণা পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে এসে কলকল শব্দে বয়ে গেছে জমির বুক চিরে। সেখানে একদল অ্যাকসেনটার খেলা করছিল একে অপরের পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু কী যে হল ওদের। হয়তো কেউ কেউ আমাকে দেখতে পেয়েছিল। হঠাৎ পি পি পি শব্দে ডাকতে ডাকতে উড়ে পালিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে।

হিমালয়ে বন্ধুর পথে হাঁটতে হাঁটতে এরকম আরো কিছু কিছু পাখির অভাবনীয়ভাবে সাক্ষাৎ পেয়ে যাই। এদের মধ্যে ফ্লাইক্যাচার, রেডস্টার্ট, চ্যাট, বী-ইটার, ফর্কটেল, ম্যাগপাই, মিনিভেট, ওরিওলি, বারবেট, ব্যাবলার প্রভৃতি অন্যতম। শুনেছি, শীতকালে-বরফপড়া শুরু হলে অ্যাকসেনটার পাখিরা পাহাড়ের উপরিভাগে থাকে না। তখন তারা নীচের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জায়গায় নেমে আসে।

হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার অন্তর্গত বাগগোটের ফুলময় উপত্যকায়একবার কয়েকটি বী-ইটারের দর্শন পেয়েছিলাম। অদ্ভুত সুন্দর এই পাখিগুলি। গায়ের রঙ ঘাসের মত কোমল সবুজ। মাথা ও গলার রঙ তামাটে, সরু ঠোঁট —সামনের দিকে একটু বাঁকানো। লেজখানা ওদের দেখবার মতো, দুজোড়া পালক আছে তাতে। প্রান্তভাগ পিনের মতো সরু। এদের গলার নীচে নেকলেসের আকারে একটু কালো ছোপ থাকে। খুবই স্ফূর্তিবাজ পাখি বী-ইটার। মনের সুখে মৌমাছি ধরে টপাটপ গিলছিল।

মৌমাছি ছাড়াও এই পাখিগুলি ডানাওয়ালা পতঙ্গ এবং বড় বড় মাছি, ধরে খায়। শিকার ধরার কৌশলটি খুব মজার। শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে শিকার ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে। তারপর অনেকক্ষণ চক্কর মারে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিকার নিস্তেজ হয় অথবা মরে যায়।

অনেকটা পায়রার আকারের মতো ম্যাগপাই পাখিও খুব মজার পাখি। পনের থেকে সতেরো ইঞ্চি লম্বা ওদের লেজখানা দেখার মতো জিনিস বৈকি! ফল আর পোকামাকড় ওদের প্রধান খাদ্য। স্বামী-স্ত্রী বেশীরভাগ সময় একসঙ্গে থাকে। মাঝে মাঝে পরিবারের সকলে একসঙ্গে ও ঘুরে বেড়ায়। তখন ওরা সাধারণত দলপতিকে অনুসরণ করে।

ম্যাগপাই খুবই অনুকরণপ্রিয় পাখি। গাছ থেকে গাছে ওড়বার সময় এরা চিত্রবিচিত্র ঝুঁটিওয়ালা কোকিল, শিকারী ঈগল এবং বাজপাখির ডাক অদ্ভুতভাবে নকল করে ডাকে।

কাশ্মীর থেকে আসাম হিমালয়ের সর্বত্র দেখা যাবে পারট্রিজ, স্নো পিজিয়ন এবং ফেজান্ট। এদের গায়ের পালকের রঙের সঙ্গে ঘাস, বরফ ও বোল্ডারের রঙের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার পক্ষে তাদের পালকের এই রঙ অবশ্য খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই। এরা সাধারণত নয় থেকে পনের হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে থাকে।

ব্লাড ফেজান্ট ঘন বাঁশঝাড়, জুনিপার অথবা রডোডেনড্রন জঙ্গলের কাছাকাছি থাকতে পচ্ছন্দ করে। হিমালয়ের এই আশ্চর্য সুন্দর পাখিটিকে আমার বহুবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই কাছ থেকে নয়। একবার শুধু কাঁচপানির জঙ্গলে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সে এক অদ্ভুত ঘটনা!

কাঁচপানির অবস্থান গাড়োয়াল হিমালয়ের চামোলি জেলায়। এটি বিশেষ কোনো গ্রাম নয়। পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলের মধ্যে মেষপালকদর একটা সাময়িক আস্তানা বলা যায়। তবে কাঁচপানিতে অসম্ভব ভালুকের উপদ্রব আছে। সেজন্য মেষপালকরাও খুব একটা প্রয়োজন না হলে ওখানে রাত্রিবাস করতে চায় না। নীচের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যায় আরো উপরে ভাঙাপানিতে।

সে যাই হোক, কাঁচপানিতে যেতে হলে যোশীমঠ থেকে প্রথমে আসতে হবে রিনি। রিনি পাহাড়ের কোলে একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম। যোশীমঠ থেকে সেখানে নিয়মিত বাস চলাচল করে।

এই রিনি থেকে ঋষিগঙ্গার বাম তীর ধরে উঠে গেছে কাঁচপানির পথ। জায়গাটার উচ্চতা প্রায় হাজার দশেক ফুটের কাছাকাছি। পায়ে হেঁটে পৌছতে দুদিনের মতো সময় লাগে।

একটি মাত্র ঝর্ণা ছাড়া সেখানে জলের কোনো ধারা নেই এবং যেটি রয়েছে সেটিও অত্যন্ত ক্ষীণকায়। কিন্তু কাঁচের মতো স্বচ্ছ তার মিষ্টি জল। আর এই কারণেই জায়গাটির নাম হয়েছে কাঁচপানি।

আমরা নন্দাঘুন্টি অভিযান শেষে ফিরে আসছিলাম। মে মাসের শেষাশেষি তখন। দুপুর বেলা। ঝক্‌ঝকে আকাশ। আমাদের অভিযানের কুলী দৌলত সিং আগে আগে হাঁটছিল। আমি ছিলাম তার পিছনে। ঘন জঙ্গল চারিদিকে। জঙ্গলে নানান জাতের গাছ। পাইন, রডোডেনড্রন, ম্যাপল, আখরোট ইত্যাদি। আর এছাড়া রয়েছে বেঁটে সরু সরু বাঁশের অসংখ্য ঝোপঝাড় আর ফার্ন, মস, ছত্রাক ইত্যাদি।

আগাগোড়া উৎরাই পথ। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ চলতে চলতে ভীষণ শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দৌলতকে ডেকে এক জায়গায় খানিক বসে জিরিয়ে নেব কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় দেখি সে একটা বড় পাথরের আড়ালে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাড় হেলিয়ে মাঝে মাঝেই কী যেন লক্ষ্য করছে। তার এরকম দেখার ভাবভঙ্গি আমার একটুও ভালো লাগে না। জঙ্গলটা আর যাই হোক মোটেই নিরাপদ নয়। স্থানীয় লোকজনের কাছে শুনেছি এখানে নানা রকমের জান্তু জানোয়ার আছে। দৌলত যেভাবে দেখছে তাতে মনে হল সে ঐরকমেরই কিছু একটা দেখতে পেয়েছে।

আমি গুটি গুটি পায়ে তার কাছে এগিয়ে যাই। দৌলত দেখতে এমনই

তন্ময় ছিল যে সে আমার উপস্থিতির কথা একটুও বুঝতে পারে না। খুব মনোযোগ সহকারে সে জঙ্গলের মধ্যে কী যেন আঁতিপাঁতি করে খুঁজছিল। অজানা আশঙ্কায় ভয়ে আমার বুক টিপটিপ করতে থাকে।

পিছন ফিরে তাকাই! সঙ্গীরা এখনো কতদূরে কে জানে? সকলে একসঙ্গে থাকলে হয়তো জন্তুটার মোকাবিলা করা যেত। বড় অসহায় লাগে নিজেকে। শেষে তীরে এসে তরী ডুবে যাবে নাকি?

হঠাৎ দৌলত পিছন ফিরে তাকায়। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে ওঠে— দেখো সাব ইধার, মজা আ যায়ে গা....

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো অবস্থা তখন। দৌলত আঙুল তুলে যে দিকটা নির্দেশ করছিল সে দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। দুজোড়া লাল টুকটুকে ফেজান্ট পাখি। র্ফান-মসের ভিতর থেকে কী যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

অপলক চোখে দেখি। কী আসাধারণ সুন্দর পাখিগুলি। হালকা ধূসর, সবুজ ও সাদা রঙ পালকের। মুখের চামড়া লাল টুকটুকে, লেজখানাও লাল ছোপ ছোপ রঙের— কয়েক ফোঁটা টাটকা রক্ত যেন ঢেলে দেওয়া হয়েছে। চৌদ্দ-পনেরো ইঞ্চি লম্বা হবে পাখিগুলি।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না। দৌলত কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে- ঐ লাল পাখি দুটি কিন্তু পুরুষ। কী অপূর্ব সুন্দর দেখতে তাই না? সে আঙুল তুলে আমাকে দেখায় — আর ঐ দুটো হচ্ছে মেয়ে।

পুরুষ ফেজান্টদের তুলনায় মেয়ে ফেজান্টাদের পালকের রঙ বেশ নিষ্প্রভ লাগে। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে তামাটে। মুখের চামরায় অবশ্য লালচে আভাস রয়েছে। কিন্তু পুরুষদের পাশে এদের ভীষণ বেমানান লাগে।

ফেজান্টরা সাধারণত ডিম পাড়ে তুষার সীমানার কাছাকাছি — বোল্ডারের ফাঁকে ফাঁকেঘাসে ছাওয়া জমিতে। অত উঁচুতে যেহেতু কোনো বড় বড় গাছপালা জন্মে না সেজন্য ডিমে তা দেয়ার সময় কোনো রকম আড়াল আব্রু থাকে না বললেই চলে। এ অবস্থায় ওরা অনায়াসে ঈগল বাজপাখিদের আক্রমণের শিকার হতে পারত। কিন্তু ওরা বেঁচে যায় ওদের দেহের পালকের রঙের জন্যই। বোল্ডার,

ঘাস, বরফ ইত্যাদির সঙ্গে ওদের গায়ের রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ফলে আক্রমণকারীরা উঁচু থেকে ফেজান্টদের সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে না। কাজে কাজেই পুরুষদের মতো ওদের পালকের রঙ দৃষ্টি আকর্ষণকারী না করে বিধাতা একদিকে তাদের পরম উপকারই করেছেন বলা যায়। তা না বলে রূপ হত অভিশাপ।

আর একবার নন্দাদেবী অভিযানে যাওয়ার সময় ধাঁরাশী গিরিবর্ত (১৩,৭৫০ ফুট) অতিক্রমকালেও একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল।

প্রতিদিনের মত আমরা সেদিনও সকাল থেকেই বরফের কাদা ভেঙে হাঁট ছিলাম। অসময়ে প্রচন্ড তুষার পাতের দরুন সেবারে লতাখরক থেকে বেসক্যাম্প বা মূলশিবির পর্যন্ত আগাগোড়া পথটাই বরফের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সে এক অসহনীয় অবস্থা। সকাল থেকেই বিকট চড়াই অতিক্রম করে একনাগাড়ে হাঁটতে হচ্ছিল বলে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম। হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এ পথের শেষ কোথায়? আর কতক্ষণই বা সময় লাগবে পরবর্তী ক্যাম্পে পৌঁছতে?

প্রচন্ড ঠান্ডায় হাত-পা জমে অসার হয়ে গিয়েছিল। পিপাসাও পেয়েছিল খুব। কিন্তু তখন শুধু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিলনা।

এই সময় হঠাৎ আকাশ ভেঙে সুরু হলো তুমুল তুষারপাত। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক ঝাপসা হয়ে যায়। দুহাত দূরের জিনিসও তখন দেখতে পাই না। এই অবস্থায় সামনে এগিয়ে যাব কি যাব না ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি না।

অদূরে দাঁড়িয়েছিল আমার সঙ্গী ইসনো গোতা। সে হতাশভাবে বলে-এখন এখান থেকে এক পাও এগোনো উচিত হবে না। ভুলক্রমে যদি এদিক-ওদিক পা পড়ে তাহলে পতন অনিবার্য। কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তুমুল তুষারপাতের মধ্যে আমরা দুজনে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। দলের অন্যান্য সহগামী বন্ধুরা কে কোথায় বুঝতে পারি না। ছুরির ফলার মতো বরফ এসে আঘাত হানে চোখেমুখে। উইন্ডপ্রুফ কোটের হুড মুখের ওপর টেনে দিয়েও নিস্তার পাইনা। ভীষণ অসহ্য লাগে।

দুজনে পরামর্শ করি। কোনো পাথরের আড়ালে যেতে পাড়লে এই কষ্ট টুকু হয়তো কমানো যেত। ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। পা-দুটো ভয়ানক যন্ত্রণায় টনটন করছে।

এ-সমস্ত কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে আশে-পাশেই কোথায় যেন একখানা বোল্ডার দেখেছিলাম ঠিক তুষারপাত হবার আগে। খুঁজে পেতে দেখলে কেমন হয়? বোল্ডারের নীচের দিকটা বরফে ঢাকা থাকলেও ওটার মাথায় তেমন কিছু সাংঘাতিক বরফ ছিলনা। ওখানে আমরা দুজনে অনায়াসে বসে বসে বিশ্রাম নিতে পারি।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে গোতাকে নিয়ে আমি টুকটুক করে এগিয়ে যাই। একটা বরফের ঢাল দিয়ে কুড়ি-পঁচিশ ফুট উপরে উঠতেই আমরা পাথরটার মাথায় পৌঁছে যাই। জায়গাটা অসমান। তার ওপরে বেশ কিছু নরম তুষারও জমেছে। তবে খুব মারাত্মক নয়। তা হোক, কায়দাকানুন করে বসে থাকা যাবে।

পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে পাথরটার ওপরে যেই না বসতে যাব অমনি সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে প্রচন্ড একটা চিৎকার ভেসে আসে— ক্রোক্ ক্রোক্ ক্রোক্...হিক্কুপ...হিক্কুপ...

আচমকা এই শব্দ শুনে আমরা দুজনে দিশেহারা হয়ে যাই। রুকস্যাকের নীচে কিছু একটা চাপা পড়েছে ভেবে তৎক্ষণাৎ এক ঝট্‌কায় রুকস্যাকটাকে তুলে নিই। আমরা উভয়ে প্রায় উলটেই পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনোমতে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে সামলে নিই নিজেদের।

পাথরের গায়ে ছোট্ট একটা ফাটল ছিল। সেখানে দেখি একঝাঁক স্নো পিজিয়ন। চোখের পলকে তারা সশব্দে ডানা ঝাপটিয়ে আবছা আলোর মধ্যে দ্রুতবেগে পালিয়ে যায়।

হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম বন্ধুর মুখের দিকে। সে মৃদু হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলে— যাক্ বাঁচা গেছে। এসো এবারে আমরা বসি।

মনটা আমার খারাপ হয়ে যায়। এই দুর্যোগের মধ্যে ওরাও সম্ভবত এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা এখানে এসে ওদের নিরাশ্রয় করলাম।

স্নো পিজিয়ন দেখতে অনেকটা পায়রার মতো। এদের পিঠ তামাটে বর্ণের। মাথাটা কালো। ডানার ওপর কালো কালো তিনটে মোটা দাগ থাকে। গলার নিচের দিকের অংশটি সাদা।

গ্রীষ্মকালে এদের চৌদ্দ-পনের হাজার ফুট উঁচুতে হামেশা দেখতে পাওয়া যায়। ওরা দলবদ্ধভাবে থাকতে ভলোবাসে। বাসা বাঁধে পাহাড়ের মাথায় যেখানে

শিয়াল পৌঁছতে পারে না। এরা সাধারণত বার্লি বা অন্যান্য খাদ্যশস্য খেয়ে জীবন ধারণ করে।

স্নো পিজিয়ন দিনে একবার হলেও নীচের শস্যক্ষেত্রে যাবেই যাবে। ব্লুরক্ পিজিয়নের সঙ্গে স্নো পিজিয়নের অদ্ভুত চরিত্রগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদের গলা, বুক ও পেটের পালকের রঙ সাদা।

বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে বহু মরসুমী পাখির ভিড় দেখা যায় হিমালয়ে। ময়না, লম্বা লেজওয়ালা প্যারাকিট, পিঙ্গলবর্ণের ছাতারে, বাবলার প্রভৃতি তাদের মধ্যে অন্যতম। পক্ষীবিজ্ঞানীদের মতে সারা ভারতবর্ষে প্রায় বারো'শ প্রজাতির পাখি আছে। তাদের আবার বহু শাখা-প্রশাখা। শুধুমাত্র সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, স্বভাব চরিত্রে তারা এত বিভিন্ন যে কোনো মানুষের পক্ষে এককভাবে তাদের প্রত্যেকটিকে চেনা বা জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া সব পাখিই যে সব সময় দেখা যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একজন শখের 'বার্ড ওয়াচারের' কথা। তিনি সুদীর্ঘ প্রায় তিনমাস আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে কাটিয়েছিলেন। এবং এই সময়ের মধ্যে আমরা বিভিন্ন উচ্চতার মধ্যে দিয়ে প্রায় শ'তিনেক মাইল পথ হেঁটেছিলাম। আমি যখনই তাঁকে দেখতাম, লক্ষ্য করতাম তিনি নোটবুক, পেন্সিল, বাইনাকুলার নিয়ে কোনো জঙ্গলের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন অথবা কোনো পাহাড়ের মাথায় উঠে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। পাখি দেখার জন্য তিনি যে কী অসম্ভব পরিশ্রম করতেন তা সঠিকভাবে বলে বোঝানো যাবে না। বলতে দ্বিধা নেই মাঝে মাঝে এসব দেখেশুনে আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগত। আবার তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা, ত্যাগ, একাগ্রতা ও সহ্যশক্তি দেখে শ্রদ্ধা হত খুব।

অভিযান শেষ করে দিল্লীতে ফিরে আসার পরে একদিন কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম — এ যাত্রায় আপনি কত রকমের পাখি দেখলেন?

ভদ্রলোকের জবাব শুনে সেদিন আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন — কত আর হবে? খুব বেশী হলে কুড়ি-পঁচিশ রকমের।

আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম থিয়াংবোচির আকাশে। দুটি গ্রিফন তাদের বিস্তৃত ডানা মেলে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছিল। ভয়ডর-শূন্য কেমন যেন নির্বিকার চিত্ত। আমি সাগ্রহে লক্ষ্য রাখছিলাম গ্রিফন দুটি কখন ঘুড়ির মত

গোত্তা খেয়ে নীচের দিকে নেমে আসবে শিকার ধরতে। কিন্তু না— তাদের অবতরণের সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখার সুযোগ তারা আমাকে দেয় না। বরং তারা ক্রমশই আরো উপরে উঠে যায়।

অনতিদূরে দুর্ধর্ষ সুন্দর আমাদাবলাম পর্বতশৃঙ্গ। তার মাথায় চাঁদোয়ার মতো একফালি পাতলা মেঘ ছিল। হাওয়ায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে এক সময় সেই চাঁদোয়া অন্তর্হিত হয়ে গেল। কিন্তু গ্রিফন দুটি নিজেদের কক্ষপথেই ঘুরে চলে শ্রান্তিক্লান্তিহীনভাবে।

মনে পড়ে যায় সেই পক্ষীপ্রেমিকের একটি কথা। তিনি বলেছিলেন ওরা সবসময়ই যে শিকার করার জন্য আকাশে ওড়ে তা কিন্তু নয়। খেলার ছলেও ওরা অনেক সময় দূর আকাশে চলে যায়। তাতে যে ভারি আনন্দ।

শুরু হয় আমার পথচলা। চারিপাশে গগনস্পর্শী তুষারাবৃত পর্বতমালা। তার পদপ্রান্তে উপত্যকার ঢালে সবুজশ্যামল বনানী। পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। জনমানবহীন পথ। স্নিগ্ধছায়া শান্ত সুনিবিড়। প্রকৃতির প্রশান্ত নিভৃতি।

অনেক নীচ দিয়ে গভীর গিরি খাতের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে দুধকোশী নদী। পথের ওপর থেকে তাকে ঠিক দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কেবল দমকা হাওয়ায় ভেসে আসে তার উচ্ছল কলরব।

শেষবারের মতো পিছন ফিরে দেখি। নীল পাইনের ফাঁকে থিয়াংবোচি মঠের চূড়া উঁকি দিচ্ছে। দেখা যায় নিকশা কালো চোর্তেনের অগ্রভাগ। তারও শেষে ভুবন আলো করা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত — এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফুট)। শান্ত, স্থির, মহান, তুষার শিখর। তাকে ঘিরে আরো সহস্রবাহু পর্বতমালা। আনত মস্তকে দন্ডায়মান। যেন প্রেমভিক্ষাপ্রার্থী।

অবনত হয়ে আসে আমারও মস্তক। আনন্দময় গভীর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে মন। পথের বাঁকে বিদ্যুৎ চমকের মতো আবির্ভাব হয় পাখিদের। ক্ষণিকের জন্য চোখাচোখি। কী ভাষায় যেন তারা কথা বলে পরস্পর। তারপর আবার উধাও হয়ে যায় চোখের পলকে।

আমি মনের আনন্দে পাহাড়ের উপর দিকে উঠতে থাকি। হিমগিরির দুর্গম গোপন-পুরে। সুরলোকের সন্ধানে।

শিশির ঘোষ

লাহুল সিংহের সন্ধানে

প্রিয় শিশির,

ক্যামপ টু-এর জায়গায় আজ ঠিক করে এসেছি। কাল দখল নেব। কিছু কেরোসিন, মিলক্ পাউডার, সামান্য চাল ও চিনি, টিন ফুড্স কয়েকটা সঙ্গে দিয়ে কাল খুব ভোরে লেবদরাম আর কাশিমিরী সিংকে ওপরে পাঠিও। ওরা ক্যামপ ওয়ান-- এ পৌঁছবার পর আমরা ক্যামপ টু-এর দিকে এগোবো। কাজেই ওরা যেন খুব ভোরে স্টারট্ করে। আবহাওয়া বেশ ভালই চলছে আর সকলে বেশ ভালই আছি। সাপ্লাই যেন ঠিকমত পাই লক্ষ্য রেখ।

শুভেচ্ছান্তে নিতাই।

নিতাই-এর ছোট্ট চিঠিটার গুরুত্ব বুঝে সেই রাতেই মালপত্র ঠিক করে বোঝা তৈরি করে ফেললাম। ওদের লড়াইয়ের রসদ ঠিক মত যোগাতে না পারলে সব পরিশ্রম হয়ত মাঠে মারা যাবে। এক কথায় আমাদের ওপর ভরসা করেই ওরা এগিয়ে চলেছে। ফরমায়েশ মাফিক রসদ জোগান দিতে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আমরা বেস ক্যামপ থেকে মাল তুলে এনে অ্যাডভ্যান্স বেস-এ মজুদ করে রেখেছি।

অ্যাডভান্স বেস ক্যামপে আমাদের খুবই একঘেয়েমী আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছিল। সব সময়েই ভাবছি এই বোধহয় কেউ সাফল্যের খবর নিয়ে এসে পড়বে। এরই মধ্যে সনাতন, অসিত মৈত্র, মানস আর স্বপন অ্যাডভান্স বেস-এ একরাত কাটিয়ে ওপরে চলে গেছে। তাঁবু কম থাকায় ওরা অ্যাডভান্স বেস থেকে একখানা তাঁবু খুলে নিয়ে গেছে। ফলে সুভাষ, ডাক্তার আর আমি একই তাঁবুতে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছি। বেচারা অমর সিং রান্নাঘরের এক কোনে রাত কাটাচ্ছে।

আরে দেখ্ দেখ্, ওটা কি বলতো ? আরে একটা নয়, দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুশান্ত শীঘ্রি বাইনাকুলারটা আন।'

'হল টা কি ? এত উত্তেজনা কিসের ?'

'সামনে দেখুন। হলদে হরিণের মত ওগুলো কি বলুনতো।'

'ওঃ আচ্ছা। ওগুলো আইবেক্স। কস্তুরী হরিণ আর ব্লাক বাক বা কালো ছাগলের মিলনে ওদের জন্ম। রিনজিং বলছিল স্থানীয় লোকেরা বলে টাংগরোল। গাড়োয়ালে বলে শুনতাম ভোরাল।'

'ডাক্তার তুই এমন চ্যাঁচালি, ভাবলাম কি না কি? সেদিন বেস ক্যামপ থেকে আসার পথে একটা দল দেখেছিলাম। একটু একটু দাড়ি আছে। ভাল করে দেখলে বুঝতে পারবি।'

'এই নে নে, এবার মাল ওঠা। অনেক বেলা হয়ে গেল। শোন সঞ্জয়, যদি পারিস একটা টাংগরোল ধরে বেঁধে রাখিস। আমরা ঘুরে আসছি।'

'পাথর পড়ে এত মাউন্টেনীয়ার মরে, আর একটা টাংগরোল মরে না?' ডাক্তার কপট আক্ষেপ প্রকাশ করল।

হাসতে হাসতে রুকস্যাকগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে সকলে ওপরের দিকে এগিয়ে গেল।

ওদিকে ওপরে নিতাই, কেশব আর অসিত রায় তিনজন পোর্টার সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। নিতাই-এর ডাইরী থেকে, "২৪ শে জুন সকালে আকাশ পরিস্কার। ১ নং শিবির থেকে কুলু পুমোরী, হোয়াইট শ্যেল, স্নো ডোম এবং আরও অনেক অনামী শিখর দেখতে পাচ্ছি। ছোওয়াং থোনডু আর লেবদরাম অগ্রবর্তী মূল শিবির থেকে প্রচুর খাবার ও অন্যান্য জিনিষ নিয়ে এসেছে। খাওয়া সেরে আমরা সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। বড়া শিগরী হিমবাহের উপর প্রথম যে বাঁক, সেই বাঁকের নালা ধরে উপরে উঠে যেতে লাগলাম।

বড়া শিগরী হিমবাহ থেকে চড়াই ধরে উঠতে প্রথমে নুড়ি পাথরের ঢাল (Scree slope) পরে নালার পাশের বালির উপর দিয়ে লায়ন হিমবাহের মুখে পৌঁছে আমরা ২নং শিবির করলাম। বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া দাওয়া সারলাম। তারপরে সকলে মিলে অলোচনা করে ঠিক করলাম রিনজিং ও অন্যান্যরা কাল নীচে ১ নং শিবিরে ইক্যুইপমেনট ও খাবার দাবার আনতে যাবে। কেশব, অসিত আর জাংবো ২নং শিবিরে বিশ্রাম নেবে। শেরিং নামগিয়াল আর আমি ৩ নং শিবিরের রাস্তা দেখতে যাব।

২৫শে জুন সকালে রিনজিং-রা নীচে নেমে গেল। রিনজিং-এর হাতে নীচের

সদস্যদের দেবার জন্য একটা চিঠিতে আমাদের অগ্রগতি জানিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি আর শেরিং নামগিয়াল বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ক্যামপের ডানদিকের আইস ওয়ালটা পাস কাটিয়ে পাথরের ওপর উঠলাম, ওইখানে দাড়িয়ে লায়ন হিমবাহের উপরের দিকটা এবং স্নো ডোমের ছবি নিলাম। লায়ন হিমবাহের উপর দিয়ে চলতেচলতে দুপুরে সেনট্রাল শৃঙ্গের রক্ রিজ —এর তলায় এসে পৌঁছিলাম। রক্ রিজ পেরিয়ে বরফের খাড়াই দেওয়াল এড়িয়ে অসংখ্য ফাটলে ভরা একটা বরফের ময়দানে এসে দাঁড়ালাম। বরফের অবস্থা ভাল থাকায় স্নো ব্রিজ (বরফ জমে তৈরী পুল) পার হয়ে পৌঁছালাম ময়দানের প্রান্তে আরও বড় আর আরও খাড়াই একটা বরফের দেওয়ালের নীচে। আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে ঘুরে দেওয়ালটার মাথায় উঠলাম। বরফের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বরফের ময়দানে লায়ন হিমবাহে ৩ নং শিবির (১৮,৬০০ ফুট) স্থাপন করলাম। শিবিরের ঠিক সামনেই লায়ন আর সেনট্রাল শৃঙ্গ দুটি দেখে আমরা আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। লায়ন হিমবাহ দক্ষিণমুখি। অসংখ্য ফাটলের খাঁজ বোঝা গেলেও নতুন তুষারপাতের ফলে ফাটলগুলি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

২৬শে জুন আমরা ৩ নং শিবিরের দখল নিলাম। ২৭শে আবহাওয়া খুব খারাপ হয়েছিল। ক্রমশ আবহাওয়া ভাল হোতে আমরা তিনটে রোপে ছ'জন বেরিয়ে পড়েছিলাম লায়ন শৃঙ্গের উদ্দেশ্যে।'

'সত্যি শিশির, শেষ কটা দিন ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে পারিনি! সেই কদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম গিয়েছে।' অভিযানের শেষে বেস ক্যামপে ফিরে কথা প্রসঙ্গে একদিন নিতাই আমাকে বলেছিল।

'তারিখটা ২৭শে জুন। সকাল বেলা ঘুম ভাঙল। তখন আবহাওয়া বিশেষ ভাল নয়। চারদিক অন্ধকার করে আছে আর সামান্য সামান্য বরফ পড়ছে। আস্তে আস্তে আবহাওয়া ভাল হল। আকাশ বেশ পরিস্কার, সকালের হলুদ রোদে চারদিক ঝল্‌মল্ করছে। আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে তাঁবু ছেড়ে আমরা লায়ন শিখরের দিকে চললাম। তিনটে রোপে তিন দল। আমি আর জাংবো, নিতাইদা আর শেরিং নামগিয়াল, রিন্‌জিং আর কেশব — অসিত রায় শিখর জয়ের বর্ণনা দিচ্ছিল আমাকে।

লায়ন শিখরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের গিরিশিরা পথে আমরা শিখরের দিকে

যাওয়া ঠিক করেছিলাম। ক্যামপ ছেড়ে বেরোবার পর কিছুক্ষণ রাস্তা বেশ ভালোই ছিল। ক্রিভাসগুলো (ফাটল) নতুন বরফে ঢাকা পড়ে আছে। মোটামুটি বেশ আনন্দেই চলছিলাম। কিন্তু তারপর ফাটলের মুখ খোলা, চারিদিকে ছড়ানো মাকড়সার জালের মত। কোথাও কোথাও ফাটলের মুখগুলো আবার পাতলা বরফের চাদরে ঢাকা। জোসেফিন স্কার-- এর দেখা লায়ন-- এর সঙ্গে আমাদের চোখ যেন ঠিক মিলছে না। এর কারণ অবশ্যই নতুন তুষারপাত । দক্ষিণ-পশ্চিম গিরিশিরার ওপরের কুঁজটা (হামপ্) বরফে ঢাকা। কুঁজটার বাঁ পাশে ছোট্ট একটা ধস নেমে বেশ কয়েকটা ফাটলের মুখ খুলে গিয়েছে। সামনে খাড়াই গিরিশিরাটা নরম বরফে ঢাকা। প্রায় হাটুঁ পর্যন্ত বরফে ঢুকে যাচ্ছে। রক্ ফেস্গুলো বেশীরভাগই বরফে ঢেকে আছে। সত্যি বলতে কি, অসময়ের এই তুষারপাত আমাদের কাছে শাপে বর হয়েছিল। রুপালী বরফের ওপর সোনালী রোদ পড়ে চারদিক ঝক্মক্ করছে। যত ওপরে উঠছিলাম ততই আশপাশের সব পাহাড়গুলো পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

বেসিক ট্রেনিং ছাড়া আমার আর কি-ই বা অভিজ্ঞতা বলুন। তার ওপর মাত্র এক দেড় হাত চওড়া রিজ্ (গিরিশিরা) ধরে হাঁটা। কেবলই মনে হচ্ছিল পা হড়কে হয়ত ছিটকে গিয়ে নীচে পড়ব। প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছিল। পা দুটো ক্রমশঃ ভারী ঠেকছিল। পা যেন আর টানতে পারছিনা, কয়েক মন করে যেন ওজন। কয়েক পা হেঁটেই আইস-অ্যাকস্-- এ ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে বুক ভরে নিশ্বাস টানছি। ঠিক জল থেকে তুলে আনা মাছের মত অবস্থা। নিতাইদা চলতে চলতে মাঝে মাঝে উৎসাহ দিচ্ছেন, 'চলে এস, আর সামান্য পথ বাকী।' একটু দম নিয়ে অসিত আবার শুরু করে।

'সামান্য পথ বাকী সেটা আমিও বুঝতে পারছি কিন্তু শরীরটা যে সে কথা বুঝতে ঠিক রাজী নয়। খুব সামলে সমঝে হাঁটছি। চমক ভাঙ্গল নিতাই দা'র ডাকে —'সোজা চলে এস, টপে পৌঁছে গেছি। মুখটা তুলে দেখি নিতাই দা হাসি হাসি মুখে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। সে যে কি আনন্দ ঠিক গল্প করে বোঝাতে পারব না। পিক্-- এ তো আপনিও উঠেছেন, কাজেই আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন তখনকার আনন্দটা সম্পূর্ণ মনে মনে উপভোগের ব্যাপার। তবে একটা কথা ভেবে খুবই আনন্দ পাচ্ছিলাম, সেটা হল—এই পিক্--এ আমরাই প্রথম ভারতীয় দল।' একনাগাড়ে কথা বলে অসিতকে যেন একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

'আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করলাম। তারপর দেখি নিতাইদা ছবি তুলতে ব্যস্ত, অন্যেরা বিশ্রাম নিতে আছিল। আমি অবাক হইয়া চারদিকে তাকায়ে দেখি। মনটা যে তখন কোথায় আছিল, ঠিক হদিশ আছিলনা।'— ভাবুক কেশব সেই আনন্দের মুহূর্তে নিজের অনুভূতির বর্ণনা দেয়।

হঠাৎ নিতাই-এর গলার স্বর শুনে ওর দিকে ফিরে বসি। ও শুরু করে, 'আসার সময় কেউ কেউ বলেছিল, মেয়েরা যে শিখরে উঠেছে তোরা সেই শিখরেই যাচ্ছিস্। তাই ভাবলাম— সেই মেয়েরা অর্থাৎ জোসেফিন স্কারের দল যা করেনি, ছেলে হয়ে সে রকম কিছু একটা করা যাক। সেই কারণেই দক্ষিণ-পশ্চিম রিজ্ ধরে টপে উঠে আমরা উত্তর-পূর্ব রিজ্ ধরে নীচে নেমে এলাম। অবশ্য কিছুটা রক্ ক্লাইমব করতে হয়েছিল, ওই পথে নামতে গিয়ে।

সনাতন এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল। নিতাই-এর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ও আরম্ভ করল, 'সে কি দারুন ব্যাপার শিশির-দা কি বলব। আমরা সবে সামিট ক্যামপ-এ পৌঁছেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম লায়ন পিক্ ক্লাইমব হয়েছে।' আমার অবস্থা ভাবতে পারছেন ? আনন্দেও লোকে নাকি কাঁদে— কথাটা কেবলমাত্র শুনেছিলাম। সেদিন কিন্তু আনন্দে ওদের জড়িয়ে ধরে আমি নিজেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম'।

'আমার মতে লায়ন পিক্-এ দ্বিতীয় দল পাঠান হোক'— লায়ন পিক্ ক্লাইমব হয়ে গিয়েছে, এবার সেনট্রাল পিক্ ক্লাইমবের আগে তিন নমবর ক্যামপের জরুরী মিটিং-এ দলের ডেপুটি লীডার অসিত মৈত্র তার মতামত জানাল।

'তাতে কিন্তু বেশ অসুবিধা রয়েছে। পোর্টাররা এক নাগাড়ে বহুদিন খেটেছে এবং ওরা কালকের দিনটা বিশ্রাম চাইছে। লায়ন-- এর সাকসেস্ফুল মেম্বারদের আমি সেনট্রাল পিক্ অ্যাটেমপট্ করার জন্য তৈরী রাখতে চাই। কাজেই, লায়ন পিক-এর টপ্-এর রাস্তা জানা লোককে কিন্তু দ্বিতীয় দলের সঙ্গে দেওয়া যাচ্ছেনা। সেটা বড় বেশী রিস্ক নেওয়া হয়ে যাবে না কি? তাই বলছিলাম কি,আবহাওয়া যখন ভাল, খাবার দাবার যখন তিন চারদিনের মত ক্যামপ থ্রি-তেই মজুত রয়েছে, আর মেম্বাররাও ফিট্ তখন আমরা আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য সেনট্রাল পিক-এর (২০,৬২০ ফুট) ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়িনা কেন?'— লীডার সনাতন পরিস্কার বক্তব্যে সমস্যাটা সকলকে বুঝিয়ে বলল এবং সকলেরই সমর্থন চাইল।

শেষ পর্যন্ত সনাতনের সাজেশনই সকলে মেনে নিল। পরের দিন সকলের জন্যই বিশ্রাম। নিতাই কিন্তু রিনজিং আর শেরিং নামগিয়ালকে রাজী করিয়ে সেনট্রাল পিক্-এর রাস্তা ভাল করে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

'বুঝলে শিশির, লায়নের টপ্ থেকে বাইনো দিয়ে সেনট্রাল পিক্ বেশ ভালো করে দেখেছিলাম। তবে সত্যি কথা বলতে কি অতদুর থেকে দেখা পথে অতগুলো লোক নিয়ে যেতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। তাই সেদিন আরাম করার সুযোগ নিতে মন চাইল না বলে রাস্তা দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম এবং পরে বুঝেছিলাম যে ভালই করেছিলাম।'— কথা শেষ করে নিতাই সুপের মগে চুমুক মারল।

'রাস্তা দেখতে যাওয়াটা আপনার ছুতো, আসলে শুয়ে বসে থাকাটা আপনার ধাতে সয় না। কদিন ধরে দেখলাম তো, না নিজে শুয়েছেন বসেছেন, না আমাদের একটু সুযোগ নিতে দিয়েছেন। বাপ্‌রে, একেবারে নাক্‌সে দম বার করে দিয়েছেন।'— কেশবের কথা শুনে আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

পাহাড়ে চড়ার সময় পথঘাট খতিয়ে দেখে নিয়ে এগোন বাঁধাধরা নিয়ম। প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতা যথার্থ বিশ্লেষণ করে লড়াইয়ে নামাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ম্যালোরী বলতেন, 'রিকনয়টার, রিকনয়টার, অ্যানড্ রিকনয়টার।' নিরীক্ষণ কর, আরও ভাল করে নিরীক্ষণ কর, তারপর সমস্ত শক্তি নিয়ে পাহাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়।

এদিকে নীচে (অ্যাডভানস্ বেস্ ক্যামপে) আমরা তখন বেশ ফাঁপরে পড়েছি। সনাতনরা আমাদের কাছে খারাপ একটা স্টোভ গছিয়ে দিয়ে একটা ভাল স্টোভ সঙ্গে নিয়ে ওপরে চলে গিয়েছে। লামা এবং অমর সিংকে কয়েকবার বাতাল পাঠাতে হয়েছে কেরোসিন, চিনি, আলু আনার জন্য। আবার স্টোভ সারানোর জন্যে পাঠাতে হল। বাতালের গুপ্তা সাহেব আমাদের স্টোভ দুটো সারাবার জন্যে কাজায় পাঠিয়ে নিজের স্টক্ থেকে একটা স্টোভ পাঠালেন আমাদের ব্যবহারের জন্যে।

— দেখছি কোয়ার্টার মাস্টার হয়ে খুবই বোকামী করেছি। এই দেখ্ সুশান্ত, ওপর থেকে লিস্ট পাঠিয়েছে টিনড্ মীট, বাটার, হরলিকস্ আর ড্রাইফ্রুট্স পাঠাবার জন্যে। ওরাতো লিস্ট পাঠিয়েই খালাস, এখন আমি মাল কোথায় পাই? আমার স্টকে আর তো বিশেষ কিছু নেই। গত চিঠিতে ওদের পরিস্কার করে আমার স্টক পজিশন জানিয়ে দিয়েছিলাম।

— যা আছে তার থেকে সামান্য কিছু পাঠিয়ে দে, যত পারিস লিকুইড ড্রিংকসগুলো পাঠা। স্টোভ জালিয়ে সামান্য একটু গরম জল করেও ওগুলো খেতে পারবে।

— এই ওপর থেকে কে যেন নামছে মনে হচ্ছে। একটু ওপরে এগিয়ে দেখ তো।

— মনে হচ্ছে পোর্টাররা কেউ। আর বাপু সাপ্লাই আমি দিতে পারব না। এবার আমায় কেটে মাংস সাপ্লাই দিতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাশমিরী সিং ক্যামপের কাছে পৌঁছে গেল 'সাব, এক টপ লে লিয়া।' কাশমিরী সিং আনন্দে নাচছে। আমাদেরও সেই অবস্থা। সুশান্ত ধাঁ করে কাশমিরী সিংকে দশ টাকা বক্‌শিস্ দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম। অমর সিং তখনই বাতালের দিকে নেমে গেল টেলিগ্রাম সঙ্গে নিয়ে।

সেনট্রাল পিক্ ক্লাইমবিং-এর গল্প পথ চলতে চলতে কেশবের মুখে শুনলাম। বেসিক ট্রেনিং নেওয়ার পর এটাই কেশবের প্রথম অভিযান। কেশব লায়ন এবং সেনট্রাল দুটো পিক্-ই ক্লাইমব করেছে।

'একটা কথা ঠিক, লায়ন আমাদের তেমন মারাত্মক কোন বাধা দেয়নি। সে তুলনায় সেনট্রাল হাজার রকম প্রতিরোধের দেয়াল খাড়া করেছিল আমাদের সামনে। সেনট্রাল পিক্-এর গঠনই হচ্ছে তার প্রথম প্রতিরোধ। সারা পাহাড়টাই গির্জের চূড়োর মত ছুঁচলো পাথরের কঠিন স্তুপ বললেই চলে। তার উপর লায়ন আর সেনট্রাল পিক্-এর মাঝের গলি দিয়ে বহে আসা প্রচন্ড হাওয়ার কল্যাণে পাথরগুলো কিছুটা ঝুরো ঝুরো। কোথাও কোথাও পাথরের গা সজারুর কাঁটার মত খোঁচা উঁচিয়ে বসে আছে। তবু রক্ষে এই যে, নতুন বরফ পড়ায় শেষের চার পাঁচশো ফুট ছাড়া প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা ছিল। তবে কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে চার পাঁচশ ফুট রুক্ষ পাথর বেয়ে উঠতে আমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়েছিল।'

'কি রে কেশব তুই যে মাঝপথ থেকে শুরু করলি, গোড়ার কথা কিছু বল'—অসিত মৈত্র কেশবকে বাধা দেয়।

'ঠিক আছে গোড়ার কথাটা তুমিই বল না'—অসিত মৈত্রকে উৎসাহিত করি। তখন অসিত শুরু করে।

'লীডারের কথামত সকাল আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। তিন নম্বর ক্যামপ থেকে সেনট্রাল পিক্-এর কোল পর্যন্ত পরিস্কার বরফের ময়দান। প্রথমদিকে ক্রিভাসগুলো বরফে ঢাকা ছিল, ক্রমশঃ সূর্যের তাপে বরফ গলে ফাটলের মুখগুলো খুলতে শুরু হয়েছে। এদিক ওদিক কয়েকটা ক্রিভাস পার হওয়া ছাড়া বিশেষ চড়াই-উৎরাইও নেই। খানিকটা যাবার পর মানস 'শরীর খারাপ লাগছে' বলে ফিরে গেল। বাকী সকলে হাঁটতে শুরু করেছি এমন সময় স্বপন 'পেট ব্যাথা করছে' বলে ফিরে গেল। ওরা দুজনে ফিরে যাওয়াতে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দলের মরোল একটু যেন ঝুলে গিয়েছিল।

ওদের ফেরার পথে তেমন কোনও বিপদ ছিল না বলে ওদের সঙ্গে আমরা কেউ আর ফিরলাম না। গ্লেসিয়ার ধীরে ধীরে উঠে এসেছে তিন নম্বর ক্যামপ থেকে সেনট্রাল পিক্-এর ঠিক কোল পর্যন্ত। গ্লেসিয়ারের ধরণ দেখে অবশ্য বহু ফাটলের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নতুন বরফ পড়ায় সব ফাটলগুলোই ঢাকা পড়ে গেছে। জোসেফিনের বইতে ঠিক এই জায়গারই একটা বিভৎস ছবি আছে। সারা অঞ্চল জুড়ে জালের মত লম্বা লম্বা ফাটল। নরম বরফে ঢাকা এই ফাটল খুব নিরাপদ নয় কিন্তু বরফের অবস্থা দেখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে খুব সহজে ধসে পড়বে না।

তিনটে দড়িতে আমরা আটজন। প্রথম দড়িতে আমি, নিতাইদা আর শেরিং নামগিয়াল। নামগিয়ালের সারা চেহারার কোথাও কোন উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই। ও যেন ওর কাজ করতে পারলে হাঁফ ছাড়ে। নিতাইদা, আমাদের ভাষায় 'হাফ শেরপা' পা যেন বাড়িয়ে রয়েছে চূড়ায় পৌছাবার জন্যে। আমার মনে প্রচন্ড উত্তেজনা। কিছুটা ঘাবড়েও গিয়েছিলাম সেনট্রালের রক্ ক্লিফ (খাড়া পাথরে খোঁচ ভরা দেয়াল) দেখে।

দ্বিতীয় দড়িতে রিনজিং আর অসিত রায়। বেচারা অসিত একান্ত বাধ্য ছেলের মত দাঁড়িয়েছিল, যখন রিনজিং ওর কোমরে দড়ি বাঁধছিল। নিতাই রিনজিংকে একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলতে বলার সঙ্গে সঙ্গে রিনজিং ওর স্বভাব অনুযায়ী বলে উঠলো, 'ফিকির মৎ করো সাব। তুমলোগ আগে চলো ম্যায় পিছে পিছে চলতে রহেগা।' বিচিত্র লোক এই রিনজিং! ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কয়েকটা মাত্র টাকার কিন্তু আমাদের জন্য ওর উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। ওর কোনও ক্লান্তি

নেই, আর কোন সময়েই ও মুষড়ে পড়ে না। সমস্ত ব্যাপারেই ওর একটাই শ্লোগান, 'ফিকির মৎ করো সাব।'

তৃতীয় দড়িতে কেশব, জাংবো আর ছোওয়াং থোনডু। জাংবোর মুখে হাসি আমি কখনও দেখিনি। কথা বলে কম কিন্তু কাজের ব্যাপারে কোনও গাফিলতি নেই। থোনডু ওদের দলের অন্যান্য সকলের থেকে কিছুটা অনভিজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল। ও সমস্ত কমজোরি মিটিয়ে দিত শরীরের তাখত আর অমায়িক ব্যবহারে। আমাদের দলের সকলেরই একান্ত অনুগত ছিল থোনডু। বিনা প্রতিবাদে প্রত্যেকের ফরমায়েশ খেটে যাওয়াই যেন ওর জীবনের ব্রত।'

থমকে গিয়ে একবার পিছনে ফিরে গ্লেসিয়ারের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার অসিত শুরু করে, 'সেনট্রাল পিক্-এর শিরা বেয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব দেখে আমরা লায়ন আর সেনট্রাল পিক্-এর মাঝের গলিটায় ঢুকে পড়ে দক্ষিণ দিকের গা বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। নরম বরফে ঢাকা পথ ধরে বেশ কিছুটা উপরে উঠলাম। এ চলায় তেমন পরিশ্রম হচ্ছে না, ঝুঁকিও বেশ কম। বিশেষ কোন ফাটল নেই, চড়াই তেমন কিছু নয়।

বেশ কিছুটা চলার পর শক্ত বরফের এলাকায় গিয়ে পৌছালাম। প্রত্যেকটি পা বেশ হুঁশিয়ার হয়ে ফেলতে হচ্ছে। সামান্য একটু বে-খেয়াল হলেই পা হড়কাচ্ছে। দু' একবার আছাড় খেতে খেতে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। এই দেখে নিতাইদা সকলকে ক্র্যামপন বেঁধে নিতে বললেন। ক্র্যামপন বাঁধার পর আবার আর এক অসুবিধে দেখা দিল। বরফের মাঝে কোথাও কোথাও স্রেফ পাথরের খাড়াই দেয়াল। সেখানে ক্র্যামপন বেঁধে উঠতে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। আবার হয়ত সামান্য একটু দুরেই শক্ত বরফ মাড়িয়ে চলতে হচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে সেনট্রালের বিচিত্র এক গঠন। ওই অবস্থার মধ্যে দিয়েই খুব সাবধানে উঠে চলেছি এমন সময় গেল আমার ক্র্যামপনটা ভেঙে।'

কাছেই ছিল নিতাই। অসিতের শেষ কথা ওর কানে যেতে ও যেন লুফে নিল কথাটা, 'সেই সময়ে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তার থেকেও বড় কথা অসিতের মুখের করুণ অবস্থা দেখেই আরও বেশী খারাপ লাগছিল আমার। হতাশায় ওর সারা শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়ছিল। ভাবলাম এই পরিস্থিতিতে ওকে এখানে একা ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যে কোন উপায়ে ওকে নিয়ে যেতে হবে

চূড়ায়'।

'নামগিয়ালকে এগিয়ে যেতে বলে আমি অসিতকে বিলের সাহায্যে প্রায় হিঁচড়ে তুলতে থাকলাম। এক পায়ে ক্র্যামপন না থাকায় অসিত নিজের ওপর বিশেষ আস্থা রাখতে পারছিল না। বহুবার হড়কে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওপর থেকে দড়ি ধরে ওকে টেনে তুলেছি। ও একটু ভাল জায়গায় পৌঁছলে আমাকে বিলে করতে বলে আবার এগিয়ে গিয়েছি। পিছল বরফের ঢালের ওপর দিয়ে ওকে প্রায় টেনে তুলে এনে আবার আমি এগিয়ে গিয়েছি।'

'বাকী পথটা এইভাবে পার হয়ে এসে আমরা খাড়াই পাথুরে দেয়ালটার তলায় পৌঁছালাম। কুড়ি হাজার ফুটের ওপরে প্রায় পাঁচশ ফুট রক্ ক্লাইমবিং। বুঝতেই পারছ কি প্রাণান্তকর ব্যাপার। তার ওপর, সমস্ত দেয়ালটা এবড়ো খেবড়ো খোঁচ (পাথরের) ভর্তি। একবার সামান্য একটু হড়কালে ছাল-চামড়া উঠে একাকার হয়ে যাবে। তার থেকেও বেশী ভয়ের কারণ হোল উত্তর পশ্চিম থেকে বহে আসা প্রবল বাতাসের ধাক্কায় সমস্ত দেওয়ালটার পাথরগুলো খুবই আলগা এবং প্রায়ই হুড়মুড় করে পাথর গড়াচ্ছে।'

'নতুন রুটে সেনট্রাল ক্লাইমব করবে বাছাধন। এবার ঠ্যালা সামলাও'— সুভাষের ছোট্ট টিপ্পনিতে সকলেই হেসে উঠলো।

'এই সুভাষ তুই একটু সিরিয়াস হ তো। সব সময়ই তোর চ্যাংড়ামি'— সঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে দাবড়ে উঠলো সুভাষকে। শেষটা বল তো অসিতদা, ও চুলোয় যাক আমরা শুনবো।'

সঞ্জয়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে অসিত আবার বলতে শুরু করল, 'এবার নিতাইদা সকলের আগে, তারপর আমি এবং শেরিং নামগিয়াল। আমাদের পিছন পিছন বাকী সকলে একে একে উঠে আসছে। নিতাইদার মুখেই শুনেছিস যে পাথর তেমন শক্ত ছিল না। আঙ্গুল দিয়ে খিম্‌ছে ধরা পাথর প্রায়ই উবড়ে বেরিয়ে আসছে। এমনকি কখনও পায়ের তলার পাথরটা পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ছে। হাত পা বহু জায়গায় কেটে ছেড়ে যাচ্ছে। হাত পা যেন আর নড়তে চায় না। বুক ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়। কোথাও দাঁড়িয়ে যে একটু বিশ্রাম নেব, সে সাহসও পাচ্ছি না বা তেমন জায়গাও কোথাও পাচ্ছি না। এই পাথরের দেয়ালটুকু উঠতে আমাদের পাক্কা আড়াই ঘণ্টা লেগে ছিল।'

'একটা বেজে পাঁচ মিনিটে আমরা চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। লায়ন পিক-এ উঠতে সময় লেগেছিল তিন ঘন্টা পাঁচ মিনিট কিন্তু সেনট্রাল পিক্-এ আরও দু-ঘন্টা সময় পেশী লাগল। প্রচন্ড আনন্দে সেনট্রাল পিক্-এর উপর দাঁড়িয়ে বুক ভরে একটা শান্তির নিঃশ্বাস নিলাম। কি দারুণ আনন্দ যে তখন আমার হচ্ছিল তা তোদের বোঝাতে পারব না। আমাদের প্ল্যান সম্পূর্ণ সফল। দুটো চূড়োতেই আমরা উঠতে পারলাম। দুটো শিখরেই আমরাই প্রথম ভারতীয় দল। বেশীর ভাগই ছাত্র আর এন সি সি ক্যাডেট।'

ব্যাক্তিগত অনুভূতির ক্ষেত্রে একের সঙ্গে অপরের কখনও মিল হয় না। কেশব এবং অসিত মৈত্র — শিখরে পৌঁছানোর জন্য ওদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর ফারাক লক্ষ্য করেছি। ভাবলাম নিতাইকে একটু বাজিয়ে দেখি। চূড়ায় ওঠা ওর এই প্রথম নয়। এবারের এই আরোহণ ওকে কতটা নাড়া দিল? নাকি ও ভালমত নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরেই হালকা মেজাজে মশগুল হয়ে রয়েছে। নিতাইকে টোকা মারলাম। নিতাই তখন শুরু করলো —

ঠিক দুটোয় আমরা নামতে আরম্ভ করলাম। তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে এবং ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়তে শুরু হোল। যত নামছি ঝড়ের দাপটবাড়ছে, বরফ পড়ারও মাত্রা বাড়ছে। ভাবলাম এতদিন সেনট্রাল আর লায়ন নীরবে আমাদের বেয়াদপি বরদাস্ত করে এখন এই শেষ চোটে বোধহয় আমাদের এক হাত দেখে নিতে চায়।

বিপদ এড়াতে তাই আরও বেশী সাবধান হলাম। ওঠার সময় রক বাট্রেস ধরে বেশ উঠেছিলাম কিন্তু নামার সময় ছোট ছোট নুড়ির ওপর বরফ পড়ে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হোল। আমি সকলের সামনে, খুব সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছি আর পিছনের সকলকে সাবধান করছি। বাট্রেস পেরিয়ে এক একটা স্নো গালিতে এসে আরও অসুবিধেয় পড়েছিলো দলের সকলেই। শক্ত বরফের ওপর নরম বরফের প্রলেপ। একটু অসাবধানে পা দিলেই হড়কে বেশ কিছুটা নীচে পৌঁছে দিচ্ছে। বেশ তাড়াতাড়ি পথ পেরিয়ে যাচ্ছি সন্দেহ নেই কিন্তু হাঁ করে থাকা ক্রিভাসগুলো তো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কোথায় কোন অতল গহ্বরে গিয়ে পড়ি তার ঠিক কি! যাইহোক সকলেই যে শেষ পর্যন্ত নিরাপদে ফিরে এসেছি তা তো দেখতেই পাচ্ছো এক্সপিডিশন সাকসেসফুল আর সকলে সুস্থভাবে নিজের

পায়ে হেঁটে চলেছি, এর বেশি আর কী চাই? — কথা শেষ করে নিতাই আমার পিঠে বেশ জোরে এক থাপ্পড় মারলো। শিষ্টতা আর শালীনতার তোয়াক্কা না রেখে এমন প্রগলভ হতে নিতাইকে এর আগে আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নিতাই যে দারুণ খুশী হয়েছে সেটা ওর আচরণেই বুঝতে পারলাম।

অসিত মৈত্র তিরিশে জুন রিনজিংকে সঙ্গে নিয়ে সোজা এ্যাড-ভানস বেস ক্যামপ-এ নেমে এসে আমাদের সেনট্রাল পিক্ ক্লাইম্‌বের খবর শোনালো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গত কয়েক দিনের শুয়ে বসে থাকার এক-ঘেয়েমি ঝেড়ে ফেলে ডাক্তার আর সুভাষ উদ্যাম নৃত্য শুরু করে দিল। সুশান্ত খুবই খুশি, কিন্তু ডাক্তার-সুভাষের নাচের আসরে যোগ দিতে পারলে না। বোধহয় শরীর এখনও ওর ইচ্ছেয় বাধ সাধছে। সঞ্জয় জড়িয়ে ধরল অসিতকে আর রিনজিং আমাকে।

আমি তখন সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ভাবছিলাম অসিতের কথা। কি প্রচন্ড মনোবলের পরিচয় এই অভিযানে দিল, ভাবতেও অবাক লাগছিলো। রিনজিং অনেক কিছুই তখন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না।

অসিতের ডাকে আবার বাস্তবে ফিরে এলাম, অসিত তখন একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যন্ত্রের মত আমার হাতটা এগিয়ে গেল ওর শরীরের উপর। যেন ওর সশরীরে উপস্থিতির বাস্তবতা উপলব্ধি করতে চাইছে আমার হাতটা। অসিত ছোট্ট এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল আমার হাতে। খুলে দেখি সনাতনের চিঠি।

'প্রিয় শিশিরদা,

গতকাল নিতাইদা, অসিতদা, কেশব, অসিত রায়,রিনজিং, শেরিং নামগিয়াল, ছোওয়াং থোনডু এবং জাংবো বেলা একটা পাঁচ মিনিটে সেনট্রাল পিক ক্লাইমব করেছে। অসিতদার (অসিত মৈত্র) কাছ থেকে সবকিছু জেনে নিয়ে আপনি কাইন্ডলি সব জায়গায় ঠিকমত টেলিগ্রাম করে দেবেন। সকলেই সুস্থ আছি, কাল নীচে নামছি। আমাদের জন্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখবেন, সকলকে শুভেচ্ছা জানালাম।
ইতি — সনাতন।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবছি, টেলিগ্রাম করার জন্য অনুরোধ করতে হবে কেন! আনন্দ আমার মনে যে কতটা তা তোমাদের হয়ত বোঝাতে পারতাম

যদি কিছুক্ষণের জন্য আকাশবাণীর ব্রডকাসটিং স্পিকারটা হাতে পেতাম। আনন্দের তোড়ে এতক্ষণে অনেক গেরস্থের ঘরের কোণের রেডিও সেটটা ফাটিয়ে চৌচির করে দিতাম।

ওদিকে ডাক্তার আর সুভাষ এমন উদ্দাম নাচ শুরু করল যে বেচারা রিনজিং আর অমর সিং ভ্যাবাচাকা হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল। সুশান্ত আর সঞ্জয় কোথা থেকে একটা রসগোল্লার টিন বের করল, সকলকে মিষ্টি মুখ করাতে।

শম্ভুনাথ ঘোষ

কল্পেশ্বর

(ওঁ) নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামী চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর।।

চলেছি পঞ্চকেদাররের অন্যতম কেদার কল্পেশ্বর দর্শনে। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন কল্পনাথ। পুরাণে এই স্থানটিকে বলা হয়েছে কল্পস্থল বা কল্পকতীর্থ।

মাত্র এক মাইল পথ। কোথাও চড়াই উৎরাই নেই,—সোজা রাস্তা। পথে দু'একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল।

হেঁটেই চলেছি। ঘড়িতে দেখলাম মিনিট পনের হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এক মাইল রাস্তা আসা উচিত।

গ্রামের সর্বশেষ বাড়ীটিও ছাড়িয়ে গেলাম। কিন্তু কোথায় কল্পনাথ। যাত্রার পূর্বে মোহর সিং বলে দিয়েছিলেন যে কল্প-গঙ্গার উপর একটি ঝুলন্ত পুল আছে, সেটি পার হলেই কল্পনাথের মন্দির।

কিন্তু সে পুলেরও দেখা নেই। এদিকে রাস্তা ভুল হবারও কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ ওই একটিই পথ। লোকজনও দেখছি না যে কাউকে জিজ্ঞাসা করব। সাত পাঁচ ভেবে গ্রামের শেষ প্রান্তে যেখানে কয়েকটি ঘর রয়েছে সেই পর্যন্ত আবার ফিরে এসে হাঁকডাক সুরু করতে বেরিয়ে এল ৮/৯ বছরের একটি ছেলে। তাকে কল্পনাথের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে মহা উৎসাহে আমাদের নিয়ে চলল।

এই রাস্তাটুকু খুবই নির্জন,— একটা ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ। তপস্যার উপযুক্ত ভূমিই বটে। এই পরিবেশে মনে থাকে না কোনও চাঞ্চল্য। মনটি অসীমের মাঝে উধাও হয়ে যায়। এবার আমার প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটি সঙ্গে নেই। কিন্তু তাতে কি হয়েছে মনে উঠল সুরের গুঞ্জরণ,— প্রকাশ পেল কণ্ঠে। —

"তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই।
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।।

গান শেষ না হতেই পৌছে গেলাম কল্পগঙ্গার উপর সেই ঝোলা পুলটির

কাছে। পুলটি বর্তমানে বেশ বিপজ্জনক অবস্থায় আছে দেখলাম। পুলের উপর যে তক্তাগুলি পাতা সেগুলি বেশ নড়বড়ে। তেমন আশঙ্কার কিছু না থাকলেও পার হতে হল বেশ সন্তর্পণে।

পুল পার হয়ে কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙ্গে অবশেষে কল্পনাথের দ্বারদেশ উপস্থিত হলাম। এই স্থানটির উচ্চতা ৮০০০ ফুট। তখনই প্রবেশ না করে বাইরে বসলাম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে।

ভাবতে লাগলাম এই কল্পকতীর্থ মাহাত্ম্যের কথা। এই সেই মহাতীর্থ যেখানে শাপগ্রস্ত ইন্দ্র শাপমুক্ত হন এবং লাভ করেন এক কল্পবৃক্ষ।

অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা উর্বশী দুর্বাসা মুনিকে একটি ফুলের মালা উপহার দেন। দুর্বাসা আবার সেটি দেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। ইন্দ্র মালাটি রাখলেন তাঁর বাহন ঐরাবতের মস্তকে এবং ঐরাবত সেটি শুঁড় দিয়ে নামিয়ে পদদলিত করল। তাঁর মালার এহেন দুর্দশা দেখে কোপন-স্বভাব মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে 'শ্রীহীন হও' বলে অভিশাপ দিলেন। শ্রীভ্রষ্ট ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করলে সেখানে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন যে ইন্দ্র যদি মহাদেবের আরাধনা করেন তাহলেই তিনি শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গরাজ্যে ফিরে আসতে পারবেন।

দেবতাদের কাছে এই সংবাদ পেয়ে ইন্দ্র দেবাদিদেবের অনুসন্ধানে বের হলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলেন না। কারণ সতীর দেহত্যাগের পর নিদারুণ মনঃকষ্টে মহাদেব যে কোথায় আত্মগোপন করেছেন সে খবর কেউ জানে না। ইন্দ্র যখন মহাদেবকে পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন তখন দৈববাণী হল যে কল্পস্থলে দেবাদিদেব-- চির বিরাজমান এবং সেখানেই তাঁকে পাওয়া যাবে। এই দৈববাণী শুনে ইন্দ্র চলে এলেন মহাতীর্থ কল্পকতীর্থে। কঠোর তপস্যায় আশুতোষকে তুষ্ট করে তাঁর বরে তিনি শাপমুক্ত হন এবং একটি কল্পতরু লাভ করেন।

এই পুণ্যক্ষেত্র কল্পকেদারখন্ড নামেও পরিচিত। এই স্থানটি অনেক মহাত্মার সিদ্ধপীঠও বটে এবং কখনও কখনও এখানে তাঁদের দর্শনও পাওয়া যায়।

এবার কল্পনাথকে দর্শন করতে হবে। অতএব উঠে পড়তে হল। একটি বৃহৎ প্রস্তরখন্ডের নীচে বড় একটি প্রাকৃতিক গুহার মধ্যেই কল্পনাথের অধিষ্ঠান। কেদারনাথের মত একটি শিলাখন্ড। ছোট্ট পথপ্রদর্শকটি দেখি ইতিমধ্যে বাইরে

থেকে কয়েকটি বন্যফুল এনে হাতে দিল। গুহার মধ্যে একটি মাটির পাত্রে জলও রাখা ছিল। মনে হয় কল্পনাথের নিত্যপূজার জল। তবে পূজারীকে পেলাম না। অগত্যা সেই জল এবং ফুলকয়টি ভক্তিভরে কল্পনাথের মাথায় দিয়ে প্রণাম করলাম—ওঁ নমঃ শিবায়।

আয়োজন অতি সামান্য। কিন্তু হৃদয়ে এল ভক্তির প্লাবন। মনে হল অল্পেই তুষ্ট হন বলেই তো ইনি আশুতোষ। নিশ্চয়ই কল্পনাথের আশীর্বাদ পেয়েছি। নইলে মনে কেন জাগে এত আনন্দহিল্লোল। আর কি চাইবার আছে! এই তো পরম পাওয়া। জানি এ আনন্দ ক্ষণিক, তবুও এর রেশটি থাকবে সারাজীবন। কল্পনাথবে আবার প্রণাম করে বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম।

কাছেই একটি ঘরে দেখলাম একজন সাধু আছেন। ঘরের মধ্যে একটি মোটা কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে ঘরটি গরম রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথটি ছোট। মাথা নীচু করেই ঢুকতে হল। ঘরের মধ্যে ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করতে লাগল। তবুও বসে পড়লাম।

কথাবার্তা সুরু হ'ল হিন্দীতে। প্রশ্নোত্তরে তিনি বললেন যে তাঁর নাম শ্রীশ্রীঅজয়নাথ। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে তিনি কল্পনাথে এসেছেন। হিমালয়ে এত তীর্থস্থান থাকতে কল্পনাথে কেন এলেন জিজ্ঞাসা করাতে বললেন তাঁর জীবনের এক অকথিত কাহিনী।

সংসারী অজয়নাথ। কিন্তু বেশীদিন কপালে সংসার সুখ সইল না। বিষয়-রূপ বিষ নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাঁধল বিবাদ। শত্রুপক্ষ পথের কাঁটা সরাবার জন্য একদিন কৌশলে তাঁর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিল সুতীব্র জহর। সেই জহর পান করে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে অনবরত গাঁজলা উঠতে লাগল। সকলেই জীবনের আশা ছেড়ে দিল। আচ্ছন্ন অজয়নাথ এই সময় স্পষ্ট শুনলেন যে কেউ যেন বলছে,'ওরে এখনই হিমালয়ে কল্পক্ষেত্রে চলে যা। সেখানে বাবা কল্পনাথের কৃপায় তুই বেঁচে যাবি।'

কিন্তু পরে আচ্ছন্নভাবে একটু কাটলে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। কোথায় কল্পক্ষেত্র। কোথায়ই বা বাবা কল্পনাথ। তারপর এই অবস্থায় তিনি যাবেনই বা কি করে। তাছাড়া প্রিয়জনেরাও তো ছেড়ে দেবে না। এই সব ভাবতে ভাবতে তন্দ্রামত এসেছে। আবার শুনলেন,'ওরে কল্পক্ষেত্রে যা। কোন ভয় নেই'।

বাস! সব্ চিন্তা বিসর্জন দিয়ে সাহসে বুক বেঁধে রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি গৃহ ছাড়লেন। তারপর অনেক পরিশ্রম করে খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন এইখানে এবং সত্যই তার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছেন।

আমি একটু দ্বিধাভরেই জিজ্ঞাসা করলাম, অসুস্থ অবস্থায় বিনা প্রস্তুতিতে এই দীর্ঘপথ আপনি এলেন কি করে?

তিনি বললেন, ঠিক ওই প্রশ্নটি আমার মনেও জেগেছিল। কোনও সদুত্তর পাইনি। তবে তাঁর ইচ্ছায় পঙ্গুও তো গিরি লঙঘন করে।

একটু থেমে আবার বললেন, বাবা কল্পনাথের আর একটি নাম নীলকণ্ঠ; তাই বোধ হয় ভক্তের বিষ নিজ কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে পুনর্জীবন দিয়েছেন।

এর পর বেশ কিছু সময় কেটে গেল, তিনি আর কোন কথাবার্তা বললেন না। আমিও চুপচাপ রইলাম।

তিনিই আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এসেছিস? বললাম, কোলকাতা। তিনি এবার আসন ছেড়ে উঠে বললেন, আমার সঙ্গে আয়। বাবা কল্পনাথের স্বয়ম্ভু মূর্তি দেখাব। আনেকেই জানে না।

তাঁর পিছু পিছু গেলাম। গুহাটির অনতিদূরে আমাকে দাঁড়াতে বলে প্রবেশ পথের দক্ষিণদিকে জটার মত ঢেউ খেলান পর্বতগাত্রের নিম্নাংশে একটি স্থানের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অবাক হয়ে দেখলাম দুই/তিন ইঞ্চি মত জটাজুটধারী একটি সুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবি।

এবার অজয়নাথজী বিদায় নিয়ে আবার তাঁর ঘরটিতে ফিরে গেলেন। আমরাও রওনা হলাম উর্গমের দিকে।

আমাদের বালক গাইডের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছতে সে বিদায় চাইল। ব্যাগে বেশ কিছু খুচরা পয়সা ছিল। সবই উজাড় করে তার মুঠো ভর্তি করে দিতে সে মূহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল। প্রত্যাশার এত অধিক প্রাপ্তিতে সে বোধ হয় ভাবল যে ভুল করে এত পয়সা তাকে দিয়ে ফেলেছি। আবার কিছু যদি ফিরিয়ে নিই। তাই আর মূহূর্তমাত্র দেরী না করে এক ছুটে চলে গেল। আমরা হাসতে হাসতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললাম। সন্ধ্যার পূর্বেই হেলাং পৌঁছতে হবে।

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে ভুগতেই হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে খুবই বিপদে পড়তে হবে, তাই একটির পর একটি পাকদন্ডী ব্যবহার করে পথের দূরত্ব হ্রাস

করবার দিকেই ছিল মনোযোগ। কিন্তু এই পাকদন্ডী শেষকালে দীর্ঘদন্ডী হয়ে আমাদের বেশ বিপদে ফেলল। একটি পাকদন্ডীর মত রাস্তা দেখে আমরা হুড়হুড় করে নেমে গিয়ে দেখি একটি জঙ্গলের মধ্যে হাজির হয়েছি, মূল রাস্তার কোন হদিশ নেই। এদিকে সন্ধ্যারও বেশী বিলম্ব নেই। যে রাস্তা ধরে এসেছিলাম সেটি ধরে ফিরতে হলে আবার অনেকটা চড়াই ভাঙ্গতে হয়। সুতরাং চড়াই ভাঙ্গার পরিবর্তে এগিয়ে যাওয়াই স্থির হল। ভরসা এই ছিল যে জঙ্গল গভীর নয়। তাই আন্দাজে উৎরাইয়ের দিকেই নেমে চললাম এবং মাঝে মাঝে উঁচু প্রস্তরখন্ডের উপর দাঁড়িয়ে মূল পথের অনুসন্ধান করতে লাগলাম। এইভাবে কাঁটাগাছ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রস্তরসংকীর্ণ বন্ধুর পথে অনেক নাকানি-চুবানি খেয়ে অবশেষে মূল পথের হদিস মিলল। এতই নাস্তানাবুদ হলাম যে এর পর থেকে আর পাকদন্ডি ব্যবহার করবার সাহস হল না। যখন হেলাংয়ে ফিরে এলাম তখন ক্রমসঞ্চরমান সন্ধ্যা ধরণীর বুকে সমাগতপ্রায়।

যোশীমঠ-গামী সর্বশেষ বাসটি তখন চলে গেছে। সমস্যা দেখা দিল আহার ও রাত্রিবাসের। সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে সেখানে রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থা নেই। অগত্যা একটি দোকানে ঢুকে চা-বিস্কুট খেয়ে রাত্রের মত ক্ষুন্নিবৃত্ত করতে হল। আমাদের নিরুপায় অবস্থা দেখে সেই দোকানেরই লালাজী তাঁর দোকানের আচ্ছাদিত বারান্দায় আমাদের থাকতে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনটি কম্বল দিতেও ভুললেন না।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নের মায়াবতী

দিগন্তবিস্তারী অদ্ভুত এক আকাশের কথা লিখছি। এক অচেনা বাতাসের কথা লিখছি যা বহে আনে শুধুই সুগন্ধ। এক এমন স্বপ্নের কথা লিখছি, যা লুকিয়ে থাকে মানুষের মনের প্রত্যন্তে ও যা ক্রমাগত মানুষের বেদনার সমারোহে এক চূড়ান্ত আনন্দ হয়ে জেগে ওঠে। কেই বা বলতে পারে, হয়ত আমার বিশ্বাসের কথাই লিখছি, মনের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকা অগণিত অবিশ্বাসের মাঝে এক টুকরো স্থায়ী ভারসাম্য, এক টুকরো সাম্রাজ্যের কথা। বা হয়ত কে বলতে পারে এমনই এক তীব্র অনুভূতির কথা, লিখতে চাইছি যা অনির্বচনীয়, চিরন্তন এবং আনন্দময়। চোখের সামনে এখন বিস্তারিত পর্বতের পর পর্বত কখনও সবুজ ও শুধুই সবুজ, কখনও বা ধূসর ও ম্যাদাটে, কখনও তীব্র প্রেমের মতো আকর্ষণপ্রিয় আবার কখনও এক শান্ত বৈরাগ্যের মতো সমাহিত। এবং ওই পর্বতের অভিকর্ষে খেলা করে চলেছে এক বালখিল্য রোদ, শীতের প্রকোপে যা প্রায় যায় যায়। মায়াবতীর আকাশ আজ দেবতাদের ছেলেমেয়েদের শার্টপাজামার মতো উজ্জ্বল এবং এখানে, এই মিশনের গেসট্‌হাউসের ছাতে আলগা চেয়ারের আলস্যে বসে আমি ওই নীলাভ ঔজ্জ্বল্যে প্রসারিত করে দিয়েছি আমার দৃষ্টি।

এত জায়গা থাকতে মানুষ কেন এখানে আসে, আলমোড়া থেকে জিপে লোহাঘাট হয়ে মায়াবতী উঠতে উঠতে ওই জিজ্ঞাসার এক অর্থ নিজের মনেই তৈরি করে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ভোগের পাশিপাশি, ক্রমাগত সাংসারিক আবর্তে ডুবে যেতে যেতেও হয়ত কেউ আকাশচারী হয়, হতে চায়, তাই আসে। আবার কেউ হয়ত মারুতি হাঁকিয়ে আসে জঙ্গলের বিভা চূর্ণ করে ফেলতে, মাড়িয়ে যেতে অগুণতি ঝরা পাতার হা-হুতাশ। বা কেউ কেউ হয়ত স্রেফ তাস খেলতে আসে। পাহাড় না দেখে, বাতাস না স্পর্শ করে, যেন তেন ভাবে গেসট্‌হাউসের এক একটি ঘর অধিকার করে অনর্গল শুধুই ব্রিজ আর ফিশ্‌। কখনও বা এই শান্ত সাজ সজ্জায়, এই ম্রিয়মাণ, অবগুণ্ঠিত প্রেমের পাশাপাশি জেগে থাকে তাদের চাষাড়ে উল্লাস। কিন্তু আমি নিজে ঠিক কেন যে এসেছি তার কোনও থিয়োরি

মাপা হদিশ পাই নি। নেহাত এমনই কী চলে এলাম ? সেই দুমাস আগে থেকে তোড়জোড় মনে পড়ল। এন্টালির অদ্বৈত আশ্রমে আমার সৌভাগ্য আমি মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজীর দর্শন পেয়েছিলাম। মহারাজ বলেছিলেন, আর কোথায় কোথায় যাবেন, মায়াবতী ছাড়া?

খুব সহজেই বলে ফেলেছিলাম, কেন, নৈনিতাল, কৌশানি, রানীক্ষেত, আলমোড়া ইত্যাদি... এবং মায়াবতী।

মুমুক্ষানন্দজী এক মুহূর্ত আমাকে অপাঙ্গে চেয়ে দেখেছিলেন এখন মনে করতে পারছি। বলেছিলেন, এবং মায়াবতী? হাসছিলেন অল্প অল্প। একটা কাগজে আমার নাম ঠিকানা লিখে নিতে নিতে বলেছিলেন, ঠিক আছে, বড্ড ভীড় হয়,আমি দিন তিনেকের জায়গা আপনাদের দেব। তবে একটা কথা বলে রাখি, মায়াবতীতে কিন্তু খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বেশ কষ্ট হবে। দুর্গম জায়গা, তাছাড়া আমাদের সঙ্গতিও সীমিত। যেটুকু যা যোগাড় হয় তাই দিয়েই আমরা অতিথি সেবা করি।

পাশে বসে থাকা রত্নাকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জেনে নেব কী নন্‌-ভেজ কিছু পাওয়া যাবে কীনা? রত্না সকলকে আড়াল করে আমার কোমরে একটা চিমটি কেটেছিল। আর ভাগ্যিস সঙ্গে ছিলেন মা। মহারাজের কথার প্রত্যুত্তরে বিন্দুমাত্র দেরি না করে বলেছিলেন ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না মহারাজ। আমরা যে জায়গা পাচ্ছি এটাই আমাদের ভাগ্য। এর বেশি আর খাওয়াদাওয়া নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়? মহারাজ বলেছিলেন, তবে যান। দেখবেন ভালই লাগবে। অনেক জিনিস পাবেন ভাববার বা চিন্তা করবার মতো। এই নিন রুট ম্যাপ। লোহাঘাট পৌঁছে যদি গাড়ি না পান যে কোনও দোকানে জিজ্ঞেস করবেন মায়াবতী আশ্রমের গাড়ি কখন আসে? আর একটা নাম মনে রাখুন, কার্তিক ব্রহ্মচারী। যে কোনও লোক চিনিয়ে দেবে। ওপরে যাওয়ার একটা না একটা বন্দোবস্ত আপনাদের হবেই। তাছাড়া ইদানীং মারুতি ট্যাকসি চলছে, ভাড়া মাত্র একশ।

কিছুক্ষণ আগে লোহাঘাট পৌঁছে মনে হয়েছিল এমন সুন্দর জায়গা কেন যে হিল স্টেশন হিসেবে বিখ্যাত হল না। কোথায় লাগে ওই বহু ব্যবহৃত কালিম্পং বা কার্শিয়াং। ঝলমলে রোদ্দুরের মাঝে কেবলই চিনার আর দেওদার। একেবারে আনকোরা। সদ্যবিবাহিতা তরুণীর মতো ব্রীড়াবনত। আর হাওয়া দিচ্ছিল। ঠান্ডা ও রুখু এক হাওয়া চুল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মুখ হাত খশখশে লাগছিল বলে

ব্যাগ থেকে বাধ্যতই বার করেছিলাম ট্র্যাডিশন্যাল বোরোলিনের টিউব। আর সত্যিই এবার এক জিপ এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সামনে। হিন্দি ইংরাজি মিশিয়ে ড্রাইভার একটা কাগজের টুকরো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এই নামের কেউ আছেন কী? দেখেছিলাম পরিষ্কার বাংলায় লেখা আমার নাম ও ঠিকানা। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল আজ সকালে ওই কাগজের টুকরোটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন কার্তিক ব্রহ্মচারী। সেই থেকে সে আমাদের প্রত্যাশী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যাকসি স্ট্যান্ডে।

এখন বেশ অন্ধকার হয়ে আসছিল চারিদিক। আমার ডানদিকে সিঁড়ি দিয়ে একটু নেমে একটি ফাঁকা ছোট ঘর রয়েছে। সুইচ টিপে দেখেছিলাম ঘরের কোণে একটি ম্লান লালচে আলো এবং ঘর জুড়ে সস্তা দামের ফরাস পাতা। ঘরে ঢোকার মুখে দরজার ওপর রঙ দিয়ে ইংরাজিতে লেখা "মেডিটেশন রুম"। গেস্টহাউসে যারা আসে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আলাদাভাবে ধ্যানমগ্ন ও একলা হতে চায় তো ওই কক্ষ তাদের জন্য নির্দিষ্ট। এখন ঘড়িতে সময় দেখেছিলাম, প্রায় সাড়ে চারটে বাজতে চলল। আর শুনতে পেয়েছিলাম বেশ দূরে কোথাও ঘন্টা বাজছে। একটানা বেজে চলেছে ঘন্টা, যেন ছোটবেলাকার স্কুলে অসময়ে রেনি-ডে ঘোষণার মতো। মিম্মি এসে আচমকা ঠেলা দিয়ে বলেছিল,বাবা উঠে পড়ো আশ্রমে যাব। আমাদের চা খেতে ডাকছে।

মাকে দেখলাম সুযোগ পেয়েই একলা এসে সেই ধ্যানকক্ষের ফরাসের ওপর বসে পড়েছেন। বুঝলাম আশ্রম অব্দি আজ আর যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওঁর। দেওয়াল জুড়ে সাদা রঙয়ের শূন্যতার ওপর ওই লালচে আলো পড়ে এক অবর্ণনীয় মায়ার জন্ম দিয়েছে। সেই মায়ার আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে কেমন এক ফাঁকা দৃষ্টিতে ওইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন মা। ভাবলাম,কই, আগে তো কতদিনই পুজোয় বসতে দেখেছি ওঁকে। এমন মগ্ন কোনওদিন দেখি নি তো। কী এমন মাহাত্ম্য হঠাৎই অনুভব করলেন উনি? তবে কী দেবতাদের বসবাসের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা? বা হয়ত আকারহীন এক অদ্ভুত নিরালম্বের। বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমার আর রত্নার হাতে লাঠি। বুমধা আর মিম্মির লাঠির প্রয়োজন নেই। ওরা দৌড়ে দৌড়ে প্রায় ট্রেকিং করার মতো পাথরফেলা রাস্তা দিয়ে আমাদের অনেক আগেই আশ্রমে পৌঁছে গিয়েছিল। আর রাস্তায় অত্যন্ত ধীর গতিতে বয়সকে

উপেক্ষা না করে হাঁটতে হাঁটতে আমরা শুনেছিলাম সন্ধে নামবার মুখে দ্রুত ঘরে ফেরা বার্কিং ডিয়ারের ডাক।

রত্নার পায়ে ফোস্কা, হাঁটতে পারছিল না একটুও। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বলেছিল, আমি কিন্তু রাতের খাওয়ার সময় আবার আসব। জীবনটা বড় তাড়াতাড়ি কেটে গেল? এই সেদিন কলেজে পড়তাম আর আজ দেখ হাঁটুর ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ছি।

প্রগলভ হয়ে বলেছিলাম, তোমাকে তো তীর্থক্ষেত্রে এনেই ফেলেছি ম্যাডাম। আরও একটু গেলেই তোমার আরাধ্য দেবতাকে পাবে।

তখন রত্না বলেছিল, ছিঃ, দেবতা কথাটা তুমি বোলো না তো। ওটার কোনও মানে নেই। যদি বলি চারিদিকের এই নৈঃশব্দ্যই আমার আরাধ্য, তুমি বিশ্বাস করবে? বলো, তুমি বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি।

আশ্রমের গেট দেখা যাচ্ছিল। যেখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে অগুণতি। খড়মড় শব্দ তুলে একটা পাহাড়ি সাপ রাস্তার একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। আমরা সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছিলাম আশ্রমের সামনে এক বিস্তারিত ফুলবিতানের সান্নিধ্যে। মাথার ওপর ফুল ও পাতার ঘেরাটোপ শুরু হয়েছিল। আর সুগন্ধ। বাঁদিকে গোলাপের সমারোহ তো ডানদিক জুড়ে আকীর্ণ রডোডেনড্রনের ঐশ্বর্য। কখনও বা নৈঋতে দেখতে পাবে গাঁদা ফুল।

অথবা তাকাও ঈশানকোণে। দেখতে পাবে পাতা বাহার. দেখতে পাবে ক্যাক্‌টাসের ফুলগুলির বিভঙ্গ। অজস্র ছোট অথচ তীব্র রঙএর ফুলগুলি ছাড়িয়ে রয়েছে ওই কাঁটাবাহারের শরীরজুড়ে।

কার্তিক ব্রহ্মচারী নিজের হাতে তদারকী করছিলেন জলখাবারের। খাওয়া বলতে মুড়ি, ছোলাভাজা আর আলুর তরকারি। তার সঙ্গে শেষপাতে ময়দা আর চিনি দিয়ে তৈরি প্যানকেক।

খেতে খেতে মিম্মি বলেই ফেলেছিল, বাবা, এমনই কী রোজ? হাসতে হাসতে বলেছিলাম, রোজ এইরকম, দুবেলা। ভেবেছিলাম ও রাগ করে বলবে, তবে ফিরে চল লোহাঘাট,বা অন্য কোথাও।

কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে মিম্মি বলেছিল, প্যানকেকটা দারুণ, না বাবা?

কার্তিক ব্রহ্মচারী নাম জিজ্ঞেস করাতে যখন মিম্মি বলেছিল, আম্রপালি, তখন সহজেই বানিয়ে বলেছিলেন, তুই মা অসিলে আমড়া-পালি, নইলে অমন মুখ ভার করে থাকিস কেন?

আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম হো হো করে।

রাত্রিবেলা পঙক্তিতে বসে রুটি ও গরম নিরামিষ তরকারি এবং সুজির পায়েস খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে একলা উঠে পড়েছিলাম। কারণ বাইরের লাইব্রেরিতে তখন কথামৃত পাঠ শুরু হবে। লাইব্রেরি ঘরটি বড় সাজানো। দেওয়াল জুড়ে পরের পর আলমারিতে অসংখ্য বই। রয়েছে দেশবিদেশের সাহিত্য ও দর্শন। অমূল্য সেই বইগুলি দেখে দীর্ঘ সময় ওই কক্ষে কাটাতে ইচ্ছা হয়।

এক বিদেশি সকলের আগে এসে বসে পড়েছিলেন। বিকেলে এঁকে একবার দেখেছি বলে মনে হয়েছিল। ইনি জাপানি মহারাজ নামে বেশি পরিচিত : আশ্রমের ফুলগাছ ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন ইনি। একে একে অনেকে এসে বসেছিলেন। শেষে এলেন মানবেন্দ্র মহারাজ। সৌম্যদর্শন এক শান্ত, খর্বকায় চেহারার পুরুষ। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। বেশ গম্ভীর। কিন্তু আমাদের সকলের দিকে চেয়ে হাসলেন। অনির্বচনীয় এক ভালবাসা যেন ছড়িয়ে দিলেন হরির লুটের মতো। যে যতখানি পাও,কুড়িয়ে নাও। আমরা কুড়োতে লাগলাম। এখানে ওখানে, ছড়ানো গালিচার খাঁজেখোঁজে হাতড়াতে লাগলাম। কিন্তু ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। একবার থার্মোমিটার ভেঙে পারা ছড়িয়েছিলাম মেঝের ওপর। মা বলেছিলেন, সাবধানে কুড়োও সবটুকু, পারা আসলে বিষ। কুড়োতে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম তবু সবটুকু কুড়োতে পারি নি। তেমনি কাবু হয়ে পড়েছিলাম আজও। মানবেন্দ্র মহারাজ দেখছিলেন আমাদের। ঘর জুড়ে রয়েছে এক প্রায়ান্ধকার। মানবেন্দ্র মহারাজ তারপর কোনও একটা তাক থেকে ইংরাজিতে লেখা কথামৃত টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। খুবই মৃদু অথচ ভারি কণ্ঠ তাঁর। আমি চুপচাপ শুনছিলাম। হয়ত বুঝতে পারছিলাম। হয়ত নয়। এক ফাঁকে রত্না এসে পাশে বসে পড়েছিল।

চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার আরাধ্যকে এখানেই পেয়ে যাচ্ছ, নয় কী?

গম্ভীর হয়ে গিয়ে ও বলেছিল, কী পেলাম, কী পেলাম না কিছুই জানি না।

কোনওদিনও ভাবি নি আমাদের পৃথিবীর বাইরে এমন একটা আলাদা পৃথিবী রয়েছে।

একটু পরে আবার বলেছিল এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পরেও কী কেউ, মানুষের যেমন স্বভাব, হা-হুতাশ করবে জীবনে কিছুই পেলো না বলে?

মানুষের স্মৃতি অতি দুর্বল। আর অতীব দুরূহ তার লোভ। মানুষ সম্পর্কে বেশি আশাবাদী না হওয়াই ভাল।

সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা কোথায় যাবে?

বললাম, ধর্মগড়।

সেটা কোথায়?

মায়াবতী আশ্রম ছেড়ে প্রায় এক ঘন্টার ট্রেকিং। দুন্‌দুন্‌, প্লিজ, তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তুমি যেন বলে ফেলো না যে যাবে।

মিম্মির কথা শুনে হেসে ফেলেছিলেন মা।

— তোরা দেখছি এই বুড়িটাকে বাদ দিতে পারলেই বাঁচিস। কিন্তু ধর্মগড়ে আছে কী সেটা বলবি তো।

বলেছিলাম, স্বামীজী এখানে এসে যে ক'দিন ছিলেন, ওই ধর্মগড়ে উঠতেন রোজ, সারাদিন ওখানে বসে ওই জঙ্গলের মাঝখানে দিন কাটাতেন। ওখানে বসে ধ্যানমগ্ন হ'তে পারলে আকাশ এসে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে।

মা বললেন, যদি যেতে পারতাম! জানি না বাপু তোমরা কী রহস্য উদঘাটন করতে যাচ্ছ। তবে স্বামী বিবেকানন্দ রোজ যে পথে হাঁটতেন সেই পথে হাঁটার ভাগ্য আমি কী আর করে এসেছি? দূর ছাই আর্থারাইটিস, ভগবানের মতো পাজী লোক আমি জন্মে দেখি নি।

হাসতে হাসতে সকলে মিলে আমরা মা'কে পৌছে দিলাম আশ্রমে। বাগানের পাশে একটুকরো ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে বেশ কয়েকটা সারি বেন্‌চ পাতা।

মা বললেন, তোমরা তো ঘন্টা দু'এর মধ্যেই ফিরবে,আমি বরং এখানেই বসি।

হয়ত বলতেই যাচ্ছিলাম, এখানে কতক্ষণ বসবেন? বরং আশ্রমের ভেতরে গিয়ে বসুন। কিন্তু তখন দৃষ্টি চলে গিয়েছিল দিগন্তে। ভোরবেলাকার মেঘ সরে গিয়ে

ক্রমশ নীল হয়ে উঠছে আকাশ আর ওই নীলে প্রোথিত বরফের সারি দেখা যাচ্ছে। ঝলসাতে লাগল ক্রমশ ওই বরফের চূড়াগুলি। কখনও বাদামি রঙ লাগে তো কখনও বা নীলাভ, আবার কখনও হীরকদ্যুতিময় এক উজ্জ্বল সমারোহ। মা বললেন, তোমরা যাও, আমি পাহাড় দেখি।

মনে মনে ভাবছিলাম, রঙ দেখতেই তো আসা। ধর্মগড় সত্যিই এক আরাধ্য স্থান। তবে তার চাইতেও অনেক প্রার্থিত ওই বরফের সার। ওই সম্পূর্ণ হিমালয়। একমাত্র এই মায়াবতী থেকেই হয়ত হিমালয়ের সব ক'টি শৃঙ্গ দেখা যায়। আমার সব নাম মনে পড়ছিল না আলগাভাবে মনে পড়ছিল নন্দদেবী, ত্রিশূল, মনে পড়ছিল মাউন্ট এভারেস্ট। এছাড়া আরও অনেক, পরপর, নাম-জানা না-জানা বরফের চূড়াগুলি। মা জোর করতে লাগলেন, কোনটা কী তোমরা তো সব জানো, পড়েছ, আমাকে চিনিয়ে দাও।

মিম্মি বলল, আমি পড়েছি, কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে,আছে কামেথ্।

বুম্‌বা বলল, ধ্যুস, সব ভুল বলছে, আমি কোনওদিন কামেথ্ টামেথের নামই শুনি নি। বলেছিলাম, নাম দিয়ে কী হবে? নাম না জানলেও পাহাড়ের অপার বিস্ময় উপলব্ধি করা যায়। আমরা সকলে বরং শান্ত হয়ে ওই বিস্তারিত বরফ সাম্রাজ্যের দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। আমাদের শরীর জুড়ে বেজে উঠবে এক অদ্ভুত গান, ওই বরফের, ঠিক শুনতে পাওয়া যাবে, দেখো তোমরা।

বুম্‌বা বলল, এইরে, বাবাও এবার সুযোগ পেয়ে কবিতা শুরু করল।

রত্না বলছিল, আমরা বরং একটু পা চালিয়ে হেঁটে ঘন্টা দু আড়াইএর মধ্যে ধর্মগড় থেকে ঘুরে আসার চেষ্টা করি। তারপর এখানে বসে যে যেমন পারব,গান গাইব।

মা'কে বসিয়ে রেখে আমরা যে যার লাঠি হাতে আশ্রমের পিছনের উৎরাই ধরে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগলাম । ভাগ্যিস পায়ে কেড্‌স ছিল, না হলে খালি পায়ে হাঁটতে হতো। ওই পথে চটি অচল। কার্তিক ব্রহ্মচারী একটি ছেলেকে গাইড হিসেবে সঙ্গে দিয়েছিলেন। যত রাস্তা হাঁটি তত উথলে ওঠে তার গল্পের ভান্ডার। কাছেরই এক গ্রামে তার বাড়ি। যে গ্রামের খুব নিকটে করবেট সাহেব নাকি তাঁর বিখ্যাত শিকার 'দ্য ম্যানইটার অফ কুমায়ুন'এর সন্ধান পেয়েছিলন। কখনও সে দৌড়ে যায় জঙ্গলের অভ্যন্তরে। কখনও বা বুনোফুল,কখনও জঙ্গলা

ফুল তুলে এনে মিম্মির হাতে দেয়। আমরা ভয়ে শিউরে উঠে বলি, ফেলে দে, হাতে ধরিস না, বুনো ফল বিষাক্ত হয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর ওই গাইড ছেলেটি বাংলা না বুঝে এক নিষ্পাপ হেসে মাথা নাড়ে শুধু।

ধর্মগড়ের বেদীর চারপাশে গোল হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে আমরা আবার মায়াবতী ফিরে এসেছিলাম। রত্নার প্রস্তাবমতো গান গেয়ে পর্বতমালাকে অভিবাদন জানানো হয়ে ওঠেনি বটে, তবে সেদিন আমরা সকলে মিলে আশ্রমের হাসপাতাল থেকে শুরু করে গোশালা ইত্যাদি সব কটি দর্শনীয় দেখে নিয়েছিলাম। শেষে গেসট্‌হাউসে ফিরে এসে একটু গিয়ে দেখেছিলাম এক অফুরন্ত সবজী ভান্ডার। ফুলকপি থেকে পালংশাক, ডালিম থেকে কফিগাছ কী নেই সেই বাগানে। মাদাম সেভিয়ার্স নিজের হাতে ওই বাগানের পরিচর্যা করতেন। বাগানের পাশেই সেভিয়ার্স দম্পতির কুটীর। আগে রেস্‌টহাউস হিসেবে আশ্রম কর্তৃপক্ষ সেখানে থাকতে দিতেন। কিন্তু এখন বন্ধ ছিল।

প্রতিদিন যেন ঠান্ডা বাড়তে শুরু করেছিল উত্তরোত্তর। আর চতুর্দিকের পর্বত ও বনস্থলী যেন হয়ে পড়ছিল আরও নিশ্চুপ ও মৌনী। মাত্র তিনদিন পরে চলে আসতে মন না চাইলেও উপায় ছিল না। আমারা না হয় এদেশী, দেখেছিলাম বিশাল এক বিদেশীদের দল। মনে হয়েছিল স্থানমাহাত্ম্য হয়ত একেই বলে। যার টানে দূরদেশের পাখীর মতো মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে উড়ে আসে।

মায়াবতী আশ্রমের গেসটহাউস বুকিং করতে হলে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে হবে : অদ্বৈত আশ্রম, এন্টালি, কলকাতা-১৪। বছরে ৪/৫ মাস, শীতের সময়টুকুতে শুধু বিদেশী ছাড়া আর কারোর জন্যে বুকিং দেওয়া হয় না। যাত্রাপথ হাওড়া থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে টনকপুর, সেখান থেকে বাসে লোহাঘাট।

সাধুসঙ্গ

দ্বিতীয় দিন সকালে গেলাম বদরীনারায়ণের মন্দিরে। তারপর ঘুরছি এদিক-ওদিক। সাধুসঙ্গের জন্য। সাধু আছে অনেক তবে কথা হচ্ছে না। একটু বয়স্ক সাধুর খোঁজ করছি। কারণ এঁদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। এঁরা জীবনে অনেক পথ চলেছে-দেখছেও অনেক। তাই বয়স্ক সাধুদের সঙ্গই করেছি বেশি।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে গেলাম অলকানন্দার ওপারে। মন্দির ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে দেখি একজন সাধুবাবা বসে আছেন। একটা বড় পাথরের চাঁই-এর উপর। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অলকানন্দার দিকে। মন কোথায় পড়ে আছে সাধুবাবার — জানি না।

পরণে এবার আর আগের মত সাদা বা গেরুয়াধারী নয়। লাল রক্তবস্ত্র! তবে টকটকে লাল নয়। অনেকবার কাচাকাচির পর গাঢ় লাল যেমন দাঁড়ায়, তেমনই। ফ্যাকাসে লালও বলা চলে। মাতৃ উপাসক। তন্ত্রসাধক বলেই মনে হলো। অপূর্ব লাবণ্য ও দীপ্তিময় চেহারা। তাতে একটা বেশ আকর্ষণ আছে। চোখ দুটো ফালা ফালা-- টানা। রঙ শ্যামবর্ণ হলেও দারুণ উজ্জ্বল। গায়ের চামড়া একটু ঢিলে হয়েছে। মাথার জটা-- কোমর ছাড়িয়ে। গলায় রুদ্রাক্ষ-- হাতেও। পাকা দাড়ি তবে ঘন নয়।

সাধুবাবার আকর্ষণে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছি সাধুবাবার পাশেই। মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

— কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

চমকে উঠলাম সাধুবাবার কথায়। তাহলে অনেক কথা বলা যাবে, প্রাণ ভরে। নিজেকে সামলে নিয়েই বললাম,

— কলকাতা-কলকাতা।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

— তীর্থ করতে বেরিয়েছো বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা নেড়ে বললাম,

— না- না, তীর্থ-টীর্থ নয়। ভ্রমণ আমার নেশা, ভালো লাগে। প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি। তাই এবারও বেরিয়েছি।

কথাটুকু বলে আর কোন প্রশ্ন করতে না দিয়েই বললাম,

— আপনার সমস্ত তীর্থদর্শন হয়েছে নিশ্চয়?

মুখে কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় নেড়েই সম্মতি জানালেন সাধুবাবা।

প্রশ্ন করলাম,

— বাবা, এখন বয়েস কত হল আপনার?

কথাটা শুনেই হেসে ফেললেন। উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন,

— তুমিই বলো না, কত হবে?

ভুরুটা সামান্য কোঁচকালাম। একটু ভেবে নিয়ে বললেন,

— কত আর হবে, ৭০।৭২।

— আপনার আস্তানা কোথায়?

একমুহূর্ত দেরী না করেই উত্তর দিলেন,

— এখন বদরীনারায়ণে। কালকে কোথায় থাকবো— তা তো জানিনে!

আবার জিজ্ঞাসা করলাম,

— তবুও কোথাও থাকার আশ্রয় তো একটা আছে!

নির্লিপ্তভাবেই বললেন সাধুবাবা,

— না বাবা, থাকার আশ্রয় কোথাও করিনি, তাতে প্রতিষ্ঠায় মন যায়। ওসব আমার ভালো লাগে না। এই ভালো আছি। যেখানে যাই, সেখানেই মাথা গোঁজবার ঠাঁই একটা হয়ে যায়। পনেরো বছর বয়স থেকে জীবনের এতগুলো বছর তো কেটেই গেল, অসুবিধে তো হয়নি কখনও।

সাধুবাবার কথায় গৃহত্যাগের বয়েসটা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম,

— বাবা, গৃহত্যাগ করলেন কেন, কি কারণে?

কণ্ঠে অসম্ভব দৃঢ়তার সুর নিয়েই বললেন,

— সংসার ত্যাগ আমার হবেই-এটাই পূর্ব নির্দিষ্ট, কারণটা কিছু নয় বাবা।

একটা বিড়ি ধরিয়ে সাধুবাবার হাতে দিলাম, সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই। তারপর বললাম, আপনার সাথে বসে এখন যে কথা বলছি, এটাও তাহলে পূর্ব নির্দিষ্ট?

প্রশান্ত মুখেই বললেন,

— হ্যাঁরে বাবা, তাই-ই। একটা মণির সাথে আর একটা মণি যেমন সুতো দিয়ে গাঁথা হয়, তেমনই বিশ্ববিধাতার সুতোয় তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগটাও গাঁথা ছিল— তাই তো তুমি এলে আমার কাছে।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বললাম,

— কারণটা কিছু নয় বললেন, কিন্তু কারণ ছাড়া তো কোন কাজই হয় না জানি। বাবা,আপনার ঘর ছাড়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

কথাটা শুনে মুচ্‌কি হেসে বললেন,

— হ্যাঁরে বাবা, মিথ্যে বলে কি কোন লাভ হবে? হঠাৎ একদিন মনে হলো ঘরে থাকবো না। বেরিয়েই পড়লাম।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে, তারপর বললাম,

— আপনার মা বাবা ভাই বোন— তাদেব কথা একটুও ভাবলেন না?

হাসি মুখেই বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়েই বললেন,

— না বাবা, কিছুই ভাবিনি, একটুও না।

কথাটুকু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

— আচ্ছা বাবা, ঠিক যে সময় আপনি ঘর থেকে বেরোলেন, ঠিক সেই সময় কি মনে সামান্যতমও কষ্ট হয়নি— অন্ততঃ মায়ের জন্যে?

এ-প্রশ্নে সামান্য ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম মুখমন্ডলে। বললেন সাধুবাবা,

— মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট হলে কি বেরোতে পারতাম।

— পরে কি কখনও মনে পড়তো রক্তের সম্পর্কে আছেন যারা-তাদের কথা।

এবার একটু উদাসভাবেই বললেন,

— মাঝে মাঝে মনে পড়তো বৈ-কি। তবে মনটাকে সংযত করে নিতাম। সাধুবাবাকে যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর পেতে বেগ পেতে হচ্ছে না বলে মানসিক আনন্দ আমার বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে বিড়িটাও গেল নিভে। আর বিড়ি ধরালাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,

—গৃহত্যাগের পর কখনও বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে করেনি?

বেশ নীচু স্বরেই বললেন,

— না-না, তেমন ইচ্ছা করেনি কখনও। তবে মাকে দেখার জন্যে মাঝে

মাঝে মনটা আকূল হয়ে উঠতো, তারপর আবার ঠিক হয়ে যেত।

— শুনেছি গৃহত্যাগের পর জন্মভূমি দর্শন করতে হয় সাধু-সন্ন্যাসীদের, আপনি....

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললেন,

— না বাবা, আমি যাইনি কখনও।

— বাড়ী কোথায় ছিল আপনার?

এখন দেখছি ভাবলেশহীন মুখমন্ডল। বললেন,

— আমি পূর্ববঙ্গের লোক।....

এবার হুট্ করে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম,

— আচ্ছা বাবা, কেমন করে চলে আপনার? আপনি কি কোন প্রকার আয় অর্থোপার্জন কিংবা সাধুজীবনকে ভিত্তি করে কোন ব্যবসা করেন?

মুখে হালকা হাসির প্রলেপ লাগিয়ে বললেন,

— না বাবা কিছুই করিনা আমি।

— তবে খান কি— কোথা থেকে পান, দেয়ই বা কে— কেমন করে চলে আপনার?

এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলো করলাম। এক নজর মুখের দিকে তাকিয়ে সাধুবাবা বললেন,

— তা তো বাবা বলতে পারিনে। তবে প্রতিদিনই খাই। দুবেলা পেট ভরেই খাই। মা-ই যোগাড় করে দেন।

কৌতূহল আমার কম নয়। জিজ্ঞাসা করলাম,

— গৃহত্যাগের পর কখনও না খেয়েছিলেন?

এবার আবেগভরা কন্ঠেই বললেন,

— আজ বহু বছর হল গৃহত্যাগ করেছি। কই, সে রকম তো মনে পড়ে না। তবে মায়ের কৃপাতেই চলেছে এ- বিশ্বসংসার— আমিও। তাঁর কৃপাতেই জুটে যায়।

প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম,

— সারাজীবনই তো অসংখ্য তীর্থ পরিক্রমা করলেন, তীর্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা বেশ খুশি হলেন বুঝলাম। মুখের ভাবদেখে। বললেন,

— বাবা, তীর্থ শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে 'তৃ' ধাতু থেকে। 'উত্তীর্ণ হওয়া'-মনের

ত্রাণই তীর্থ। পার্থিব জীবনের যা কিছু পাপ মলিনতা কলুষতা— তা থেকে মনকে উত্তীর্ণ করার অর্থই হচ্ছে তীর্থ। তবে তীর্থের তিনটে ভাগ আছে। যে তীর্থে দেহের রোগ দূর হয় অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর জল হাওয়া আর মনোরম স্থানকে বলে ভৌমতীর্থ। তবে এই তীর্থে মনের ক্লেশ দূর হয় না।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু চুপ করে রইলেন। চুপ করে রইলাম আমিও, পরের কথা শোনার জন্য। আবার শুরু করলেন,

— আত্মিক উপলব্ধি হয়েছে এমন মহাত্মাকে বলে জঙ্গমতীর্থ। জঙ্গম শব্দে গমনশীল বুঝায় অর্থাৎ মহাত্মা বা মহাপুরুষের দর্শন,কথোপকথন ও সঙ্গলাভের মাধ্যমে মনের মলিনতা থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই জঙ্গমতীর্থ। আর বাবা, মন যখন ত্রাণ পায় অর্থাৎ রজো ও তমোগুণকে অতিক্রম করে মন যখন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয় তখন তাকে মানসতীর্থ বলে। এক কথায় বিশুদ্ধ ও পবিত্র নির্মল মনই পরমতীর্থ-মানসতীর্থ।

তীর্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ শুনে প্রশ্ন এলো মনে-বললাম,

— বাবা, আমরা যারা সাধারণভাবে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তীর্থের কথা বলি, তাতে আপনার বলা তীর্থের সাথে তো এর কোন সম্পর্কই নেই। তা'হলে দূর-দূরান্তরের তীর্থে যাচ্ছে যারা-তাদের অযথা ছুটোছুটি করে লাভটা কি?

কথাটা শুনেই সাধুবাবা বললেন,

— তাতে অনেক লাভ আছে বাবা। কোন তীর্থেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। আমি অন্ততঃ এত বছরের জীবনে কোন তীর্থেই ভগবানকে হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখিনি। তবে জানবে বাবা, এই ছুটোছুটিরও একটা ফল আছে। বাহ্য তীর্থ মানুষের মনকে পবিত্র নির্মল উদার ও আনন্দময় করে তোলে। এই আনন্দই ভগবানের সান্নিধ্যলাভের সবটা নয়, তবে বড় একটা সোপান। তীর্থ মানুষকে ভগবানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তীর্থ কখনও ভগবান দর্শন করায় না।

সাধুবাবার কথার উপর ভিত্তি করেই প্রশ্ন করলাম,

— আসলে তীর্থ একটা সোপান মাত্র, 'মন' টাই সব-কি বলেন?

হাসি মুখেই বললেন,

— নিশ্চয়ই, এটা কি বাবা বলার অপেক্ষা রাখে!

সঙ্গে সঙ্গে আমার জিজ্ঞাসা,

বাবা, মানুষের মনের ভাব তো প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হচ্ছে-মনের পতনও তো হচ্ছে অবিরত। কত নোংরা চিন্তা...

আমার কথা শেষ হতে দিলেন না সাধুবাবা,

এর জন্যেই তো নিজেকে সঁপে দিয়ে সাধন ভজন করতে হয়। তারপর সব আপ্‌সে হয়ে যায়। খাটতে হয় না। এটাই সৃষ্টির নিয়ম। এ-নিয়মের কোন ব্যাতিক্রম নেই-হয় না— হবেও না। তবে বলা যতটা সহজ-ততটা সহজ নয়। লেগে থাকতে হবে। হচ্ছে না বলে ছেড়ে দিলে হবে না। সবই হয়। তবে ধৈর্য্য নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় সাপেক্ষ্য।

এই পর্যন্ত বলেই চুপ করলেন। মুখে ভাবের পরিবর্তন ঘটলো দেখে মনে হলো কি যেন একটা চিন্তা করছেন। কথা বলে চিন্তায় ছেদ টানলাম না। নিজের থেকেই বললেন,

–– তবে একটা কথা আছে বাবা, আর যাকে বিশ্বাস করতে হয় করো-তবে মনকে কখনও বিশ্বাস করো না, যত সংযমেই থাকো না কেন! ওই যে মনের পতনের কথা বললে, তাই বললাম।

কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পেলাম। তাই প্রশ্ন করে বসলাম,

— সারাটা জীবনই তো বাবা সাধন ভজন আর তীর্থ ধর্ম করেই কাটালেন। আপনার কি কখনও মনের পতন ঘটেছে?

আমরা অলকানন্দার পাড়ে বসেই কথা বলছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি এলো ঝম্ ঝম্ করে। পাহাড়ে বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকে না। টুকরো মেঘের বৃষ্টি। তাড়াতাড়িই থেমে যায়। সাধু বাবা আর আমি একটা আশ্রমের বারান্দায় এসে বসলাম। দু'জনেই আধভেজা হয়ে গেছি। একটু শীত শীত করতে লাগল। কথায় এত মশগুল হয়ে ছিলাম যে, অনেকক্ষণ বিড়ির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সাধুবাবাকে একটা দিয়ে নিজেও ধরালাম একটা। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কথা শোনার জন্য বিড়িতে বেশ লম্বা করে একটা টান দিয়ে বললেন,

— আমি বাবা মিথ্যে কথা বলিনে। এই জীবনে এসে মিথ্যে বলবো কেন মনের একবার পতন হয়েছিল— কি রকম হয়েছিল বলি।

কোন কথা বললাম না। একইভাবে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে। সাধুবাবা:

ভাবান্তর কিছু হলো না। বললেন,

— আমার বয়েস যখন ৫০/৫৫, তখনকার কথা। সে সময়ে বেশ কিছু দিন ধরেই মনে হতে লাগলো,জীবনে কখনও নারীসঙ্গ করিনি-নারীসঙ্গের স্বাদও পাইনি কখনও। তাই ভাবলাম, একবার যাই না, দেখি ওর ভিতরে কি আছে। আবার ভাবছি, নাহ্, সাধুজীবনে এসব কথা ভাবা-ই পাপ। এতদিনের সংযম তপস্যা সব নিষ্ফল হয়ে যাবে। একবার ভাবছি যাই, আবার ভাবছি, একাজ আমাকে শোভা পায় না। তাহলে এ-পথে এলাম কেন-গৃহী হতে দোষ ছিল কোথায়? কেউ তো আমাকে বাধা দেয়নি। এই সব ভাবনা আমাকে বিষমভাবে অস্থির করে তুললো— দিনের পর দিন। একদিকে সাধনা আর একদিকে অনাস্বাদিত নারীসঙ্গ আমাকে দো-টানায় ফেললো।

সাধুবাবা আধবোজা চোখে অতীত স্মৃতি মন্থন করে চললেন,

— যাবো কি যাবো না-এ রকম ভাবতে ভাবতে বাবা একদিন সত্যিই চলে গেলাম। যখন বেশ্যাবাড়ী ঢুকতে যাবো-তখন মনে হলো, এটা ঠিক কাজ হচ্ছে না। আবার ভাবলাম, দূর, যাই না— দেখি কি আছে? দো-টানা মন নিয়ে বাবা একেবারে ঢুকেই পড়লাম।

কোন প্রশ্ন করলাম না। একই সুরেই বললেন সাধু বাবা,

— ওখানে ঢোকা মাত্রই বাড়ীময় একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এ-ঘর ওঘর থেকে মেয়েরা সব ছুটে এলো। প্রথমে আমি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদের ভিতর থেকে একটা মেয়ে এগিয়ে এসে আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসালো। তারপর প্রণাম করলো। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েটা কিছু মিষ্টি আর জল এনে দিল। খাবো কি আমি— শুধু ভাবছি, কি জন্যে এলাম, কেন এলাম এখানে? সাধু হয়ে মনের এ-কি পতন ঘটল আমার! এ-সব ভেবে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলাম। মেয়েটা মিষ্টি খেতে বললো। আমি অন্যমস্কভাবেই খেতে লাগলাম। খাওয়া শেষ হলো। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, 'সাধুবাবা, এতো রাতে এখানে এসেছেন কেন?

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে রইলেন। মুখটা দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে সাধুবাবার। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

— আপনি কি বললেন বাবা?

— মুখ থেকে আমার একটা কথাও বেরোলো না। মাথা নিচু করেই বসে রইলাম। আমার উদ্দেশ্যের কথা কিছুই বলতে পারলাম না। তখন মনে হতে লাগলো — এখানে না এলেই ভালো করতাম। খুব ভুল হয়ে গেছে। এ রকম সাত পাঁচ ভাবছি। মেয়েটি মনের কথা বুঝতে পেরেই হয়তো বললো, 'সাধুবাবা, এপথ তো আপনার নয়, কেন এলেন এখানে? আমি নির্বাক। বসেই আছি। এইভাবে কাটলো কিছু সময়। হঠাৎ দেখি দুজন পুলিশ এসে হাজির। ওদের কেউ হয়তো খবর দিয়েছিল।

সাধুবাবার মুখটা কেমন যেন আরও মলিন হয়ে উঠলো। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে পরে বললেন,

— ওরা আমাকে সোজা নিয়ে গেল থানায়। অফিসবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন গেছিলাম ওখানে? আমি বাবা আমার মনের সব কথাই খুলে বললাম ওনাকে। একটাও মিথ্যে বলিনি। শুনে তো অফিসবাবু অবাক! আমাকে কিছু বললেন না। ছেড়ে দিলেন। থানা থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

কথাগুলি শুনে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম। সাধুবাবা কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললেন,

— মায়ের ইচ্ছা নেই বাবা, তাই তিনিই আমাকে রক্ষা করলেন। নহলে এত বছরের সংযমতার জীবন আমার শেষ হয়ে যেত। তাঁর করুণাতেই বাবা আমার বহ্মচর্যব্রত রক্ষা পেল।

সাধুবাবার জীবনের এই ঘটনা শুনে ভাবলাম, সংযমী জীবনে মনের অবস্থা যদি এমন হতে পারে, তাহলে আমরা যারা গৃহী জীবনে আছি-নিয়ত মনের ভাব গতি বিভিন্নমুখী হয়ে আরও কত — কোন নরকে পতন হচ্ছে বা হবে। তা ভেবে একেবারে শিউরে উঠলাম।

সাধুবাবা আর আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। এর মধ্যে বৃষ্টিও থেমে গেছে। আবার দুটো বিড়ি ধরালাম। সাধুবাবাকে একটা দিয়ে বললাম,

— আমার যারা আপনাদের মতো যাদের দেখি, তাদের সাধু বলেই জানি, ভাবি এবং শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাধু কে - সাধু কাকে বলে?

মুখের সেই মলিন ভাবটা কেটে গেছে। প্রশ্নটা শুনেই সাধুবাবা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বললেন,

— বাবা, আমাদের মতো যাদের- আমার মতো যাদের দেখো, তারা কেউই বলতে পারো সাধু নয়। বলতে পারো, গৃহী জীবন থেকে এটা একটা আলাদা জীবন— তবে 'সাধু'— এ-জীবন নয়।

কথাটা শুনতেই কেমন যেন লাগল! কথার ভাবটা ধরতে না পেরে বললাম,

— তার মানে?

— মানেটা অতি সহজ। সাধু হওয়া কি মুখের কথা! 'যিনি সদা সত্য কথা বলেন, কৃপালু, কারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না, সকল দোষ হতে মুক্ত, সকলের প্রতি ক্ষমাশীল, যথাশক্তি সকলের উপকার করেন, যিনি সুখে-দুঃখে সমবুদ্ধি— তিনিই সাধু। যথার্থ সাধু যারা — তারা মানুষ পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষলতা — সকলেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। আর সদা সকল শাস্ত্রের প্রতিই শ্রদ্ধাবান।'

বিড়ির আগুনটা নিভে গেছে। পোড়া দিকটা মেঝেতে ঘষতে ঘষতে বললেন,

— এবার ভাবো, সাধু কে? সাধু যারা — তাঁরা ধৈর্যশীল, গম্ভীরাত্মা ও অপ্রমত্ত হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা ও মৃত্যু তাঁর বশীভূত। তিনি অমানী অথচঅপরকে সম্মান দান করেন। তিনি করুণ হৃদয়, দয়ালু ও জ্ঞানবান। সকলের প্রতিই মৈত্রীভাবাপন্ন। এবার বলো, যাদের দেখো তাদের মধ্যে এসব গুণগুলোর কতটুকুই বা আছে! তাই বললাম, এটা একটা আলাদা জীবন— তবে সাধু জীবন নয়।

প্রকৃত সাধুর সংজ্ঞা জানতে পারলাম সাধুবাবারই মুখে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন এলো মনে। বলেই ফেললাম,

— আচ্ছা বাবা, ইউরোপীয় পন্ডিতদের মতে লিঙ্গপুরাণ তো সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেখানে উল্লিখিত আছে যে, কলিযুগে নতুন নতুন সাধু- সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। এরা গৃহীদের বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত করবে! আরোও মজার কথা হলো যে, এই সব সাধু সন্ন্যাসীরা হবে প্রবল ধনশালী আর শিষ্যরা হবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট। এ- কথার সত্যতা সম্পর্কে আপনার মত কি?

মন দিয়ে কথাটা শুনলেন। তারপর বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বললেন,

— দেখো বাবা, লিঙ্গপুরাণের সাথে আমার মতের কোন পার্থক্যই নেই। পুরাণ তো ঠিকই বলেছে। যার সত্যতা তো সমাজের বুকে দেখতেই পাচ্ছো। বড় বড় মঠ মন্দির আর আশ্রম করে একশ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীরা বসে আছে টাকার

উপর, আর দরিদ্র গৃহীরা লাইন দিয়ে নিচ্ছে দীক্ষা। প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসীদের কোন প্রতিষ্ঠা থাকবে না। জীবিকা নির্বাহের পথ হবে-আকাশবৃত্তি। আজকাল সাধুদের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেও কি তুমি লিঙ্গপুরাণকে অস্বীকার করতে পারো?

কথাগুলো সম্মোহিতের মতো শুনলাম। আর মনে-মনে হরিদ্বারের প্ল্যাটফরমের সেই সাধুবাবার কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানালাম, — 'বেটা, আজকাল তো সাধুয়ো মে ভি পরিবর্তন আ গয়া হ্যায়। সাধুলোগতো কুত্তে কি তরহ্ হো গয়ে হ্যায়। ...সাধুলোগ গাঁও মে পরিবার রককে আতে হ্যায় অউর সাধুকা ভেক পকড় কর রূপেয়া কামাতে হ্যায় অউর ফির ঘর্ ভেজতে হ্যায়।... খুদ আপনে আঁখো সে দেখো কি বাতানুকূল কমরে মে সাধুমহারাজ আরাম সে বয়ঠে হুয়ে মৌজ মস্তি কর রহে হ্যায়। ক্যা তুম উস্‌কো আপনে আত্মা সে সাধু কহোগে ইয়া ভোগী?'

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাই হলো। আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেছে। বেলাও বেড়েছে অনেক। এবার উঠতে হবে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম,

— একটা কথা বলবো বাবা?

— বলো না।

— প্রকৃত সত্য কথা বলতে পারেন, ঈশ্বর কে— কোথায় আছেন বা কোথায় থাকেন?

কথাটা শুনে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর মিষ্টি হাসি হেসে, পিঠ চাপড়ে বললেন,

— বাবা, পৃথিবীর কোন মানুষ কোনোদিনও বলে দিতে পারবে না, ঈশ্বর কে— কোথায় আছেন বা কোথায় থাকেন? যখন সময় হবে, তখন আপনিই বুঝে যাবে — তিনি কে — কোথায় আছেন বা কোথায় থাকেন?

রতন লাল বিশ্বাস

দোলপা এক নিষিদ্ধ দেশ

বিচিত্র সবুজ রঙের কাঁথা স্টিচের শাড়ী। নক্সা কাটা। সবুজ যে কত রকমের। কখনও কাঁঠাল পাতার মত ঘন। সবুজের মধ্যে সোনা রঙ। নদী পড়ে রয়েছে এলিয়ে। ছোট গ্রাম। হঠাৎ প্লেন নেমে আসে অনেক নীচুতে। মাথার উপর সূর্য। ছায়া পড়ে মাটিতে। নদীর স্রোত স্পষ্ট হয়। গ্রামের আভাষ আসে। আবার অনেক উঁচুতে। শূন্যলোকে। নদী তখন অনন্ত সবুজ। নেপালের তরাই অঞ্চল। ভেসে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে। বিশেষতঃ নতুনদের কাছে। প্লেনের মধ্যে একটা অদ্ভুত নীরবতা। প্লেন চলেছে ঘন মেঘের মধ্যে দিয়ে। কিছুই দেখা যায় না। নেপালগঞ্জ এয়ারপোর্টের কথা মনে পড়ে। হাসি পায়। ওজন কমানোর জন্য আমরা সকলে সব পোষাক পরে নিয়েছি। এমনকি এই গরমে উলের পোষাক ও উইন্ডচিটার। কাঁচের দরজা পেরোনোর সময় নিজেকে দেখতে পাই। অদ্ভুত লাগে। হাঁটা চলার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। লাগেজের ওজন কমাতে হবে। প্রশান্তদার নির্দেশ। আমাদের গন্তব্যস্থল জুমলা। প্লেনে মাত্র আধ ঘন্টার পথ। একটা ঝাঁকুনি। প্লেন নামতে শুরু করেছে জুমলা এয়ারপোর্টে। কলকাতা থেকে আমরা বেরিয়েছিলাম ১০ ই সেপ্টেম্বর '৯৩। গোরখপুর, গোন্ডা ও নেপালগঞ্জ হয়ে জুমলা পৌঁছালাম ১৪ ই সেপ্টেম্বর। তিলা খোলার ডানতীরে অনেকটা এলাকা জুড়ে বর্ধিষ্ণু জনপদ জুমলা (উচ্চতা ২৩৪০ মি.)। এখানে এখন আপেলের মরসুম। চারিদিকে তাই এত সব ব্যস্ততা। মূল জনপদটি এয়ারপোর্ট থেকে বেশ খানিকটা দূরে। রারা সরোবর যাবার পথে ১৯৭৯-এ এখানে একবার এসেছিলাম। স্বভাবতঃই পূর্ব পরিচিত সব কিছুকে একটু মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি। অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। এয়ারপোর্ট ও বাজার এলাকা আরো বেশী জমজমাট হয়েছে। আমাদের এবারের অভিযানের পরিকল্পনা হল এখান থেকে হাঁটাপথে যাব দোলপা উপত্যকার অভ্যন্তরে। সে এক অজানা নিষিদ্ধ দেশ।

নেপাল হিমালয়ের এক অত্যন্ত নির্জনতম প্রান্তে এই দোলপা উপত্যকার অবস্থান। দক্ষিণে ধৌলাগিরি হিমল, উত্তর ও উত্তর পূর্ব প্রান্তে তিব্বত অর্থাৎ চীন

সীমানা। পশ্চিমে কাঞ্জিবোরা হিমল ও পূর্বে কালী গণ্ডকি বা থাকোলা অঞ্চল-এই হল দোলপা জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা। দ্রাঘিমাংশ ৮২°৪৫´থেকে ৮৩° ৩০´ও অক্ষাংশ ২৮° ৪৫´থেকে ২৯° ৩০´এর মধ্যে ১৩০০ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চল জুড়ে দোলপা উপত্যকার ব্যাপ্তি। এর মধ্যে মূল দোলপা উপত্যকার আয়তন ৫০০ বর্গমাইল। এই অঞ্চল এখনও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। বিস্তর সরকারি বাধা নিষেধ। এযাবৎ মূল দোলপা অঞ্চলে খুবই কম সংখ্যক পর্যটক যাবার সুযোগ পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে কোন ভারতীয় পর্বতপ্রেমীর পদার্পণ এই অঞ্চলে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। অনেকের ধারণা চীনের তিব্বত দখলের পর প্রাচীন তিব্বতীয় সংস্কৃতি একমাত্র এখানেই টিকে আছে। আমাদের আশা এই নিষিদ্ধ দেশে সেইসব প্রাচীনপন্থী তিব্বতীয় মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে যাব।

১৫ ই সেপ্টেম্বর আমাদের হাঁটা শুরু হল। দলে আমরা ন'জন ও তিনজন মালবাহক। তিলা খোলার দু'ধারে সোনালী সবুজ সোপান ক্ষেত। মাঝে মাঝে গ্রাম। এরই মধ্যে স্বপ্নসুন্দর মনোরম পথ। মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টি। কোদো ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে উঠে এলাম দেপালগাঁও। একগুচ্ছ পরপর লাগোয়া ঘরবাড়ি। বাড়ির ছাউনি দিয়েছে ভুজগাছের ছাল দিয়ে। পরের গ্রাম গুরজানকোট। গ্রাম ছাড়িয়ে কাদামাটির পথ ধরে শেষ বেলায় উঠে এলাম দেওরালি ভঞ্জং গিরিবর্ত্মের উপরে। সামনে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এক সুন্দর উপত্যকা। দিনের শেষে পৌঁছে গেলাম গোথিচোর চারণক্ষেত্রে (উচ্চতা ২৭৬০ মি.)। এখানেই শেষ হল প্রথম দিনের হাঁটা। সকলেই ক্লান্ত। এখানকার ভেড়া প্রজনন কেন্দ্রের সাজানো গোছানো সুন্দর বিশ্রামগৃহে আমাদের আশ্রয়। পাহাড়ে ঘেরা ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা এই চারণক্ষেত্রটি অপূর্ব। দূরে, অনেক দূরে প্রায় ডানদিক ঘেঁসে চারণক্ষেত্রটি মিশেছে দুটি পাহাড়ের কোলে। ওখানে নেমেছে মেঘ। ছোট নদী বয়ে চলেছে অজস্র শাখা নিয়ে। জলের আলপনা। কাঠের তৈরি বাংলোর ঝুল বারান্দায় বসে তাকিয়ে থাকি চারণক্ষেত্রের দিকে। ঘন মেঘের আনাগোণা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। একই রকমের আলো নিয়ে প্রভাত থমকে আছে এখানে। মনে হয় থাকি। থেকে যাই এখানে। কিন্তু তা তো হবার নয়। যেতে হবে। সুজিতের ভাষায় আজ মাধুকরীর দ্বিতীয় দিন। ও ট্রেকিং বলে না। বলে মাধুকরী।

বৃষ্টিভেজা পথ ধরে নেমে এলাম বাপিলা নালার তীরে। পথের পাশে

কুড়িগাঁও। গ্রামের একমাত্র কুঁড়ে ঘরে ক্ষণিকের বিশ্রাম। শিশুরা গুটিগুটি এগিয়ে আসে। ওদের হাতে বেলুন দিতেই ওরা খুব খুশী হল। নালাটির বামতীর ধরে পথ চলা। পরের গ্রাম মুনিগাঁও। ধারাবাহিক গভীর অরণ্যের মাঝে গুটি কয়েক ঘরবাড়ি নিয়ে ছোট্ট গ্রাম মুনিগাঁও। রাত কাটানোর জন্য গ্রামের এক বাড়িতে ঘর জুটে গেল। পাওয়া গেল কিছু টাটকা সবজি ও আপেল। ভোর হতেই যথারীতি বেরিয়ে পড়লাম। গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ। বনমধ্যে চুতরা গ্রাম। অল্পকয়েকটি কুঁড়ে নিয়ে এই নির্জন গ্রামটি। গ্রাম ছাড়িয়ে আবার সেই নির্জন বনানী। বনমধ্যে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। সেই সঙ্গে চুপচাপ বসে পাখী আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনি। ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করে তাঁবু টাঙানো হল। জায়গাটার নাম নাপোকুনা।

নাপোকুনা থেকে ঘনবনের মাঝে পাকদন্ডি চড়াই পথ। পরের দিন সেই বনজঙ্গল পেরিয়ে উঠে এলাম মৌরিয়া ভঞ্জং গিরিবর্ত্মের উপরে (উচ্চতা ৩৯৩০ মি.)। কর্ণালী ও ভেরী জল বিভাজিকা গিরিশিরার উপর এই গিরিবর্ত্মটির অবস্থান। চারিদিকে মেঘের আনাগোনা। এরই মধ্যে লুকিয়ে পড়ল তুষারাবৃত পর্বতচূড়া দুধুকুন্ডারি ও ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা। মৌরিয়া ভঞ্জং থেকে ঘাস ও ফুলে ঢাকা পাহাড়ের ঢাল ধরে একটানা নামা আর নামা। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ি। রঙবেরঙের ফুলগুলিকে চেনার চেষ্টা করি। বুগিয়ালের মধ্যে দিয়ে একসময় ঢুকে পড়লাম বনানীর মধ্যে। ছায়া ছায়া পথ ধরে শেষ বেলায় পৌঁছে গেলাম চোরিকোট গ্রামে। গ্রামের মাঝখানে স্কুলবাড়ি। মাষ্টার মহাশয়রা ওখানেই থাকতে দিলেন।

পরেরদিন রিমি যাবার পথে দেখতে পাই এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। পূর্ব আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কাঙমারা-৫ তুষারশুভ্র শৃঙ্গটি। চারিদিকের ধারাবাহিক ঘনসবুজের মাঝে এই তুষারাবৃত পর্বতচূড়াটিকে দারুণ লাগছিল। রিমি ও মাঝগাঁও গ্রাম ছাড়িয়ে একটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে নেমে এলাম হরিকোট গ্রামে। গ্রামে ঢোকার মুখে রয়েছে একটা ছোট্ট গুম্ফা। হরিকোট বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাড়িঘরগুলো সব ঘেঁসাঘেঁসি করে তৈরি। গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথের অবস্থা খুবই শোচনীয়। জলকাদার মধ্যে এবড়ো খেবড়ো পাথর। সঙ্গের কুলিরা বেঁকে বসল। আর যাবে না। অগত্যা নতুন করে চারজন কুলির বন্দোবস্ত করতে পরদিন অনেকটা সময় চলে যায়। গ্রাম ছাড়িয়ে চড়াই পথ শুরু। শুধুমাত্র ঘরের কাজ বা ক্ষেতের কাজই নয় মেয়েরাই লেগে পড়েছে ঘরবাড়ি রঙ করার কাজে। ঘন্টাখানেক চলার পর একটা কাঠের

গেট টপকে ঢুকে পড়লাম 'সে ফোকসামদো ন্যাশনাল পার্ক' এলাকার মধ্যে। নেমে এলাম জগদুলা খোলার ধারে। এরই বামতীরে তৈজাম। ওখানে রয়েছে নেপাল সামরিক বাহিনীর এক সৈন্যশিবির ও সেইসঙ্গে ন্যাশনাল পার্কের চেকপোস্ট। ভয় হয়। কোনো ঝামেলায় পড়ব না তো! না, আর এগোনো সম্ভব হল না। আমাদের আটকে দিল সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। ওদের সঙ্গে যোগ দিল 'সে ফোকসামদো ন্যাশনাল পার্ক' দপ্তরের ফরেস্ট গার্ড। নানা অজুহাত দেখিয়ে কুলিরাও চলে গেল। আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সঙ্গের কাগজপত্র দেখানো, বোঝানো আর সেই সঙ্গে ওদের সদর দপ্তরের সঙ্গে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ। এ এক অধীর অপেক্ষা। অবশেষে গভীর উৎকণ্ঠার অবসান। পরদিন দুপুরে ছাড়া পেলাম। কিন্তু এই বসতিহীন ঘন অরণ্যের মাঝে কোথায় পাবো মালবাহক। এ এক দুঃসাধ্য কাজ। জওয়ানদের সহায়তায় চারদিন পর তিনটি 'জো' এর ব্যবস্থা হল। 'জো' হল দো-আশলা চমরী গরু অর্থাৎ গরু ও চমরীর মিশ্রণ। সঙ্গে যাবে দুর্গা বাহাদুর ও নন্দ বাহাদুর।

২৪ শে সেপ্টেম্বর নতুন উদ্যমে চলা শুরু। ঘনবন। পিচ্ছিল চড়াই পথ। বন ছাড়িয়ে উঠে এলাম ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ঢালে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাই গুরপাঙ উপত্যকায়। নানা রঙের ফুলের মেলা। ঘাস ও গুল্মে ঢাকা পাহাড়ের ঢালে দুপুরের রান্না খাওয়া। জায়গাটির নাম চুনে। গুরপাঙ নালার বামতীর ধরে দিনের শেষে পৌঁছে যাই এক অনিন্দ্যসুন্দর চারণক্ষেত্রে। এক বিস্তীর্ণ সবুজ গালিচা। কোথাও কোন লোকজনের দেখা নেই। মেঘ সরে যায়। সন্ধ্যার পর স্পষ্ট হয় কাঙমারা শৃঙ্গমালা। চাঁদ ওঠে। আমরা বেরিয়ে পড়ি তাঁবু ছেড়ে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে দিগন্ত ভাসিয়ে। দূরে নদীর পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটা ইয়াক। সব যেন স্বপ্নময়। আমরা সবাই নির্বাক, একটা বিশালতার সামনে দাঁড়িয়ে বোবা হয়ে যাওয়া। কেমন যেন আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছি। এই বিশালতার কাছে বার বার যাবার চেষ্টা। খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। সেই আত্মস্থিত বিশালতার অন্তহীন প্রকাশ এই বিশাল, উদার সদাচঞ্চল, সদাস্থির, মহাস্থবির, মহামৌনি তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গমালা শোভিত হিমালয়ে। তাঁবুর বাইরে কাটিয়ে দিলাম অনেকটা সময়।

রাতের অন্ধকার থাকতেই আমাদের তোড়জোড় শুরু। পরদিন বেরিয়ে পড়লাম খুব সকালে। চারিদিকটা তখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা। একটা থমথমে অবস্থা।

খাড়া চড়াই পথ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতে থাকি। কারো মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ি। পাহাড়ের ঢালে সাদারঙের ফুলের মেলা। এত উঁচুতে এত ফুল দেখে মন ভরে যায়। উচ্চ হিমালয়ের বুকে এ এক অপরিসীম পাওয়া। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে ফেনকমল ফুলের মেলা। উঠে এলাম কেটা গিরিশিরার শীর্ষে। সাজানো পাথরের স্তূপ দেখে মনে হল আমরা পৌঁছে গেছি গিরিবর্ত্মের শীর্ষে। কিন্তু নিরাশ করল দুর্গা বাহাদুর। ও জানাল যে এটা পাস নয়। এখনও যেতে হবে আরও অনেকটা পথ। ক্রমে শুরু হল বরফে ঢাকা প্রান্তর। এক হাঁটু বরফের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পৌঁছে যাই কাঙমারা গিরিবর্ত্মের শীর্ষে। পাথর সাজিয়ে তৈরি হয়েছে কিয়ার্ন ও তারই ওপরে নানারঙের প্রার্থনা পতাকা। গিরিবর্ত্মের উপরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাই ভগবান বুদ্ধকে। বরফ পড়ার যেন শেষ নেই। আমরা ঢুকে পড়েছি বহু আকাঙ্খিত দোলপা অঞ্চলে। আমাদের মন আনন্দ ভরে উঠল। এখান থেকে বরফের ঢালে উৎরাই পথ। বরাফাবৃত ঢালের শেষে নেমে এলাম ঘাস ও গুল্মে ঢাকা পাহাড়ের দেশে। তারই মাঝে ফুটেছে নানা ধরণের ফুল। এদের মধ্যে দেখতে পাই ডেলফেনিয়াম ও মেকানপসিস (নীল পপি)। পুঙমি নালার ডানতীর ধরে দ্রুত নামতে থাকি। সেদিন দাজুখরকায় পৌঁছান সম্ভব হল না। অগত্যা পাহাড়ের ঢালে কোনরকমে তাঁবু টাঙালাম। রাতভোর বৃষ্টি হল। জলকাদার মধ্যেই মালপত্র গুছিয়ে পরের দিন চলা শুরু। মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ঘন্টা দুয়েক চলার পর বনপো অধ্যুসিত পুঙমি গ্রামে পৌঁছে যাই। গ্রামে প্রবেশের মুখে একটা সুন্দর গেট রয়েছে। একে এরা বলে কানি। কানির দেওয়ালে ও সিলিং-এ সুন্দর কারুকার্য বর্ণিত অপূর্ব সব রঙ্গীন দেওয়ালচিত্র। গুম্ফা চত্ত্বরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নেমে এলাম সামদো। দুটি নদীর মিলন হয়েছে এখানে। পুঙমি নালা মিলিত হয়েছে বাউলি বা সুলিগাড নালার সঙ্গে। এখানে মিলিত হয়েছে দুটি পথ। পথের পাশে সেনাবাহিনীর ছাউনি। সামদো থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা পথ নেমেছে দুনাই অভিমুখে। আমরা চললাম পূর্বমুখী চড়াই পথে। বাউলি গাড অর্থাৎ সুলিগাড নদী এখন আমাদের চলার সঙ্গী। শুভ্র ফেনা নিয়ে নীলাভ স্বচ্ছ জলরাশি নেমে আসছে পাইন আচ্ছাদিত বনের মধ্যে দিয়ে। নদীতটের এই মনোরম পথে পৌঁছে যাই পালেম। "সে ফোকসামদো ন্যাশনাল পার্ক" বিভাগের সদর দপ্তর এখানেই। নিকটেই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি। কোথাও কোনো লোকজনের

দেখা নেই। এগুলি সব রিঙমো গ্রামের লোকজনের শীতকালীন আবাস। একটা বড়সড় ঘরে ঢুকে পড়লাম।

পালেম থেকে শুরু হল পাকদন্ডি চড়াই পথ। সুলিগাডের দক্ষিণতটে নদী থেকে অনেকটা উপরে রয়েছে এক সুন্দর গ্রাম। দূর থেকে ভোরের আলোয় গ্রামটিকে দারুণ লাগে। সে এক স্বপ্নময় দৃশ্য। গ্রামটির নাম মারোয়া। চড়াই পথে পৌঁছে যাই সুলিগাড জলপ্রপাতের কাছে। আমরা অভিভূত। মন্ত্রমুগ্ধ। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। প্রবল গর্জনে সুলিগাড নদী ৩৩০ মিটার উপর থেকে আছড়ে পড়ছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখি প্রকৃতির এই অনন্তরূপ। জলের রেণুতে রামধনুর রঙ ধরেছে। এ নদীর উৎপত্তি ফোকসামদো সরোবর থেকে। আকাশধোয়া জলপ্রপাতটিকে পিছনে ফেলে পা বাড়ালাম রিঙমো গ্রামের দিকে। পথের পাশে বৌদ্ধমন্ত্র লিপি খোদাই করা পাথরের স্তূপ। চৈত্য ও প্রার্থনা পতাকা বলে দেয় গ্রাম আর বেশী দূরে নয়। পৌঁছে গেলাম রিঙমো গ্রামে। সুলিগাড উপত্যকা দোলপা জেলার অন্তর্গত। কিন্তু মূল দোলপা উপত্যকার বাইরে এর অবস্থান। শুধুমাত্র সরকারি কাজের সুবিধার্থে মূল দোলপার আয়তন বৃদ্ধি করেছে নেপাল সরকার। মূল দোলপার সঙ্গে যুক্ত করেছে সুলিগাড ও তিচু-রঙ উপত্যকা দু'টোকে। অল্প কয়েকটি ঘরবাড়ি নিয়ে রিঙমো গ্রাম। ঘরবাড়িগুলি সব একই ধরণের। নীচের অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ঘরটি গবাদি পশুদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট। দোতলায় কাঠের চুল্লিকে ঘিরে ওদের শোয়া বসার ঘর। তিনতলার একটি অংশে ভাঁড়ার ঘর ও বাকি অংশ উন্মুক্ত ছাদ। ওটাই ওদের উঠোন। এক টুকরো খাঁজকাটা কাঠের সাহায্যে ওদের ওঠানামা। রিঙমো গ্রামের লোকজন সকলেই বনপো সম্প্রদায়ভুক্ত। গ্রাম থেকে সংগ্রহ করি কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আকাশছোঁয়া যার দাম। এক ফাকড়িং চালের দাম ৬০ টাকা। চিনি ৭০ টাকা। কেরোসিন তেল ১৫০ টাকা নেপালী। এক ফাকড়িং হল ৯০০ গ্রাম। ভারতীয় ১০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়েছিল ১৬০ টাকা নেপালী।

রিঙমো থেকে সমতল পথ ধরে মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ফোকসামদো সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। তীব্র গেরুয়া রঙের সুউচ্চ খাড়া পাহাড়ের মাঝে নীল হৃদয় ফোকসামদো। এ যেন বাংলার চৈতন্য। সর্বত্যাগী, গেরুয়া বসন। কিন্তু নীলের জন্য পাগল। শ্রীক্ষেত্রের দিগন্তবিলীন অন্তহীন কৃষ্ণসম নীলের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বিস্ময়ে আমি হতবাক। এত ভয়ঙ্কর নীল

সারোবর আমি আগে দেখিনি। বিশ্বাসই হচ্ছে না। কার সাথে তুলনা করব। তুঁতে, তীব্র তুঁতে, নীলকান্তমণি, ময়ূরকণ্ঠি, কৃষ্ণনীল, শরতনীল, দ্রৌপদী চক্ষু নীল। কিছুর সাথেই মেলানো যায় না। এই নীলের একমাত্র উদাহরণ ফোকসামদো নীল। সরোবরটি লম্বায় অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ৪.৮ কিলোমিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ১.২ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ৬৫০ মিটার। 'ফোকসো' শব্দের অর্থ ফুসফুস। হ্রদের আকৃতি অনেকটা ফুসফুসের মতো। তাই এর নাম ফোকসামদো। সরোবরের কাকচক্ষু স্বচ্ছজলে কোন জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব চোখে পড়ল না। এ এক দূষণমুক্ত জলাশয়। শীতকালে সুলিগাড নদীর জল জমলেও এর জল বরফ হয় না। ভূতত্ত্ববিদদের মতে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ফলে কাঞ্জিরোবা নদীর গতিপথ আটকে যায়। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এই জলাশয়ের। কিন্তু আঞ্চলিক প্রবাদ একটু অন্যরকম। পূর্বে এখানে একটি গ্রাম ছিল। এক অপদেবতা গ্রামের মধ্যে দিয়ে পালানোর সময় গ্রামবাসীকে এক টুকরো নীলকান্তমণি দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল তার পালিয়ে যাবার পথ যেন কাকেও না বলা হয়। কিন্তু পদ্মসম্ভবা তার অলৌকিক ক্ষমতায় সেই নীলকান্তমণি টুকরোটিকে একতাল গোবরে পরিণত করেছিলেন। গ্রামবাসীদের ধারণা হল এটা ছিল অপদেবীর চাতুরী। অপদেবী ওদেরকে ঠকিয়েছে। তাই তারা অপদেবীর পশ্চাৎ অনুসরণকারীকে তার গতিপথ দেখিয়ে দিলেন। অপদেবী রুষ্ট হয়ে প্রতিশোধ নিলেন। তারই অভিশাপে এখানে নেমে এসেছিল বন্যা। গ্রামটি প্লাবিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এই সরোবরটির।

পরদিন সকালে সরোবরটির পশ্চিমতীর ধরে চলতে থাকি। যাব উত্তরপ্রান্তে। এই পথ সেবু লা বা কাঙ লা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে চলে যায় সে অঞ্চলে অর্থাৎ মূল দোলপা উপত্যকার অভ্যন্তরে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক টুসি ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত তিব্বেতোলজিষ্ট ডেভিড স্নেলগ্রোভ এই পথ ধরেই পৌঁছেছিলেন মূল দোলপা ভূখন্ডে। তীব্র খাড়া পাহাড় সরাসরি নেমে গেছে সরোবরের গর্ভে। উত্তরপ্রান্তে রয়েছে দুটি নালা। কাঞ্জিরোবা হিমল ও উত্তরপূর্ব দিকের গিরিশ্রেণী থেকে এদের উৎপত্তি। এদের সংগৃহীত সব জলটাই পৌঁছে দেয় ফোকসামদো সরোবরে। সরোবরের তীর বরাবর এই সংকীর্ণ পথ ধরে মালপত্রসমেত ইয়াকের চলা সম্ভব নয়। সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে পাইন জুনিপার আচ্ছাদিত পাহাড়ের ঢাল। এরই মধ্যে দিয়ে উত্তর দিকে রয়েছে একটা পথ। এ পথেই যেতে হবে বিখ্যাত

রিঙমো গুম্ফা চত্ত্বরে। আমরা পরদিন গিয়েছিলাম সেই গুম্ফা দর্শন করতে। পাহাড়ের ঢালে সুন্দরভাবে তৈরি বনপোদের এই গুম্ফাটি। বনপো সম্প্রদায়ের লোকেরা সেন-রেপকে অনুসরণ করেন। চোর্তেন চৈত্য, মানি পাথরের স্তুপ প্রদক্ষিণ করা কিংবা প্রার্থনা চক্র ঘোরানো এদের ধর্মে সবকিছুই ডানদিক থেকে বামদিকে। যা হল মূল বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ উল্টো। এদের ধর্মচিহ্ন হল উল্টো স্বস্তিকা। বনপোরা দাবী করে যে ওরাই প্রকৃত তিব্বতীয় প্রাচীন ধর্ম অনুসরণ করছে যার সৃষ্টি হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মেরও অনেক আগে। কিন্তু এদের ধর্ম মূল বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনের প্রভাবে প্রভাবিত। বৌদ্ধধর্মের অনেক আচার এবং প্রথা এই ধর্মে স্থান পেয়েছে। দোলপা উপত্যকার মূল বোদ্ধধর্মের সঙ্গে এদের কোন সংঘাত নেই। সমতল ছাদবিশিষ্ট দু'টি দোতলা বাড়ি নিয়েই রিঙমো গুম্ফা। ভেতরটা অন্ধকার। সব কিছুর উপর ধুলোর আবরণ। দু'টি ছেলে ড্রাম বাজিয়ে এবং ধর্মীয় পুস্তক সংগ্রহ থেকে পাঠ করে আমাদের স্বাগত জানাল। শতছিদ্র নোংরা বেশভূষা। মাথায় লম্বা চুল। সম্ভবতঃ তাতে কোন কালে সাবান তেল পড়েনি। বিবর্ণ হলুদ গায়ের রঙ। হাতের আঙুল অস্বাভাবিক সরু। চোখ কোটরাগত। উজ্জ্বল ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করছে। কিন্তু স্পষ্টতই অমনোযোগী। কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশ। ভাল লাগে না। সরোবরের পূর্বতীর ধরে উত্তরদিকে আর এগোনো সম্ভব হল না। ফিরে আসি। রাস্তাটি চমৎকার। হালকা বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা রাস্তা। ডান পাশে সরোবর। চারিদিক নিস্তব্ধ। দিন শেষ হয়ে আসছে। দিন শেষের রঙ মিলেছে ফোকসামদোর নীল জলে। এখন তার অন্য রূপ। পিছন থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ড্রাম বাজানোর গুরুগম্ভীর শব্দ।

ফোকসামদো থেকে দুর্গাবাহাদুর ফিরে যাবে ওর গ্রামে। খুবই প্রাণবন্ত লোক ছিল দুর্গাবাহাদুর। আবার সমস্যা। গ্রামের ঘরে ঘরে লোক খোঁজা। দর কষাকষি। অনেক টানা পোড়েনের পর ঠিক হল রিঙমো গ্রামের ছেলে তেনজিং মারবো যাবে আমাদের সঙ্গে। মালপত্র বইবার জন্য নিতে হল তিনটে চমরী। প্রতিদিনের জন্য দিতে হবে ৭০০ নেপালী টাকা। ৩০ শে সেপ্টেম্বর শুরু হল আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পদযাত্রা। লক্ষ্য মূল দোলপা ভূখন্ড। হালকা অরণ্যের মাঝে দক্ষিণমুখো এক পথ ধরে রোমান চারণক্ষেত্রে পৌঁছে যাই। বুগিয়ালের মধ্যে দিয়ে প্রায় সমতল পথ। চিনচুনে থেকেই শুরু হল ধুলো পাথরের মধ্যে দিয়ে কষ্টকর পথ। ওঠা আর

ওঠা। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ি। শ্বাসকষ্ট হয়। সেই ছলে পিছনে ফেলে আসা দৃশ্যে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া। সবুজ অরণ্যকে বিদায়। একটা ক্ষীণ নালার ধারে ধারে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলি উত্তরদিকে। অসিতদাকে নিয়ে শঙ্কর অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। তাই দোদাং-এ আমাদের তাঁবু পড়ল। ভোর হতেই দেখি ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু জমে বরফ হয়ে গেছে। আমাদের সেদিনকার লক্ষ্য বাঘা লা গিরিবর্ত্ম। এবড়ো খেবড়ো পাথর আর মাঝে মধ্যে বরফের ঢাল। ধীর পদক্ষেপে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে উঠে এলাম গিরিবর্ত্মটির শীর্ষে (উচ্চতা ৫১৪০ মিটার)। আমরা উঠে এসেছি গ্রেট হিমালয় বিভাজিকা গিরিশিরার উপরে। পাথরের স্তূপ ও প্রার্থনা পতাকা টাঙানো রয়েছে উপরে। প্রশান্তদা ও আমি দক্ষিণদিকের গিরিশিরাটি ধরে উঠে এলাম অনেকটা উপরে। চারিদিকটা একটু ভাল করে দেখে নেওয়া। উত্তরদিকে কানজিলারোয়া পর্বতচূড়া। পশ্চিমদিকে কাঙমারা শৃঙ্গমালা ও দক্ষিণে রয়েছে নরবুকাঙ ও সাঙ্গপাঙ্গোরা। পূর্বদিকের আমাদের সেই নতুন দেশ মধ্য হিমালয় উপত্যকা। যার অবস্থান গ্রেট হিমালয় বিভাজিকা ও তিব্বতীয় প্রান্তিক গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী অংশে। ধূসর বাদামী রঙের পাহাড়। গাঢ় নীল আকাশে দুধ সাদা রঙের মেঘের আনাগোনা ও বৃক্ষহীন নির্জন দিগন্ত। প্রকৃতির আর এক রূপ। এই নিয়েই মূল দোলপা অঞ্চলের শুরু। ধৌলাগিরি, চুরান ও পুথি হিয়চুল্লি হিমল তৈরি করেছে একটা দেয়াল। একটা বাধা। উত্তরমুখী গাঙ্গেয় বর্ষা মেঘ বাধা পায় এখানেই। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই রুক্ষপ্রান্তরের। বাঘা লা গিরিবর্ত্মের পূর্বদিকে বরফের ঢাল। সেই বরফের মধ্যে দিয়ে দ্রুত নেমে এলাম পয়োন খোলার ধারে (উচ্চতা ৪৪৮০ মিটার)। আমরা গ্রেট হিমালয় বিভাজিকা গিরিশ্রেণী পেরিয়ে পৌঁছে গেছি মধ্য হিমালয়ান উপত্যকার অঞ্চলে। আমরা প্রবেশ করেছি আমাদের স্বপ্নের দেশে। প্রবেশ করেছি নিষিদ্ধ দেশ মূল দোলপা উপত্যকায়। স্বভাবতই সকলে দারুণ উত্তেজিত। পয়োন খোলার ডানতীরে দুপুরের বিরতি। পয়োন খোলা বয়ে চলেছে উত্তরদিকে। এরই ডানতীর ধরে ক্রমে উঠতে হল অনেকটা উপরে। পূর্বদিকে একটা পথ চলেছে নুমালা গিরিবর্ত্মের দিকে। এ পথ তারাপ উপত্যকায় যাবার পথ। আমরা চলি উত্তরদিকে অন্যপথে। পথের ধারে একদল বনভেড়া। আমাদের সাড়া পেয়ে দ্রুত উঠে গেল একটা পাহাড়ের মাথায়। কয়েকটা ইয়াক নিয়ে একজন আঞ্চলিক লোক চলেছে দুনাই অভিমুখে। প্রতিটি ইয়াকের পিঠে রয়েছে ৬০ কেজি

করে তিব্বতীয় নুন। ওরা আসছে তিব্বত থেকে। সেদিন আমাদের আশ্রয় জুটেছিল থেমামুচে চারণক্ষেত্রে।

ভোর থেকেই শুরু হল তুষারপাত। এরই মধ্যে পথ চলা। পথের ধারে তিনজন আঞ্চলিক লোকের দেখা পেলাম। ওরা মাখন চা পান করছে। আমাদেরও কাপে কাপে এগিয়ে দেয়। চায়ের সঙ্গে দিয়েথে সাম্পা ছাতু। এটাই হল দোলপাবাসী তথা তিব্বতীদের প্রধান খাবার। ওরা একদল ইয়াক নিয়ে চলেছে সালদাঙ গ্রামের দিকে। ঘোড়ার পিঠে চেপে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ইয়াকের দল। ওদের পোষাক হল খয়েরী রঙের তিব্বতীয় লম্বা কোট। যার নাম 'বাকু'। কানের দু'ধারে ঝুলছে একগুচ্ছ লাল সুতো। সুতোর রঙ ও মাথা র টুপির রঙই বলে দেবে ওরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরুষেরা হাতে পড়েছে লাল ও সাদা রঙের চুড়ি। আর চুলে বেঁধেছে লম্বা বিনুনি। ওদের বিদায় জানিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এলাম লামেসিয়া গিরিবর্ত্মের উপর (উচ্চতা ৫১৩৬ মিটার)। আমরা বিস্ময়স্তব্ধ। আমাদের দৃষ্টি যায় অনেক অনেক দূর পর্যন্ত। নাম না জানা অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গমালা। ঢেউ-এর মতো। যেন বিশেষ নির্দেশে থমকে দাঁড়িয়েছে। তীব্র ঠান্ডা হাওয়া বইয়ে অল্প অল্প তুষারপাত হচ্ছে। আমরা সকলেই নির্বাক। অসিতদা ধ্যানমগ্ন। আত্মসমাহিত। হাওয়ার প্রচন্ড বেগে দাঁড়ানোই মুসকিল। দেবী বসে আছে চোর্তেনের আড়ালে। মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে আছে দূরে ভুবনমোহিনী রূপের দিকে। একটু একটু কাঁপছে। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে ওকে। ওর চঞ্চলতা গেছে থেমে। এক আঞ্চলিক লোক আসছিল আমাদের সঙ্গে। লম্বা চুল। কাঁধে গীটারের মত বাদ্যযন্ত্র। এর সাথে কোন কথাই হয়নি। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়েছি। প্রত্যুত্তরে মিটিমিটি হাসি। সেই লোক মাঝে মাঝে আঙুল ছোঁয়াচ্ছে ওর বাজনার তারে। মৃদু সুর। অসিতদা কান্না আর না পাওয়ার যন্ত্রণার আকুতি নিয়ে গাইছে 'তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তরও মাঝে'। তুমি কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করছে যেন গায়ে কাঁটা দেয়। এ কোন 'তুমি'? কোথায় যে'জন আছে? আঞ্চলিক লোক মাথা নীচু করে অসিতদার গানের সাথে বাজনা বাজাচ্ছে। কেউ অপরের ভাষা বুঝি না। কিন্তু সম্ভবত সুর বুঝি, আকুতি বুঝি। আদিগন্ত, ধ্যানস্থ, আত্মসমাহিত উদার গিরিশৃঙ্গমালার বিশাল মৌনতার সামনে পৃথিবীর ছাদে বসেছে অপার্থিব জলসা।

লামেসিয়া লা থেকে উত্তর পূর্বে অর্থাৎ উপরি বারবুঙ অঞ্চলে আছে দু'টি

উপত্যকা সারবুঙ ও তারাপ আর **উত্তরদিকে** লাঙগু অঞ্চলে রয়েছে নামগুঙ ও পানসাঙ উপত্যকা।এদের নিয়েই মূল দোলপা অঞ্চল। লামোসিয়া লা থেকে মূল পথটি গেছে সালদাঙের দিকে। আমরা উত্তর পশ্চিমমুখো পথ ধরে যাব সে অঞ্চলে। নুড়ি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বিপদসংকুল উৎরাই পথ। নামতে হল অনেকটা নীচে। দিনের শেষে পৌঁছে যাই তেরেলামুকচুঙ। রাতে হাঁড়কাঁপুনি ঠান্ডা। সঙ্গের সকল শীত পোষাক জড়িয়েও তাঁবুর মধ্যে থাকা দায়। ভোর হতেই দেখি চারিদিকে বরফ জমেছে। ক্যাম্পের পাশের কুলকুল শব্দে বয়ে চলা ছোট্ট নালাটি তখন থমকে দাঁড়িয়ে। সবটাই জমে বরফ। সেদিনের চলা শুরু হল এক রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। রাতে প্রচন্ড ঠান্ডা হলেও দিনের বেলায় বেশ গরম! ধীরে ধীরে উঠে এলাম সে গিরিবর্ত্মের উপরে (উচ্চতা ৫১০০ মিটার)। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে স্পষ্ট হল সে অঞ্চল ও ক্রিষ্টাল মাউনটেন সহ কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতচূড়া। সরাসরি নেমে এলাম একটা নালার ধারে। নালাটিকে সঙ্গী করে পথ চলা। চারিদিকে জুনিপারের ঝোপঝাড়। যেন চা বাগানের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছি। ধারাবাহিক রুক্ষতার মাঝে সবুজের ছোঁয়া। খুবই ভাল লাগে। চোখের আরাম হয়। পথের পাশে পড়ে রয়েছে বৌদ্ধবাণী খোদিত পাথরের স্তূপ অর্থাৎ মানি পাথর। ৩ রা অক্টোবর আমরা পৌঁছে যাই এক ঐতিহাসিক গুম্ফার দ্বারপ্রান্তে (উচ্চতা ৪৬০০ মিটার)। 'সে' শব্দের অর্থ ক্রিস্টাল। তাই এই গুম্ফাটি ক্রিস্টাল গুম্ফা নামে পরিচিত। হতাশ হই। খুবই সাধারণ কাঠামো। হিমালয়ের অন্যান্য অনেক বৌদ্ধগুম্ফার সঙ্গে এর মিল নেই। কয়েকটি সাধারণ আঞ্চলিক ঘর। লাল রঙের আধিক্য। অজস্র ধর্ম পতাকা উড়ছে। সে গুম্ফার সামনে নদীর দিকে মুখ করে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা। ওখানে বসি। জন মানবের চিহ্ন নেই। প্রাণী বলতে পাহাড়ের ঢালে কয়েকটা বনভেড়া। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন কালে অপেক্ষা মানুষ মানুষের জন্য। শব্দ বলতে নদীর শব্দ, বাতাসের শব্দ, প্রার্থনা পতাকার পতপত শব্দ। *পৃথিবী প্রেমময় হয়ে উঠুক, ধরণী অহিংস হয়ে উঠুক, জীবলোকের পারস্পরিক সহ-অবস্থান হোক।* ধর্মের এই শাশ্বতবাণী কে শুনতে আসে ওখানে? এই নির্জন দুসাধ্য, দুস্তর, রুক্ষ পার্বত্য উপত্যকায় প্রকাশ্য দিবালোকে দেবালয়ের সামনে দাঁড়িয়েও কেমন যেন ভয় করে। একটা অস্বস্তি। কেন ভয়? কেন অস্বস্তি? সম্ভবত একা হয়ে যাবার ভয়। আমরা ন'জনে এখন একা। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর প্রায় শেষবেলায়

এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম। জুনিপারের বোঝা নিয়ে বৃদ্ধলোকটি ঘরে ফিরে এল। গুম্ফা লাগোয়া একটি দোতলা বাড়ি। নীচের অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিয়ে ওর পিছু পিছু উঠে এলাম ওর আশ্রয়ে। উনোনে জুনিপার ঝোপের সাহায্যে আগুন ধরাল। আমাদের বসতে দিল ওখানে। সুন্দর এক কারপেটের উপরে। ভাষা এখানে প্রধান অন্তরায়। নেপালের অন্য অঞ্চলের তিব্বতীয়রা নেপালী ভাষা ভালভাবেই রপ্ত করলেও অধিকাংশ দোলপাবাসীরা তাদের নিজস্ব তিব্বতী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না। বৃদ্ধলোকটি সে গুম্ফার তদারকি লামা। শতছিদ্র লামা পোষাক। মুখে হাসি লেগেই আছে। ও সারাবছর একাকী কাটায় এই নির্জন প্রান্তরে। গুম্ফাসংলগ্ন একটা ঘরে আমাদের থাকতে দিল। নীচু দরজা। তাই ঘরে ঢুকতে হল হামাগুড়ি দিয়ে। সে গুম্ফার প্রধান লামা থাকেন সাকাং গুম্ফায়। উত্তর দিকে বয়ে চলেছে ইয়েজু কানজু নালা। এরই বামতীরে একটা পাহাড়ের গায়ে সাকাং গুম্পার অবস্থান। একে গুম্ফা না বলে বরং নির্জন আবাস বলাই শ্রেয়। তিব্বতের অনেক প্রসিদ্ধ লামারা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে এখানে নির্জনবাস করেছেন। 'সে' গুম্ফার ভিতরে আছে নানা ভঙ্গীমায় উপবিষ্ট ভগবান বুদ্ধের নানা অবতার মূর্তি। মাখনের প্রদীপের স্বল্পালোকে দেখলাম লাল কাপড়ে মোড়া বৌদ্ধধর্মের উপর লেখা সারি সারি পুঁথি। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া তাংখাসমূহ। মূলগুম্ফা ও উত্তরদিকের চৈত্যগুলির মাঝখানে স্তূপাকারে রয়েছে রাশি রাশি মানি পাথর। অধিকাংশ পাথরের গায়ে লেখা রয়েছে 'ওম মণি পদ্মে হুঁম' অথবা আঁকা রয়েছে বৌদ্ধমূর্তি। চৈবা সম্প্রদায়ভুক্ত কায়গু সাকার এই গুম্ফাটির মূল মূর্তিটি হল পদ্মসম্ভবার। একাদশ শতাব্দীতে এই গুম্ফাটি তৈরি করেছিলেন তেন-চিন-রা-পা-লামা। দোলপো উপত্যকায় প্রাক বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ধর্মগুরু ধ্রতব ইয়াসে দোলপা উপত্যকায় প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিনি এখানকার সাকাং গুম্ফায় নির্জনবাস করে মোক্ষলাভ করেছিলেন। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন দোলপাবাসীরা এখানে মিলিত হন। সপ্তাহকাল ধরে উদ্‌যাপিত হয় এক উৎসব। ক্রিষ্টাল পাহাড়কে ঘিরে আয়োজিত হয় ১০ মাইলের এক পরিক্রমা। যাকে এরা বলে 'কোরা'। সাকাং ছাড়িয়ে আরো উত্তরদিকে রয়েছে বনপো সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গুম্ফা সামলিং ও পিজোর।

'সে' গুম্ফা থেকে অনেকটা নীচে ইয়েজু ও কানজু নালার মিলনস্থল। জলের

ধারার উপর কয়েকটা ধর্মচক্র। জলের স্রোতের সাহায্যে ঘুরছে এই ধর্ম চক্রগুলো। নদীর কুলকুল ধ্বনিতে প্রচারিত হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের শান্তির প্রার্থনা। এই নির্জনতম শান্ত উপত্যকায় শান্তির জন্য এত কাতর প্রার্থনা। ভাবতেও অবাক লাগে। নিকটেই সমতল ছাদবিশিষ্ট তিনটে ঘর। গ্রীষ্মকালীন আবাস। এরা সালদাঙ গ্রাম থেকে এখানে এসেছে গবাদি পশু চরাতে। সঙ্গে এনেছে ছাগল, ভেড়া, গরু ও কুকুর। শীতের আগেই গ্রামে ফিরে যাবে। ওদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি সামান্য কিছু ভাঙা ও ধুলোভর্তি চাল। প্রতি ফাকডিং-এর দাম ১০০ টাকা নেপালী।

দোলপা উপত্যকায় প্রথম মানুষের প্রবেশ ঘটেছিল প্রায় দু'হাজার বছর আগে। পূর্বে দোলপা ছিল তিব্বতের অংশ বিশেষ। লামারা মুস্তাং উপত্যকার মধ্যে দিয়ে মধ্য তিব্বতে যাতায়াত করতেন। তখন দোলপা মুস্তাং ও তিব্বতের মধ্যে কোন সীমানা চিহ্নিত ছিল না। দোলপা ও মুস্তাং উপত্যকা'কে তিব্বতের প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হত। প্রায় দুশো বছর আগে নেপালের গোরখা রাজারা জুমলা ও মুস্তাং অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব বহাল করেছিলেন। সাধারণভাবেই এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশ অর্থাৎ দোলপা উপত্যকাও নেপালের সঙ্গে যুক্ত হয়। সাম্প্রতিককালে এই অঞ্চলে অল্প কিছু বিদেশী পর্যটকের প্রবেশ ঘটেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক গুসিপি টুসি, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড স্নেলগ্রোভ এবং ১৯৭৪ এ ডঃ জর্জ সেলার ও পিটার মেতিহসান। এরা সকলে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন এই নিষিদ্ধ দেশে। সংগ্রহ করেছিলেন নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য। দোলপা অঞ্চলে শান্তিতে বসবাস করছে এখানকার মানুষজন ও সেইসঙ্গে প্রচুর সংখ্যক বনভেড়া, নেকড়ে, তুষারচিতা ও আরো অনেক বন্যপ্রাণী।

এই নির্জন প্রান্তরে 'সে' থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল হল সালদাঙ গ্রাম। তেনজিং মারবো ওর ইয়াক নিয়ে ফিরে গেল। ও কাঙলা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে ফিরে যাবে রিঙমো গ্রামে। সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলি। জুনিপার ঝোপের মধ্যে দিয়ে উঠে এলাম এক রুক্ষ গিরিখাতের মাঝে। তারই মাঝে বয়ে চলেছে এক ক্ষীণ জলধারা। একসময় পাকদন্ডী চড়াই পথে উঠে এলাম সালদাঙ গিরিবর্ত্মের শীর্ষে। তীব্র বেগে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। কিয়ার্নের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ি। মূল দোলপা অঞ্চলের গ্রামগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দূরদূরান্তে। এক গ্রাম থেকে আর এক

গ্রামে যেতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিক্রম করতে হয় এক বা একাধিক গিরিবর্ত্ম। ধুলো পাথরের মধ্যে দিয়ে নামার পালা। দক্ষিণমুখো এই পথ ধরে সরাসরি নেমে এলাম একটা চারণক্ষেত্রে। পাহাড়ের কোলে যাযাবর পশুপালক ড্রোকপাদের তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর কাছাকাছি ওদের ভেড়বখরির দল। সঙ্গে মিশমিশে কালোরঙের হিংস্র তিব্বতী কুকুর। ইয়াকের লোম দিয়ে তৈরি হয় এইসব তাঁবুগুলো। ঢিলেঢালা পোষাকে দৈত্যাকার চোহারার ড্রোকপা মানুষগুলোকে খুবই বন্য লাগে। বছরের বেশীরভাগ সময়ই ওঁরা তাঁবুতে বসবাস করে। দোলপার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ওদের সর্বস্ব নিয়ে যুগ যুগ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। চারণক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে সরাসরি নেমে এলাম নামগুম গ্রামে। (উচ্চতা ৪৮০০মি.)। গ্রামের মাঝখানে খাড়া পাহাড়ের গায়ে নামগুম গুম্ফা। চৈবাদের এই ছোট্ট গুম্ফাটি খুবই সাজানো গোছানো। গ্রামে মাত্র ছ'টি বাড়ি ও সামান্য চাযের জমি। চাষবাস, পশুপালন ও চীন সীমান্তে বিনিময় ব্যবসা এই হল এখানকার মানুষের জীবিকা। বছরে এখানে একটাই ফসলের মরসুম। 'ওয়া' নামে এক ধরণের বার্লির চাষই প্রধান। কাপরদানা আলু ও মূলোর চাষও করে থাকে।

পরেরদিন সেই অপূর্ব সুন্দর গুম্ফাটিকে নীচে রেখে চড়াই পথে উঠতে থাকি। ক্রমে রুক্ষ পাহাড়ের গায়েগায়ে আড়াআড়িভাবে চলিতে হল ধুলো আর ঝুরো পাথরের মধ্যে দিয়ে। পথে এক দোলপা রমণীর সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে পথ ছেড়ে দ্রুত উঠে গেল অনেকটা উপরে। দূর থেকে অবাক বিস্ময়ে আমাদের দেখছে। ওরা বাইরের লোক দেখতে অভ্যস্ত নয়। লাল ও কমলা রঙের পাতায় ছেয়ে আছে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। তারই মধ্যে দিয়ে স্বপ্নসুন্দর উৎরাই পথ। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঢেউ খেলানো ঢিপি ঢিপি বাদামী পাহাড়। মন আনন্দে ভরে ওঠে। একটা বাঁক ঘুরতেই দূরে দেখতে পাই সালদাঙ গ্রাম (উচ্চতা ৩৬২০ মি.)। মূল দোলপার উপত্যকার মাঝে সবচেয়ে বড় গ্রাম। চারদিকে রুক্ষতার মধ্যে জীবনের ছবি। গ্রামটির উত্তরদিকের প্রায় শেষপ্রান্তে করমা সিপচের বাড়ি। আমরা ওর পিছু পিছু পৌঁছে যাই ওর বাড়িতে। বাড়িতে এই সময় একাকী বসবাস করছে করমার বড় মেয়ে দাওয়া সিপচে। ক্ষেতের কাজ, ঘরের কাজ, জো ও চমরী চরানো ও ওদের দেখাশোনা, শুকনো গোবর ও ঝোপঝাড় সংগ্রহ করা, সারাদিনই ওর ব্যস্ততা। সবকিছুই করছে ও একা। শুঁকনো ঝোপঝাড় আর গোবর হল দোলপা তথা

তিব্বতীয় মালভূমি অঞ্চলের একমাত্র জ্বালানী। আমরা পাথরে ঘেরা একটা প্রাচীরের মধ্যে ঢুকে পড়ি। একটা নীচু দরজা। ভেতরটা অন্ধকার। আধো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মেয়েটির পিছু পিছু উঠে এলাম দোতলায়। ঘরের মাঝখানে রয়েছে একটা উনোন। উনোনের ওপর বসানো রয়েছে একটা লোহার খাঁচা। চায়ের জল চাপানো হল। শুকনো গোবরের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেল। অস্বস্তি হয়। তবুও বাইরের হিমেল হাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। ঘরে একটা মাত্র জানালা। জানালা না বলে গর্ত বলাই ভালো। এক টুকরো কাঠ দিয়ে সহজেই বন্ধ করা যায় গর্তটি। এই আধো অন্ধকার ও ধোঁয়ার মধ্যেই দোলপার লোকজন উনোনকে ঘিরে বসে কাপের পর কাপ চা পান করে। গল্প করে আবার রাতের শোবার ব্যবস্থা এখানেই। উনোনকে ঘিরেই এদের বাড়ির সবকিছু। প্রাকৃতিক কারণে গতানুগতিকভাবে মন্থরগতিতে চলে এদের জীবনযাত্রা। চায়ের সঙ্গে আমাদের খেতে দিল সাম্পা ছাতু। চা তৈরি হয়েছে তিব্বতী লবণ, তিব্বতী শঙ্ চা ও মাখন মিশিয়ে। ওয়া বার্লি দেখতে অনেকটা যবের মত। এগুলিকে কড়াই-এর উপর ভেজে নিয়ে জাঁতার সাহায্যে গুঁড়ো করা হয়। এটাই সাম্পা ছাতু।

মেয়েদের পোষাক হল তিব্বতীয় জোব্বা, কোমরে চাবির তোড়া, হাতে লাল ও সাদা রঙের একগুচ্ছ চুড়ি। অনেকটা শাঁখা ও পলার মত। গলায় রঙীন পাথরের মালা। কানে ঝুলছে পাথরের দুল। লম্বা চুলে বেঁধেছে অসংখ্য সরু সরু বিনুনি। দাওয়া করমোর এখনও বিয়ে হয়নি। ওর বয়স ১৮। এখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ৩০। তবে ৪০ বছর বয়সেও বিয়ে হয়ে থাকে। বর নির্বাচনের দায়িত্ব কনের নিজের। আমরা উঠে এলাম ছাদের উপর। ছাদের চারধারে জড় করা রয়েছে জুনিপারের ডালপালা। শীতকালের জন্য সঞ্চয়। উপর থেকে চারিদিকটা দেখে আমরা সকলে অভিভূত। উত্তরমুখী একটা পথ চলেছে তিব্বত সীমানার দিকে। এই পথ ধরে দু'দিনে পৌঁছান যায় সীমান্তবর্তী গ্রাম কায়টো চোঙরা। ওখানেই নেপাল তিব্বত সীমান্ত বিনিময় ব্যবসার বাজার বসে। তিব্বত থেকে সাধারণত আসে নুন ও উল। নেপাল থেকে নিয়ে যায় মূলতঃ খাদ্যশস্য ও পরিচ্ছদ। চীনের তিব্বত দখলের পর চীন সরকার এই বিনিময় ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিল। ইদানিং সেই ব্যবসা আবার চালু হয়েছে। এর মধ্যে মধ্য নেপালে পৌঁছে যাচ্ছে তিব্বতী লবণ। ড্রোকপারা অর্থাৎ পশ্চিম তিব্বতের যাযাবরি পশুপালকেরা এই লবণ সংগ্রহ

করে উত্তর তিব্বতের দ্রাব অঞ্চলের শুষ্ক সরোবর থেকে। এই অঞ্চল কায়টো চোঙরা থেকে দিন দশেকের হাঁটাপথ। বিনিময়ে ওরা পাচ্ছে নেপাল থেকে আনা খাদ্যশস্য। শীতকালে দোলপা ভূখন্ডে প্রচন্ড ঠান্ডা ও বরফ পড়ে। তখন এখানে গবাদি পশুদের খাদ্যাভাব হয়। পূর্বে দোলপাবাসীরা শীতকালে ওদের ভেড়বখরি ও জো-গুলিকে চরানোর জন্য দিয়ে দিত ড্রোকপা বা চাংপাদের কাছে। এর জন্য ড্রোকপাদের পারিশ্রমিক দিতে হত খাদ্যশস্য। তারও একটা হিসেব ছিল। যাযাবরিরা এইসব ভেড়বখরি, জো ইয়াক নিয়ে চলে যেত সাঙপো ও আরো উত্তরের উপত্যকাগুলিতে। কিন্তু বর্তমানে চীন সরকার ও ব্যবস্থাও বন্ধ করে দিয়েছে। এখন শীতকালে এইসব গবাদিপশুদের নিয়ে দোলপাবাসীরা চলে যায় গ্রেট হিমালয়ান বিভাজিকার দক্ষিণ ঢালে। এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইয়াক ছাড়া এই রুক্ষ প্রান্তরে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইয়াকই এদের বাঁচার প্রধান অবলম্বন।

সালদাঙ থেকে পূর্ব দিকে একটি পথ সারকাভোট অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে কালী গন্ডকি উপত্যকায়। এপথে অতিক্রম করতে হবে একাধিক গিরিবর্ত্ম। দোলপার গ্রামগুলি শীতকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কারণ প্রতিটি গিরিবর্ত্মের উপর তখন জমা হয় প্রচুর বরফ। সালদাঙ থেকে শীতকালে বেশ কিছু লোকজন নেমে আসে বারবুঙ উপত্যকায়। ওরা যায় গবাদি পশু চরাতে, ব্যবসায়ের সামগ্রী নিয়ে আবার কখনও অন্যদের ক্ষেতে কাজ করতে। সালদাঙ গ্রামের মধ্যে দিয়ে উত্তরদিকে বয়ে চলেছে নামকুঙ খোলা। এই নদীটি ইয়াকসার গুম্ফার নিকটে মিলিত হয়েছে পানসাঙ খোলার সঙ্গে। পানসাঙ ও নামকুঙ অঞ্চলের সব নদীনালায় সংগৃহীত জল দোলপা কর্ণালী হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় মুগু কর্ণালী নদীপথে। ইতস্ততঃ কয়েকটা উইলো গাছ, দিগন্ত বিস্তৃত বাদামী পাহাড়, তুঁতে নীলাভ আকাশ, বিরামহীন ঝোড়ো হাওয়া আর গতানুগতিক মন্থর জীবনযাত্রা। এ নিয়েই বিস্তীর্ণ সালদাঙ গ্রাম। আমরা রয়েছি তিব্বতীয় মালভূমির উপরে। এ কথা ভাবতেই সমস্ত শরীরে আনন্দ ও রোমাঞ্চের শিহরণ বয়ে যায়। মনে পড়ে বিশ্বনন্দিত পরিব্রাজকদের কথা।

করমা, শিবশঙ্কর ও আমি চললাম মূল গ্রামের দিকে। পাঁচটি ছোট বড় গ্রাম নিয়ে সালদাঙের ব্যাপ্তি। ৮০ টি ঘরবাড়িতে বসবাস করছে প্রায় ৬০০ জন।

ঘরবাড়িগুলো সবই এবড়ো খেবড়ো পাথর দিয়ে তৈরি। দেয়ালে কোন রঙের প্রলেপ নেই। যথারীতি নীচু দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় এক/দু'ফুট নীচু এক অন্ধকার ঘরে। এদের গবাদি পশুরা থাকে এখানেই। সরু কাঠের গায়ে খাঁজকাটা সিঁড়ির সাহায্যে দোতলায় ওঠা। ওখানে উনোনকে ঘিরে রান্না, খাওয়া ও শোবার ব্যবস্থা। দোতলায় আরো একটি বা দুটি ছোট ঘর আছে। পরিবারের সবরকম জিনিসপত্র থাকে ওখানই। ঘরগুলো সব নীচু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমরা গ্রামের মাঝে চালের সন্ধান করি। ঘরে ঘরে চাল খোঁজা। অনেকক্ষণের চেষ্টায় মাত্র এক ফাকডিং চাল জুটল। বহু যত্নে রাখা ছিল একটা বাক্সের মধ্যে। এখানে ভাত খাওয়াটা খুবই ব্যয়বহুল ও বড়লোকি ব্যাপার। নেপালের অন্যত্র বসবাসকারী তিব্বতীয়দের থেকে এরা আলাদা। জীবনযাত্রায় এখনও সাবেকী ঐতিহ্য বহাল রেখেছে। এদের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় রয়েছে নানা উৎসব ও নানা বৈচিত্র। কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যেও এরা খুবই সুখী, সদাহাস্যময় ও আমোদপ্রিয়। মন্থর গতিতে ও মহানন্দে দিন কাটায় ওদের স্বাধীন রাজ্যে। ওদের জীবনের চাহিদা খুবই কম।

এখানকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কোন পশু হত্যা করে না। কিন্তু ওরা মাংসাসী। প্রত্যেকটি বড় গ্রামে বসবাস করে লোরা সম্প্রদায়ের একটি পরিবার। ওরাই গ্রামে কসাই-এর কাজ করে। আমাদের জন্য নিয়ে এল ইয়াকের মাংস। করমার কাছে পেলাম খানিকটা আলু। দ্বিজদা ও সুজিত রান্নায় লেগে পড়ল। দাওয়া সিপচে হাতে হাতে এগিয়ে দেয় শুকনো গোবর ও ডালপালা। বেশ কয়েকদিন পর সেদিন রাতে আমাদের ভাল খাবার জুটেছিল। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ। মাখনের প্রদীপের স্বল্পালোকে আমরা উনোনে ঘিরে বসে রইলাম। আমাদের রাতের বিছানা হয়েছিল ওখানেই। দাওয়া সিপচে শুয়ে পড়ল ছাদের উপরে খোলা আকাশের নীচে।

৬ই অক্টোবর নেমে এলাম নামকুণ্ড খোলার তীরে। এই নদী ধরেই দক্ষিণদিকে আমাদের চলার পথ। যাব তারাপ উপত্যকায়। পরের গ্রাম নামদো। নামকুণ্ড খোলার ডানতীর বরাবর খানিকটা উপরে অনেকটা এলাকা নিয়ে গ্রামটি। গ্রামের ৬০ টি বড়িতে বসবাস করছে প্রায় চারশো লোক। নদীর বামতীরে খাড়া এক পাহাড়ের শীর্ষে রয়েছে নামদো গুম্ফা। অবাক বিস্ময়ে দূর থেকে দেখি সেই আশ্চর্যজনক স্থপতি। গিরিখাত গভীরে নালাটির বামতীরে চোরাগাঁও ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নিকটেই

নদীতীরে আমাদের তাঁবু পড়ল। পরেরদিন নামকুণ্ড খোলাকে ছেড়ে আমরা পূর্বদিকে এগিয়ে চলি। নদীর কুলকুল শব্দ ও ইয়াকের গলায় বাঁধা ঘন্টার টুং টাং আওয়াজই আমাদের চলার সঙ্গী। সেদিন তাঁবু পড়ল জাঙলা গিরিবর্ত্মের উত্তর ঢালে। এক অসাধারণ সুন্দর এই নির্জন প্রান্তরটি। শক্ত বরফ গলিয়ে সংগৃহীত হল সেদিনকার জল। রাতে প্রচন্ড ঠান্ডার মুখোমুখি হলাম। তবুও ভোর হতেই চটপট বেরিয়ে পড়ি। আধঘন্টার মধ্যে উঠে এলাম জাঙলা গিরিবর্ত্মের উপরে (উচ্চতা ৫১০০ মিটার)। আমরা দূরে চোখ রাখতেই মন্ত্রমুগ্ধ একটা বোবা মৌনতা। দূরে গ্রেট হিমালয়ান বিভাজিকা গিরিশিরা। গিরিশিরাটিকে অলংকৃত করেছে একাধিক গিরিশ্রেণী। এরই মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এক সুউচ্চ ধ্যানস্থবির বিশালকার পর্বতচূড়া। ধারাবাহিক রুক্ষতার মধ্যে শুভ্রশোভিত এই গিরিশৃঙ্গটি একাকী বিরাজমান। সকলের থেকে একটু দূরে, স্বতন্ত্র ভাবে। মনে প্রশ্ন জাগে দেবাদিদেব হিমালয়ের উপর এমন শাসনের ভঙ্গিমায় কে দাঁড়িয়ে আছে? সে নিজেই নিজের পরিচয়। সে হল ধবলগিরি যা ধৌলাগিরি-১। আমরা অভিভূত ওর রূপে ওর বিশালতায়। জাঙলা থেকে দক্ষিণমুখো উৎরাই পথ ধরে ক্লান্তিকর নামা। পাহাড়ের গায়ে সবুজের আবরণ। পৌঁছে গেলাম এক সবুজ ময়দানে। এহেন সুন্দর চারণভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভেড়বখরির দল। পৌঁছে যাই তারাপচু-এর ধারে। চু-শব্দের অর্থ নদী। তারাপ স্বপ্নময় উপত্যকা। ২০ কিলোমিটার লম্বা প্রায় সমতল প্রান্তর জুড়ে রয়েছে ১০ টি গ্রাম। নদীর দু'পাশে শস্য শ্যামলা ক্ষেত আর জলাভূমি। মনে হল আমরা পৌঁছে গেছি ভূস্বর্গে। রয়েছে বেশ কয়েকটি গুম্ফা। টোকিও চাম্পা ও গুরু গুম্ফাগুলি হল চৌবাদের। সিপচোক হল বেনপোদের। সেদিন রাতে আশ্রয় জুটল টোকিও গুম্ফা সংলগ্ন একটা ঘরে। গুম্ফার লামা রয়েছেন সালদাঙ গ্রামে। লামার মেয়ে মেয়েজামাই ও ওদের শিশুপুত্র সপরিবারে বসবাস করছে গুম্ফাটির দোতলায়। দোলপা অঞ্চলের অধিকাংশ লামারা বিবাহিত এবং পরিবারের সঙ্গেই বসবাস করেন। সুন্দরী তন্বী তরুণীটি গুম্ফা ও গুম্ফা সংলগ্ন জমির উত্তরাধিকারী। সংসারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তারই উপর ন্যস্ত। সন্ধ্যার পর পৌঁছে গেলাম ওদের ঘরে। যথারীতি এগিয়ে দেয় তিব্বতী চা ও সাম্পা। এটাই এখানকার সৌজন্য। তিব্বতী মাখন চা প্রথম প্রথম খুবই বিস্বাদ লাগত। বমি হবার উপক্রম হত। কিন্তু পরে আমরা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। শুকনো মাংস ও সাম্পা দিয়ে

তৈরি করেছে একটা সুপ। ওদের রাত্রে খাবার। খাবার খাওয়ার পর এখানকার সকলেই খাবারের প্লেটটি জিব দিয়ে চেটে পুটে এমনভাবে খেয়ে নেয় যে ওটাকে ধোয়ার প্রয়োজন হয় না। ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। ঘর ভরে গেছে ধোঁয়ায়। সুজিত ও দ্বিজদা শুকনো গোবরের জ্বালানী দিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। এরই মধ্যে কিরণময়দা ডাইরির পাতা শেষ করে চলেছে। লিখে রাখছে সারাদিনের অজস্র অভিজ্ঞতার কথা। করমা ওর ইয়াক নিয়ে ফিরে যাবে সালদাঙ গ্রামে। পরবর্তী পথের জন্য চাই মালবাহক। তারাপ চু গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ পথ। এ পথে চমরী চলাচল সম্ভব নয়। আবার সমস্যা। এখানকার লোকেরা প্রচুর টাকা দাবী করে। শেষ পর্যন্ত টোকিও গ্রামের সেরিং থেনডুপ ও প্রেমা রাজী হল। তারাকোট পর্যন্ত তিনদিনের জন্য দিতে হবে ২৪০০ টাকা নেপালী। সমতল সবুজসুন্দর প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে দ্রুত চলতে থাকি। তারাপ উপত্যকা দোলপার অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নদীতীরে ঘনসবুজে ঢাকা জলাভূমি। দু'ধারে পর্বতগাত্র যথারীতি রুক্ষ ও ধূসর বাদামী বর্ণ। ধারাবাহিক মরুপাহাড়ের দেশে এইসব জলাভূমিকে বড়ই আশ্চর্য লাগে। পৌঁছে যাই দো গ্রামে (উচ্চতা ৪০৯০ মিটার)। এবড়ো খেবড়ো পাথর সাজিয়ে তৈরি হয়েছে গ্রামের প্রাচীর। তারই মাঝে রয়েছে ৩৪ টি ঘরবাড়ি। বসবাস করছে ভোটিয়া মগর সম্প্রদায়ের লোকজন। নেপালী মগরারা এখানে বংশানুক্রমে বাস করছে। এরাও খাম ভাষায় কথা বলে ও তিব্বতী বেশভূষা পরতেই অভ্যস্ত। এক কথায় দোলপার বসবাসকারীদের বলা হয় দোলপা পা। এখান থেকে দক্ষিণদিকে তারাকোট যাবার দু'টি পথ। তারাপ চু গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বিপদসংকুল পথে সময় লাগবে মাত্র তিনদিন। অপর পথটি পাঁচদিনের। অতিক্রম করতে হবে একটি গিরিবর্ত্ম। দো গ্রাম থেকে সরাসরি পূর্বমুখী পথটি চলে গেছে সারকাভোট অভিমুখে। আমরা তারাপ চু গিরিখাতের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। নদীটিকে সঙ্গী করে চলার পথ। পৌঁছে যাই কামটারকা (উচ্চতা ৩৪০০ মিটার)। এখানে লাঙ খোলা মিশেছে তারাপ নদীর সঙ্গে। মূল দোলপার মাঝে যে নদীনালাগুলি আমরা চলার পথে পেয়েছি সেগুলি অধিকাংশই উত্তরমুখী। একমাত্র তারাপ চু ব্যতিক্রম। তারাপ চু নদী এক গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে গ্রেট হিমালয় বিভাজিকা এবং প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণদিকে। নদীর ডানতটে চাম্পা লা পেরিয়ে নেমে এলাম এক টুকরো সবুজ ময়দানে। ওখানেই আমাদের

তাঁবু পড়ল। খাড়া পাহাড়ের কোলে রয়েছে কয়েকটি গুহা। আমাদের মালবাহক সঙ্গীরা আশ্রয় নিল গুহার মধ্যে।

পরের দিন চলতে থাকি কখনও খাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে আবার কখনও নদীর হিমশীতল জল ছুঁয়ে। ক্রমশঃ আরো সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। শুরু হল বিপদসংকুল এলাকা। তীব্র খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁসে পথ। মাঝে মাঝে পথ ভেঙ্গে নেমে গেছে নদীগর্ভে। পরিবর্তে পাতা রয়েছে সরু কাঠের গুঁড়ি। তারই উপর দিয়ে সন্তর্পণে পথ চলা। হিমশীতল এই খরস্রোতা নদীটা বারদুয়েক পেরোতে হল হাত ধরাধরি করে। দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাই একটা খাড়া পাহাড়ের নীচে। উঠতে হবে অনেকটা। প্রায় ৮০/৯০° পাহাড়ের গা ঘেঁসে পথ। পিঠের রুকস্যাক বারবার আটকে যায়। পা রাখতে হচ্ছে খুবই সতর্কভাবে। গিরগিটির মত দেয়াল বেয়ে এগিয়ে চলা। নীচের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠি। ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। এ এক দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর পথ চলা। আড়াআড়ি ভাবে একটা ঢালে পৌঁছে যাই। মাটি ও ঝুড়ো পাথরের ধস নেমেছে ওখানে। এরই মধ্যে দিয়ে নামতে হবে। দাঁড়ানোর উপায় নেই। গড়ানো পাথরের সঙ্গে নীচের দিকে নামতে থাকি। নদীতীরে পৌঁছে তবেই স্বস্তি। তাঁবু টাঙালাম একটুকরো সবুজ ময়দানে। পরেরদিন চলার পথ নদীর ডানতীরের পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘন ঝোপঝাড় ও গাছপালার মধ্যে দিয়ে। পৌঁছে গেলাম হিমালয়ের সেই পরিচিত শ্যামল সবুজ উপত্যকায়। একটা প্রহরী চৌকি পেরিয়ে নেমে এলাম বারবুঙ খোলার ধারে। এ নদীর উৎপত্তি সারকাভোট ও মুকুট অঞ্চল থেকে। তারাপ চু ও বারবুঙ খোলার সঙ্গমস্থলের নিকটেই রয়েছে একটা গুম্ফা। এটাই হল বিখ্যাত সানদুল গুম্ফা। আমরা পৌঁছে গেলাম তিচু রঙ উপত্যকায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সোনালী সবুজ সোপান ক্ষেত। ক্ষেতে কর্মরত আঞ্চলিক লোকজন। এরই মধ্যে উঠে এলাম তারাকোট গ্রামে (উচ্চতা ২৮০০ মিটার)। অল্পদূরে এক গিরিশিরার উপরে সাহারতারা গ্রামটি। গোরখা রাজত্বকালের পূর্বে তিচু-রঙ স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল তারাকোট। এখানে ছিল প্রশাসনিক দপ্তর অর্থাৎ জঙ। এই উপত্যকায় বসবাসকারী মগররা তারালি বলেও পরিচিত। তিব্বতী আচারে প্রবাহিত। মূল দোলপা ও মধ্য নেপালের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন হত এদের মাধ্যমে। এখান থেকে দক্ষিণদিকে ধোরপাটান হয়ে পোখরা যাবার পথ আছে।

আমরা পরদিন বারবুঙ খোলার ধারে ধারে এক সহজসুন্দর গাছপালায় ঘেরা প্রশস্ত পথ ধরে চলি দুনাই অভিমুখে। পথের ধারে ছোট ছোট গ্রাম। মাঝে মাঝে পাইন গাছের হালকা বনানী। আমরা ফিরে এসেছি আমাদের পরিচিত হিমালয়ের অঙ্গনে। ১৬ কিমি. দূরে দুনাই (উচ্চতা ২১০০ মিটার)। পৌঁছতেই বিকেল গড়িয়ে এল। এখানেই দোলপা জেলার সকল সদর কার্য্যালয়। এই ছোট্ট শহরটিও বেশ জমজমাট। সারিসারি দোকানঘর। বহু লোকজনের বসবাস। বারবুঙ খোলার বামতীরে প্রশস্ত পথ ধরে নেমে এলাম রূপগাড গ্রামে। পথের ধারে এক হোটেলেই রাত কাটানো। রাত কাটিয়ে ১৩ই অক্টোবর চড়াই পথে পৌঁছে যাই জুফল বিমান বন্দরে (২৬২০ মিটার.)। শেষ হল আমাদের পদযাত্রা। গত ২৯ দিনে আমরা পেরিয়ে এসেছি প্রায় ৪০০ কিমি. পথ ও অতিক্রম করতে হল সাতটি গিরিবর্ত্ম। বিমানবন্দরের কাছেই একটা হোটেলে আছি। সামনে প্রশস্ত ঘাসে ঢাকা লন। ওখানেই সারাদিন অপেক্ষা। আগামীকাল (১৪ই অক্টোবর) আসবে একান্ত আমাদের জন্য ভাড়া করা বিমান অর্থাৎ চার্টার্ড ফ্লাইট। যাব নেপালগঞ্জ। আবার ওজনের সমস্যা। মালপত্র বাছাবাছি চলেছে। ফেলে দিতে হবে অনেককিছু।

১৪ই অক্টোবর সকাল ৯'টা। জুফল বিমানবন্দরে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। প্লেন আসবে। ফিরে যাবো নেপালগঞ্জ। সুজিত একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একলা। পাহাড়ের দিকে মুখ করে। এগিয়ে যাই ওর কাছে। ও টের পায় না। পিঠে হাত রাখি। ও চমকে ওঠে। ফিরে তাকায়। কেমন যেন উদাস বাউল চোখ। চোখের কোলে সুস্পষ্টতই নীল অপরাজিতা ফোকসামদোর নীল ঢেউ।

স্বপন রায়

যমুনোত্রী

জান্‌কী বাঈ চটির জন্যে প্রস্তুতি

হনুমান চটি থেকে যমুনো ত্রীর দূরত্ব তের কিলোমিটার। বহুযাত্রী সকাল সকাল বেরিয়ে যম্‌না মাঈকে দর্শন করে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। আমরা তা করব না। আমরা আজ আট কিলোমিটার যাব। জান্‌কী বাঈ চটিতে রাত্রিবাস। কাল ভোরে ফের রওনা হয়ে যমুনোত্রী ঘুরে একেবারে হনুমান চটিতে ফিরে আসব। এতে কষ্ট কম হবে। আমাদের দলে অধিকাংশ বয়স্কা মহিলা। চড়াই উৎরাইয়ের পথে হাঁটা চলার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, তাই এমনতরো ব্যবস্থা।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছে বৃষ্টি পড়ার শব্দে। টিনের চালার তলায় রাত্রিবাস। তাই বৃষ্টি ঝরার শব্দ স্পষ্ট শুনেছি। কখনো জোরে, কখনো আস্তে। একে তীব্র শীত, তায় বৃষ্টি। আলস্যের আর দোষ কি! কলকাতা থেকে যে'কটি কম্বল এনেছি তা পর্যাপ্ত বোধ হয়নি। হোটেলওলার কাছ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে 'একসেট' ভাড়া নিয়েছি। 'সেট' এ থাকে একটি লেপ ও একটি তোষক। পাঁচটাকা প্রতি রাতের জন্য। 'বেডটী' দিয়েছে ছ'টায়। প্রাতঃরাশের সময় এসে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লাম। দরজা খুললেই দৃষ্টি গিয়ে ঠেকে সামনের সবুজ পাহাড়ে। কিছুটা দূরে লোহার একটি সেতু। সেটি পেরিয়ে অন্য একটি পাহাড়ের খাড়াই পথ। এখান থেকেই যমুনোত্রীর পথ শুরু। কিন্তু ও কী? এই সাতসকালে তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই পিলপিল করে চড়াই ভেঙে বহুযাত্রী রওনা দিয়েছেন। শুধু বৃষ্টি নয়, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। যাত্রীদের বর্ষাতি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও কারো ফেরার চেষ্টা নেই। সকলেরই যেন রোখ চেপে গিয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে পাঞ্জা কষে তারা একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন। যাত্রীদের সঙ্গে যাচ্ছে ঘোড়া, ডান্ডি এবং কান্ডি। বাহকদের বর্ষাতি নেই। বৃষ্টি থামারও লক্ষণ নেই। পাহাড়ের মাথায় পাইন গাছগুলোর ওপর জমাট বাঁধা চাপ চাপ ঘন কাল মেঘ পিলে চমকিয়ে দেয়। দরজা বন্ধ করে ফের বিছানায় এসে বসি। যমুনোত্রী মাথায় থাক।

সহযাত্রীরা সকলেই আমার মত অলস নয়। কেউ কেউ প্রাতঃকৃত্য সেরেছেন। কেউ ভিয়েন থেকে গরম জল ম্যানেজ করে স্নান সেরে ফেলেছেন। আর শুয়ে থাকা যায় না। শাল মুড়ি দিয়ে পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। বৃষ্টি থামেনি, থামার লক্ষণও নেই। কাঠের পাটাতনের ওপর তীরবেগে বৃষ্টি পড়েই ছিটকে যাচ্ছে। হাত বিশেক দূরে যমুনা। সামনের একটি বাঁক পেরিয়ে ভী-ষণ তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে নদীর বুকে ভীষণাকার প্রমত্ত হস্তিতুল্য প্রস্তরখন্ডগুলিকে উল্টিয়ে ফেলে দেবে। যমুনায় দৃষ্টি নন্দন ঘন নীল জল। নির্মল, নিষ্কলুষ। নীল যমুনার বুকে সাদা ভেলার মত নিরন্তর ভেসে চলেছে বিভিন্ন আকারের ফেনা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায়! আমাদের বারান্দার নীচে বিশাল একটি রডোডেনড্রন গাছে লাল রঙের পাহাড়ী ফুল। সে গাছের তলায় কয়েকটি ঘোড়া নিরুপায় ভিজছে।

সাড়ে এগারোটায় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ। গাট্টি বোচ্‌কা দু'ভাগে বেঁধে ফেলা হয়েছে। বেশিরভাগ মাল-পত্তর চটির একটি ঘরে বন্দী থাকবে। বাকী সামান্য কিছু বিছানা এবং শীতবস্ত্র যাবে জানকীবাঈ চটিতে, ঘোড়ার পিঠে। ম্যানেজারবাবুর তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই রওনা হওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টি বারবারই বাধ সাধছে। আকাশ ভরসা দিচ্ছে না। বৃষ্টির বেগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেলে, সহযাত্রীরা সকলেই উৎসাহ উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন, পরক্ষণেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামলে, সকলেরই উৎসাহ উবে যায়। পাহাড়ী বৃষ্টির চরিত্র বোঝা দায়!

যমুনা মাঈ কী-জয়

বেলা একটার সময় বৃষ্টি একটু ধরলে মালবাহী ঘোড়াগুলো রওনা হয়ে গেল। আর অপেক্ষা করা সমীচীন বোধ হল না। সন্ধ্যার আগে যেকোন মতেই জানকী চটিতে পৌঁছন চাই। পাক্‌দন্ডিতে যারা যাবেন, তারা প্রায় সকলেই পুরুষ, তারা রওনা হলেন। পুরুষ দলের সঙ্গে গেলেন শ্রীমতি গীতা রায়। আরতি দত্ত আমাদের দলে সবচেয়ে প্রবীণ। তাকে আমরা গায়িকা মাসি বলে ডাকি। তিনি ডান্ডিতে উঠে এতক্ষণ বেসুরো গলায় গাইছিলেন, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে...(বাঙালী কবিরা যমুনাকে নিয়ে যদি একটি গান বাঁধতেন!) চারজন ডান্ডিবাহক তাঁকে ঘাড়ে

তুলল। তারপর জয় যমুনা মাঈ কী-জয় বলে তারা বৃষ্টির মধ্যে রওনা দিল। সোমার বয়স কম হলেও সে হাঁটার ঝুঁকি নিল না, নিল ঘোড়া। অন্যান্য মহিলারা গেলেন ঘোড়ায়। কিন্তু সাউথ ক্যালকাটা গার্লস এর অধ্যাপিকা শ্রীমতি রীণা সরকারের পৃথুলা শরীর দেখে ঘোড়াঅলারা বেঁকে বসল। তাদের দাবী এই মাঈজীর জন্যে ডবল সওয়ারীর মাসুল দিতে হবে। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে, বিড়ি ধরিয়ে গাড়োয়ালী ভাষায় তারা জোর আলোচনা চালাতে লাগল। শেষে তাঁর পতিদেবতাটির মধ্যস্থতায় গাড়োয়ালীরা ঘোড়া রওনা করিয়ে দিল। কিন্তু দলের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ব্যক্তিত্ব রথীন মজুমদার তখনো যাত্রা শুরু করেননি। তাঁর স্ত্রী কিছুটা অশক্ত, প্রায়শই শ্বাসের কষ্টে ভোগেন। দু'দিন ভাল থাকলে তিন দিনের দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই মজুমদারবাবু দীর্ঘ চার বছর অপেক্ষা করে এবার চারধামে এসেছেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি। শ্রীমতী মজুমদার যাবেন ডান্ডিতে। বাহকেরা তাঁকে কাঁধে তোলার আগে তিনি স্ত্রীর বর্ষাতি ঠিক করে দিলেন। ব্যাগ খুলে দেখলেন লেবু দিয়ে জরানো আদার কুচির কৌটো ঠিক আছে কিনা। তাছাড়া কিসমিস, লজেন্স, চুইনগাম, আমসত্ত্ব নিয়েছেন তো? পুরু কম্ফোর্টারের বন্ধনী থেকে বাঁ কানটি বাইরে কেন? তিনি তা ঢেকে দিলেন। আচ্ছা, অতিরিক্ত একসেট মোজা আর গ্লাভস নেওয়া হয়েছে তো? ব্যান্ডির শিশিটা? সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও মনে হল কি যেন নেওয়া হল না, কি একটা যেন বাদ থেকেই গেল। ডান্ডিবাহকেরা একসময়ে বিরক্ত হয়ে সওয়ারী কাঁধে তুলে রওনা দিল। তারপরে ধীরে ধীরে অতীব সন্তর্পনে রওনা দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহাদুরের এক নিষ্ঠাবান কর্মী এবং সেতারবাদক রথীন মজুমদার।

হনুমান চটির লাগোয়া একটি লোহার মজবুত সেতু, সেটি পেরোলেই চড়াই। মাটির ওপর শক্ত পাথরের টুকরো গেঁথে তৈরি করা রাস্তা। সমতলের বাসিন্দাদের পক্ষে এপথে চলা একটু কষ্টকর। তবে পাহাড়ে পাথুরে রাস্তার সুবিধেও কিছু আছে। তা হল, দু'টি পাথরের টুকরোর মাঝখানে লাঠির আলটি গেঁথে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। এছাড়া পাথরের ফাঁকে ফাঁকে অনবরত পা আটকিয়ে উঠে যাওয়া যায়। পাকদন্ডীতে যেপথে আমরা চলেছি, সেপথেই যাচ্ছে ডান্ডি, কান্ডি এবং ঘোড়ার সওয়ারী। ডান্ডিকে অনেকে বলে ডুলি। হালকা কাঠে মোচার খোলার আকারে তৈরি দোলা। তাতে কাঠের চেয়ারে একজন সওয়ারী স্বচ্ছন্দে বসে যেতে পারে।

ডান্ডির বাহক চারজন। সামনে দু'জন এবং পিছনে দু'জন। হনুমান চটি থেকে দু'দিনে যমুনোত্রী ঘুরে আসার দক্ষিণা ৫০০ (পাঁচশ) টাকা। কান্ডির ভাড়া ১৫০ (দেড়শ) টাকা। ফুট চারেক লম্বা একটি ঝুড়িকে লম্বালম্বি তিন ফুটের মত কেটে ফেলা হয়। ঝুড়িটির এক চতুর্থাংশ থাকে ফাঁকা। সাধারণত শিশু এবং মালপত্র বহন করার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়। সওয়ারী বা মাল বহন করে একজন বাহক। আর ঘোড়ার চার্জ ১৫০ (দেড়শ') টাকা। যাতায়াত একদিনে সারলে অর্থদণ্ড কিছু কম।

চড়াই ভেঙে প্রথমটায় সবাই তরতর করে উঠে যায়। খানিক পথ গেলেই হাঁপ ধরে। দ্রুত নিঃশ্বাস ছড়ায় বাতাসে। আর তখনই সমস্ত শীতবস্ত্র অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়। শীতবস্ত্র খুললেই বিপদ। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তার চেয়ে রাস্তার ধারে খানিক বিশ্রাম নিলে শরীরে দ্রুত স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। তখন আবার পথ চলা। আঁকা বাঁকা বিশালকায় অজগর সাপের মত পথ পাহাড় পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। প্রথমটায় ডানধারে ছিল শক্ত পাহাড়, বাঁয়ে ভীষণ গর্জন তুলে বয়ে যাওয়া যমুনা। এখন নদী ডানদিকে, বাঁদিকে পাহাড়। আমাদের দৃষ্টি নদীর দিকে নয়। পাহাড়ের দিকেও নয়, পথের দিকে। এপথ এমনই যে পথিকের সমস্ত মনোযোগ টেনে নেয়। এমনি পথে চলা কারুরই অভ্যেস নেই, তাই পথের পাশে খাদের মধ্যে চীর, পাইন কিংবা ফুলে ভরা রডোডেনড্রন কাউকেই মোহিত করে না।

মেঘলা দিন। সকাল থেকে একবারও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। খাদের গাছগুলিতে ঝুপসি অন্ধকার, কেমন যেন রহস্যময় ভয়াল মনে হয়। টিপ টিপিয়ে বৃষ্টির বিরাম ছিল না। এবার বৃষ্টি নামল মুষলধারে। মাঝে মাঝেই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ক্ষীণ ধারার ঝর্না, পথের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি-ধারার সঙ্গে তার বেগ বাড়ে। যাত্রীকে আরো সন্তর্পণে পথ চলতে হয়। সোয়েটার, কোট, জ্যাকেটের ওপর বর্ষাতি চাপিয়েই সকলে রওনা দিয়েছিলেন বলে রক্ষে। কিন্তু মুস্কিলে পড়লেন তারা, যাদের গায়ে অল্পদামী, প্লাস্টিকের আবরণ-ফুট চারেক লম্বা প্লাস্টিক দু'ভাঁজ করা ওপরদিকটা সেলাই করা। অল্প বৃষ্টিতে এগুলি বেশ কাজ দেয়। কিন্তু দুরন্ত বাতাসে গায়ে রাখা দায়। তাই কেউ কেউ কোমরে দড়ি পেঁচিয়ে নিয়েছেন, যাতে সেটি উড়ে না যায়। যমুনোত্রীর পথ একেবারে জনশূন্য। কোন বসতি নেই, দোকানপাট তো দূরের কথা। তাই পথ চলা বড় একঘেয়ে,

বিরক্তিকর। হারিয়ে যাবার ভয় নেই। তাছাড়া দশ/বিশ হাত অন্তর পাহাড়ের গায়ে চুনের প্রলেপ দিয়ে পথ নির্দেশ করা। তা দেখে এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না। একা একাই পথ চলি। শুরুতে কিন্তু এমন ছিল না। আমরা পাঁচজন একসঙ্গে রওনা হয়েছিলাম। রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর তরুণ চিকিৎসক ডাঃ তুলসী ভট্চাজ, পায়রাডাঙার সুশীল দে, খিদিরপুরের শ্যামল দাস, আমার মা শ্রীমতি গীতা রায় এবং আমি। আমাদের পিছনে রথীনবাবু। সকলের বয়স এক নয়, হাঁটার গতিতেও ভিন্নতা। তাই কেউ এগিয়ে গেছেন। কেউ পিছিয়ে পড়েছেন।

প্রায় দু'কিলোমিটার পথ এসেছি এক ঘন্টায়। ঘোর বর্ষণে নাকাল হয়েছি বিস্তর। বর্ষাতি থাকা সত্ত্বেও জ্যাকেটের দুই হাতা, কলার, প্যান্টের নীচের অংশ ভিজে চুপচুপে। জুতো মোজা ভিজে দ্বিগুণ ভারি। এক কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ, অন্য কাঁধের ব্যাগে জলের বোতল, সামান্য খাবার এবং টুকিটাকি জিনিস। সমস্ত ভিজেছে। শরীর তো নয়, যেন এক ভারবাহী জন্তু। আবার বৃষ্টি এল প্রচন্ড জোরে। দাঁড়াব কোথাও তার উপায় নেই। ঘরবাড়ি দোকান পাটের চিহ্ন নেই। রাস্তায় এমন কোন গাছপালা নেই যে তার তলায় আশ্রয় নেব। অগত্যা একটানা হেঁটে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। দু'কিলোমিটারের মাথায় পথের পাশে একটি দোকান দেখে সেখানে আশ্রয় নিই।

পথ যত এগোচ্ছে অর্থাৎ যতই ওপরে উঠছি খাদ ততই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। হনুমান চটিতে যমুনা ছিল হাতের কাছে। এখন অনেক অ-নেক নীচে। সেদিকে তাকালে বড় ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু চোখ সরিয়ে হাঁটা শুরু করলেই মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায়। তাই ক্বচিৎ কখনো তাকিয়ে দেখি সেদিকে। অপরদিক থেকে ভিন্ প্রদেশের যাত্রীরা ফিরে আসছেন। হয়তো সকাল কিংবা গতকাল তাঁরা রওনা হয়েছিলেন, আজ নেমে যাচ্ছেন হনুমান চটিতে। মুখোমুখি দেখা হলেই, বলো যমুনা মাই কি — জয়। পাঁচ ছ' বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধা — তীর্থযাত্রীর বয়স সীমা। সকলের হাতেই একটা করে লাঠি। নিশ্চিন্তে চলেছেন। যারা ফিরছেন, তাঁদের মুখে তৃপ্তি, আনন্দ এবং পথশ্রমের জটিল রেখা। ভারি ভালো লাগে। সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হাঁটা। পথের কোন কিছুই মন টানে না। তাই ফিরে আসা যাত্রীদের সঙ্গে দু'একটি কথা হয়। কিছুটা বৈচিত্র্য আসে। অতীব বৃদ্ধ কোন যাত্রী অথবা কোন শিশুকে স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসতে

দেখলে ভাল লাগে। নিজের কষ্টকে বেশী প্রাধান্য দিতে ইচ্ছা করে না। সামনে দোচালার কিছু ঘড়বাড়ি দৃষ্টিপথে এলে প্রাণে জল আসে — তবে কি ফুলচটি এল!

আজকাল হনুমান চটি পর্যন্ত বাস এসে যাওয়ায় ফুলচটির গুরুত্ব কমেছে। বেড়েছে জান্‌কীবাই চটির গুরুত্ব। আমার এক সহকর্মী, সলিলকুমার মিত্র দু'বার এপথে এসেছেন। প্রথমবার ১৯৬৬-তে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৬-এ। তখন ধরাসু পর্যন্ত বাস আসত। তারপর হাঁটা। প্রথমদিন তাঁরা হাঁটতেন তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাঁরা উঠতেন গংগানি। তৃতীয় দিন স্যানাচটি। চতুর্থদিনে ফুল চটিতে রাত্রিবাস। পঞ্চমদিনে যমুনোত্রী দর্শন। ভাবতে ভারি ভালো লাগে যে আজকাল একদিনে যমুনোত্রী ঘুরে হনুমান চটিতে দিব্যি ফিরে আসা যায়। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের সময়, অর্থ, এবং পথশ্রম লাঘব হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আগে যারা দিনের পর দিন হেঁটে এপথে আসতেন তাঁদের প্রাপ্তি ছিল অনেক অ-নেক বেশী। পথকষ্টের সঙ্গে ভয়, আনন্দ-বেদনার যুগ্ম অনুভূতি থাকত তাঁদের মনে। হিমালয়কে অনেক বেশী উপভোগ করতে পারতেন।

ফুল চটিতে পৌঁছে একটি চায়ের দোকানে বসি। সঙ্গীরা একে একে আসেন। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে গল্প হয়। একটু পরে এক কান্ডিঅলা দোকানে এসে পৌঁছয়। তার পিঠের ঝুড়িতে একটি শিশুর পোশাক এবং বিছানা। কান্ডিঅলার বুকে প্লাস্টিকে জড়ান মাস কয়েকের এক শিশু। পিছনে আসে বছর পঁচিশেক বয়সী দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতী। যুবতীটি আমাদের বেঞ্চে এসে বসে। কাঁচা হলুদের মত তাঁর গায়ের রং। সমস্ত শরীরে অদ্ভুত পেলবতা ছড়ানো। বর্ষাতি খুলে সে মুখচোখের জলবিন্দু রুমালে মোছে। তারপর হাতের লাল চেটো দুটিতে ঘষা দিয়ে ডাগর চোখ মেলে তাকায়। তার পাতলা ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে। 'বংগাল সে আতা হ্যায় না!' এমন অপত্যাশিত প্রশ্নে চমকে উঠি। দেখি তার ঠোঁট জুড়ে আছে টেপা হাসি। আলাপ জমে যায়। নাম তার ললিতা। বাড়ি বিকানির। এক দফায় সে কলকাতা গিয়েছিল। থেকেছে বেশ কিছুদিন। তাই বাঙালী দেখলেই চিনতে পারে। বাঙালী মেয়েরা ভাল ঘরণী হয়, তারা অপূর্ব সব রান্না জানে ইত্যাদি ইত্যাদি....। কিন্তু কান্ডিঅলার কাছে শিশুটি? ওটা তার দাদা-বৌদির একমাত্র সন্তান। জন্মের পর শিশুটি খুব ভুগেছিল। বাঁচার আশা ছিলনা। তখনই তার বৌদি মানত করেন ভাল হলে যম্‌না মাঈকে দরশন করে, আশীর্বাদ নিয়ে আসবেন। তাই এখানে তাদের আসা। মিনিট দশেক

পর ললিতার দাদা-বৌদি আসেন। তারা ললিতাকে তাড়া লাগান। বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। সামনেই জান্‌কি চটি। অতএব, এসো এগিয়ে যাই।

আমরাও উঠি। হাঁটা শুরু করি। চড়াই ভেঙে এগিয়ে যাই। পথের দু'পাশে পড়ে থাকে সার দেওয়া দোকানপাট এবং যাত্রী-আবাস। কোন কোন দোকান থেকে আওয়াজ আসে— 'চা পিজিয়ে মহারাজ। গরমাগরম পাকোড়া ভী হ্যায়।' দাঁড়াই না। মেঘলা দিন, রাস্তা বড় পিছল। তাছাড়া সন্ধ্যাও হয়ে এল। জান্‌কীবাই দু' কিলোমিটার দূরে। তবু পথকে বড় দীর্ঘতর বলে বোধ হয়। একটি বাঁক ঘুরে সামনের রাস্তায় গিয়ে আঁতকে উঠি। পথ খুবই সংকীর্ণ এবং ভয়ঙ্কর। পাশে খাদ। অ-নেক নীচে ধীরে বয়ে যাচ্ছে যমুনা। নদীর ওপারের খাড়া পাহাড়টি দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ফিরে যাওয়া যাত্রীদের মুখে এই পথটির কথা শুনেছি।এখানে নাকি একটু সাবধানে পেরতে হয়। সামনে শীর্ণ পথের উপর ধ্বস নেমেছিল একটু আগে। এখনো জায়গায় জায়গায় পাথর, মাটি ছড়ানো। বৃষ্টিতে কোথাও কাদা জমেছে। খুব সাবধানে পা ফেলে এগোই। আবাব বৃষ্টি এলো প্রচন্ড জোরে। কিন্তু থেমে থাকার উপায় নেই। আমার মত জন্মভীতুর মনেও পথ চলতে চলতে সাহস জাগে, আত্মনির্ভরতা বাড়লে, হাসি মুখে নির্ভয়ে এগিয়ে যাই।

বড় বড পাথর খন্ডের উপর পা ফেলে খরস্রোতা দুটি ঝর্না পেরিয়ে যাই। পদে পদে ভয় এসে অক্টোপাসের মত গলাটিপে ধরতে চাইছে। ধীরে ধীরে চলি। পথই সাহস জুগিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্ত সাহস হঠাৎ ছিদ্র হওয়া বেলুনের মত চুপসে যায় সামনের চড়াই দেখে। এটাই তাহলে সেই কুখ্যাত 'ছাইগাদা'! কয়েক'শ ফুট দীর্ঘ টানা চড়াই। লাইম স্টোনের কাদা ছড়ানো। অতীব পিচ্ছিল এবং ভয়ঙ্কর। ডানদিকেব পাহাড় থেকে যে কোন মুহূর্তেই ঢালাইয়ের মাখা সিমেন্টের মত মালমশলা গড়িয়ে পড়তে পারে। পড়ছেও। বাঁদিকে পথের ধারে খাদ। একবার কোনমতে পা ফস্‌কে গেলে পাথরের টুকরোর মত কয়েক'শ ফুট নীচে নিশ্চিন্তে হারিয়ে যাওয়া। মা আমার সামনে। মাতালের মত টালমাটাল অবস্থা। দু'বার তাঁর কেড্‌স পিছলে গেল। কোনমতে লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিলেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতের ব্যাগটি কাঁধে নিই। হাত ধরে কিছুটা এগিয়ে দিই। তিন তিনটি ব্যাগ সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বেগতিকদেখে সুশীলদা পিছনথেকে দৌড়ে আসেন। মায়ের হাত ধরে ধীরে— অতীব ধীরে এগিয়ে নিয়ে আসেন।

আমাদের সামনে ললিতা। তার দামী শাড়ি, শায়ার লেস কাদায় মাখামাখি। কেড্‌স দু'টিতে কাদা লেগেছে প্রচুর। কেড্‌স-এর পিছনের সেলাই ফেটে তার গোলাপী রঙের গোড়ালী বেরিয়ে পড়েছে। পা থেকে খুলে যেতে চাইছে জুতো জোড়া। থেমে ঠিক করে নেবার মত ঝুঁকিও নেওয়া চলে না। সে পথের দিকে ভারি মনোযোগ দিয়ে গজেন্দ্রগমনে চলেছে। দীর্ঘ বিপসঙ্কুল পথও একসময় শেষ হয়। কিছুটা উৎরাই। তারপর একটি লোহার সেতু। সেটি পেরিয়ে অপর একটি পাহাড়ে উঠতে হবে। সেতুর ওপর উঠে ছাইগাদার দিকে একঝলক তাকিয়ে দেখি। এখন পথটিকে ততটা ভয়ঙ্কর বলে বোধ হচ্ছে না। সেতু থেকে বহু নীচে যমুনার শরীরের দিকে চেয়ে মনে হয় আত্মপ্রত্যয় কিছু বেড়েছে।

কব্জি ঘুরিয়ে দেখি সাড়ে ছ'টা বাজে। কলকাতায় এখন সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে আলো আরো প্রায় দেড়ঘন্টা থাকবে। তবে দিনের ঔজ্জ্বল্য কমেছে। যতটা সম্ভব দ্রুত পথ চলার চেষ্টা করি। আবার পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই। নীচে যমুনা। তাকাই না। তবে তার চলার শব্দ সঙ্গীতের মত কানে বাজে। দ্রুত চলি। শীঘ্র হাঁপিয়ে যাই। দাঁড়িয়ে পড়ি। আবার চলি। বেশ কিছুটা পথ এসে একটা বিশাল পাহাড়ের কোলে বসে পড়ি। হাঁপাই। ললিতা আগেই সেখানে এসেছে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। হাসি বিনিময়। ওদের শিশুটি তারস্বরে কেঁদে চলেছে। কান্তিঅলা তাকে দু'হাতে তুলে নাচিয়ে দুলিয়ে নানাভাবে চুপ করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ললিতা অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে।। তার বৌদিরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন। হয়তো সন্তানের কান্নার শব্দ তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে এল। হাঁপাতে হাঁপতে বৌদি এল। দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর সন্তানকে কোলে নিয়ে বামস্তনটি শিশুর মুখে তুলে দিলেন। আর তক্ষুনি সমস্ত পাহাড় জুড়ে নেমে এল সেই আগের স্তব্ধতা। ললিতা একবার আমার দিকে চেয়ে গুহার বাইরে বয়ে যাওয়া ঝর্নাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

দেরি আর সয় না।প্রায় এসে গেছি। মনের মধ্যে অসংখ্য ছুটন্ত হরিণের হিল্লোল। বামদিকের পাহাড় ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে আর ডানদিকে সরছে যমুনা। বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে চলার পথ। পোয়া মাইল দূরে অসংখ্য ঘরবাড়ি — বসতির চিহ্ন। আর পায় কে! পথ চলা বন্ধ হয়ে যায়। চোখ আটকে গেছে সামনের পাহাড়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে ডানদিকে তাকাই আর অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি তুষার ঢাকা পর্বত চূড়ার ওপর। আজ সারাদিন সূর্যদেব মুখ লুকিয়ে ছিলেন মেঘের আড়ালে। আমাদের চোখে বিস্ময় আর চমক লাগানোর জন্যে শেষ রশ্মিটুকু ছড়িয়ে

দিলেন শুভ্র জটাজুটধারী এক মহান ঋষির মাথায়। মাত্র এক ফার্লং পথ যেতে মন আর সায় দেয় না। পথের ওপর দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ দেখি পর্বতচূড়ার সেই অপরূপ রূপ। চোখের দৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত নম্রতা। হে সুন্দর তোমাকে প্রণাম।

জান্‌কী বাঈ চটি

পথের ধারে একটা বাড়ির দোতলায় উঠে আসি। দোতলার সবকটি ঘরে কুম্ভ স্পেশালের লোক। ঘরগুলোর সামনে চওড়া বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত অঞ্চলে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। উত্তরে যতদূর চোখ যায় ঘন সবুজ গাছ-গাছালি ঢাকা পর্বত শ্রেণী। তাদের কাঁধে চেপে বসে রয়েছে তুষারে ঢাকা পর্বত চূড়াগুলি। পুবেও একই দৃশ্য। আজ এত পথ এসেছি অথচ মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির জন্যে ছবি তোলার কথা মনে হয়নি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসি। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলি। পরপর কয়েকটা।

ছোটবড় উঁচু নিচু পাথরে বাঁধান রাস্তা। কাদা আর অশ্ব পুরীষে একাকার। পা ফেলতে বড় ভয় করে। এ ব্যাপারে আমাদের মাষ্টারমশাই একেবারে নির্ভীক। তিনি দত্তপুকুর থেকেই টক্সাইড ফুঁটিয়ে এসেছেন। তাঁর ওপর সবসময়ে তাঁর পায়ে জুতো। চপ্পল নৈব নৈব চ। যাই হোক, সন্তর্পণে পা ফেলি। পথের দু'ধারে সারি সারি দোকান। চা নিমকিন্ থেকে চাপাটি সব্জী। সমস্ত দোকানের সঙ্গে লাগোয়া ঘরবাড়িই 'যাত্রী আবাস'। সব দোকানে চুল্লির পাশে আজ পুরুষ-মহিলাদের উপচে পরা ভীড়। বিকেলে যারা এখানে এসে পৌছেছেন, সকলেরই জামাকাপড় অল্পবিস্তার ভিজেছে। উনানের পাশে, কেটলির গায়ে সেগুলি ধরে সকলেই তাঁদের ভেজা জামা কাপড় শুকিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। সকাল হলেই যমুনোত্রীর পথে রওনা হতে হবে। আজ সন্ধার মুখে বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। অমন ঘন নীল আকাশ বহুকাল দেখিনি। চারিদিকের পাহাড় বিশ্বস্ত প্রহরীর মত জান্‌কী বাঈকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। আটটা নাগাদ দিনের আলো সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল। তখন আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ আর হাজার হাজার তারা। তাদের সংখ্যা এত বেশী যে মনে হয় একটির গায়ে অন্যটি লেগে রয়েছে। গাড়োয়াল হিমালয়ে শুধু পাহাড়ই নয়, রাতের আকাশও বড় সুন্দর। সেদিকে চেয়ে সমস্ত রাত কাটিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসে।

চড়াই বহুৎ কঠিন হ্যায়, মহারাজ....

সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই মন কানায় কানায় ভরে যায়। চারিদিক রোদে ঝলমল করছে। গতদিন ঝড়-বৃষ্টির যে এত তান্ডব চলছিল, তার কোন চিহ্ন কোথাও নেই। দূরে পাহাড় চূড়ার ঢালে, গাছ-গাছালিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে সকালের নির্মল আলো। আজ আমরা সব্বাই যমুনোত্রী যাব।পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে ফেরার সময় উৎরাই-এ তের কিলোমিটার নেমে হনুমান চটিতে পৌছতে হবে। মোট আঠার কিলোমিটার হাঁটা। আবহাওয়া অনুকূল থাকা চাই। প্রত্যূষে দিনের মেজাজ দেখে সকলেই খুশি।

ডান্ডি আর ঘোড়ার সওয়ারীরা আগে রওনা দিলেন। তারপর পাকদন্ডীর যাত্রী। হরি সিং নামে এক ঘোড়াঅলা খবর পেয়েছিল যে একজন মহিলা জান্‌কীবাই চটি পর্যন্ত হেঁটে এসেছেন। সকাল হতেই সে তার ঘোড়াটি নেওয়ার জন্যে আমার মাকে ক্রমাগত অনুরোধ করছিল। আমরা বলেছি, উনি হেঁটে এসেছেন, বাকী পথ হেঁটেই যাবেন। একটুও অপ্রতিভ হল না হরি সিং। 'আপ জান্‌তা নেহি। চড়াই বহুৎ কঠিন হ্যায়, মহারাজ।' ঘোড়া বিনে চলা দায়। তাছাড়া দলের কোন মহিলাই পাকদন্ডিতে যাচ্ছেন না। তাই সকলের অনুরোধে মাকে ঘোড়ার পিঠে চড়তেই হল।

আজ শুরুতেই আমরা গতি বাড়াই। পাহাড়ী পথে চলা অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। জান্‌কী চটি পেরতে বেগ পেতে হয় না। সামনে একটি বন। দীর্ঘ বিশাল গাছ-গাছালি ছাওয়া। অধিকাংশ গাছই নিষ্পত্র। গায়ে পুরু শ্যাওলা। জায়গাটা কলকাতার কাছাকাছি কোন শহরতলিতে হলে শীতের সময় বিশ/ত্রিশটি দল নির্ঘাত পিকনিক করতে আসত। গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তা ধরে এগোই। জায়গাটি এত ভাল লেগে যায়!

বন পেরিয়ে এবার পাহাড়ের গায়ের পথ ধরি। সেই সংকীর্ণ বন্ধুর পথ। রাস্তা কোথাও এক/দেড় ফুট চওড়া। কোথাও পাহাড় চুঁইয়ে পথের ওপর নেমে এসেছে জলের ধারা। কোথাও মাথা নিচু করে গুঁড়ি মেরে পেরিয়ে যেতে হয়। এক জায়গায় ফাঁপা একটি পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে পথ। তীব্র গর্জন তুলে বয়ে যাচ্ছে যমুনা। কখনো পাহাড়ের ওপর থেকে ঝর্না ছিটকে পড়ছে রাস্তায়। আজ

বর্ষাতি গায়ে নেই। মাথার টুপি কোট ভিজে যায়। খুব মনোযোগ দিয়ে সাবধানে পথ চলছি। এবার পথের বাঁক পেরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ডানদিকে নদীর ওপরে ঝর্নার দৃশ্য পথ চলা রোধ করে দেয়। থমকে দাঁড়াই নির্জন ঝর্নার রূপ দেখি। ছবি তুলি। একটা মজবুত লোহার সেতু পেরিয়ে অপর একটি পাহাড়ের রাস্তা ধরি। পথ সত্যি দুর্গম; কান্না পেয়ে যায়। সামনে পাহাড়ের গা দিয়ে যেপথ, তাতে সোজা হেঁটে যাওয়া যায় না। আড়াআড়ি এক পা দ্'পা করে খুব সাবধানে চলি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে লাল কালিতে লেখা নির্দেশ পড়ি— 'জীবন বড় অমূল্য বস্তু, তাই সাবধানে পথ চল।' ভাল লাগে। একটু দাঁড়িয়ে পড়ি। দলের সকলের খোঁজ খবর নিই। মাষ্টারমশাই দ্রুত এগিয়ে এসে সকলের হাতে একটি করে লজেন্স দেন। সেটি মুখে পুরে আবার পথ চলা। নিঃশব্দে। সকলের মনের উন্মাদনা যেন স্থির.পাহাড়ের মত শীতল। কোন শব্দ নেই চারিদিকে। কেবল পাথরের ওপর লোহার আল পড়ে কখনো 'খটাং' করে শব্দ হয়। একমনে চলেছি। হঠাৎ দূরে তুষার ঢাকা পাহাড়ের দিকে চোখ পড়ে। দৃষ্টি আর সরে না। আমাকে এগিয়ে যেতে হয় না। হিমবাহই যেন তার সম্মোহনী শক্তি দিয়ে টেনে নিয়ে যায় কাছে। বিশাল পাহাড়ী সৌন্দর্যের ছবি ক্যামেরায় বন্দী করার চেষ্টা করি। যদিও জানি বৃথা সে চেষ্টা।

জান্‌কীবাঈ চটি থেকে দু'কিলোমিটার যাবার পর পথের বাঁদিকে গোটা তিনেক দোকান। অন্য কোন বসতি নেই, তবু নাম কৈলাস চটি। আগে যারা পাঁচ/ছয় দিন পাকদন্ডিতে এসে যমুনোত্রী দর্শন করতেন, তারা হয়ত এখানে বিশ্রাম নিতেন, রান্না খাওয়া করতেন। দোকানে বিস্বাদ চা আর ঠান্ডা পকোড়া, জিলিপি। বাইরের রাস্তার ওপর মহারাষ্ট্র থকে আসা একটি দল আঁচল বিছিয়ে ছাতু, ঠেকুয়া শুক্‌নো চিঁড়ে দিয়ে জলযোগ সারছে। আমরা দোকানে বসলাম না। রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ছবি তুললাম। তারপর সরল দেহাতিদের জলযোগ দেখতে লাগলাম। এদের জীবনধারা কত সহজ। বেশভূষা, লটবহর, কথাবার্তা ব্যবহারে কোথাও তথাকথিত ভদ্রতার ছাপ নেই। কত সুখী এরা। তীর্থে পৌঁছে এ্যাটাচ্‌ড বাথ (attached bath) চায় না,গরমজলে মুখ ধোয় না। সর্বোপরি, দেবদ্বিজে ভক্তির কথা বেমালুম কবুল করে, ছলনা করে এড়িয়ে যেতে চায় না। আমরা লক্ষ্য করছি দেখে একজন অল্প বয়স্কা মহিলা লজ্জা পেল। ঘোমটা টেনে

সকলের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

গতকাল যারা এসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ যমুনোত্রী থেকে গিয়েছিলেন। বৃষ্টিতে হনুমান চটিতে নেমে যাবার ঝুঁকি নেননি। তাঁরা ফিরছেন। মুখোমুখি হলেই কেউ কেউ ধ্বনি দিচ্ছেন— 'বলো, যমুনা মাতাকী'— মুহূর্তে অন্যান্য যাত্রীরা পাল্টা জবাব দিচ্ছেন— 'জয়'। চড়াই ভেঙ্গে উঠতে বেশ বেগ পাচ্ছি। ক্ষণে ক্ষণেই দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে যারা ফিরছেন, তারা গড়গড়িয়ে নেমে আসছেন। এত হিংসে হয় দেখে। শুধু তাই-ই নয়, ফিরতি পথের যাত্রীদের চোখে মুখে খুশী এবং তৃপ্তির ছাপ লক্ষ্য করি। চারজন কিশোরের একটি দল একরকম দৌড়ে নেমে গেল। মনে হল, বাড়ির পরিচিত সিঁড়ি তারা লাফিয়ে নামছে। আরও দু'কিলোমিটার পথ বাকী। পাহাড়ের গায়ে লেখা নির্দেশ— 'সামনে খতরনখ চড়াই; সাবধানে পথ চল।' এখানকার পথ খানিকটা প্রশস্ত। ফুট পাঁচেক চওড়া। রাস্তার ধারে সিমেন্ট বাঁধান রোয়াক। দুটি চীর গাছ রোয়াকের ওপর ছায়া ফেলেছে। সেখানে বসি। হাতের কাছেই পাশাপাশি দুটি পাহাড়ের চূড়া। সম্পূর্ণ তুষারে ঢাকা। একটি পাহাড়ের গা দিয়ে সাদা জটার মত ধারা নেমে আসছে। বাতাসে উড়ছে ময়দার মত কিছু বস্তু। আশেপাশে পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে জমাট বাঁধা বরফ গলে গলে নামছে নীচে — বহু নীচে, উপলখণ্ড মথিত করে! যমুনার মূল ধারার সঙ্গে নিজেদের বিলিয়ে দেবার কী দুরন্ত উন্মাদনা!

দেহাতিদের একটি দল আমাদের সামনে, পথের ওপর সারি দিয়ে বসে পড়ল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দল। উমাপ্রসাদ দত্ত এদের দলনেতা। তিনি এসে রোয়াকে আমার পাশে বসলেন। মুখ জুড়ে বার্ধক্যের আঁকিবুকি। ধুতির ওপর সস্তা কম্বল, পায়ে কেড্‌স, মাথায় কাপড়ের ফেট্টি জড়ান। এরা সবাই বিহারের সীতাপুর জেলার বাসিন্দা। 'ক্ষেতির কাম-কাজ' করে কোন রকমে এদের দিন চলে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে গত রাতে তাদের দলের সমস্ত টাকা চুরি গেছে। টাকা ছিল উমাপ্রসাদের স্ত্রীর কাছে। আজ সকালে উঠে তা টের পেলেন। তাঁর স্ত্রীর আঁচল সরিয়ে সয়েটার খুলে বুকের মাঝখানে পর পর তিনটি ব্লাউজের কাটা অংশের দিকে তাকিয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। তাঁর বুকে ছিল চারহাজার সাতশ' টাকা। দলের ষোলজন যাত্রীর গচ্ছিত ধন। উমাপ্রসাদ জানেন গাড়োয়ালীরা গরীব হলেও ভীষণ সৎ। তাই তার সন্দেহ কোন তীর্থযাত্রীই তাঁদের এই সর্বনাশ করেছে। হয়তো পিছু নিয়েছিল, টের

পায়নি। ইচ্ছে ছিল চার ধাম ঘুরে বাড়ি ফিরবেন। এখন যমুনোত্রী থেকেই ফিরতে হবে। উপায় কী!

ওপর থেকে যাত্রীদের সঙ্গে দু'চারজন গাড়োয়ালীও নেমে আসছে। সঙ্গে ঘোড়া। যাত্রীবিহীন। নামার সময় তো তেমন কষ্ট নেই, তাই অনেক যাত্রীই কেবল উঠার সময়ই ঘোড়ায় চড়ে। দু'চারজন গাড়োয়ালী তাদের ঘোড়ায় ওঠার জন্য বড্ড পীড়াপীড়ি করে। সস্তায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। রাজী হই না। কলকাতা থেকে মিত্তিরদা (সলিলকুমার মিত্র) বলে দিয়েছিলেন, হাঁটা পথে কষ্ট হলেও তা খুবই উপভোগ্য, থ্রিল আছে। ঘোড়ায় চড়লে অনেক কিছু হারাতে হয়।'—সত্যিই তাই। ঘোড়াঅলাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই। তবু নিরস্ত হয় না। শেষ অস্ত্র ছোঁড়ে—'চড়াই বহুৎ কঠিন হ্যায়, মহারাজ। আপকা মালুম নেহি।' হেসে ফেলি। কোনমতেই বশ করতে না পেরে কাঁচুমাচু হয়ে সে একটি সিগারেট চাইল। দিলাম। সেটি ধরিয়ে তার সঙ্গীর সঙ্গে নেমে গেল সে। সঙ্গীটিকে বলতে শুনলাম, 'জোয়ান মরদ। রক্ত ওদের গরম। জানি যাবে না— তবু, এই সিগারেটটাই নীট লাভ।'

যমুনোত্রী

পা আর চলে না। একেক সময় মনে হয় সমস্ত জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য চড়াই বহুৎ কঠিন। পদে পদে মালুম হয়। বাঙালী মহিলাদের একটি দলকে দেখে দাঁড়াই। বেহালা থেকে আসছেন। দলের এক প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করি, 'সত্যি করে বলুন তো, আর কতটা যেতে হবে?' বললেন,'সামনের চড়াইটা শেষ করলেই যমুনার উৎস এবং মন্দির।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী দেখলেন? কেমন দেখলেন?' তিনি বললেন,'ভাল, বড় ভাল। তবে কী দেখলাম, বলতে পারব না ভাই। মনে হল আজ যেন চোখ দুটি সার্থক হল। জীবন ধন্য।'

প্রৌঢ়াটি ঠিকই বলেছিলেন। সামনের চড়াই ভেঙ্গে উঠতেই আধ কিলোমিটার দূরের দৃশ্য চোখের সামনে ধরা দিল। দৃশ্য তো নয়,যেন বিশাল ক্যানভাসে মহৎ কোন শিল্পীর আঁকা স্থির চিত্র। কী করে বোঝাব! লিখে বোঝান যে মুর্খামির কাজ হবে। কতটুকু বলতে পারব। বন্দরপুঁছ পর্বতের পাদদেশে যমুনার উতরণ ভূমি, যার জন্যে নামকরণ যমুনোত্রী। কেউ বলেন, যমুনা এখানে উত্তরবাহিনী তাই নাম — যমুনোত্তরী বা যমুনোত্রী। সে যাই হোক, এখানে আসার আগে পথে যত হিমবাহ,

ঝর্না দেখেছি, যমুনোত্রীর রূপের কাছে সকলই তুচ্ছ। ধ্যানী মৌনী কোন তপস্বীর মাথায় বরফ আর তুষারের মুকুট। খয়েরী পাহাড়ের গা বেয়ে সেই ধ্যানীর মুকুট থেকে গড়িয়ে পড়ছে সাদা অতীব সাদা দুগ্ধধারার মত সফেন বারিধারা। তারপর সবুজ গাছ ছাওয়া পাহাড়কে দু'ফালা করে ছল ছল কল-কল করে নেমে যাচ্ছে যমুনা। মনে হয় যে কোন নদী নয়— চঞ্চল অবাধ্য শীর্ণকায়া এক বালিকা বয়ঃসন্ধির আবেগে ছুটে চলেছে নীচে— অনেক নীচে —। উপলখন্ডের বন্ধন সে মানবে না।

বাকী পথ টুকু সমতল। কষ্ট বোধ হয় না। বাঁদিক থেকে বয়ে আসা একটি ঝর্না— পাথরের ওপর পা ফেলে সাবধানে পেরিয়ে যাই । তারপর ঘিঞ্জি দোকানপাট. হোটেল এবং যাত্রী আবাস। নদীর সেতু পেরিয়ে ওপারে যাই। পাশাপাশি তিনটে উষ্ণকুন্ড। একটির জল খুব বেশী গরম, তার নাম সূর্যকুন্ড। সেটির জল টগবগ করে ফুটছে। কাপড়ে বেঁধে চাল ডাল আলু ডুবিয়ে রেখেছে অনেকে। রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই যমুনা মায়ের প্রসাদ। বাণেশ্বরদার পরামর্শে গরম জলে খিচুরি তৈরির লোভ ত্যাগ করি। কলকাতায় পৌছতে পৌছতে প্রসাদে ছাতা পড়ে নাকি গন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় কুন্ডটি মাঝারি গরম। তৃতীয়টি স্নানের উপযুক্ত। সেটিতে স্নান করি। তৃতীয় কুন্ডটির ধারেই মন্দির। সেখানে শ্বেতপাথরে তৈরি গঙ্গ। এবং পাশে কষ্টিপাথরে তৈরি যমুনার কল্পিত মূর্তি।

এবারে ফেরার পালা। পাঁচ কিমি নেমে জানকীবাঈ চটিতে মধ্যাহ্ন ভোজ। তারপর আরো আট কিমি নেমে সন্ধ্যার আগেই হনুমান চটি। ইচ্ছে থাকলেও দেরি করার উপায় নেই। তাই ফেরার জন্যে প্রস্তুত হই। ঝর্না পেরিয়ে যাই। পিছন থেকে যমুনোত্রী টানে। ফিরে চাই। আবার দেখি সেই ঘন নীল আকাশের গায়ে অসীম শুভ্র পর্বতশৃঙ্গকে। পাহাড়ের গায়ে জমাট বাঁধা বরফের গা বেয়ে নেমে আসছে যমুনোত্রীর করুণাধারা। সেই একই ছন্দে বিরতিহীন..... অবিরত। চোখের তারায় আঁকা হয়ে রইল যমুনোত্রীর রূপ। হে সুন্দর বিদায়।।

সুজিত কুমার আঢ্য

পশ্চিম হিমাচলের শৈলশহর

হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যাকা ছেড়ে মাণ্ডি থেকে শুরু করে পশ্চিমমুখী পাঠানকোটের শাহপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছবির মতন অপরূপ কাংড়া ভ্যালির দিকে এগিয়ে চললাম। হিমাচলের এই উত্তর-পশ্চিম অংশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, স্থাপত্যভাস্কর্য ও বিশ্বপরিচিত শিল্প সংস্কৃতির পাশাপাশি রয়েছে ধরমশালা,জ্বালামুখি. কাংড়া,চাম্বা প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধ, শাক্ত তীর্থভূমি। আর চারিদিকের তুষার আবৃত পাহাড় ও উপত্যাকা জুড়ে প্রকৃতির অসীম লীলাভূমির আফুরন্ত ভান্ডার ও হিমাচলী অধিবাসীদের হার্দিক ব্যবহার পথিকজনের হৃদয়ে চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকার মতো।

মাণ্ডি থেকে ১৪৭ কিমি পাড়ি দিয়ে যোগীন্দরনগর, বৈদ্যনাথ,পালামপুর ছুঁয়ে ধরমশালা এসে পৌছালাম সন্ধ্যা ছটার পর। এপথে হিমাচল প্রদেশের বাসে সময় নিল কমবেশি ছ ঘন্টা। আমাদের ধারণা ছিল ধরমশালা বা ডালহৌসীতে হিমাচলের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে হোটেল পাওয়া সহজ ও দামেও কম। তবে এই পূজার মরসুমে ট্যুরিষ্টের আনাগোনা একটু বেশি তাই খুব একটা সহজলভ্য বলে মনে হল না। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের পর সঙ্গীরা ফিরে এসে জানাল হোটেল পাওয়া গেছে। বাস আড্ডা থেকে শহরে আসার ঘুরপথ রয়েছে তবে রাস্তা সংক্ষেপের জন্য একটি স্বর্গারোহন সিঁড়িও আছে। সেটি উঠতে যে কোন লোককেই বার কয়েক দম নিতে হবে।

সিমলা কুলু মানালীর তুলনায় ধরমশালায় ভ্রমনার্থী কিছু কম আসে বটে তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটকের ঝুলিতে ভরার মত রসদের ঘাটতি নেই। এর তিন দিকে ধৌলাধার পাহাড় শ্রেণী দিয়ে ঘেরা। চারিদিকেই নজর কাড়ার মতো সুউচ্চ ওক, পাইন, দেবদারু, রডোডেনড্রেন গাছের সমারোহ। হিমাচলের এ অঞ্চল চায়ের চাষও হয় বেশ। বাসে আসার সময় পলামপুরের পথে পাহাড়ের ঢালে ঢালে চায়ের বাগান লক্ষ করেছি।

ধৌলাধার পর্বতের একটা গিরিশিরার ওপর দাঁড়িয়ে অছে লোয়ার ও আপার

ধরমশালা। শহরটি ১০ কিমি ব্যবধানে দুভাগে গড়ে উঠেছে। ১২০০মি উঁচুতে লোয়ার ধরমশালা প্রকৃতপক্ষে বাসস্ট্যান্ড, কোতোয়ালি বাজার, ব্যবসা বাণিজ্য, স্কুল, পোস্টাপিস, টুরিষ্ট অফিস, বসতি নিয়ে জমজমাট। তবে এ এমন নয় যে পথ চলতে মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খেতে হবে। আর ১০ কিমি দূরে ১৯০০ মি উচ্চতায় আপার ধরমশালায় রয়েছে বৃটিশ আমলের ম্যাকলিয়ড গঞ্জ ও ফরসিথ গঞ্জ। চীন লাসা দখল করার পর ১৯৬০ খৃঃ তিব্বতীয় মহানগুরু নোবেলজয়ী দালাইলামা বৌদ্ধিক বাতাবরণে এখানেই তাঁর মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পরদিন পাখি ডাকা ভোরে আপার ধরমশালার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম ম্যাকলিয়ডগঞ্জে উপস্থিত হতে নজরে পড়ল তিব্বতীয় মেয়ে পুরুষ রাস্তায় হেঁটে চলেছেন নানা কাজে। হাতে তাঁদের প্রার্থনা চক্র বা মনিচক্র (Prayer wheel)। এঁরা বলেন মানি। সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় জপযন্ত্র। যন্ত্রটা ভারি অদ্ভুত। ওপরের অংশটা গোল কৌটোর মতো। মাথাটা ঢাকনার মতো খুলে যায়। তার ভেতর তিব্বতী মহামন্ত্র — 'ওম মণিপদ্মে হুম্' কাগজে হাজার বার লিখে বা ছেপে প্রত্যেকটি জপযন্ত্রে পুরে দেয়। আর নিচের অংশে থাকে একটি হাতল। সেটা ধরে একবার ঘোরালেই হাজার বার মন্ত্র জপা হয়ে গেল। রাস্তার ধারে ধারে তিব্বতীদের দোকানপাঠ, হোটেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পথের ধুলোয় খেলা করছে। কী সুন্দর তাদের চেহারা! হিমাচলের অন্যান্য পাহাড়ি এলাকার চেয়ে এখানকার বাতাবরণটা সত্যিই বেশ তফাত। লাসা থেকে দালাইলামা প্রথমদিকে ডালহৌসীতে আসলেও পরে এই অঞ্চলে আশ্রয় নেবার পর উচ্চতা, ঠান্ডা এবং তিব্বতীয় অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার তিব্বতীয় নারীপুরুষ এখানে বসবাস শুরু করেন। গড়ে উঠে ঘরবাড়ি তিব্বতীয় শিল্পশৈলী সমৃদ্ধ মঠ ও তিব্বতী শিক্ষা প্রতিষ্টান। বিশ্বের দরবারে আজ ধর্মশালা The Little Lhasa of India নামে সুপরিচিত।

বলতে ভুলেছি যেদিন এদিকে আসছিলাম, রাস্তায় একসময় পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকাল। সামনে আরো বেশ কয়েকটি গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে। দূরে একটি বিরাট বিদেশি গাড়িতে আসছেন তিব্বতী বৌদ্ধগুরু দালাইলামা। যাবেন মানালী। রাস্তার দুধারে রঙিন কাগজের মালা আর স্বাগতস্তম্ভ। পাহাড়ি পথের উভয়দিকে লাইন দিয়ে অপেক্ষমান আপামর জনসাধারণ। কী বিরাট কনভয়

একসময় মহানগুরুর গাড়ি বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের কী অপরিসীম ভক্তি শ্রদ্ধা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা ভার! সেই চলে যাওয়া ধুলোধূসরিত পথের ওপরই শ্রদ্ধালুরা সষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগলেন।

অতএব ভারতের পোতালা আশ্রমে দালাইলামা নেই। থাকলে আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হত। একটি বিশাল বিদেশী ট্যুরিষ্ট দল এসেছে মঠে। তারা ভেতরে প্রার্থনা সভায়ে বসে আছেন হাত জড়ো করে। মুন্ডিত মস্তক মেরুন আলখাল্লা পরিহিত লামারা সারিবদ্ধভাবে প্রার্থনা করছেন। মাঝে মাঝে হুংকার দিয়ে মন্ত্র উচ্চরিত হচ্ছে। মঠের গর্ভগৃহ একেবারে শূচিবিধৌত। কাঠের মেঝের ওপর মূল্যবান কার্পেট পাতা। মোমের আলোয় উজ্জ্বল চারিদিক। নিঃশব্দে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা অদ্ভুত সুন্দর ধূপের গন্ধ মন প্রাণ আবিষ্ট করে দিল। এক একটি বেদিতে শয়ে শয়ে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ মৃদু বাতাসে তির তির করে কাঁপছে। দর্শনার্থীদের এদৃশ্য দেখতে বেশ ভাল লাগে।

পাশের আর একটি প্রার্থনা গৃহে এলাম। এটি আগেরটির চেয়ে অনেক বড়ো। একসঙ্গে কয়েকশো লোক ধরতে পারে। সামনে তথাগতের বিরাট সোনালী ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। মাথা উঁচু করে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ঘাড় ব্যথা করে। পাশাপাশি অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, অতীশ দীপঙ্করের মূর্তি। অনেক ভক্ত দন্ডিকাটার মতো মাটিতে প্রণাম করতে করতে সমগ্র মঠ পরিক্রমা করছেন। দীর্ঘায়ত এক একজন লামাকে দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। আবার কয়েকজনকে দেখলে বেশ সম্ভ্রম জাগে, কথা কইতে ইচ্ছে করে। তাঁদের মধ্যে এতজন শান্ত সৌম্য লামার সঙ্গে আলাপ হতে জানা গেল তিনি বেশ কয়েক বছর এখানে আছেন। পূজা-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এখানকার তিব্বতী চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসাবিদ্যারও অভ্যাস করতে হয়। কথায় কথায় বুঝলাম তিব্বতী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তিনি সুপন্ডিত। ফেরার সময় তাঁকে নিয়ে একটি ছবি তোলার অনুরোধ জানালে তিনি আপত্তি করলেন না।

ম্যাকলিয়ডগঞ্জে তিব্বতী জনবসতি, রেষ্টুরেণ্ট, স্কুল ছাড়াও তিব্বতীয় অনেক দুর্লভ বস্তুর দোকানও আছে। তাছাড়াও তিব্বতের প্রাচীন বহু প্রতিষ্ঠান এখানে এসে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দালাইলামার মূল বাড়ির সামনেই রয়েছে বুদ্ধ মন্দির। আর পাশেই একটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের মঠ। পথের ধারে সিমেন্টের

বাঁধানো সব মনিস্তম্ভ। তার গায়ে তিব্বতী অক্ষরে লেখা ওঁম্ মনি পদ্মে হুম্। যতবার ঘোরাবে ততঁ পূর্ণ লাভ। হাতের মনিচক্রও তাই-যতবার ঘোরানো হবে ততবার পুন্য অর্জন হয়ে গেল। মালা জপার বিকল্প উপায় আর কি।

ম্যাকলিয়ডগঞ্জ থেকে ১ কিমি দূরে The Tibetan Institute of Reforming Arts (T I R A) তিব্বতী নৃত্য গীত বাদ্য নাটক ইত্যাদি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এরা এপ্রিলের ২য় শনিবার থেকে দশ দিনের একটি বার্ষিক লোকনাট্যের উৎসব উৎযাপন করে। হস্তশিল্পের কেন্দ্রটিও পর্যটকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষক।

আমরা এবার অন্যদিকের পথ ধরবো। ধরমশালার ৮ কিমি দূরে ম্যাকলিয়ডগঞ্জ ও ফরাসিথঞ্জের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে সেন্ট জন চার্চ। আরণ্যক পরিমন্ডলে গথিক স্থাপত্যের চার্চটি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর। এটির বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় হল অমূল্য কারুকার্য শোভিত কাঁচের সার্সিগুলি। কাঁচের মধ্যে যিশুখৃষ্টের জীবনী ও ব্যাপ্টি স্ট সেন্ট জনের কাহিনী এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের গল্পগুলি বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত। এই গির্জার প্রাঙ্গনেই শায়িত আছেন বৃটিশ ভারতের ৮ম ভাইসবয় লর্ড এলগিন। স্কটল্যান্ডবাসী শাসক বৃটিশ উপনিবেশে শাসন করতে এসে স্বদেশীয় সাধুর নামে উৎসর্গিত গির্জার মাটিতে চির নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছেন। সমাধিবেদীর ওপর গাছের পাতায় ছেয়ে আছে।

ধরমশালার কাছে দূরে পিকনিক স্পট ও প্রমোদ ভ্রমণের মনোরম জায়গার অভাব নেই। এরমধ্যে ম্যাকলিয়ডগঞ্জ বাজার থেকে হাঁটা পথের মধ্যে অথবা লোয়ার ধর্মশালা থেকে ১১কিমি দূরে ভাগসুনাথের প্রাচীন মন্দির উল্লেখযোগ্য। একটি পুষ্করিনী ও মিষ্টি জলের ঝর্ণা স্থানীয় মানুষের কাছে পবিত্র বলে গন্য। দেবদারু আর পাহাড় ঘেরা ১১কিমি দূরত্বে ডাল লেকটি কাশ্মীরের তুলনায় বৃহৎ না হলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে সামরিক ছাউনির কাছেই সেপ্টেম্বর মাসে বাৎসরিক মেলায় গদ্দী উপজাতি ও পাহাড়ি লোকজনের ঢল নামে। একই দূরত্বে ২১০০ মি. উচ্চতায় ধরমকোট একটি আদর্শ বনভোজের জায়গা। এখান থেকে কাংড়া উপত্যাকা ও ধৌলাধার পর্বতমালার অপরূপ দৃশ্য পথিকজনকে তৃপ্তি দেয়। একান্ত আপন ও প্রিয় মানুষকে ভুলে যেসব জওয়ান চীন ও পাক যুদ্ধে স্বদেশ ভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে ধরমশালায় ঢোকার মুখেই গড়ে উঠেছে

ওয়ারমেমোরিয়াল। এক বিকালে পায়ে পায়ে এসব দেখে নেওয়া চলে।

এখান থেকে কয়েকটি ট্রেকিং-এর পথ গেছে। ট্রেকিং-এ উৎসাহিতদের জন্য ধরমশালার মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে তাঁবু ও ট্রেকিং সামগ্রী মেলে। লোয়ার ধরমশালা থেকে ১৭ কিমি পাহাড়ি হাঁটাপথে ২,৮২৭ মি. উচ্চতায় তুষারাবৃত্ত ধৌলধার গিরিশ্রেণীর তরাই অঞ্চলে ট্রিউন্ড। ট্রেক করে বরফের পথ পেরিয়ে আরো ৫ কিলোমিটার গেলেই ইলাকা নামক জায়গা থেকেই প্রকৃত বরফের দেশ শুরু। ফরেস্ট রেষ্ট হাউস থেকে চারিদিকের তুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী ও পান্না সবুজ উপত্যকার দৃশ্য দেখতে দেখতে অনায়াসে দুদিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করবে। কেউ যদি দিনে দিনেও বেড়িয়ে আসতে চান তাহলে কাক ভোরে রওনা হওয়া উচিত।

ধরমশালার কোটয়ালা থেকে ২২ কিমি গিয়ে ১৯৮৩ মি উঁচুতে কাবেরী। কাবেরী গেষ্ট হাউস থেকে আরো ১৩ কি মি উঁচুতে সবুজ বন্য পরিবেশে কাবেরী লেক। সেখানে একরাত্রি কাটালে মন্দ লাগবে না। চামুন্ডা দেবীর মন্দির আছে ১৫ কিমি দূরে ছবির মতো দাধ গ্রামে। মোটরপথ গেছে মন্দিরের দিকে। এখানে তিনদিকে ধৌলারার শ্রেণী ও অপর দিকে বাণের কুন্ড. পাথিয়ার এবং লাহেলা অরণ্য। ধরমশালা থেকে ২৫ কিমি দূরত্বের মধ্যে তপ্তপাণি-উষ্ণপ্রস্রবণ। পিকনিকের চমৎকার জায়গা। এই পথেই ম্যাকরিয়াল নামক জায়গার ঝরণাটি ভাগসুনাথ মন্দিরের নিকটস্থ ঝরণাটির চেয়ে দ্বিগুন।

ধরমশালা থেকে কাংড়ার দূরত্ব ১৭ কিমি। কাংড়ায় এসে বাস প্রায় মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করল। আমরা নেমে চা খেয়ে নিলাম। দূরে সাদা পাথরের কাংড়ার বজ্রেশ্বরী মন্দির দেখা যাচ্ছে। ফেরার পথে দেখে নেওয়া যাবে। আবার যাত্রা শুরু। পথে একটি শুকনো নদীর ওপর পুল পেরিয়ে আসতে হল। তারপর একটি নদীও পেলাম। সহযাত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এটি বাণগঙ্গা। বাস থেকেই কাংড়া কোর্ট নজরে এল। এর কথা ফিরতি পথে বলা যাবে।

বেলা সাড়ে দশটার পর জ্বালামুখীতে এসে আমাদের বাস যাত্রা শেষ হল। পাহাড়ের ওপর মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকি। ওপর থেকে সারা শহরটা স্পষ্ট দেখা যায়। সতীর ৫১ শক্তি পীঠের এক পীঠ নামে কথিত এই জ্বালামুখী মন্দির। এখানে কোনও দেবীর মূর্তি নেই। ভেতরে কয়েকটি নীলচে অগ্নিশিখা দিবারাত্র

জ্বলছে। ভক্তদের বিশ্বাস এখানে সতীর জিভ পড়েছিল। বস্তুত ভূগর্ভস্থ গ্যাসের দৌলতেই এই দীপশিখা জ্বলছে বহু বছর ধরে। আমরা যখন ওখানে পৌঁছলাম দেখি মন্দির বন্ধ। বালতি বালতি জল দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ ধোয়া শুরু হল। কয়েকজন সেবায়েত মূল মন্দিরের বারান্দায় ঝোলানো ঘন্টা বাজাতে থাকল ক্রমাগত। সঙ্গে বাদ্য পরিবেশন হতে দেখলাম। মন্দিরের ভেতর এতক্ষণ ভোগ আরতি এইসবে শেষ হয়েছে। দরজা খুলল। অধীর আগ্রহে ভক্তদল ভেতরে ঢোকার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল। মাইকে বার বার ঘোষণা করছে আস্তে আস্তে প্রবেশ করুন। পায়ে পায়ে ভেতরে গিয়ে দেখি ধূপ ধূনোর ধোঁয়ায় একেবারে অন্ধকার। তার ওপর কোনো জানালা নেই। পাশের লোককেও পরিষ্কার নজরে আসে না। এই সুযোগে কেউ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেও বোঝার উপায় নেই। ভক্তদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী। কেউ কেউ দেওয়ালে কাপড়ের টুকরো বেঁধে মানত করছেন। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে একটি বিরাট হোমকুন্ড, সেখানে ধূনি জ্বলছে আর চারিপাশে দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট শিখা জ্বলছে তির তির করে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মূর্তি বলে কিচ্ছুটি নেই। তাতেই প্রণাম করে মনবাঞ্ছা জানাচ্ছেন বিশ্বাসী লোকেরা। পূজোর অর্ঘ্য বলতে ছোলা, মুড়ি আর শুকনো নারকেল। ইদানিং মন্দিরটি দোতলা করায় আগের গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেছে। এখানে ফি বছর এপ্রিলের প্রথমদিকে ও অক্টোবরের মাঝামাঝি জাঁক-জমক করে নবরাত্রির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায় সম্রাট আকবর যোধা বাঈয়ের সঙ্গে এখানে এসে এমন মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়ে মন্দিরের চূড়াটি সোনার তবকে মুড়ে দেন।

ভরদুপুরে জ্বালামুখী থেকে ৩০ কিমি দূরে কাংড়ায় এসে নামলাম। কুলু উপত্যকা ভ্রমণ রসিকদের কাছে যতটা সমাদর পেয়েছে কাংড়া উপত্যকা কিন্তু তেমনটি পায়নি। তা বলে দেখার কিছু যে নেই তা নয়। স্থাপত্য সমৃদ্ধ দেবদেউল, ঘন সবুজ বৃক্ষরাজিতে শোভিত গভীর উপত্যকা, ডলমাইটের সুউচ্চ পর্বতমালা প্রভৃতি মিলে মিশে এখানে পর্যটকের মুগ্ধ করার উপাদান আছে যথেষ্ঠ। চলার পথে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে অসংখ্য সৌন্দর্যের উৎস উজার করা আছে। অন্যান্য চাষাবাদের সঙ্গে কালো ও সবুজ চায়ের চাষও করা হয় এখানকার বহু চা বাগানে।

কাংড়া উপত্যকার মানুষজন সুপুরুষ এবং যথেষ্ঠ কর্মঠ বলে সেনাবিভাগে সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। কাংড়ার গদ্দী উপজাতিরা অতি সাদাসিধা, অনাড়ম্বর

জীবনযাপন করেন। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই গদ্দী সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ভারমোর অঞ্চলের বাসিন্দা। অদ্ভুত আলখাল্লার মতো পোষাক ও কোমড়ে বিরাট দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধা এই আধা ভবঘুরে জাতিকে ধৌলাধারের ধারে ধারে সর্বত্রই ভেড়ার পাল নিয়ে বিচরণ করতে দেখা যায়। কাশ্মীরের গুর্জররা যেমন মুসলমান এরা তেমনি ধর্মে হিন্দু। উপত্যকার তরাই অঞ্চলে চাষাবাদ নিয়ে কেউ কেউ পাকাপাকি গ্রাম্য জীবনযাপন করলেও মূলত এরা যাযাবর। গ্রীষ্মকালে বউ-ঝিরা ঘর গৃহস্থালী সামলায় আর পুরুষরা ভেড়া ছাগল চড়াতে পাহাড়ের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। গদ্দী পুরুষরা সেসময় পাহাড়ে জঙ্গলে বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মোকাবিলা করে খুব কঠিনভাবে দিনপাত করতে বাধ্য হয়। তখন তাদের ভিষণাকার বিশ্বাসী পাহাড়ী কুকুরগুলি বিশেষ সহায়তা করে। বাস্তবিকই গদ্দী সম্প্রদায় খুবই সাহসী ও ফূর্তিবাজ।

শিল্পমানসের কাছে কাংড়া শিল্পাধারা একটি বিশেষ জগৎ জুড়ে আছে। অতি সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ে হালকা রঙে পরিবেশিত এখানকার চিত্রকলায় পারস্য শিল্পশৈলীর একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আঠারো শতকে রাজা সংসার চাঁদ কাটোকের নিরলস আগ্রহে এই শিল্পারীতির প্রসার লাভ করে। তাঁর সময়েই শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির চূড়ায় আরোহণ করে। তিনি অনেকগুলি স্থাপত্য সমৃদ্ধ দেবদেউল তৈরি করান। একসময় এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল নগরকোট। এর খ্যাতি সূদুর আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সময়ে সময়ে সুলতান মামুদ, ফিরোজ তুঘলক ও শেষে তৈমুর লঙ্ এই নগরে অবাধ হত্যা, হিন্দু শিল্প ও ধনসম্পদ সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি লুঠ তরাজ চালিয়ে রিক্ত করে গেছে। পুরনো বজ্রেশ্বরী মন্দিরটির গায়ে তখন অসংখ্য মণিমুক্ত ছিল বলে শোনা যায়। এবং এর সোনালী চূড়াটি সূর্যের আলোয় দিগন্ত থেকে দেখা যেত। মুঘল আমলে কিছুটা শান্ত থাকলেও সর্বশেষ ধাক্কাটি আসে আঠরো শতকের শেষে রনজিৎ সিংএর কাছ থেকে। রাজা সংসার চাঁদ বাধ্য হয়ে কাংড়া ত্যাগ করে প্রথমে ৪৮ কিমি দূরে বিপাশার তীরে নাদান ও পরে আরো ১৬ কিমি উজিয়ে সুজনপুরটিরায় ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানেও তিনি কাংড়া শিল্পধারার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। কাংড়া শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন চাম্বার ভুড়ি সিং মিউজিয়ামে রাখা আছে।

বজ্রেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। রাস্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে মন্দির

কিছুটা উঁচুতে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি। দুইপাশে সারি সারি দোকান। কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর মনে করিয়ে দেয়। সমগ্র কাংড়ায় জ্বালামুখীর পরেই বজ্রেশ্বরীই প্রধান। পাহাড়ের নিচে খরস্রোতা বাণগঙ্গা যেমন ছুঁয়ে যাচ্ছে তেমনি মন্দিরের উত্তরলোকে তুষারকিরিট ধৌলাধার বিস্তারিত থাকায় মনে হচ্ছে যেন মন্দিরের ঠিক পিছন থেকেই উঠছে ধৌলাধার। ধীরে ধীরে মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমে একটি চতুষ্কোণ মন্দির, ওপরে গম্বুজ। তারপর আরো দু'টি গম্বুজওয়ালা মন্দির। এখানে বিগ্রহের অভিব্যক্তি শান্ত, পার্বতীর মতো। আর শান্ত শিব তার বামে। পাশাপাশি অনেক দেবস্থান। যেমনটি আছে কাশীর অন্নপূর্ণা বা উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে। বজ্রেশ্বরী মন্দিরটিতে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন ছবি, ফটো, ঝাড়লণ্ঠন, মার্বেল পাথরের কাজ। এদিকে ওদিকে রঙবাহারী তুলির প্রলেপ। কালে কালে বৈদেশিক আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ১৯০৫ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য কাংড়া টেম্পল ও রেস্টোরেশন কমিটি নতুন করে মন্দিরটি গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছেন।

আমরা বলি কাংড়া ফোর্ট। স্থানীয় লোকেরা বলে কোট কাংড়া। কোট মানে দুর্গ। কাংড়া শহর, মন্দির ছাড়াও প্রাচীন দুর্গটি টুরিস্টদের একান্ত দ্রষ্টব্য। বাণগঙ্গা ও পাতালের মাঝে যে দোয়াব, ঠিক তার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়ের ওপর এই দুর্গ। লম্বায় তিন হাজার ফুট ও চওড়ায় একশো থেকে এক হাজার ফুট। এককালে এই দুর্গের ভেতর ঘরবাড়ি, মন্দির সব ছিল। হানাদারদের আক্রমণে ও ১৯০৫ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে সব একেবারেই গেছে। ধনদৌলতের লোভে সুলতান মামুদ মন্দিরটিকে ধূলিসাৎ করেছিলেন। রাজার প্রাসাদ আর কোষাগার ছিল ভেতরে। বর্তমানে দুটি সুন্দর বড় ঘর আছে। আর আছে একটি ছোট সেনানিবাস।

ধৌলাধার পর্বতশ্রেণী ছেড়ে আমাদের বাস ক্রমশ দুর্গম ও ভয়ঙ্কর পাহাড়ী পথ দিয়ে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার কাছাকাছি এসে পড়েছে। নিচে সুতোর মতো সরু ইরাবতী, পাথরে ধাক্কা খেয়ে কালো জলে সাদা ফেনা তুলে বয়ে চলেছে। নদীর পাশাপাশি ঘরবাড়ি দেশলাই বাক্সের আকৃতি নিয়েছে। চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে বেশিক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। গায়ে মুখে হলুদ কণে দেখা আলোর ছটা বুলিয়ে সূর্য পাহাড়ের কোলে মিলিয়ে গেল। পাহাড় এলাকায় সূর্য অস্ত যাওয়া মানেই ঠান্ডা হিংস্র শ্বাপদের মতো হামাগুড়ি দিয়ে

আক্রমণ করতে আসা। হঠাৎ দূরে পাহাড়ের গায়ে জোনাকির মতো টিপ টিপ আলো দেখে বুঝলাম চাম্বা নগরী আর দূরে নয়। পাহাড়ী এলাকায় অন্ধকার রাত্রে দূর থেকে ওপরে শহরগুলো মনে হয় যেন দেওয়ালীর আলোয় সেজে উঠেছে। অনেক সময় এই শহরকে ইতালীর দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সন্ধ্যের পর অন্ধকারে কোন নুতন শহরে এলে একটা লাভ হয় যে পরদিন সকালে দিনের আলোয় ঝুপ করে চোখের সামনে শহরটাকে নজরে আসে। ঘুম ভাঙতেই শুনতে পেলাম অদূরে ইরাবতীর একটানা শব্দ। হোটেলের ছাদ থেকে নদীটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ যতটা পাল্লা যায় পায়ে হেঁটে কাছাকাছি দেখার জায়গাগুলো দেখে নিতে হবে। শহরের মধ্যে পায়ে হাঁটা দূরত্বে আছে- চামুন্ডা দেবীর মন্দির, চৌগান লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ভুড়ি সিং মিউজিয়াম প্রভৃতি।

আমাদের হোটেলের একেবারে সামনাসামনি রাস্তা দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে চামুন্ডা দেবীর মন্দিরে যাবার। এটি চৌগান থেকে ১ কিমির মধ্যে। উঠছি তো উঠছি, শেষ আর হয় না। পান্ডবরা এর চেয়ে অনেক সহজে স্বর্গে পৌঁচেছিল বলে মনে হয়। নামবার সময় শুনেছিলাম মোট সিঁড়ির সংখ্যা ৩৯৪ টা। এক একটা ধাপের উচ্চতা এক হাত করে। বার কয়েক বিশ্রাম নিয়ে, কপালের ঘাম মুছে অবশেষে ওপরে উঠে দেখি সে এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ঠান্ডা হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল। ওপরে উঠতে যতই কষ্ট হোক এখান থেকে পাখির দৃষ্টিতে পুরো চাম্বা শহরটা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। আর বেশ বোঝা যায় ইরাবতী প্রবল গতিতে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। ওপর দিয়ে নদীটির দিকে চেয়ে থাকতে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। মন্দিরের ভেতর চামুন্ডা মাতার মূর্তি। সমস্ত মন্দিরটা কাঠের তৈরি। সিলিং এ অগুনতি ছোট বড় ঘন্টা ঝুলছে। মানত পূরণ হলে ভক্তরা এইসব ঘন্টা বেঁধে যায়।

চাম্বার মেয়েরা সত্যিই সুন্দরী। হিমাচলের অন্যান্য জায়গা যেমন মানালি বা কুলুর চেয়ে একটু ভিন্ন ধরণের রূপ। স্কুল কলেজে মেয়েরা দল বেঁধে চলেছে বা ঘরোয়া কাজে ব্যস্ত মেয়েদের মোহিত করা রূপ দৃষ্টি টেনেনেয় বার বার। একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি এখানে বহু মানুষ পক্ষাঘাতে পঙ্গু। একটা হাত বা একটা পা অকোজো হয়ে গেছে। লাঠি ভর করে বেশ কষ্ট করে উঁচু নিচু পথে চলাচল করছে। একবেলাতেই ডজনখানেক এমন মানুষ নজরে এল। বয়স তাদের খুব বেশি নয়।

বিষয়টা খুব অবাক লাগল আমার কাছে।

বেশির ভাগ স্থানের নামের পিছনে যেমন একটা কিংবদন্তী লুকিয়ে থাকে তেমনই চাম্বার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা কাহিনী শোনা যায়। চাম্বা উপত্যকার আসল নাম চম্পাবতী। অনেককাল আগে এখানে চম্পাবতী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। কোন এক সময় এই রাজবালা এক পরবাসী সুদর্শন যুবকের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হন। এবং তাকে গোপনে বিয়ে করলে রাজার পক্ষে তা সুখকর হয়নি। অতঃপর সেই তরুণের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে (কেউ কেউ বলে রাজাই তাকে গুপ্তহত্যা করায়) চম্পাবতী স্বামীর লেলিহান চিতায় আত্মবিসর্জন দেন।

চাম্বার পাহাড়ী সীমার একদিকে জম্মু ও কাশ্মীর, অন্যদিকে লাহুল, জাস্কার ও লাদাখ, এর মাঝখানে দুর্গম আকাশছোঁয়া পীরপাঞ্জালের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে চন্দ্রভাগা। চম্পাবতী, লাহুল ও কুলু উপত্যকাই আসলে পাঞ্জাবের ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, আর বিপাশার উৎপত্তিস্থল। চাম্বার আরো ৬৯ কিমি উত্তরে ভারমোর ও মণিমহেশ। ভারমোর থেকে মণিমহেশ ৩৪ কিমি ট্রেকিং করে যেতে হয়। প্রাচীন চাম্বা রাজ্যের রাজধানী ছিল এই ভারমোর। মণিমহেশ মন্দির রয়েছে ভারমোরেই। মণিমহেশে কোন মন্দির নেই। আছে একটি কুন্ড, বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটি ত্রিশূল আর অগুনতি শিবলিঙ্গ। জন্মাষ্টমীর ১৫ দিন পর এখানে পূণ্য অবগাহণ উপলক্ষে বিশেষ জনসমাগম হয়।

চাম্বাতে নাম করার মত কয়েকটি উৎসব হল পয়লা বৈশাখে নবরত্ন, পয়লা ভাদ্রে পত্ররুসংক্রান্তি, এটির সঙ্গে বর্ষামঙ্গলের তুলনা করা যেতে পারে। বর্ষার সাফল্য ও উর্বরতার মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। আর মণিমহেশের বিরাট মাশরু উৎসব— এতে চাম্বা উপত্যকার যত নর্তকীর দল এসে হাজির হয়। নাচের দল বদলের সঙ্গে সঙ্গে জীবনসঙ্গীরও সন্ধান মেলে। কুলুর দশেরার সঙ্গে এর সংস্কৃতি ও প্রাচুর্যের যেন এক মিল দেখা যায়।

পরদিন হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম চৌগানে। চৌগান আর কিছুই নয়- চাম্বার গড়ের মাঠ। আধ মাইল খানেক লম্বা সমতল ভূমি। সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো। আগেকার দিনে রাজারা এখানে পোলো খেলতেন। আমরা সমতলবাসিরা যেমন এক টুকরো টিলা, পাহাড় বা সামান্য উঁচু জায়গাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি, তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি, ঠিক তেমনি এখানকার এই পাহাড়বাসীরা এক টুকরো সমতল জায়গাকে বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। দিনের

সমস্ত সময়ই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে চলতে ফিরতে উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা পাথুরে পাহাড়ী পথ ভাঙ্গতে বাধা হয়। তাই এক চিলতে সমান জায়গা এত আদরের। এই সমতল চৌগানই চাম্বাবাসীর দৈনন্দিন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় মিলনের কেন্দ্রভূমি ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থান।

এখানকার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সবচাইতে পুরানো ও সর্বাধিক স্থাপত্য সমৃদ্ধ। রাজবাড়ির কাছেই একই বিশাল চত্বরের মধ্যে পাশাপাশি রাজস্থানী শৈলীর দু'টি মন্দির বেশ সমৃদ্ধশালী। এর মধ্যে তিনটি বিষ্ণুর, বাকি শিবের। মন্দিরগুলি স্থাপত্যরীতি অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চলের থেকে বৈশিষ্টপূর্ণ এবং দেখে দশম শতকের শিল্পীদের প্রতি আনত শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করে। চৌগানের গেটের কাছে হরি রাই নামে ১১ শতকের বিষ্ণুমন্দিরটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রোঞ্চ নির্মিত বিষ্ণুমন্দিরের ভাস্কর্যশৈলী এবং শিল্প সুষমা এত চমৎকার যে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ করে।

ঠিক সকাল দশটায় ভুড়ি সিং মিউজিয়াম খুলল। জানি সমস্ত মিউজিয়ামের দরজায় ক্যামেরা ইত্যাদি রেখে যেতে হয়। তবুও সঙ্গে নিয়েই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে দরোয়ানের সঙ্গে একচোট বচসা বেঁধে গেল। যাইহোক, আগেই জানা ছিল এখানে কাংড়া পেইন্টিং ও বাসোলী স্কুল অব আর্টের উঁচু দরের সংগ্রহ আছে। ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখতে লাগলাম। গত দুই শতকের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি বেশ মুগ্ধ করে। দশাবতার তাসগুলিও চমৎকার। 'চাম্বার রুমাল' নামে খ্যাত এখানকার কাপড়ের ওপর সেলাই এর কাজ দেখে চোখ ফেরানো যায় না। চাম্বা অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ের মানুষের পোষাক আষাকও বেশ ভাল লাগল। তাছাড়াও আছে বাদশাহী আমলের মুদ্রা, তাম্রলিপি, পাণ্ডুলিপি, অলংকার ও কিছু প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন।

চাম্বার কাছে পিঠে বেশ কিছু দৃষ্টি আকর্ষক দর্শনীয় স্থান আছে যেমন-১১ কিমি দূরে সারোল-ইরাবতীর তীরে একটি অসাধারণ পিকনিক স্পট। এখানকার *হর্টিকালচার, বিভিন্ন প্রজাতির লেবু, মেষপালন ফার্ম, পল্টি, মৌমাছি পালন, টিনে* খাদ্য সংরক্ষিত করার কারখানা প্রভৃতি দেখে পর্যটকের বেশ ভালই লাগবে। ছোট্ট অথচ উর্বর উপত্যকা।

চাম্বা থেকে ৩০ কিমি দূরে বইরা সিউল প্রোজেক্টের কাছাকাছি কাতাসন দেবী আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির। জায়গাটি অতি শান্ত ও মনোরম বলে ভক্ত ও পর্যটকের দল হাজির হয়। মন্দির চত্বর থেকে চাম্বা উপত্যকার একটি অসাধারণ

দৃশ্যপট দেখা যায়। আর ৩৫ কিমি দূরে ১৮২৯ মি. উচ্চতায় অবস্থিত সালোনি। এখানে ভান্ডাল উপত্যকার সুদূরের পাহাড় শীর্ষে তুষারমৌলী দেখতে দেখতে দুটো দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।।

চাম্বা বা ডালহৌসী এসে খাজিয়ার না দেখার মত বোকামি আর হয় না। এ যেন নিমন্ত্রণ বাড়ি এসে না খেয়ে যাবার মতন! চাম্বা থেকে খাজিয়ার মাত্র পনেরো কিমি পথ। দুপুরের বাসে রওনা হয়ে গেলাম। ডালহৌসী থেকে একটি সুন্দর বন-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ি ৩০ কিমি পথ আছে খাজিয়ার আসার। এটি নাকি দারুণ সৌন্দর্যময়। তাছাড়া চাম্বা থেকেও পায়ে হেঁটে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে সুন্দর ট্রেকিং করা যায়। তবে একটি গাইড অবশ্যই দরকার।

খাজিয়ার সম্বন্ধে আসার আগে যত পড়েছিলাম, যত ছবি দেখেছিলাম, বাস্তব দৃষ্টিতে খাজিয়ার তার চেয়ে আরো আরো সুন্দর। কেউ যদি আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ পেতে চান তাহলে যেন একবার এই খাজিয়ায় এসে দিন কয়েক কাটিয়ে যান। এমন শান্ত, নিড়িবিলি, নিস্তরঙ্গ জায়গা বোধহয় আর কোথাও নেই।

বাস আমাদের নামিয়ে দিল একেবারে খোলা মাঠ ময়দানের ধারে। নেমেই একেবারে বিরাট চমক। দেড় কিমি লম্বা, এক কিমি চওড়া সবুজ উপত্যকা। সেখানে ছাগল, ভেড়া, গরু ও কয়েকটি ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছে। চারিধারে ওক, পাইন, দেবদারু গাছে সমাকীর্ণ। উপত্যকার ঠিক মাঝখানে একটি ছোট্ট লেক। জল থাকলে নৌকা চড়ে ঘোরা যায়। একদিকে একটি মন্দির নাম খাজিনাগ। মন্দিরের চূড়াটি নাকি সোনার। এক প্রান্তে মাত্র কয়েকটি থাকার মতো বাংলো। কোন শব্দ নেই, লোকজন নেই, কোলাহল নেই, বাংলোর বারান্দায় চুপটি করে বসে বসে পান্না সবুজ তৃণভূমির দিকে চেয়ে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। শহরের জমানো সারা জীবনের ক্লান্তি কেটে যাবে অচিরেই।

আমাদের দেখতে পেয়ে কয়েকটি ঘোড়াওয়ালা ছুটে এল। তাদের দেখে আমাদেরও ঘোড়া চড়ার উৎসাহ গেল বেড়ে। পুরো ময়দানটা এক চক্কর দেওয়া গেল। গতির মধ্যে বেশ একটা আনন্দ আছে। অনেকদিনের একটা সাধ মিটিয়ে নিলাম। তবে ঘোড়া যেমন শীর্ণকায় তেমন জীনটাও তত শান্ত। এবং অনভ্যাসের *দারুণ ঘোড়ায় চড়ার আনন্দের সমপরিমাণ সেলামি দিতে হয়েছে তিনদিন ধরে।*

পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে লম্বা লম্বা রশ্মি ছাড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাও নামতে দেরি করল না। সেই সঙ্গে প্রবল গতিতে হাওয়া। বাসের

জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আলো আঁধারি প্রদোষবেলায় আর একবার খাজিয়ারকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিলাম। মনে মনে আউরে নিলাম-আর কি কখনও কবে, এমন সন্ধ্যা হবে! যারা পশু চড়াতে এসেছিল তারা ধীরে ধীরে ফিরে গেল। পিছন দিকে কারা যেন বাংলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তাকাতেই বুঝলাম নব-পরিণীতা। আলাপ হতে জানালো আমরা দিন সাতেক আছি এখানে।

পরদিন ভোর ছটা নাগাদ ডালহৌসির বাস ধরা গেল। চাম্বা নগরীকে বিদায়। আমরা প্রথমেই ঠিক করেছি ডালহৌসিতে থাকবো না। কোন একটা হোটেলে মালপত্র গচ্ছিত রেখে সারাদিন ঘুরে ফিরে দুপুর বিকেলের বাসে কাংড়া বা পালামপুর গিয়ে রাত কাটিয়ে দেবো। পরের দিন সোজা সেখান থেকে বাসে চলে যাবো সিমলা। আধাআধি পথে রাত কাটালে ধকল অনেকটা কমবে।

চাম্বা-ডালহৌসির দূরত্ব ৪৯ কিমি। ঘন্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। বাস স্ট্যান্ডের কাছে অতি ছোট স্যাঁতস্যাঁতে একটি হেটেল ঘরে জিনিষগুলো রেখে চা ও জলখাবার খেয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেলাম কাছাকাছি যা দেখার আছে। একটা গাড়ি পাওয়া গেলে ভাল হত কিন্তু ওপরের দিকে গাড়ি যায় না। চরণই একমাত্র ভরসা।

ইতিহাস বলে ১৮৫১ খৃঃ লর্ড ডালহৌসি এখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস তৈরির পরিকল্পনা করেন। ১৮৫৪ খৃঃ নাগাদ সেটি সমাপ্ত হয়। সেই স্বাস্থ্যনিবাসটি কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভারতের এই দ্বিতীয় প্রাচীন শৈলাবাস। প্রথমটি হল দার্জিলিং। ইংরেজরা দেশত্যাগের পর ডালহৌসির আকর্ষণ অনেকাংশে কমে গেছে। তাঁরা একসময়ে নিজেদের মনের মতন গড়ে তুলেছিলেন এই পাহাড়ি শহরটিকে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস কাছারি এমনকি সেনানিবাস পর্যন্ত। কেউ কেউ ডালহৌসিকে স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি শহরের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এককালের সাজানো-গোছানো শহরের বৈভব আজ আর নেই। কেমন যেন পরিত্যক্ত ভাব।

সবুজে ছাওয়া পাঁচটি ছোট ছোট পাহাড়-ভঞ্জর, পাতরেন, বাকরোটা,তেহরা ও কালগ নিয়ে ডালহৌসি। কতযুগের শেওলাধরা বিরাট গুড়িওয়ালা ওক পাইন প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিয়ে যায়। সেই যখন দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ বা সুভাষচন্দ্র এখানে দিন কাটিয়ে গেছেন তখনও এই বিশাল বনস্পতির দল মাথা তুলে বিরাজ করত। এখানে এসেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঘর থেকে বাইরে আসার স্বাদ পেয়েছিলেন। তার বর্ণণা পাই জীবনস্মৃতির ছত্রে ছত্রে। আকাশ চেনা বা সংস্কৃত শিক্ষা হয়েছিল

এখানেই। ডালহৌসি পাহাড় কবির জীবনে অনেক বড় পাওনা, যা তাঁর উত্তর কালে পাথেয় হয়েছিল।

হাঁটতে হাঁটতে ম্যালের কাছে এসে পড়েছি। এখন প্রায় দশটা বাজে। এখানে তেমন লোকজন নেই। ম্যাল একেবারে ফাঁকা বললেই চলে। স্থানীয় কিছু লোক রাস্তার ধারে রেলিং এ ভর দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। সকাল বেলার আলোয় পরিবেশটা বেশ মনোরম। লোককে জিজ্ঞাসা করে আমরা পাঞ্জাপুল্লা ফল্‌সের দিকে পা বাড়ালাম। একটু পরে জি.পি.ও পড়ল পথে। স্থানীয় কয়েকজন জুটে গেল আমাদের সঙ্গে। তারাও চলেছে এদিক পানে কাঠ কাটতে। গল্প করতে করতে অনেকটা পথ এগিয়ে এলাম। একের পর এক বাঁক পেরিয়ে চলেছি তো চলেছি। জি. পি. ও স্কোয়ার থেকে ৪ কিমি মতন হবে। পথে পড়ল সাতধারা। সাতটি ধারা বিশিষ্ট ঝরণা তবে বর্তমানে একটিই দেখা গেল। এর জলে নাকি অভ্র আর ওষুধের গুণে ভরা।

অবশেষে পাঞ্জাপুল্লা জলপ্রপাতের কাছে এসে দাঁড়ালাম। জায়গাটি খুবই আকর্ষণীয়। তবে জলের ধারা যথেষ্ঠ কম তাই মন খারাপ লাগে। একটি রেস্টুরেন্ট আছে। ঝরনার জল পাইপের সাহায্যে শহরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন দর্শকের সমাগম হল। পাঞ্জাপুল্লার জলপ্রপাত ছাড়া আর একটি কারণে দর্শনীয়-শহীদ ভগৎ সিংএর কাকা অমর সিং এর একটি শহীদ বেদী আছে এখানে। তিনি সুভাষ চন্দ্র বসু ও কর্ণেল হাবিব-উল-রহমানের সঙ্গে জার্মানীতে আই. এন. এ গঠনে নিযুক্ত ছিলেন। যাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে নির্বাসনে। এই মহান বীর ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যেদিন সারা ভারতে তেরঙ্গা পতাকা অবাধে মুক্তির বাতাসে পত পত করে উড়ছিল।

ডালহৌসীতে আর যা দেখার জায়গা তা হল-বাকরোটা পাহাড়-৪.৮ কিমি দূরে। এখান থেকে তুষারশৃঙ্গর দৃশ্য ভারি সুন্দর দেখায়। দৈন কুন্ড ২২৪৩ মি. উচ্চতায় ১.৬ কিমি দূর, এই জায়গা থেকে বিপাশা, ইরাবতী ও ঝিলাম নদীর দৃশ্য চমৎকার। ২২৮৬ মি উচ্চতায়, ৮.৫ কিমি দূরত্বে কালাটোপ একটি সুন্দর পিকনিক স্পট, জীপে যাওয়া যায়।

বাস-ষ্ট্যান্ডের কাছে নেমে এলাম। এখান থেকে আমরা সোজা সিমলার বাস পেতে পারি। সেটি ছাড়বে বিকেল চারটে। ৪০০ মাইলের পথ একভাবে চলবে, আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করলাম এতটা পথের ধকল সইতে পারবো

তো? নাকি রাত্রিবেলা থামবে কাংড়ায়, সেখানে রাতটা কাটিয়ে আবার সকালে সিমলার বাস ধরবো। কাছেই একটা হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে খেতে ঠিক করা গেল একেবারেই সিমলা যাওয়া হোক। ওখানে পুরো একটা দিন পাচ্ছি। না হয় সেখানে চব্বিশ ঘন্টা শুধু শুয়েই কাটানো যাবে।

বাসের মধ্যেই বসে রইলাম চারটে পর্যন্ত। অনেকক্ষণ বাসটি এসে অপেক্ষা করছে। ড্রাইভারও সীট জোড়া দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কাছে পিঠে সামান্য হেঁটে এলাম। ঠিক চারটে বাস ছাড়ল। শুরু হল ১৬ ঘন্টার বাস সফর। এপথের বাসভাড়া ৮৫ টাকা। এতটাকা একসঙ্গে ভাড়া দিতে খুড্ডো গায়ে লাগে। যতই হোক বাসে যাচ্ছি তার জন্য এতো! প্রথমে রাস্তা বেজায় খারাপ। কাঁচা রাস্তা, ধূলোয় শরীর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। আলির ভাষায় ধূলোয় গোর হবার জোগাড়। কেবল বাঁক নিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। একসময়ে পেট ব্যথাও শুরু হল। কিচ্ছুটি করার নেই। এব্যাপারে স্থানীয় লোকের কোন বিকার লক্ষ্য করলাম না। তারা অভ্যস্ত, ঘন্টা দেড়েক পর অবশ্য একটু মন্দের ভালো রাস্তায় এসে পড়ল। পথে একবার দাঁড়াল চা খাবার জন্য। মেয়ে পুরুষ সব্বাই যে যেদিকে পারল ছুটল পাহাড়ের আড়াল খোঁজার তাগিদে।

সন্ধ্যের অন্ধকারে একেবারে পান্ডববর্জিত এক জায়গায় আমাদের বাসটা হঠাৎ বিশাল ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রেক কষে থেমে গেল। সামনে আর একটা বাস দাঁড়িয়ে। তার যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ঘন্টাখানেক ধরে এখানেই অবস্থান করছে। সরু পথ, মাত্র একটা বাসই সেখান দিয়ে চলতে পারে। চারিদিক ঘন অন্ধকার, রাস্তায় নেমে পড়লাম। বেশ লাগল, পাহাড়ি রাস্তায় এমন অন্ধকারে চারিদিক দেখতে। মনে হল সারারাত এমন জায়গায় কাটাতে পারলে মন্দ অভিজ্ঞতা হবে না। বাস আবার চলবে কিনা এই অনিশ্চয়তার কথা ভেবে মেয়েরা ভয়ে শিউরে উঠল। অনেকক্ষণ পর বেশ কয়েকজন যাত্রী মিলে খারাপ বাসটিকে ঠেলতে ঠেলতে একটা পাহাড়ী বাঁকের মুখে এনে রাখা হল। সেখানে একটু চওড়া জায়গা পাওয়া গেছে। আমাদের বাস পাশ দিয়ে চলে আসতে পাড়বে। দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাদের বাসে উঠে বসলাম। সবাই স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল। খারাপ বাসের যাত্রীরাও আমাদের বাসে উঠে এল।

রাত আটটার পর কাংড়ায় এসে বাস থামল। এখানে আধ ঘন্টার মত

বিশ্রাম। সবাই খেতে নেমে গেল। আমার একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না। চরকির মত দিনের পর দিন ঘুরছি। খাওয়া শোওয়ার ঠিক ঠিকানা নেই। শরীর আর বইছে না। সঙ্গীরা তবুও জোড় করে কিছু খেয়ে নিতে বললে। একেবারে খালি পেটে থাকলে শরীর আরো খারাপ করবে। মুখে চোখে জল দিয়ে, ধাবায় ডাল রুটি তরকারি খেয়ে বেশ ভালই লাগল। সারা রাত বাকি আছে। রাতের বাস সফরের অভিজ্ঞতা যে কত সুখের তা না বলাই ভাল। সারাদিনের ক্লান্তি সমস্ত শরীর জুড়ে। চলন্ত বাসে না যায় বসা, না যায় ঘুমান, সে এক নিদারুণ কষ্টকর অবস্থা।

এবার আর একদম থামা নয়। সোজা চলেছে পাহাড়ী পথ বেয়ে। রাস্তা সমান নয়, উঁচু নিচু আঁকা-বাঁকা। পাশে কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ। রাত্রির অন্ধকারে সেখানে ঢাল বেয়ে বাস নেমে গেলে, ঘুমন্ত যাত্রীর আর কখনও ঘুম ভাঙবে না।

ইতিমধ্যে বাসের ড্রাইভার কনডাক্টর বদল হয়ে গেছে। তারা আবার আমাদের টিকিট পরীক্ষা করে নিল। এর মধ্যে অনেক লোক নামল ও নতুন যাত্রীও উঠল। তবে কাংড়ার পর আর কোন যাত্রী অবশ্য উঠল না। আমাদের মত এত দূর পাল্লার লোক আর একটিও নেই! কাংড়া থেকে একজোড়া বন্দুকধারী পুলিশ উঠল। মনে হয় এ পথে নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে তাই এমন ব্যবস্থা। আমাদের সামনের সিটে এক পরিবারের একটি যুবতী মেয়েকে দেখে এই পুলিশ প্রবরের আনন্দ আর ধরে না। আকারে ইঙ্গিতে তাদের সম্বন্ধে নানা মন্তব্য শুরু করল। এতদূর পথ যাবে, এ যেন তাদের একটা কষ্ট লাঘবের সুন্দর উপায় দেখছি। রক্ষকই এখানে ভক্ষক হয়ে উঠল। ব্যাপারটা একেবারে সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু সরাসরি তাদের নিষেধ করতেও পারছি না। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ জমালাম। নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলাম। সিগারেট বিনিময়ও হল। তারপর তারা যখন আমার পরিচয় জানতে চাইল এবং কি কারণে এখানে এসেছি জিজ্ঞাসা করল তখন উত্তরে বললাম আমি সি.বি.আই এর লোক, অফিসিয়াল কাজে এদিকে এসেছি। এই কথা শুনে পুলিশদুটি একেবারে মিইয়ে গেল। শুধু বললে বান্দা বহুত খতরনক হ্যায়, প্যাহেলে সে আপকো ওইসাহি কুছ লাগতা থা। লেকিন আপতো হামারী ডিপার্ট কা হ্যায়। কই বাত নেহি। কাল সাম কো চায় কা লিয়ে ফাঁড়ি মে আইয়ে। এরপর আর কোন কথা হয়নি। মুখ বন্ধ করে চুপচাপ সিমলা পৌঁছাবার কিছু আগেই তারা নেমে গেল।

লেখক	শিরোনাম	গ্রন্থ/পত্রিকা
যদুনাথ সর্বাধিকারী	কেদারনাথ	তীর্থভ্রমণ/প্রথম প্রকাশ/১৯১৫
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	হিমালয় ভ্রমণ	আত্মজীবনী/বিশ্বভারতী/ চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬২
স্বামী রামানন্দ ভারতী	হিমারণ্য	মিত্র ও ঘোষ/ প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৫
জগদীশচন্দ্র বসু	ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে	অব্যক্ত/আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জন্ম শতবার্ষিক সমিতি/ শতবার্ষিক সংস্করণ/ ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮
জলধর সেন	বদরিনাথ	হিমালয়/ মিত্র ও ঘোষ/ প্রথম সংস্করণ/মাঘ ১৩৯৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হিমালয় যাত্রা	জীবনস্মৃতি/বিশ্বভারতী, বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ/অগ্রহায়ণ ১৩৮০, (বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।)
স্বামী বিবেকানন্দ	হিমালয়	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৫ম খন্ড) উদ্বোধন/সুলভ সংস্করণ ১৯৮৮
স্বামী অখনন্ডানন্দ	গৌরীকুন্ড	তিব্বতের পথে হিমালয়ে/ উদ্বোধন/ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৫
স্বামী অভেদানন্দ	লে	কাশ্মীর ও তিব্বতে/ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ/ পঞ্চম সংস্করণ/শ্রাবণ ১৩৯১
ভগিনী নিবেদিতা	অমরনাথ	স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে/ উদ্বোধন/অষ্টম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮৩
মহেন্দ্রনাথ দত্ত	বদরীনারায়ণের পথে	বদরীনারায়ণের পথে/ মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রথম মুদ্রণ/২৮ শ্রাবণ, ১৩৫৯
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	সিমলা শৈল	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রদীপ'/ সন ১৩০৪-১৩০৫
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	মানা-ব্যাসগুহা বসুধারা-শতোপন্থ	হিমালয়ের মহাতীর্থে/ ভট্টাচার্য সন্‌স লিমিটেড/ প্রথম সংস্করণ/অক্টোবর ১৯৫০
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	গোণাতাল	হিমালয়ের পথে পথে/ মিত্র ও ঘোষ/ প্রথম প্রকাশ/ শ্রাবণ ১৩৬৯
প্রবোধকুমার সান্যাল	দেবতাত্মা হিমালয়	দেবতাত্মা হিমালয়/ মিত্র ও ঘোষ/ প্রথম পেপার ব্যাক সংস্করণ/জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০

লেঃ কর্ণেল সত্যেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	রুদ্রনাথ	হিমবন্তের দেবদেউল/প্রকাশক ঃ অমরেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশঃ রথযাত্রা ১৩৭৬
কমলা মুখোপাধ্যায়	ব্রহ্মাশিখরের পাদদেশে	হিমালয় প্রসঙ্গ(পত্রিকা) চতুর্দশ বর্ষ ১৯৯০
তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ	শৈলতীর্থ মণিমহেশ	দেশ/২৩ জুলাই ১৯৮৮
জ্যোতি চৌধুরী	কিন্নরলোক	কিন্নর লোক ছাত্র শিক্ষা নিকেতন/ প্রথম প্রকাশ/মহালয়া ১৩৭৫
যতীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রী কৈলাস দর্শন	দুইবার শ্রী কৈলাস ভ্রমণ/ ইষ্ট এন্ড ওয়েস্ট পাবলিশার্স/এপ্রিল ১৯৭১
ভক্তি বিশ্বাস	হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ	হিমালয় প্রসঙ্গ(পত্রিকা) অষ্টাদশ-উনবিংশ বর্ষ/ ১৯৯৪-৯৫
গৌরকিশোর ঘোষ	নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি	নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ/১৩৬২
কালকূট	স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে	স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে/ কালকূট রচনা সমগ্র/ মৌসুমী প্রকাশনী/ ১৫ জুলাই ১৯৮৮
নারায়ণ সান্যাল	রামওয়াড়া থেকে কেদারনাথ	পথের মহাপ্রস্থান/ দে'জ পাবলিশিং/ তৃতীয় সংস্করণ/ জুলাই ১৯৮৬
সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	ভিলাঙ্গনা	হিমালয়ের পথে ভিলাঙ্গনা ও পাঁওয়ালী কান্থা/ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার/ প্রথম প্রকাশ/শ্রাবণ ১৩৮৫
কমলকুমার গুহ	দ্রাস ও করাগিল	অচেনা কাশ্মীর/ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির/ ১৫ আগষ্ট ১৯৯৯
শম্ভুনাথ দাস	হরমুকুট গঙ্গা	হিমালয়(পত্রিকা) বার্ষিক সংখ্যা ১৯৮০
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	কুয়ারী গিরিদ্বার	পায়ে পায়ে হিমালয়/ নাথ পাবলিশিং/ প্রথম সংস্করণ/ফেব্রুয়ারী ১৯৯১
বীরেন্দ্রনাথ সরকার	রহস্যময় রূপকুন্ড	রহস্যময় রূপকুন্ড/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ দ্বিতীয় সংস্করণ/জুন ১৯৬৩
ধ্রুব মজুমদার	তুঙ্গনাথ	সহসা হিমালয়/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ প্রথম সংস্করণ/সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
শঙ্কু মহারাজ	সুন্দরের অভিসারে	সুন্দরের অভিসারে/ নাথ পাবলিশিং হাউস/ প্রথম প্রকাশ/এপ্রিল ১৯৮১
গোপালকৃষ্ণ রায়	নাথু-লা	সাপ্তাহিক বর্তমান/ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭
সুনীল চৌধুরী	কোশলরামের মাতৃভক্তি	হিমালয়ের পথে প্রান্তে/ বঙ্গবাণী প্রকাশনী/ প্রথম সংস্করণ/জানুয়ারী ১৯৭৭

অমিয়কুমার হাটি	গঙ্গোত্রী থেকে নন্দনবন	চতুরঙ্গী অভিযান/ গ্রন্থালোক/ প্রথম প্রকাশ/ ১৩৮৯
বিশ্বদেব বিশ্বাস	কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে	কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৬৮
অশ্রুময় গুহঠাকুরতা	নন্দাকিনীর উৎসপথে	নন্দাকিনীর উৎসপথে/ প্রকাশকঃ চৈতালী দাস/ শ্রাবণ ১৪০০/ পরিবেশকঃ দে বুক স্টোর
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	রমনীয় রাণীক্ষেত	যুগান্তর সাময়িকী ১৯৬৫
দীপককুমার সরকার	নন্দনকাননে	নন্দনকাননে/ সুপ্রিয়া প্রকাশনী/ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩
সুজয়া গুহ	রন্টি অভিযান	ভ্রমণকাব্য(পত্রিকা) প্রথমবর্ষ চতুর্থ সংখ্যা/ জুলাই ১৯৬৮
প্রদীপ্ত চক্রবর্তী	খাটলিং বাসুকীতাল	মহাদেবের জটার দেশে/ বুক ট্রাস্ট/ প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	থোরাং পেরিয়ে	থোরাং পেরিয়ে মুক্তিনাথ/ গণমন প্রকাশন/ প্রথম মুক্তিনাথ প্রকাশ,নভেম্বর ১৯৮৪
দীপালী দে	মদমহেশ্বর	হিমালয় সমীক্ষা(পত্রিকা) পঞ্চম বর্ষ ১৯৮১
প্রাণেশ চক্রবর্তী	হিমালয়ের গোপনপুরে	হিমালয়ের গোপনপুরে/ জয়শ্রী প্রকাশনী/প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫
শিশির ঘোষ	লাঙ্গুল সিংহের সন্ধানে	লাঙ্গুল সিংহের সন্ধানে/ শৈব্যা পুস্তকালয়/ প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২
শম্ভুনাথ ঘোষ	কল্পেশ্বর	হিমগিরির অঙ্গনে/ হিমগিরি প্রকাশনী/ প্রথম প্রকাশ অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৮৪
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বপ্নের মায়াবতী	আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ মার্চ, ১৯৯৭
শিবশংকর ভারতী	সাধুসঙ্গ	ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ (১ম খন্ড) ভাস্বতী/ প্রথম প্রকাশ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
রতন লাল বিশ্বাস	দোলপা এক নিষিদ্ধ দেশ	নেপাল থেকে নেপালে(প্রথম পর্ব) পথ পরিক্রমা/প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
স্বপন রায়	যমুনোত্রী	সচিত্র পূর্বায়ণ/ পূজা সংখ্যা ১৩৯৪
সুজিতকুমার আঢ্য	পশ্চিম হিমাচলের শৈলশহর	মাসিক চোখ পত্রিকা/ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৯৭

যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫ — ১৮৭০)

বহুতীর্থ পর্যটনকারী, সঙ্গীত রচয়িতা এবং লেখক। জন্ম রাধানগর, জাহানাবাদ (অধুনা আরামবাগ) হুগলী। পিতা মথুরামোহন সর্বাধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত লহরী, তীর্থভ্রমণ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭ — ১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা। অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং বাংলা ভাষা চর্চায় আগ্রহী হন। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্ম। তাঁর 'আত্মজীবনী' বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ।

স্বামী রামানন্দ ভারতী (১৮৩৬ — ১৯০১)

পূর্বাশ্রমের নাম রামকুমার ভট্টাচার্য। জন্ম ফরিদপুরের সামন্তসার-ইদিলপুর। সংস্কৃত অধ্যয়ন করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান। হিন্দুধর্মে আস্থা হারিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষির ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন। স্ত্রী ও শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর নর্মদাতীরবাসী এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে 'স্বামী রামানন্দ ভারতী' নামে পরিচিত হন। হিমালয়ের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। রচিত গ্রন্থ ঃ উদাসীনবাবার আসাম ভ্রমণ, চিরযাত্রী এবং হিমারণ্য।

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯ — ১৯৩৭)

পদার্থবিদ, জীবনবিজ্ঞানী এবং সুলেখক। জন্ম ৩০ নভেম্বর, মৈমনসিংহে। ১৮৮০তে বি.এ পাশকরে বিলাত যান। কেমব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ এবং লন্ডন থেকে বি.এস.সি পাশ করেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ অব্যক্ত (প্রবন্ধ সংকলন)।

জলধর সেন (১৮৬০ — ১৯৩৯)

সাহিত্য পত্রিকার খ্যাতিমান সম্পাদক এবং বিশিষ্ট লেখক। ১৩২০ থেকে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন। ১৩ মার্চ নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম। গল্প, উপন্যাস, জীবনী লিখলেও খ্যাতি পান প্রবাস চিত্র এবং হিমালয় গ্রন্থের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ — ১৯৪১)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশতম সন্তান। জোড়াসাঁকোয় জন্ম ২৫ বৈশাখ। শৈশব থেকেই কাব্য রচনায় পারদর্শী। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ, সাহিত্যের সব শাখাতেই

স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন। 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে। ১৯০১ সালে বোলপুর শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মাচর্যশ্রম' আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পরে 'বিশ্বভারতী'তে পরিণত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ — ১৯০২)

ধর্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারক, পরিব্রাজক এবং বিদগ্ধ লেখক। পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলকাতার সিমলা পল্লীতে জন্ম। ১৮৯৩ তে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। হিন্দুধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে শিবজ্ঞানে জীবসেবার জন্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরিব্রাজক রাজযোগ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাংলাভাষার স্থায়ী সম্পদ।

স্বামী অখন্ডানন্দ (১৮৬৪ — ১৯৩৭)

পূর্বনাম গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৭ জন শিষ্যের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গী ও সহচর হয়ে বহুতীর্থ পর্যটন করেন। তাঁর 'তিব্বতে তিন বৎসর' উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ ঃ স্মৃতিকথা ও ভক্তের ডায়েরী।

স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬ — ১৯৩৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যতম প্রধান শিষ্য। পূর্বাশ্রমের নাম কালীপ্রসাদ চন্দ। ছেলেবেলা থেকেই ধর্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। পৃথিবীর বহুদেশে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৯২২ সালে কাশ্মীর থেকে তিব্বত পর্যটন করে লেখেন কাশ্মীর ও তিব্বতে।

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭ — ১৯১১)

পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে ২৮ অক্টোবর জন্ম। ১৮৯৫ এ লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে আসেন ১৮৯৮-এ। স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নেন। নাম হয় নিবেদিতা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নারী শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কালী, দি মাদার, দি মাষ্টার এ্যাজ আই স হিম এবং স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮ — ১৯৫৬)

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ। ১৮৯৬ এ ইংল্যান্ড যান আইন পড়তে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অগ্রজের অনুপ্রেরণায় আইন ছেড়ে ইতিহাস,দর্শন, বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। রামকৃষ্ণ

মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (তিনখণ্ড) এবং শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অনুধ্যান উল্লেখযোগ্য রচনা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ — ১৯৩২)

আদি নিবাস গুরাপ, হুগলী। ১৯০১ সালে বিলাত যান। ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেন। ১৯১৬ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। ভারতী পত্রিকায় কবিতা লিখে সাহিত্য জীবন শুরু। পরে গদ্য রচনায় হাত দেন। কুন্তলীন পুরস্কার পান রাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখে। ১৪ টি উপন্যাস এবং শতাধিক গল্প লেখেন। সিন্দুর কৌটা, দেশী ও বিলাতী এবং সতীর পতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫ — ১৯৭৯)

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, তন্ত্রাভিলাষী এবং সুলেখক। সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। তন্ত্রের গূঢ় রহস্য ও তান্ত্রিকের সন্ধানে ভারত ও তিব্বত ভ্রমণ করেন। তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর এবং হিমালয়ের মহাতীর্থে তাঁর বিখ্যাত রচনা।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০২ — ১৯৯৮)

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। কলকাতার ভবানীপুরে ১২ অক্টোবর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম.এ। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ হিমালয়ের পথে পথে, পঞ্চকেদার এবং কৈলাস ও মানস সরোবর। ১৯৭১সালে অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫ — ১৯৮৩)

কলকাতায় জন্ম। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও সিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। পদাতিক, স্বদেশ, বিজলী ছাড়া যুগান্তর সাময়িকী কিছুদিন সম্পাদনা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর সব দেশেই ভ্রমণ করেন। ১৯৭৮ এ উত্তরমেরুতে যান। তাঁর মহাপ্রস্থানের পথে, দেবতাত্মা হিমালয় এবং উত্তর হিমালয় চরিত বাংলা সাহিত্যের আকর গ্রন্থ।

লেঃ কর্ণেল সত্যেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯১০ —)

সেনা বাহিনীর চিকিৎসক হয়েও হিমালয়ের বহু দুর্গম তীর্থপথে পর্যটন করে বেড়ান। যুগান্তর এবং হিমাদ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি 'হিমবন্তের দেব দেউল' গ্রন্থে স্থান পায়। জন্ম ২৮ ডিসেম্বর, নদীয়া জেলার কাঁচরাপাড়ায়।

কমলা মুখোপাধ্যায় (১৯১৩ —　　)

স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী এবং লেখক। হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় জন্ম ২৪মে। উচ্চশিক্ষা লাভ কলকাতায়। শিক্ষকতায় সমস্ত জীবন কাটে। পাশাপাশি চলে সমাজসেবা ও ভ্রমণ। অধিকাংশ লেখালেখি হিমালয়কে ঘিরে। সম্পাদনা করেন হিমালয় সমীক্ষা, মন্দিরা ও ঘরে বাইরে। অবসর জীবনেও যাবতীয় চিন্তাভাবনা মেয়েদের সমাজসেবা নিয়ে।

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ (১৯১৮ —　　)

বিশিষ্ট সাংবাদিক, ভ্রমণ পিপাসু এবং অন্তর্মুখী লেখক। মৈমনসিংহের ফুলবাড়িতে জন্ম।১৯১৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। কেদার-বদ্রী ভ্রমণ করতে গিয়ে হিমালয়ের মোহে পড়ে যান। পেশাগত কারণে ইংরেজি লিখতে হলেও হিমালয় বিষয়ে বহু বাংলা রচনা ছড়িয়ে আছে বিখ্যাত পত্র পত্রিকায়। আশির কোটা পার করেও ভ্রমণ-প্রিয় মানুষটি এখনো একাকী ঘুরে বেড়ান হিমালয়ের পথে পথে।

জ্যোতি চৌধুরী (১৯১৯ —　　)

হিমালয় প্রেমিক জ্যোতি চৌধুরীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে। যৌবনে হিমালয়ের বহু দুর্গম অঞ্চলে পর্যটন করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কিন্নরলোক, নদীজপমালা এবং ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর।

যতীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (　　)

শিক্ষাব্রতী ও হিমালয় প্রেমী। ফি-বছর একাধিকবার হিমালয় তীর্থে পর্যটন করতে বেরতেন। স্বাধীনতার আগে পায়ে হেঁটে কৈলাস ও মানস সরোবর ভ্রমণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দুইবার শ্রীকৈলাস ভ্রমণ।

ভক্তি বিশ্বাস (১৯২১ —　　)

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহধন্যা ভক্তির জন্ম ২৪ অক্টোবর। জলপাইগুড়িতে। ১৯৫৯ সালে ১২৫ মাইল হেঁটে কেদার-বদ্রী দর্শন করেন। ১৯৬৩ তে সাতটি হিমবাহ পার হয়ে গোমুখ থেকে বদ্রীনারায়ণ যান। হিমালয়ের নানাস্থান ভ্রমণ করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রতিবেশী ভুটান, নেপাল হিমালয় এবং অরুণাচলের পথে পথে।

গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩ —　　)

ছদ্মনাম ঃ রূপদর্শী, বেতালভট্ট এবং গৌড়ানন্দ কবি। জন্ম ঃ হাটগোপালপুর, যশোর, বাংলাদেশ। প্রথমে দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকায় যুক্ত হন পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক এবং শেষে

সহযোগী সম্পাদক। ১৯৮০ তে আজকাল এর সম্পাদক। পরে ফের আনন্দবাজারে যোগদান করেন। সাংবাদিকতার জন্যে দক্ষিণ কোরিয়ার কো.জয়. উক(১৯৭৮) এবং ম্যাগসেসে (১৯৮১) পুরস্কারে ভূষিত হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ সাগিনা মাহাতো, অন্নপূর্ণা অভিযানএবং নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি। 'প্রেম নেই' উপন্যাসের জন্য বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৮২) পান।

কালকূট (১৯২৪ — ১৯৮৮)

সমরেশ বসু (পিতৃদত্ত নাম সুরত নাথ বসু)র ছদ্মনাম। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবন। কালকূট নামে লেখা উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার সূচনা করে। প্রথম রচনা ভোট দর্পন। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হন। উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ কোথায় পাব তারে, অমৃত বিষের পাত্রে, মন চল বনে প্রভৃতি। 'শাম্ব' উপন্যাসের জন্য ১৯৮০ তে অকাদেমি পুরস্কার পান।

নারায়ণ সান্যাল (১৯২৪ —)

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও চিত্রকর। ছদ্মনাম ঃ আধুনিকা দেবী, বিকর্ণ। জন্ম কলকাতায় ২৬ এপ্রিল। গতানুগতিক ধারার বাইরে বিচিত্র বিষয়ে বহু রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ দন্ডক শবরী, আমি নেতাজীকে দেখেছি, পথের মহাপ্রস্থান ইত্যাদি। 'অপরূপা অজন্তা'র জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৬ —)

আজীবন শিক্ষাব্রতী, হিমালয় প্রেমিক এবং সুলেখক। হিমালয়ের টানে বহুবার ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন। নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, হিমালয় পথে ভিলাঙ্গনা ও পাঁওয়ালী কান্থা এবং নানা কণ্ঠ স্মৃতির ভিতরে। জন্ম কলকাতায় ১৯ আগষ্ট। এখনো তিনি সৃষ্টিশীল।

কমলকুমার গুহ (১৯২৮ —)

ছদ্মনাম 'মহারাজ'। যৌথভাবে প্রথম গ্রন্থ 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' লিখে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে সাড়া জাগান। চাকরীর সুবাদে দেশে বিদেশে প্রচুর ভ্রমণ করলেও হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। বহু পর্বত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ থেকে প্রকাশ করে চলেছেন 'HIMAVANTA' নামে পর্বতারোহণ ও অভিযান বিষয়ে মাসিক পত্রিকা। কমলকুমার পৃথিবীর বহু দেশে পর্বত অভিযান বিষয়ে নিয়মিত সাংবাদিক। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অচেনা কাশ্মীর। জন্ম ঢাকায় ২৫ সেপ্টেম্বর।

শম্ভুনাথ দাস (১৯২৯ — ১৯৯৭)

হিমালয়ের বিশিষ্ট পর্যটক এবং গবেষক। জন্ম মাতুলালয় যশোহরে ' ১৫ সেপ্টেম্বর। বহু পর্বত অভিযানে অংশ নেন। হিমালয় বিষয়ে প্রচুর লেখা ছড়িয়ে আছে নানা পত্র পত্রিকায়। একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দুর্যোধন দ্রৌপদীর দেশে। প্রয়াত হন ২৫ আগষ্ট ১৯৯৭তে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০ —)

বিশিষ্ট গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং ভ্রমণ কাহিনীর লেখক। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন: সুযোগ পেলেই হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। জন্ম ৩ জানুয়ারী ঢাকার কয়কীর্তন গ্রামে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পিন্ডার হিমালয়ে, পায়ে পায়ে হিমালয় এবং বহুপতির দেশে।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯৩০—)

ভ্রমণ সাহিত্যে সুপরিচিত নাম। দেশ ভ্রমণের জন্যে ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। পুরীতে ধরা পড়ে ফিরে আসেন। অনেক বাছাই করে রেল-এ চাকরি নেন সারাজীবন ভ্রমণ করবেন বলে। ১৯৬০এ রূপকুন্ডে যান। পরের পঁচিশ বছর বিরতিহীনভাবে হিমালয় ভ্রমণ করেন। পাবনার সোহাগপুরে জন্ম ১৩৩৭ সালের ২২ আষাঢ়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পথের তীর্থে, সিকিম, হিমালয়ের ফুল, গঙ্গার কথা, চৈতন্যরহস্য সন্ধানে ইত্যাদি।।

ধ্রুব মজুমদার (১৯৩০ — ১৯৯৩)

বাংলাদেশের চাঁদপুরে ২৯ ডিসেম্বর জন্ম। প্রথম হিমালয় দর্শন ১৯৫৫ সালে। তীর্থযাত্রী হিসাবে। তারপর বহুবার হিমালয়ে যান। কখনো পর্বত অভিযাত্রী। কখনো সাংবাদিক। তাঁর অধিকাংশ লেখাই হিমালয় কেন্দ্রিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সো মাভাং, হিমালয় বিচিত্রা এবং সহসা হিমালয়। প্রয়ান ঘটে ১৯৯৩ এর ২৯ ডিসেম্বর।

শঙ্কু মহারাজ (১৯৩১ —)

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। আজীবন কেবল ভ্রমণ সাহিত্যই রচনা করেছেন। জন্ম বাংলাদেশের বরিশালে। যৌথভাবে 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' লিখে প্রচুর খ্যাতি পান। গ্রন্থসংখ্যা তিপ্পান্ন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মধু বৃন্দাবনে (৩খন্ড), কাশীখন্ড, গজমোতী গোয়া এবং দেশের মাটি।

গোপালকৃষ্ণ রায় (১৯৩৩ —)

সাংবাদিক হলেও গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ রচনা, জীবনী গ্রন্থের সঙ্গে লিখেছেন অজস্র ভ্রমণ কাহিনী।

টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে বাংলাভাষায় তাঁর দৃষ্টান্তমূলক উপন্যাস 'ডোনার ফাদার'। সুচিত্রা সেন-এর অন্তরঙ্গ জীবনী 'সুচিত্রার কথা' তাঁকে বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা দিয়েছে। বর্তমানে গুয়াহাটির 'সময় প্রবাহ'র বিশেষ প্রতিনিধি। জন্মঃ ১২ মার্চ টাঙ্গাইলের হালিসাকান্দায়। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে চেনা মানুষ অচেনা জীবন, নয়ন, অনলে পুড়িয়া গেল এবং বালফাকরাম অন্যতম।

সুনীল চৌধুরী (১৯৩৩ — ১৯৮৮)

নির্ভীক পর্বতারোহী, সমাজসেবী ও সুলেখক। চাকরী করতেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলে। সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন হিমালয়ে। বাংলাদেশ, যুগান্তর, কথা সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় ভ্রমণ বিষয়ে বহু রচনা লিখেছেন। অন্যতম প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তীর্থ সুন্দরডুঙ্গা, নীলকণ্ঠের ডাকে, ত্রিশূলী তীর্থের পথে এবং অভিযাত্রী।

অমিয়কুমার হাটি (১৯৩৫ —)

স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং সুলেখক। ছদ্মনাম ঃ নাগার্জুন। একাধিক পর্বত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ভ্রমণ বিষয়ক রচনা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম ঃ ৩০ জুন আহমেদপুর, বীরভুম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মধুরা, এবং চতুরঙ্গী অভিযান। 'ক্যানসার' গ্রন্থের জন্য ১৯৮৫ তে রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

বিশ্বদেব বিশ্বাস (১৯৩৬ —)

বাঙালী পর্বতারোহীদের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। পর্বত অভিযান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশ্বদেবের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় হিমালয়ের নানা অভিযান। তাঁর লেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে এবং পাহাড় যখন ডাকে বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। নাগপুরে জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৮৮ তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তেনজিং পুরস্কার এবং ১৯৮৯ পান SPORTS AWARD. অশোককুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৯০ তে।

অশ্রুময় গুহঠাকুরতা (১৯৩৬ — ১৯৯৪)

দক্ষ পর্বতারোহী, নিষ্ঠাবান সম্পাদক এবং প্রচার বিমুখ লেখক। হিমালয়ের বহু পর্বত অভিযানে অংশগ্রহণ করে দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। হিমালয় অভিযান ভিত্তিক বহু মূল্যবান পুস্তক পুস্তিকা সম্পাদনা করেছেন। ভ্রমণ রসিকদের জন্যে উপহার দিয়েছেন দুটি অমূল্য গ্রন্থ ঃ নন্দাকিনীর উৎস পথে এবং গাড়োয়ালের গিরিবর্ত্মে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত (১৯৩৭ —)

সুপরিচিত চিত্রশিল্পী, কবি, অভিজ্ঞ সম্পাদক এবং অন্তর্মুখী লেখক। যশোরের কালিয়ায় জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতায় এম. এ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ পাখি জানে, নৈঃশব্দ্যের

প্রতিধ্বনি। উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ছুটির গল্প(দু'খন্ড) এবং শতবর্ষের রূপকথা। শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্যে সুনির্মল বসু পুরস্কার পান ১৯৮২ তে। অবসরকালীন সময়েও তাঁর কলম এবং তুলি সমান সচল।

দীপক কুমার সরকার (১৯৩৭ —)

পঞ্চাশের গোড়ায় প্রথম হিমালয় দর্শন করেন। পরের পাঁচ দশক হিমালয়ের নানা প্রান্তে ভ্রমণ করে বেড়ান। এই ধ্যানী অভিযাত্রী হিমালয় ছাড়া অন্যত্র ভ্রমণের কথা চিন্তা করতে পারেন না। জন্ম বহরমপুরে ১২ সেপ্টেম্বর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রূপতীর্থ রূপকুন্ড, নন্দন কাননে, পিন্ডারির পথে, মেঘের দেশে এবং বিপাসার জলসাঘরে।

সুজয়া গুহ (১৯৩৮ — ১৯৭০)

বাঙালী মহিলা পর্বতারোহিনীদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়েও অভিযান করেন। পাতার হাটি, বরিশালে জন্ম ৩০ জানুয়ারী। ১৯৭০ সালে লাহুলে এক অনামী শৃঙ্গে (পরে নামকরণ হয় ললনা শৃঙ্গ) অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দেন। ২১.১৩১ ফুট শৃঙ্গ টি আরোহণের পর মূল শিবির থেকে বাতাল গ্রামে যাবার পথে এক সঙ্গীকে করচা নালায় ভেসে যেতে দেখে 'শক'এ তার মৃত্যু হয়। মুম্বইয়ের ক্লাইম্বারস ক্লাব প্রতিবছর তাঁর নামে ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা পর্বতাভিযাত্রীকে শীল্ড দিয়ে থাকেন।

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী (১৯৩৮ —)

বিশিষ্ট পর্বতারোহী এবং গ্রন্থকার। বহু পর্বত অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। দীর্ঘদিন হিমালয় ভ্রমণের মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন হিমালয়ের সর্বপ্রথম গাইড বই 'হিমালয় সাথী'। সর্বস্তরের পাঠক দ্বারা গ্রন্থটি সমাদৃত হয়। এরপর লেখেন মারসেন্দি মারসেন্দি, মহাদেবের জটার দেশে, পায়ে হেঁটে হিমালয় এবং হিমালয়ের দিনগুলি। লেখকের জন্ম কলকাতায় ১৫ জুন।

শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮ —)

অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালিতে জন্ম ১৬ আগষ্ট। যৌবনে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন প্রকাশন জগতে। ১৯৭৮ সাল থেকে হিমালয়ের নানা প্রান্তে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। পত্র পত্রিকায় বিস্তর লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ থোরাং পেরিয়ে মুক্তিনাথ এবং সুন্দরডুঙ্গা পিরী।

দীপালী দে (১৯৩৮ —)

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং ভ্রমণ কাহিনী লেখক। বহুবার হিমালয় পর্যটন করেছেন। শিল্পী সুলভ মন দিয়ে দেখেছেন হিমালয়ের সৌন্দর্য। তবে প্রাণবন্ত সত্তার তাগিদে বিশেষভাবে দেখেছেন হিমালয়ের

বৃক্ষ, লতা এবং ফুল। যা তাঁর গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করেছে। জন্ম কলকাতায় ৩০ আগষ্ট। একসময় 'হিমালয় সমীক্ষা' নামে পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

প্রাণেশ চক্রবর্তী (১৯৪০ —)

জনপ্রিয় পর্বতারোহী এবং আত্মমগ্ন লেখক। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে তিনি তাঁর অনন্য লেখনী শৈলীতে স্বতন্ত্রমাত্রা যোগ করেছেন। হিমালয় প্রসঙ্গে তাঁর দুর্লভ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রয়েছে তিনটি গ্রন্থে — মানসী মানা, রক ক্লাইম্বিং এবং হিমালয়ের গোপনপুরে। ১৯৪০ এর জানুয়ারীতে মৈমনসিংহে জন্ম।

শিশির ঘোষ (১৯৪০ —)

অভিজ্ঞ পার্বতারোহী, দক্ষ সংগঠক এবং ভ্রমণ কাহিনী লেখক। ১৯৬৭ তে গাড়োয়াল হিমাল শ্রীকণ্ঠ অভিযান করেন। তারপর একে একে কোকশ্যেন ও ঘুষুপিসু, লাম্পাক, ফ্লুটেড পীক প্রভৃতি শৃঙ্গে সফল অভিযান করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ লাহুল সিংহের সন্ধানে এবং মন্দির পর্বত। জন্ম কলকাতায় ৮ জানুয়ারী। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার পর্বতারোহী দলের কার্যকারী সম্পাদক

শম্ভুনাথ ঘোষ ( )

হিমালয় প্রেমী এবং গ্রন্থকার। হিমালয়ের দুর্গম পথে দীর্ঘদিন পর্যটন করে বেড়ান। হিমালয়ে তীর্থগুলিই লেখককে আকৃষ্ট করেছে বেশি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিমগিরির অঙ্গনে।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫১ —)

অননুকরণীয় আঙ্গিক এবং সুললিত ভাষায় লিখতে পারেন গল্প, উপন্যাস কিংবা ফিচার। যা খু সহজে পাঠকের মনের জানালা খুলে দেয়। হিমালয়ের রূপ ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হলে, পাঠকে তার ছবি লিখে মোহিত করতে পারেন। ৪ জানুয়ারী চন্দননগরে জন্ম। একসময় 'দন্দশূ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। নিত্যনতুন কিছু সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর থাকেন প্রতিনিয়ত। প্রকাশি গ্রন্থ দু'টি ঃ দহনবেলা এবং হননমেরু।

শিবশংকর ভারতী (১৯৫১ —)

কলকাতায় জন্ম। প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষী এবং লেখক। জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রথমদিকে প্র সংগ্রাম করতে হয়েছে। তীর্থ পরিক্রমার মধ্যে তিনি প্রাণের আনন্দ খুঁজে পান। ভ্রমণ বিষ অসংখ্য লেখা ছড়িয়ে আছে নামী পত্র পত্রিকায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ তীর্থ হিমালয়ে, জ্যোতি পন্ডিত না ৪২০ এবং ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ (৪খন্ড)।

রতন লাল বিশ্বাস (১৯৫৪ —)
সমকালীন ভ্রমণ সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। হিমালয়ের নানা দিক দিগন্তে অসংখ্যবার ভ্রমণ করেছেন। বিগত তিন দশকে ষাটটির বেশি পদযাত্রা সংগঠিত করেন। ভ্রমণ বিষয়ে লিখেছেন প্রচুর। ১০ নভেম্বর টিটাগড়ে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নেপালের তিন দিগন্ত, নেপাল থেকে নেপালে (প্রথম পর্ব) এবং লা-সো-লাদাখ।

স্বপন রায় (১৯৫৫ —)
ছেলেবেলা থেকেই ভ্রমণে অনুরাগী। পরিণত বয়সে হিমালয় মোহিত করে। প্রথম হিমালয় যাত্রা তীর্থযাত্রী হিসাবে। এখন সুযোগ পেলেই ছুটে যান হিমালয়ের নানা প্রান্তে। মধ্য কলকাতায় জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দু'চারদিনের ভ্রমণ এবং পশ্চিমবঙ্গের মেলা।

সুজিতকুমার আঢ্য (১৯৫৫ —)
ভ্রমণ রসিক ও মুক্ত আলোকচিত্রী। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করলেও হিমালয় ভ্রমণ করেছেন বিশেষ আগ্রহ নিয়ে। ভ্রমণ বিষয়ক রচনা এবং ছবি প্রকাশিত হয়েছে নামী পত্রিকায়। কলকাতায় জন্ম ২৮ অক্টোবর। গ্রন্থভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর অসংখ্য রচনা।

"অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং শম্ভুনাথ ঘোষ-এর জন্ম তারিখ, জন্মস্থান ইত্যাদি বিষয়ে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।"

— সম্পাদক

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে বুক ট্রাস্টের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

শতবর্ষের ভ্রমণকথা ১০০.০০

সম্পাদনা/তাপস কুমার ঘোষ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ হয়ে আধুনিক কালের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন পর্যন্ত ৫৫ জন লেখকের ভ্রমণ কাহিনীর এক আশ্চর্য সংকলন. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে পৃথিবীর মোহময় স্থানগুলির কাহিনী, বৈচিত্রের দিক থেকে বইটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

* * *

অথ কাশী কথা ৭০.০০

সম্পাদনা/তাপস কুমার ঘোষ

কাশী বাঙ্গালীর চিন্তায়-মননে এক রোমাঞ্চকর শব্দ। নানা বয়সের, নানান মানসিকতার মানুষের কাছে কাশীর আবেদন নানামুখী কিন্তু দুর্নিবার। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ২৫জন লেখকের লেখা নিয়ে এক অনবদ্য সংকলন অথ কাশী কথা।

* * *

হিমালয়ের দিনগুলি ৮০.০০

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ছেলেবেলায় হঠাৎ খেয়ালের বসেই পা-রাখা হিমালয়ে। তারপর, একটানা চল্লিশ বছর হিমালয় পরিক্রমা। কখন যেন নিজেকেই জড়িয়ে ফেলেছেন হিমালয়ের সাথে। প্রদীপ্ত চক্রবর্তীর সেই সুদীর্ঘ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার এক অসাধারণ এ্যালবাম, হিমালয়ের দিনগুলি।